বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ

প্রধান সম্পাদক

শামসুজ্জামান খান

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

মো. আলতাফ হোসেন

সহযোগী সম্পাদক

আমিনুর রহমান সুলতান

বাংলা একাডেমি ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী

মাযহারুল ইসলাম তরু

সমন্বয়কারী

শহীদ সারওয়ার

সংগ্রাহক

কনকরঞ্জন দাস

আব্দুর রশিদ

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
চাঁপাইনবাবগঞ্জ

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪২১/ জুন ২০১৪

বাএ ৫২২২

প্রকাশক
মো. আলতাফ হোসেন
লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রণ
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
তিনশত সত্তর টাকা

BANGLADESHER LOKOJO SONSKRITI GRONTHAMALA : CHAPAI NAWABGONJ : (Present state of Folklore in Chapai Nawabgonj District) Chief Editor : Shamsuzzaman Khan, Managing Editor : Md. Altaf Hossain, Associate Editor : Aminur Rahman Sultan, Publication : *Lokojo Sonskritir Bikash Karmosuchi* (Programme for the Development of Folklore), Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2014. Price : Tk. 370.00 only. US$: 50

ISBN-984-07-5231-6

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমি তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখা-প্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমি থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমীর ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি তা চিহ্নিত করার

www.pathagar.com

জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায়নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *মৈয়মনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *মৈয়মনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমিতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে Cultural Survey of Bangladesh গ্রন্থমালা-এর অধীনে ফোকলোর অংশ ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হলো এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, "Folklore is folklore only when performed". অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements)

www.pathagar.com

কীভাবে সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য ফোকলোরের গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমি ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি*-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায় লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে

১. সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করতে হবে।
২. সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।
৩. সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।
৪. সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
৫. সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।
৬. সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।
৭. সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।
৮. প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।
৯. সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।
১০. সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।
১১. সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
১২. বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে।

www.pathagar.com

যে-সব তথ্য/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে

ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১. জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।

২. জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।

৩. জেলা/উপজেলার নদ-নদী, পুকুর-দিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।

৪. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষ-পার্বণ, বৈশাখি খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।

৫. জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।

৬. লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/উপজেলার হাট-বাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।

৭. অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

খ. লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত

১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।
   - ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শক-শ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।
   - খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা

ক. ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।

খ. ডেস্ক-ওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।

গ. দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।

ঘ. যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রা-পথ।

ঙ. স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।

চ. থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌঁছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।

www.pathagar.com

ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।

জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item-যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

ঞ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

ট. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে “From the perspective of living community and to be specific, functionally”, ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে-ফিল্ডওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics)

www.pathagar.com

অভ্যন্তরীণ নিয়ম (inner rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উদ্ভাবনা এবং দর্শক/শ্রোতা (audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active tradition-bearer) প্রতিক্রিয়া/মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ড. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।

ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটেনি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত

www.pathagar.com

করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে রাজশাহীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
নির্দেশিকা

সংজ্ঞা : Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় : Folklore is folklore only when performed– Roger D Abrahams জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়। জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

১. নামকরণের ইতিহাস : কাহিনি, কিংবদন্তি॥ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট॥ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য॥ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলদ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খাল-বিল-হাওর॥ মৃত্তিকার ধরন॥ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু॥ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি)॥ নারী-পুরুষের হার॥ তরুণ ও প্রবীণের হার॥ শিক্ষার হার॥ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয়॥ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি)॥ শিল্প-কারখানা॥ ব্যবসা-বাণিজ্য॥ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি)॥ খাদ্যাভ্যাস॥ পোশাক-পরিচ্ছদ॥ পেশাগত পরিচয়॥ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ)॥ হাটবাজার, বড়ো দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরস, বটতলা ইত্যাদি॥ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি। (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

২. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ : আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন—গুনাই যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা (চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা,

www.pathagar.com

রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা, খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন (বহু জেলা), আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান (সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাশুরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোনা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া মানিকগঞ্জ, আটপাড়া, নেত্রকোনা), মানিক পির (সাতক্ষীরা), ইত্যাদি; মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমর্দের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর উপজেলা, মানিকগঞ্জ), গুড়পুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার, ঢাকা), শীতলপাটি (বড়োলেখা), বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাট-বাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা)।

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব (চাঁদপুর), আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর),

www.pathagar.com

গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোনা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালিদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মালাইকারী, মুক্তাগাছার মণ্ডা (ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহী), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহী), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ী), রসগোল্লা (জামতলী, যশোর), রাজভোগ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ), কার্তিক কুণ্ডুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ক্ষীরের চমচম, সন্দেশ (নড়াইল), বরিশাল মেহেন্দিগঞ্জের ঘোল এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়ে হলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্দা, গোল্লাছুট, হাডুডু, বউছি, নৌকা বাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি), বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা)।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধাবাড়ীর শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহরমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুণিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)। (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

৩. **উপাদানের বিন্যাস :** একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলাভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৪. **তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা।** (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৫. **ছবি।** (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৬. **সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান।**

মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যে-সমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :

১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছেদে)। ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শুলুক। ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি :

www.pathagar.com

ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি, পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরস, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর। ১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম বাংলার চায়ের দোকান। ২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

মাঠকর্মে অন্য যে-সব বিষয় থাকবে না

১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।
২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।
৩. এলাকার কবি-সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদ-নদী ও খাল-বিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা (folk tale), রূপকথা (fairy tale) খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth), ঘ. কবিগান, ঙ. লোকছড়া, চ. লোককবিতা, ছ. ভাটকবিতা, জ. পুথিসাহিত্য ও পুথি পাঠ।

তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)

ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঘ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad)

ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা/গীতিকা (ballad)

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)
১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব, ২. ঈদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরস ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তুপূজা, ১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন, ১৬. খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে ক্ষীর খাওয়ানো, ২৩. মানসিক (মানত),
২৪. গরুন্নাতের শিরনি, ২৫. ছড়ি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়ে হলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব।

ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance)
ক. লোকনাট্য : ১. যাত্রা, ২. পালাগান, ৩. আলকাপ গান, ৪. সংযাত্রা। খ. লোকনৃত্য।

সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)
১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-সিঙ্গারা, বুলবুলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাডুডু খেলা, ৭. ঘুড়ি ওড়ানো, ৮. ডাংগুলি খেলা, ৯. নৌকা বাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।

অষ্টম অধ্যায় : লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)
১. মিস্ত্রি/ছুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার, ৬. ঘরামি, ৭. ছৈয়াল, ৮. বাউয়ালি প্রভৃতি।

নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant)
ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।

দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)

একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)

দ্বাদশ অধ্যায় : লোকখাদ্য
১. পিঠা, ফিরনি, কদমা, মিষ্টি, ইত্যাদি

ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition)

চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)
১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/জাখা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা ছরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমির সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মো. আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন

www.pathagar.com

এবং অনবরত তাগাদা ও নিদের্শনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো পাণ্ডুলিপি আদায় করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য তাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ থেকে যে-বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতোপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা হয়নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত বাংলা একাডেমির পরিচালকবৃন্দ, প্রধান গ্রন্থাগারিক ও ফোকলোর উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব আমিনুর রহমান সুলতান এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ—Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে চাঁপাইনবাবগঞ্জের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

জেলা পরিচিতি (interoduction of the district) ২৩-৭০
ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা
খ. ভৌগোলিক অবস্থান
গ. বনভূমি ও গাছপালা
ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
ঙ. জনবসতির পরিচয়
চ. নদ-নদী ও খাল-বিল
ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা
ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তি
ঞ. মুক্তিযুদ্ধ
ট. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

লোকসাহিত্য (flok literature/ folk narrative) ৭১-১৩৪
ক. লোকগল্প/কিস্‌সা/কাহিনি/রূপকথা/উপকথা
খ. কিংবদন্তি
গ. লোকপুরাণ
ঘ. কবিগান
ঙ. লোককবিতা
চ. ভাটকবিতা
ছ. লোকছড়া
জ. পুথিসাহিত্য ও পুথিপাঠ

গ্রাম/স্থান নামকরণ (village/place name) ১৩৫-১৩৮

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture) ১৩৯-১৭৬
লোকশিল্প
১. মৃৎ শিল্প, ২. কাঁসা শিল্প, ৩. নকশি কাঁথাশিল্প, ৪. রেশমশিল্প, ৫. নকশি পাখা,
৬. নকশি শিকা, ৭. দারুশিল্প, ৮. চিত্রকলা

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ (folk costume) ১৭৭-১৮০
লুঙ্গি, গামছা, ধুতি, ফতুয়া, পিরহান প্রভৃতি

লোকস্থাপত্য (folk architecture) ১৮১-১৮৪
কোঠাঘর, দোচালা, চারচালা, আটচালা প্রভৃতি

www.pathagar.com

লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad) ১৮৫-২৮৮

ক. লোকসংগীত
১. গম্ভীরা
২. মেয়েলি গীত
৩. জারিগান
৪. নৌকার গান
৫. ব্যাঙ বিয়ের গীত
৬. কারাম উৎসবের লোকসংগীত
৭. সোহরাই উৎসবের লোকসংগীত
৮. ফাগুয়া উৎসবের লোকসংগীত
৯. সারহুল উৎসবের গান
১০. ওরাওঁ প্রেমসংগীত
১১. ওরাওঁ বিয়ের গীত
১২. সাঁওতালি প্রেমসংগীত
১৩. বাহা উৎসবের লোকসংগীত
১৪. সাঁওতালি বিয়ের গীত
১৫. দাঁসাই গান
১৬. দং গান
১৭. লাগড়েঁ গান
১৮. ডান্টা গান
১৯. গাম গান
২০. জান গান
২১. মহররমের ঝাণ্ডিগান
২২. চাঁপাইনবাবগঞ্জের আঞ্চলিক গান
২৩. গায়েনের গীত
২৪. নাতির গান
২৫. দেহতত্ত্বের গান
২৬. মুর্শিদি গান

খ. গাথা
১. উত্তরবঙ্গের ফকির বিদ্রোহ
২. নবাবগন্জে নীল বিদ্রোহ
৩. তেভাগা আন্দোলন

লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments) ২৮৯-২৯২

১. বাঁশি, ২. একতারা, ৩. দোতারা, ৪. ঢোল, ৫. খোল

লোকউৎসব (folk festival) ২৯৩-৩০৬

১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব
২. নবান্ন উৎসব

www.pathagar.com

৩. ঈদ উৎসব
৪. শারদীয় দুর্গোৎসব
৫. রথউৎসব
৬. জন্মাষ্টমী
৭. ওরস
৮. আশুরা
৯. বিয়ে উৎসব
১০. সোহরাই
১১. বাহা উৎসব
১২. এরো উৎসব
১৩. সারহুল উৎসব
১৪. কারাম উৎসব
১৫. খারিয়ানি উৎসব
১৬. ফাগুয়া

লোকমেলা (folk fair) ৩০৭-৩০৮
১. তত্ত্বিপুর গঙ্গাস্নানের মেলা
২. রথমেলা
৩. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা

লোকাচার (ritual) ৩০৯-৩২৪
১. অন্নপ্রাশন
২. খড়ের দাগার অনুষ্ঠান
৩. নাক ও কান ফোঁড়ানি
৪. জামাই ষষ্ঠী বা আমৈত
৫. আকিকা বা শিশু নামকরণের অনুষ্ঠান
৬. মানসিক বা মানত
৭. রাখাল ফোটা
৮. তেরিহা
৯. বিয়ে উপলক্ষে লোকাচার
১০. খৎনা বা মুসলমানি
১১. সাধ ভক্ষণ
১২. ষেটেরা
১৩. নামকরণ
১৪. শিশুর জন্মের পর আজান বা শংখধ্বনি

লোকখাদ্য (folk food) ৩২৫-৩২৮
১. কলাইয়ের রুটি, ২. নকশি পিঠা

www.pathagar.com

লোকনাট্য (folk theatre) **ও লোকনৃত্য** (folk dance) ৩২৯-৩৬০

ক. লোকনাট্য

আলকাপ

খ. লোকনৃত্য

১. গাজনের নাচ

২. ছোকরা নাচ

লোকক্রীড়া (folk games) ৩৬১-৩৯০

১. অস্ত্র লাঠি ও শক্তির খেলা, ২. গুটি বা ঘুঁটির খেলা, ৩. গুড্ডির খেলা, ৪. চোখ বাঁধা খেলা, ৫. কানামাছি খেলা, ৬. লোকচুরি খেলা, ৭. চোরচোর খেলা, ৮. কোটবন্দি ও ছকের খেলা, ৯. দারিয়াবান্ধা বা বন্দন, ১০. গোল্লাছুট, ১১. হা-ডু-ডু, ১২. বৌ-ছি খেলা, ১৩. বাঘ-বকরি খেলা, ১৪. রুমাল চুরি, ১৫. নুনতা খেলা, ১৬. ছড়ার খেলা, ১৭. ধাঁধার খেলা, ১৮. তাস জাতীয় খেলা, ১৯. নাট্যধর্মী খেলা, ২০. বুড়া-বুড়ির খেলা, ২১. টিয়ারে টিয়া খেলা, ২২. পশু-পাখির খেলা, ২৩. পানির খেলা, ২৪. নৌকা বাইচ, ২৫. ঘর কন্যা খেলা

লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups) ৩৯১-৪০০

১. জেলে, ২. দোহ'ড়্যা, ৩. কাঠ মিস্ত্রি/ ছুতার, ৪. গাছি বা গা'ছ্যা, ৫. রাজমিস্ত্রি, ৬. কলু, ৭. তাঁতি, ৮. কামার, ৯. কম্বল কারিগর, ১০. ওস্তা বা হাজাম, ১১. কাঁসারি, ১২. মুচি, ১৩. ময়রা

লোকচিকিৎসা (folk medicine) **ও তন্ত্রমন্ত্র** (chant) ৪০১-৪১৪

ক. লোকচিকিৎসা

খ. তন্ত্র-মন্ত্র

ধাঁধা (riddle) ৪১৫-৪২২

প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb) ৪২৩-৪৩২

লোকবিশ্বাস (folk belief) **ও লোকসংস্কার** (folk superstition) ৪৩৩-৪৪৪

লোকপ্রযুক্তি (folk technology) ৪৪৫-৪৬০

১. লাঙল, ২. জোয়াল, ৩. ছোট সেঁউতি, ৪. বড় সেঁউতি, ৫. মই, ৬. বিদা, ৭. মুগুর, ৮. নিড়ানি, ৯. কোদাল, ১০. মাথল, ১১. কাস্তে, ১২. হাসুয়া, ১৩. দা, ১৪. কাড়েল, ১৫. বাড়হুন, ১৬. ঢেঁকি, ১৭. ছ্যাওয়া, ১৮. যাঁতা, ১৯. ঘানি, ২০. কুমারের চাক, ২১. পইন, ২২. করাত, ২৩. বাটালি, ২৪. হাতুড়ি, ২৫. মৎস্য শিকার সরঞ্জাম

লোকভাষা (folk language) ৪৬১-৪৮০

www.pathagar.com

জেলা পরিচিতি

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল

আম, কাঁসা, পিতল, লাক্ষা, নকশি কাঁথা ও রেশমের জন্য বিখ্যাত এবং গম্ভীরা, আলকাপ, মেয়েলি গীতের মতো লোকউপাদানে সমৃদ্ধ এলাকা চাঁপাইনবাবগঞ্জ। এ জেলার অতীত অত্যন্ত গৌরবময়। ইসলামী স্থাপত্যকলার অজস্র নিদর্শন বুকে ধরে রাখা চাঁপাইনবাবগঞ্জ এক সময় ছিল প্রাচীন বাংলার রাজধানী গৌড়ের এক উল্লেখযোগ্য জনপদ। ঐতিহ্যবাহী ছোট সোনামসজিদ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত), দারসবাড়ি মসজিদ ও মাদ্রাসা (১৪৭৯ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত) এর ধ্বংসাবশেষ, শাহ্ সুজার কাছারি বাড়ি (১৬৩৯-৬৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত) হযরত শাহ্ নেয়ামতুল্লাহ (রঃ)-এর মাজার ও তোহাখানা মসজিদ (১৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত) খঞ্জনদিঘির মসজিদ, চাঁপাই জামে মসজিদ প্রভৃতি মসজিদ স্থাপত্যকলা এবং মকরমপুর ঘাটে বল্লাল সেন কর্তৃক নির্মিত শ্মশানবাড়ির ধ্বংসাবশেষ (১১৫৮-৭৯ খ্রিষ্টাব্দে) নওদার স্তুপ বা ষাঢ় বুরুজ (১১৭৯-১২৩৫ খ্রিষ্টাব্দ) নাধাইয়ের জমিদার বাড়ি, নাচোলের রাজবাড়ি, জোড়ামঠ প্রভৃতি হিন্দু স্থাপত্যকলার নিদর্শন চাঁপাইনবাবগঞ্জের ঐতিহাসিক গুরুত্বের পরিচায়ক।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ শুধু ঐতিহাসিক নিদর্শনেই সমৃদ্ধ নয়, অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে এখানকার মানুষের সংগ্রামের ইতিহাসও অত্যন্ত গৌরবময়। স্বদেশি ও বহিঃশক্তির প্রতিরোধে যুগে যুগে এ জেলার মানুষের বুকের তাজা রক্তে সিক্ত হয়েছে বরেন্দ্র ভূমির এই তপ্তভূমি। কৃষকের রক্তে প্রথমবারের মতো চাঁপাইনবাবগঞ্জের মাটি রাঙা হয়ে ওঠে ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে রামচন্দ্রপুরহাটে নীলকর জন ক্লাউনের বিরুদ্ধে সংঘটিত নীল বিদ্রোহে।[১] তারপর ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের জিতুবোটকা ও মানু সরদারের নেতৃত্বে সংঘটিত সাঁওতালদের বিদ্রোহের[২] কারণে চাঁপাইনবাবগঞ্জের মাটিতে রক্ত ঝরে। এরপর ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে ইলা মিত্র ও রমেন মিত্রের নেতৃত্বে তেভাগার দাবিতে সংঘটিত নাচোলের কৃষক বিদ্রোহে[৩] চাঁপাইনবাবগঞ্জ সংগ্রাম মুখর হয়ে ওঠে। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন[৪] এবং ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের মহান স্বাধীনতা[৫] সংগ্রামে চাঁপাইনবাবগঞ্জবাসীর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গৌরবময়।

ঐতিহ্যসমৃদ্ধ জেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জের সম্যক পরিচয় তুলে ধরতে হলে আমাদের ইতিহাসের আশ্রয় নিতে হবে। আর সে ইতিহাস নিঃসন্দেহে গৌড়ের ইতিহাস। কেননা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ যেহেতু গৌড়ের খণ্ডাংশ ছিল, সেহেতু এখানকার ইতিহাস গৌড়ের ইতিহাসের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। তবে সে আলোচনায় যাবার আগে চাঁপাইনবাবগঞ্জের নামকরণের ইতিহাস আলোচনা আবশ্যক।

www.pathagar.com

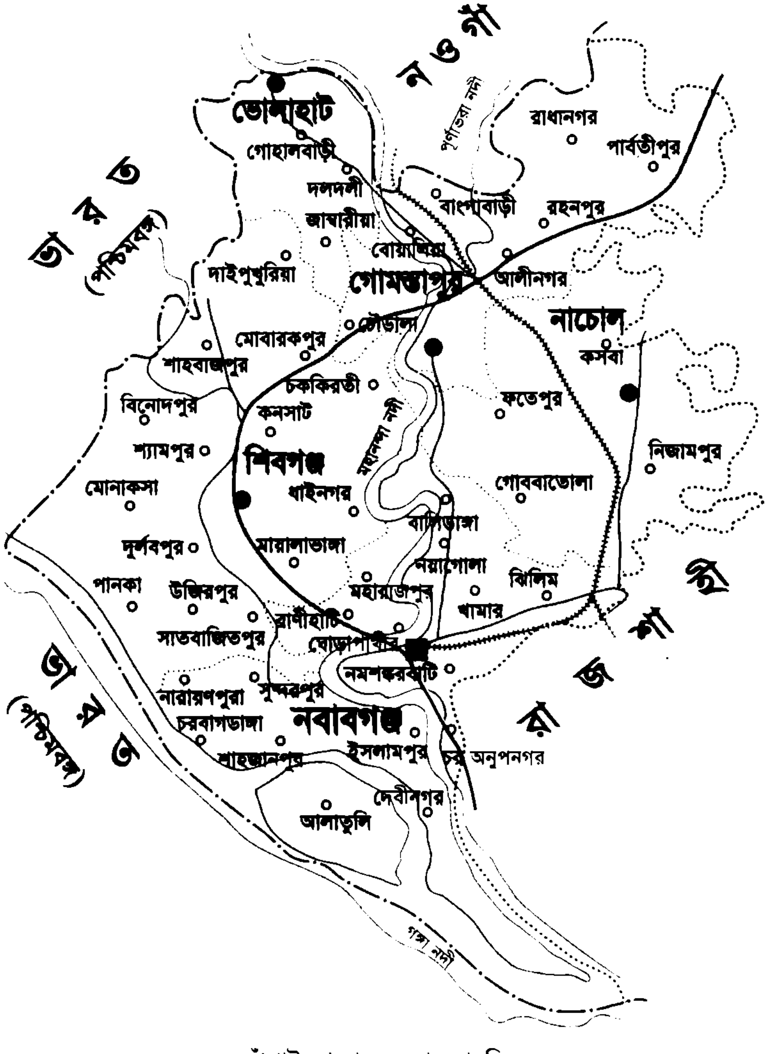

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মানচিত্র

www.pathagar.com

হিমালয়ের পাদদেশ থেকে বয়ে আসা মহানন্দা নদীর তীরে বরেন্দ্র ভূমির এক প্রান্তে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহর অবস্থিত। বরেন্দ্রভূমির বিস্তীর্ণ মাঠ প্রাচীন গৌড় নগরীর পরিত্যক্ত বিরাণভূমি আজ দেশের ব্যস্ততম জনপদে পরিণত হয়েছে বটে, কিন্তু খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, শতাব্দী পূর্বেও এখানে ছিল দুর্ভেদ্য জঙ্গল।

নবাবগঞ্জের নামকরণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে জানা যায়, পূর্বে এ অঞ্চল ছিল মুর্শিদাবাদের নবাবদের বিহারভূমি। যার অবস্থান ছিল বর্তমান দাউদপুর মৌজায়। নবাবরা তাঁদের পাত্র-মিত্রসহ এখানে শিকার করতে আসতেন বলে এ স্থানের নাম হয় নবাবগঞ্জ। যতদূর জানা যায়, বাংলা বিহার উড়িষ্যার অন্যতম নবাব সরফরাজ খাঁ (রাজত্বকাল ১৭৩৯-৪০ খ্রিষ্টাব্দ) একবার শিকারে এসে যে স্থানটিতে ছাউনি ফেলেছিলেন তা-ই পরে 'নবাবগঞ্জ' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। তবে অধিকাংশ গবেষকের মতে নবাব আলীবর্দী খাঁর আমলেই (১৭৪০-৫৬ খ্রিষ্টাব্দ) নবাবগঞ্জ নামকরণ হয়।[৬]

বর্তমান নবাবগঞ্জ রেলস্টেশনের সন্নিকটে হুজরাপুর ঘেঁষে এক সময় 'আমিরাবাজার' নামে এক জমজমাট ব্যবসা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। আমিরাবাজার গড়ে উঠার আগে নবাবগঞ্জের সূত্রপাত ঘটেছিল। আমিরাবাজার ধ্বংস হয়ে পরবর্তীতে নবাবগঞ্জ বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। আমিরাবাজার যে এককালে ঘনবসতি ও বন্দর ছিল নদীর ভাঙনে সে স্থানে অলংকারাদি, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হওয়ায় তা প্রমাণিত হয়। আমিরাবাজারের অদূরে (বর্তমান পাঠানপাড়া) তখন দুর্ভেদ্য জঙ্গল ছিল। চাঁপাই গ্রামের পথে গোকূলেও নিবিড় বন ছিল। সেখানে নানাপ্রকার হিংস্র জানোয়ার বসবাস করত। নবাব ও নবাবকর্মীরা এ স্থানে তাবু স্থাপন করে বন্যপশু শিকার করতেন। শিকারের কারণে স্থানটি তখন মুর্শিদাবাদে খুবই পরিচিত হয়ে ওঠে। নবাব আলীবর্দী খাঁর আমলে মুর্শিদাবাদ তথা পশ্চিমবঙ্গ মারাঠা কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে বরেন্দ্র ভূমি নিরাপদ মনে করে মুর্শিদাবাদ, খরদহ, বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি স্থান থেকে রাঢ়ী, ব্রাহ্মণ, কংশ, শিল্পী, তামুলি ও বহু মুসলমান সওদাগর গঙ্গা-মহানন্দার সঙ্গমস্থলের ভূখণ্ডে এসে বসতি স্থাপন করে। তখন এ স্থানে নলীয়া নামীয় এক শ্রেণির মুসলমানের বাস ছিল। নল-খাগড়ার জিনিসপত্র তৈরি করে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। তারপর বর্গীর ভয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে হাজার হাজার লোক আসার ফলে স্থানটি আরো সরগরম হয়ে ওঠে। কালক্রমে নবাবগঞ্জের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। নবাবগঞ্জের ডাকঘরটি চাঁপাই গ্রামে অবস্থিত হওয়ায় নবাবগঞ্জ 'চাঁপাইনবাবগঞ্জ' নামে পরিচিত হয়।[৭]

'চাঁপাই' নামকরণের ক্ষেত্রে দুটি কারণ রয়েছে বলে অভিজ্ঞমহল মনে করেন। কারণ দুটি হচ্ছে :

১. বর্তমান নবাবগঞ্জ শহর থেকে ৫/৬ মাইল দূরে মহেশপুর নামে একটি গ্রাম রয়েছে। নবাব আমলে এই গ্রামে নাকি 'চম্পাবতী' মতান্তরে চম্পারাণী বা চম্পাবাঈ নামে এক সুন্দরী বাঈজী (নৃত্য শিল্পী) বাস করতেন। তাঁর নৃত্যের খ্যাতি আশে-পাশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি নবাবদের প্রিয়পাত্রী ছিলেন। তারই নামানুসারে স্থানের নাম 'চাঁপাই' হয় বলে অনেকে মনে করেন।

www.pathagar.com

২. চাঁপাই নামকরণের আর একটি প্রচলিত মত হচ্ছে– এ অঞ্চল রাজা লক্ষীন্দরের বাসভূমি ছিল। লক্ষীন্দরের রাজধানীর নাম ছিল 'চম্পক' একথা সকলেই স্বীকার করেন। এখনও চম্পক নগরীর প্রকৃত চৌহদ্দী তথা অবস্থান কোথায় এ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। যা হোক নবাবগঞ্জ জেলায় আমরা চসাই, চান্দপুর, বেহুলা গ্রাম আর বেহুলা নদীরও সন্ধান পাই। অবশ্য এ বেহুলা নদী আজ মালদহ জেলায় প্রবাহিত। বিভাগ পূর্বকালে এ চাঁপাই মালদহ জেলার অধীনে ছিল। রাজশাহীর কৃতীসন্তান প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় (১৮৬১-১৯৩০) বলেছেন, বেহুলা তার স্বামীকে ভেলায় নিয়ে মহানন্দার উজান বেয়ে ভেসে গিয়েছিল।[৮] প্রখ্যাত ভাষাবিদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯)-এর 'বাঙলা সাহিত্যের কথা' ১ম খণ্ডে বর্ণিত লাউ সেনের শত্রুরা জামুতিনগর দিয়ে গৌড়ে প্রবেশ করে। বর্তমান ভোলাহাট উপজেলার জামবাড়িয়া পূর্বে জামুতিনগর নামে পরিচিত ছিল। এসবের ওপর ভিত্তি করে গবেষকগণ চাঁপাইকে বেহুলার শ্বশুরবাড়ি চম্পকনগর বলে স্থির করেছেন। তাছাড়া নবাবগঞ্জ-গোদাগাড়ীর মধ্যবর্তী গ্রামগুলোতে বেহুলা, চাঁদ সওদাগর ও লক্ষীন্দরের নাম এতই প্রবল যে চাঁপাইকে চাঁদ সওদাগরের রাজবাড়ি না বলে পারা যায় না।[৯] আসলে সেখানকার পুরাকালের অনেক ঘর-বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখেই এরূপ অনুমান করা হয়েছে বলে মনে হয়।

খ. ভৌগোলিক অবস্থান

ভৌগোলিক সীমারেখায় বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী জেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জ। এই অঞ্চলটির কিছু অংশ গৌড়ীয় এবং কিছু অংশ বরেন্দ্র। এর উত্তরে ভারতের মালদহ, দক্ষিণে পদ্মা ও ভারতের মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমে ভারতের মালদহ ও পদ্মা নদী এবং পূর্বদিকে রাজশাহী ও নওগা জেলা বিদ্যমান।[১০] এর মধ্যবর্তী অঞ্চল নিয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা গঠিত। গ্রাফসম্যানের ভূচিত্রাবলির ভৌগোলিক মানচিত্রে এ জেলার অবস্থান ২৪°.৬২''–২৫°.০৬'' উত্তর দ্রাঘিমায় এবং ৮৮°০৭''–৮৮°৩০'' পূর্ব অক্ষাংশে।[১১] রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কারণে জেলাটির মানচিত্র বেশ ক'বার ভাঙচুর হয়েছে। গৌড়ীয় ভাষা সমৃদ্ধ পোরশা অঞ্চল কিছুদিন পূর্বেও চাঁপাইনবাবগঞ্জের মধ্যে ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা নওগাঁ জেলার একটি উপজেলা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

পোরশা উপজেলা নওগার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের আয়তন কমেছে। ১৯৫১ খ্রি. জেলার আয়তন ছিল ৮৬৫ বর্গমাইল। কিন্তু বর্তমানে এটি ৬৭৯.০৫ বর্গমাইল (১৭৭১.০৬বর্গ কি.মি.) আয়তন সম্পন্ন জেলা। ১৯৫১ সালের সরকারি আদমশুমারিতে এর জনসংখ্যা ছিল ৫,০০,৫৩১ জন এবং বর্তমান জনসংখ্যা ১৬,৫১,০৯৩ (২০১০ সালের হিসাবে) জন। বর্তমানে এ জেলায় ৪৫টি ইউনিয়ন রয়েছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের শহরাঞ্চল ছাড়াও শিবগঞ্জের, শিবগঞ্জ পৌরসভা এবং নাচোল উপজেলার নাচোল পৌরসভাসহ– মোট তিনটি পৌরসভা রয়েছে। ১৯৪৭ খ্রি. দেশ বিভাগের পূর্বে এ অঞ্চল ছিল হিন্দু অধ্যুষিত। বর্তমানে এটি মুসলমান সমৃদ্ধ জেলা

www.pathagar.com

হলেও এখানে অনেক হিন্দু রয়েছে। পূর্বে এখানে কোন খ্রিষ্টান ছিল না। স্বাধীনতার পর কিছু সংখ্যক সাঁওতাল ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিষ্ট ধর্ম পালন করে। ফলে এখানে হিন্দু, মুসলিম, সাঁওতাল(ওরাওঁসহ) খ্রিষ্ট ধর্মের বাস। এছাড়াও এখানে রয়েছে, মেথর, ডোম, গুড়ি, চাঁই,চামার ইত্যাদি নিম্ন বর্ণের হিন্দু। সব ধর্ম ও সম্প্রদায় মিলিয়ে এখানে অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ বিদ্যমান।[১২]

এ জেলার মৃত্তিকায় রয়েছে বৈচিত্র্যের ছাপ। কোথাও বালিময়, কোথাও বেলে দো-আঁশ; কোথাও বা শক্ত কঠিন এঁটেল– যা শীত-গ্রীষ্মে কঠিন আর বর্ষায় কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল। আবার উঁচু ঢিবির কঙ্করময় হালকা লাল শক্ত মাটি– রুক্ষ অথচ উর্বর। স্থানীয় ভাবে একে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ক. দিয়াড় অঞ্চল–১. বালিময় ও বেলে দো-আঁশ। নদীর তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে সাধারণত পলিসমৃদ্ধ বেলে মাটি লক্ষ করা যায়। তার অদূরেই দো-আঁশ মাটি–এসব মিলিয়েই গড়ে উঠেছে ডালবীজ সমৃদ্ধ দিয়াড় অঞ্চল। খ. ভাতি অঞ্চল– কাঠাল ও দো-আঁশ।

এ অঞ্চলের মাটি কোন অংশে কঠিন কোন অংশে দো-আঁশ। এই অঞ্চলে সুমিষ্ট বাহারি আম ও ইক্ষুর মুগ্ধ সমারোহ। গ. লাল মাটির বরেন্দ্র অঞ্চল– ধান, গমের উৎকৃষ্ট অঞ্চল হিসাবে বিবেচিত। রেশমের চাষ হয় মূলত ভোলাহাট উপজেলার দো-আঁশ মাটিতে। তবে এই তিন অঞ্চলেই বিভিন্ন ফসল চাষ করা হয়। উষ্ণ,আদ্র ও সমভাবাপন্ন মৌসুমী জলবায়ূধন্য এ জেলার জলবায়ুকে ক্রান্তীয় প্রায়ার্দ্র মৌসুমি জলবায়ূ নামে চিহ্নিত করা যায়। বাংলাদেশে ৬টি ঋতুর অস্তিত্ব কথিত থাকলেও এই জেলা শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রধান অঞ্চল। এখানকার তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৪০°-৪৫° সেলসিয়াস। এবং সর্বোনিম্ন ৪°-৩° সেলসিয়াস। মৌসুমী বায়ূর প্রভাবে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১১.৯৯" –১৩.৪০" এর মধ্যে। তবে বিগত কয়েক বছরের হিসেবে বছর বিশেষে বৃষ্টিপাতের পরিমাণে লক্ষণীয় তারতম্য আছে। ২০০৫ খ্রি. পর সাম্প্রতিক বছর গুলোতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যাচ্ছে।

জেলার প্রধান নদী পদ্মার উজানে ভারতের পশ্চিম বঙ্গ অঞ্চলে গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণ করে স্বাভাবিক জলপ্রাবাহ ব্যাহত করা হয়েছে। যার কারণে ভারতের মালদহ, মুর্শিদাবাদসহ এ জেলার পদ্মা সংলগ্ন দিয়াড় অঞ্চলে ব্যপক নদী ভাঙন শুরু হয়েছে। বর্ষার সময় পশ্চিম বঙ্গ গঙ্গা ব্যারেজের সব ক'টি দরজা খুলে দেয় বলে জলপ্রবাহের আধিক্যে ও খরার সময় পানি কমিয়ে দেয় বলে খরার আধিক্যে এই জেলা আক্রান্ত। যার ফলশ্রুতিতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে ডিপ পাম্প নির্ভর ফসল চাষ করা হচ্ছে। এই দুই কারণে জেলাটির পানির স্তর অনেক নিচে নেমে গেছে।

জেলায় অনেকগুলো ইট ভাটার কারণে– খড়ির জন্য প্রচুর বৃক্ষ নিধন ও ভাটার ধোঁয়ায় পরিবেশের বিঘ্ন ঘটছে। প্রধানত গঙ্গা ব্যারেজের কুপ্রভাব পাশাপাশি ভাটার ধোঁয়া ইত্যাদির করণে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে জেলা ও জেলার আশেপাশের অঞ্চলে লু হাওয়ার আভাস লক্ষণীয়।

www.pathagar.com

গ. বনভূমি ও গাছপালা

খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ থেকে ২০০ বছর পূর্বে মৌর্য শাসনামলে বরেন্দ্র পুণ্ড্র বর্ধনের একটা ভুক্তি বা প্রদেশ ছিল মর্মে বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়। বরেন্দ্র অঞ্চলে সবচেয়ে পুরাতন জনবসতি ছিল যা খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ৬০০ বছরের প্রাচীন। গুপ্ত, পাল, সেন ও মুসলিম শাসনের পর ব্রিটিশ শাসনের প্রথম পর্যায়ে বাংলাসহ বরেন্দ্র অঞ্চল নির্মমভাবে শোষিত হতে থাকে। ১৭৭০ সালে (বাংলা ১১৭৬ সাল) বাংলা এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ইতিহাসে এই দুর্ভিক্ষ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিতি লাভ করে। এ দুর্ভিক্ষ বা মন্বন্তরে বাংলার এক তৃতীয়াংশ লোক মারা যায়। অসংখ্য সমৃদ্ধ জনবসতি বা গ্রাম পরিত্যক্ত ও উজাড় হয়। এর কারণে বরেন্দ্র অঞ্চলের অধিকাংশ জায়গা বিরাণ জঙ্গলে পরিণত হয়েছে।

আদিতে বরেন্দ্র অঞ্চলের সমতল বনভূমি পরিষ্কার করে বসতি স্থাপন ও জুমচাষের মত কৃষি কাজের প্রচলন ছিল বলে মনে করা হয়। সর্বোপরি ব্রিটিশ শাসনামলে ১৭৭১ সালের রেনেলেন রিপোর্ট, ১৮৫৯-৬০ সালের রেভিনিউ সার্ভে, ১৮৮৬ সালের সাইমন এর রিপোর্টে বরেন্দ্র অঞ্চলের অধিকাংশ জায়গা ঘনজঙ্গলে ঢাকা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৩]

বর্তমান চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা পুরাভূমি বরেন্দ্র অঞ্চলের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিগণিত। ১৮৭৬ সালের হান্টারের বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, সব ধরনের গাছ-পালা বরেন্দ্র অঞ্চলে পাওয়া যেত। ১৯২৩ সালে নেলসনের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, এ অঞ্চলে ধীরে ধীরে লোক বসতি গড়ে উঠতে শুরু করে এবং চাষাবাদের জমির জন্য বন-জঙ্গল উজাড় হতে থাকে। বন উজাড়ের কারণে অনেক প্রাণি ও গাছ-পালা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মত চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা বা চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে জনবসতির সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। ফলে বড় বড় গাছ কর্তন ও বন জঙ্গল ধ্বংসের কারণে অনেক লতাগুল্ম ও গাছ-পালা বিলুপ্ত হয়েছে বা বিলুপ্ত হওয়ার আশংকায় রয়েছে। ফলে হারিয়ে গেছে বা যাচ্ছে অনেক প্রয়োজনীয় গাছ-পালা ও বনৌষধি।

এককালে চাঁপাইনবাগঞ্জ তথা বরেন্দ্র অঞ্চলে অসংখ্য পুকুর বা দিঘি ছিল। এই সংখ্যা বর্তমানে কমে যাচ্ছে। পুকুর ভরাট করে ধানের জমি ও আমের বাগান তৈরি হচ্ছে। পুকুর এবং জলাভূমিতে চেপ্টা শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদ দেখা যায়। তাছাড়া দিয়ার অঞ্চলে নিম্নভূমিতে বাঁশঝাড়, কাশবন ও খাগড়া জাতীয় ঘাস দৃষ্ট হয়। পূর্বে বরেন্দ্র অঞ্চল জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। বর্তমানে সেই সব জঙ্গল কেটে চাষাবাদ শুরু হয়েছে। বরেন্দ্র অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে তালগাছ, খেজুরগাছ, শিমুল, পাকুর, বাবলা ও নানা ধরনের বরই গাছ দেখা যায়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা আম্রকাননে সুশোভিত। উৎকৃষ্ট মানের আম ও লিচু বিশেষ করে আমের উৎপাদনের জন্য এ জেলার খ্যাতি সর্বত্রই।

www.pathagar.com

ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে সমগ্র বাংলাদেশ হচ্ছে একটি ব-দ্বীপ (Delta)। প্রাগৈতিহাসিককালে এই সমগ্র অঞ্চলটি ছিল সমুদ্রের গভীর তলভূমি। স্মরণাতীতকালে ধীরে ধীরে হিমালয় পবর্তসহ 'বঙ্গভূমি' নামের এই ব-দ্বীপটি সমুদ্রের তলদেশ থেকে জেগে ওঠে এবং কালক্রমে এখানে সভ্যতার বিকাশ ঘটে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশের কোন অংশ সর্বপ্রথম সমুদ্রের তলদেশ থেকে জেগে উঠেছিল? যে অংশ সবচেয়ে আগে জেগে উঠেছিল ধরে নিতে হবে সে অংশই সবচেয়ে প্রাচীনতম ভূ-ভাগ এবং স্বাভাবিকভাবেই সভ্যতা-সংস্কৃতির যে সেখানেই সবার আগে বিকাশ ঘটেছিল এতে কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়। প্রত্নতাত্ত্বিকদের অভিমত হচ্ছে সমুদ্রের তলদেশ থেকে সবার আগে জেগে ওঠে হিমালয় পর্বত এবং তার পাদদেশ। তন্মধ্যে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল ছিল অন্যতম। এরপর ধীরে ধীরে বাংলাদেশের পূর্ব-দক্ষিণ এবং সবশেষে দক্ষিণ বাংলার নিম্নাঞ্চল সমুদ্রের তলদেশ থেকে জেগে ওঠে। এ তথ্য অনুযায়ী হিমালয়ের পাদদেশ সংলগ্ন বাংলাদেশের সবচেয়ে উচ্চতম এবং প্রাচীনতম ভূ-ভাগই যে 'বরেন্দ্র অঞ্চল' ইতিহাসে তার প্রমাণ মেলে।[১৪] ঐতিহাসিক গবেষণায় রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর এবং পশ্চিমবঙ্গের মালদহ ও মুর্শিদাবাদের কিছু অংশ দার্জিলিং ও কোচবিহারসহ গঠিত অঞ্চলকে 'বরেন্দ্র অঞ্চল' হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। খ্রিষ্টীয় দশম শতকের কবি সন্ধ্যাকর নন্দী পশ্চিমে গঙ্গা (মহানন্দা) পূর্বে করতোয়া নদী বিধৌত অঞ্চলকে 'বরেন্দ্রী' বা 'বরেন্দ্র মণ্ডল চূড়ামণি' নামে অভিহিত করেছেন।

এই বরেন্দ্র ভূমিকে বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীনতম অঞ্চল বলে মনে করার কারণ হচ্ছে এ অঞ্চলেই প্রাচীন পুরাকীর্তি ও প্রত্নবস্তুর সন্ধান সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেছে। একটি দেশের প্রাচীনতম অংশই যে সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশে গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্যকে ধারণ করে থাকবে এটা খুবই স্বাভাবিক। বরেন্দ্র ভূমি সৃষ্টির সঙ্গে 'চাঁপাইনবাবগঞ্জ' নামের ভূ-খণ্ডটি ইতিহাস জড়িত।

ঐতিহাসিকদের মতে গৌড়, সারস্বত, কাণ্যকুব্জ, মিথিলা ও উৎকল নিয়েই এই পঞ্চগৌড় কোনো সময় মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমানের কিয়দংশ ও মালদহ গৌড়ের অন্তর্গত ছিল। সুতরাং নবাবগঞ্জকে গৌড়ের অখণ্ড হিসেবে আমরা ধরে নিতে পারি।

ইতিহাস প্রসিদ্ধ গৌড় এবং প্রাচীন সভ্যতার সূতিকাগার বরেন্দ্র ভূমির পরশধণ্য ভূ-খণ্ড নবাবগঞ্জ। প্রকৃতপক্ষে এর স্বতন্ত্র কোন ইতিহাস না থাকলেও গৌড় ও বরেন্দ্র ভূমির প্রাচীন ইতিকথাই যে নবাবগঞ্জের প্রাচীন ইতিহাস একথা আমরা বলতে পারি। এবারে সেই দৃষ্টিকোণের আলোকে আমরা হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগে নবাবগঞ্জের অবস্থান ইতিহাস নির্ণয়ে সচেষ্ট হবো। নবাবগঞ্জ জেলার ইতিহাস আলোচনাকালে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, যেহেতু নবাবগঞ্জ প্রাচীন পুণ্ড্র বর্ধণ ও আধুনিক উত্তরবঙ্গের অবিচ্ছেদ্য একটি ভৌগোলিক অংশ সেহেতু তার ভাগ্যও ঐ এলাকার রাজনৈতিক ভাগ্যের সঙ্গে বরাবরই ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল।

www.pathagar.com

পুণ্ড্র বর্ধণে যখন যে শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নবাবগঞ্জেও তখন সেই শাসন বিস্তৃত হয়েছে। যাহোক রাজনৈতিকভাবে কখন থেকে নবাবগঞ্জ সার্বভৌম শাসনকর্তার শাসনে শাসিত হতে থাকে তার কোন সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না।

একাদশ শতাব্দীতে দিব্যক নামক একজন কৈবর্ত বংশীয় সামন্তরাজা পালদের বিতাড়িত করে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁর ভ্রাতা রোদক ও রোদকের পরে তাঁর পুত্র ভীম রাজা হন। রামপাল (১০৭৭-১১২০ খ্রিষ্টাব্দ) পরবর্তীতে ভীমকে পরাজিত ও নিহত করে পিতৃরাজ্য পুনরাধিকার করেন। রামপালের পরই পালরাজ শক্তি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শেষ পাল নৃপতি মদনপালের সময়ে (১১৪০-৫৫ খ্রিষ্টাব্দ) সেনরা গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন।

কর্ণাটক থেকে আগত ও রাঢ় অঞ্চলে বসবাসকারী সামন্ত সেনের পৌত্র ও হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন (১০৯৭-১১৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) ছিলেন সেন বংশের প্রথম নৃপতি। বিজয় সেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বল্লাল সেন (১১৫৮-৭৯ খ্রিষ্টাব্দ) বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। নবাবগঞ্জে এখনও তাঁর অসংখ্য কীর্তির স্বাক্ষর রয়েছে। তন্মধ্যে শিবগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত বালুয়া দিঘি ও গোমস্তাপুর উপজেলার মকরমপুর ঘাটে অবস্থিত শ্মশান বাড়ি অন্যতম। তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেনের (১১৭৯-১২০৫ খ্রিষ্টাব্দ) সময়ে বাংলাদেশে মুসলমানদের আগমন ঘটে।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর কেন্দ্রীয় মোঘল শক্তি হীনবল হয়ে পড়ে এবং বাংলার সুবাদারগণ নামেমাত্র মোঘল আধিপত্য পেলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁরা স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করছিলেন। এ সময়ে নবাব আলীবর্দী খান (১৭৪০-৫৬ খ্রিষ্টাব্দ) নবাব সরফরাজ খানকে (১৭৩৯-৪০) পরাজিত ও নিহত করে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। আলীবর্দী খাঁর সময়েই এই এলাকার নাম 'নবাবগঞ্জ' হয়।

নবাবগঞ্জ অঞ্চলের ইতিহাস খুব প্রাচীন হলেও নবাবাগঞ্জ থানা শহর ও মহকুমা শহরের ইতিহাস খুব বেশিদিনের নয়। নবাবগঞ্জ প্রাক ব্রিটিশ যুগ পর্যন্ত নবাবদের বিহারভূমি হিসেবেই পরিচিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে লোকালয় গড়ে উঠলে স্বাভাবিকভাবে সেখানে নানা পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তবে একথা সত্যি যে, নবাবগঞ্জ শহরে থানা স্থাপন খুব বেশি দিনের কথা নয়। পূর্ণিয়া ও দিনাজপুর জেলা ভেঙে মালদহ জেলা গঠিত হয় ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে। কিন্তু ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত একে কোন কালেক্টরের অধীনে দেয়া হয়নি। Mr. Ravan Show মালদহ জেলার প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর নিযুক্ত হন। এ সময় শিবগঞ্জ ও কালিয়াচক থানাদ্বয় অপরাধপ্রবণ অঞ্চল (Crime area) বলে কুখ্যাত ছিল। নবাবগঞ্জ তখন শিবগঞ্জ থানার অধীনে একটি পুলিশ ফাঁড়ি ছিল মাত্র। তাও আবার নবাবগঞ্জ শহরে নয়, বারোঘরিয়া নামক স্থানে। এই বারোঘরিয়ায় এক সময় নীলকর সাহেববের নীলকুঠির প্রধান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং রেশম, পাট প্রভৃতির জন্য প্রসিদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্র ছিল। নবাবগঞ্জ তখন 'বারোঘরিয়া-নবাবগঞ্জ' নামে পরিচিত ছিল। পরে বারোঘরিয়ার রেশম কারবার বন্ধ হয়ে গেলে এর গুরুত্ব কমে যায় এবং নবাবগঞ্জ স্বতন্ত্র নামে পরিচিতি লাভ করে।

www.pathagar.com

শিবগঞ্জস্থিত 'তরতীপুর' সে সময় বড় নদী বন্দর ছিল। লালগোলা ঘাট থেকে মহানন্দা নদীর উপর দিয়ে শিবগঞ্জ ভোলাহাট, ইংরেজ বাজার হয়ে রাজমহল পর্যন্ত এবং পদ্মার ওপর দিয়ে মনিহার ঘাট, সাহেবগঞ্জ, মুঙ্গের, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থান পর্যন্ত স্টিমার যাতায়াত করতো। কালক্রমে নদীগর্ভ ভরাট হয়ে স্টিমার চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। নদীর গতিধারাতেও পরিবর্তন ঘটে। ফলে শিবগঞ্জের মুন্সেফ চৌকিতে যাতায়াতে অসুবিধা দেখা দেয়। দেশি নৌকা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না, তাও আবার ছিল বিপদসংকুল। উপরন্তু শিবগঞ্জ থেকে নদী দূরে সরে যাওয়ায় জনগণের অসুবিধা বেড়ে যায়। এসব কারণেই ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দ মুন্সেফ চৌকি শিবগঞ্জ থেকে নবাবগঞ্জে স্থানান্তরিত হয় এবং তারও কিছুদিন পর ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দ নবাবগঞ্জ থানায় উন্নীত হয়।

থানা প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই নবাবগঞ্জ ও তার পার্শ্ববর্তী থানাগুলো নিয়ে একটি স্বতন্ত্র মহকুমা গঠনের পরিকল্পনা ও প্রয়াস চলতে থাকে। কিন্তু বারংবার এর শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তিত হওয়ার ফলে তা বাস্তবে পরিণত হয়নি। ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই অঞ্চল রাজশাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আবার বিহারের ভাগলপুরের (বিভাগ) অন্তর্গত ছিল। ইতোমধ্যে ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দ ১২ জন ওয়ার্ড কমিশনারের সমন্বয়ে নবাবগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ তদানীন্তন পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশসহ এই অঞ্চলটি আবার রাজশাহী বিভাগের অন্ত র্ভুক্ত করা হয় এবং তা মালদহ জেলার অন্তর্গত থাকে। ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দ এখানে সাবরেজিস্ট্রি অফিস স্থাপিত হলে স্বাভাবিকভাবেই নবাবগঞ্জে কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়। ফলে সরকারি কাজ কর্মের সুবিধার জন্য 'চাঁপাই' গ্রামে অবস্থিত পোস্ট অফিসটি ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে নবাবগঞ্জ শহরে স্থানান্তর করা হয় এবং তার নাম রাখা হয় চাঁপাইনবাবগঞ্জ। সে সময় থেকেই নবাবগঞ্জ 'চাঁপাইনবাবগঞ্জ' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ দেশ বিভাগের সময় র‍্যাডক্লিক রোয়েদাদ অনুসারে নবাবগঞ্জ ও তার পার্শ্ববর্তী শিবগঞ্জ, নাচোল, ভোলাহাট ও গোমস্তাপুর থানাকে মালদহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পূর্ব পাকিস্তানের রাজশাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শাসন ব্যবস্থার সুবিধার্থে ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১ নভেম্বর রাজশাহী জেলার একটি থানা ও দিনাজপুরের অন্তর্ভুক্ত 'পোরশা' থানাসহ একটি নতুন মহকুমার সৃষ্টি হয় এবং নবাবগঞ্জ শহরেই মহকুমার সদর দফতর স্থাপিত হয়। তাই নবাবগঞ্জের নামানুসারে নতুন মহকুমার নাম রাখা হয় 'নবাবগঞ্জ'।

মহকুমা গঠিত হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ নবাবগঞ্জের উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দেন। প্রথম দিকে রাজশাহী সদরের মহকুমা হাকিম নবাবগঞ্জ মহকুমার যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন করতেন। তারপর সরকারি অফিসের জন্য কয়েকটি বাড়ি হুকুম দখল করে মহকুমার যাবতীয় অফিস নবাবগঞ্জে স্থানান্তরিত করা হয়। কিছুদিন পর নবাবগঞ্জের জন্য মহকুমা হাকিম নিয়োগ করা হলে প্রয়োজনীয় অফিস নির্মাণ হতে থাকে। ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দ মহকুমা জেলখানা, ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ নবাবগঞ্জ টাউন ক্লাব, ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দ নবাবগঞ্জ কলেজ, ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দ হাসান জাহির পাবলিক লাইব্রেরি (নবাবগঞ্জ সাধারণ পাঠাগার), ১৯৬০

www.pathagar.com

খ্রিষ্টাব্দ জাকি আযম স্টেডিয়াম (নবাবগঞ্জ স্টেডিয়াম), ১৯৬২-৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ফৌজদারী আদালত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নবাবগঞ্জের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই নবাবগঞ্জকে জেলায় উন্নীত করার জোর দাবি চলতে থাকে। কিন্তু দেশে বিরাজমান অস্থিতিশীলতার কারণে দীর্ঘদিন তা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি।

১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি লে. জে. (অব.) হুসাইন মুহম্মদ এরশাদ প্রশাসনকে জনগণের দ্বার গোঁড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে থানাগুলোকে উপজেলা এবং মহকুমাকে জেলায় রূপান্তরিত করেন। এই পদক্ষেপের ফলে নবাবগঞ্জের ৫টি থানা শিবগঞ্জ, নাচোল, ভোলাহাট, গোমস্তাপুর ও নবাবগঞ্জ সদর উপজেলায় উন্নীত হয়। নবাবগঞ্জ মহকুমা ১৯৮৪ সালের ১ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে জেলায় উন্নীত হয়।

১৯৮৪ সালের ১মার্চ জেলার নাম 'নবাবগঞ্জ' ঘোষণা করা হয়। কিন্তু জেলার নাম 'চাঁপাইনবাবগঞ্জ' হোক এটাই ছিল জেলাবাসীর দাবি। পরবর্তী সময়ে জেলাবাসীর আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে নিকার ৮৬তম বৈঠকে নবাবগঞ্জ জেলার নাম পরিবর্তন করে 'চাঁপাইনবাবগঞ্জ' করার সিদ্ধান্ত হয়। ১ আগস্ট ২০০১ তারিখে সরকারি প্রজ্ঞাপনে (নং-সম (জেএ২)৩৯/৯৯-৩৪০) এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ করা হয়।

ঙ. জনবসতির পরিচয়

পৃথিবীতে প্রথম মানুষের আবির্ভাব কখন ঘটেছিল বিজ্ঞানীগণ সে সম্পর্কে নিশ্চিত নন। তবে ভারতবর্ষে মনুষ্য বসবাসের ইতিহাস কয়েক লক্ষ বছরের প্রাচীন এবং এখানে মানব সমাজের বহু পদচিহ্ন পড়ে আছে। এই আদিমকালের মানুষ জীবন ধারণের তাগিদে শিকার ও খাদ্যের উপযোগী লতাগুল্ম সংগ্রহ করত। সে সময় জীবনযাপন সহজ ছিল না। তাই মানুষ যাযাবর জীবন যাপন করত ও যূথবদ্ধ হয়ে বাস করত। এদের মধ্যে গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল বলে অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন।

ভারতবর্ষের যে ভূখণ্ড বিশ শতকের পূর্বে বঙ্গদেশ বলে পরিচিত ছিল; প্রাচীন হিন্দুযুগে তার এরূপ কোন একক নাম ছিল না। এর বিভিন্ন অংশের ভৌগোলিক নাম ছিল এবং তার অনেকগুলোই বিভিন্ন যুগের রাজ্যের নাম হতে উদ্ভূত। আর্য প্রভাবের ফলেই যে অধিকাংশ নামের উৎপত্তি হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর্য প্রভাবের পূর্ব মাত্র বঙ্গ ও পুণ্ড্র এই দুইটি জাতি অথবা স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'বঙ্গ' ইতিহাসে একটি প্রাচীন দেশ। 'ঐতয়ের আরণ্যক' গ্রন্থে বঙ্গ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। বঙ্গ জনপদের নাম আছে; 'বোধায়নের ধর্মসূত্র' গ্রন্থে। এছাড়াও মহাভারতে একাধিকবার বঙ্গ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। চীন-দেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে পরিভ্রমণের সময় পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্ত ও কর্ণসুবর্ণ এই চারটি স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

বঙ্গের প্রাচীনতম জনপদগুলোর অন্যতম ছিল পুণ্ড্র। উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী ও দিনাজপুর, পুণ্ড্র জনপদের আওতাভুক্ত ছিল। বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ই ছিল পুণ্ড্রনগর বা পুণ্ড্রবর্ধন। পুণ্ড্রনগর পুণ্ড্র রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, পুণ্ড্র একটি প্রাচীন জাতিমূলক নাম। এরা উত্তরবঙ্গে বাস করত বলে এ অঞ্চলের নাম পুণ্ড্রদেশ বা পুণ্ড্রবর্ধন নামে খ্যাত ছিল। ভবিষ্য পুরাণের ভাষ্য অনুযায়ী জানা যায় যে, নিম্নবর্ণিত সাতটি দেশ পুণ্ড্রদেশের শাসনাধীনে বা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১. গৌড় ২. বরেন্দ্র ৩. নাবিতি ৪. সূক্ষ্ম (রাঢ়) ৫. ঝারিখণ্ড ৬. বরাহ ভূমি ৭. বর্ধমান।

কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রাম চরিতম্' কাব্যে গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যবর্তী ভূ-ভাগকেই বরেন্দ্র নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই পুরাভূমি বা বরেন্দ্রের একটি রেখা ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে ঐ নদীর দুই তীরে বিস্তৃত হয়ে আসামের শৈল শ্রেণি স্পর্শ করেছে। রেনেলের নক্‌শায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। বৃহত্তর বগুড়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহীর উত্তরাঞ্চল, দিনাজপুরের পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চল ও রংপুরের পশ্চিমাঞ্চল বরেন্দ্রের কেন্দ্রভূমি হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বলতে যে অঞ্চলটি বুঝায় পুরাকালে এটি পুণ্ড্র তথা বরেন্দ্র জনপদ নামে খ্যাত ছিল। বরেন্দ্র ভূমিতে কখন থেকে মানব বসতি শুরু হয়েছিল তা বলা কঠিন। ভূ-স্তরের গঠনানুযায়ী এই অঞ্চলে অত্যন্ত প্রাচীন বলা হয়ে থাকে। তবে এই প্রাচীনতার সীমা নির্দেশ করা কঠিন। প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে ইতিহাসের উষালগ্ন পর্যন্ত এই সুদীর্ঘকাল যে মানব গোষ্ঠীসমূহ আদি বরেন্দ্র পুণ্ড্র ভূমিতে বিচরণ করেছে, নদী-জলাশয়ের তীরে মৎস্যাদি শিকার করে জীবনধারণ করেছে এবং আরও পরে যারা গ্রামীণ সমাজ রচনা ও কৃষির সূচনা করেছিল, কি ছিল তাদের নরগোষ্ঠীর পরিচয়, কেমন ছিল তাদের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, তাদের সাথে আজকের বরেন্দ্রের কোন জাতি-গোষ্ঠীর আদৌ সাদৃশ্য রয়েছে কিনা, তাদের উৎস ভূমি কোথায় এই সব প্রশ্ন আজও নৃবিজ্ঞানীদের কাছে কৌতূহলের বিষয়। ঐতরেয় আরণ্যক, বাৎসায়নের কামসূত্র, মনুসংহিতা, বৈয়াকরণ পানিনির রচনা, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মহাভারত, বোধায়ন, ধর্মসূত্র, আচারঙ্গ, চর্যাগীতিকা ইত্যাদি প্রধান গ্রন্থে প্রাচীন বরেন্দ্রবাসীর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই প্রাচীন গ্রন্থসমূহের বর্ণনার আলোকে নৃবিজ্ঞানীগণ অনুমান করেন যে, ঐতিহাসিককাল থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে এই বরেন্দ্র ভূমিতে বিচিত্র মানব গোষ্ঠীর আগমন ঘটে। আগত মানব গোষ্ঠীর পারস্পারিক মেলামেশা ও রক্তধারার সংমিশ্রণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে শঙ্কর জনগোষ্ঠী।

বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী মোটামুটি দীর্ঘমুণ্ড ও প্রশস্ত নাসিকা-আদি অস্ট্রেলিয়, দীর্ঘমুণ্ড ও মধ্যম নাসিকা-মেলানিড এবং বিশেষভাবে গোলমুণ্ড ও উন্নত নাসিকা-অ্যালপাইন। এই তিন নরগোষ্ঠীর সমন্বয়ে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশের যে জন-নৃবৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতি তা শতাব্দীর পর শতাব্দীর ধরে গড়ে উঠেছে, এর প্রায় সমগ্র মূল রূপায়ণই প্রধানত 'অ্যালপাইন' ও আদি 'অস্ট্রেলিয়' এ দুই জনধারার লোকদেরই

www.pathagar.com

কীর্তি। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার জনগোষ্ঠীর মাঝে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্ষীণ মাত্রায় মঙ্গোলীয় জনধারার ছাপ লক্ষ করা যায়। অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক ও জাতিতাত্ত্বিক তথ্য বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, এই দেশের তথা এই অঞ্চলের জনগঠনের আদি স্তরে হরেক বা বিচিত্র জনগোষ্ঠীই গোড়াপত্তন করে। সংগতভাবেই সাধারণ মানুষের ধর্মীয় আধ্যাত্মিক চেতনাও মৌলিক স্তরে বিদ্যমান ছিল আদিম মানুষ সুলভ সর্বপ্রাণবাদী বিশ্বাস (Animism) বা উপলব্ধি। কেননা, পৃথিবীর সর্বকালের ও সকল অঞ্চলের আদিম মানব সমাজে সর্বপ্রাণবাদী অধ্যাত্ম চেতনা একটি বিশ্বজনীন বিষয় তা সকল নৃবিজ্ঞানী স্বীকার করেন, বাংলাদেশে তথা বরেন্দ্রের শবর, পোদ, চণ্ডাল, ডোম, পুলিন্দ, কোচ, মেচ, রাজবংশী, পুণ্ড্র জাতিগোষ্ঠীর লোক তাদের আদিকালের বিশ্বাস ও আচরণ প্রণালীকে যুগযুগান্তর ধরে আঁকড়ে রেখেছিল। এছাড়াও সে সময় এ অঞ্চলে 'কোল' নামীয় জনের জাতিসমূহ বৈদিক আর্যগণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় ছিল। এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাসহ উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র ভূমিতে প্রাচীনকালে ও আধুনিককালে বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর উপস্থিত লক্ষণীয়। বাংলাদেশের প্রাচীনতম এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে পুণ্ড্র জাতির কথা উল্লেখ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় আরণ্যক, মনুসংহিতা, জৈন ধর্মগ্রন্থ আচারঙ্গ, ব্রহ্ম বৈর্বত পুরাণ, মহাভারত ইত্যাদি প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থে পুণ্ড্র জাতিকে দুর্ধর্ষ, দস্যু, পাপাচারী, অচ্ছুত, ম্লেচ্ছ, নিকৃষ্ট, অরণ্য-পর্বতচারী, পতিত উপজাতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' পুণ্ড্র দেশে এলে প্রায়শ্চিত্ত করার বিধান দেওয়া আছে। এই বর্ণনা থেকে নিশ্চিত ধারণা জন্মে যে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা তথা বরেন্দ্রের আদিম অধিবাসীগণ আর্য জাতির বংশোদ্ভূত নয়। বৈদিক যুগে বরেন্দ্রবাসীদের আর্যদের সাথে কোন রকম সম্পর্ক ছিল না। নৃবিজ্ঞানী ও পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বলা যায় যে, আর্যগণ এ অঞ্চলে আসার পূর্বে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এ দেশে বসবাস করত। তারাই ছিল চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা তথা বরেন্দ্রের জনগোষ্ঠীর রূপকার। বাংলার ইতিহাসে পুণ্ড্রবর্ধন জনপদ ও বরেন্দ্র এ দুটিই বিখ্যাত নাম। খ্রিষ্টের জন্মের কমবেশি সহস্র বছর পূর্বেও পুণ্ড্রদেশ এবং পুণ্ড্র জাতির অস্তিত্ব ছিল। বাংলাদেশে পুণ্ড্ররাই সর্বপ্রথম নগর সভ্যতার গোড়া পত্তন করেছিল। পুণ্ড্র জাতির নামানুসারেই এ জনপদটি গড়ে উঠেছিল উপর্যুক্ত বর্ণনার আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, আর্য প্রভাবের পূর্ব হতেই পুণ্ড্র জাতি বরেন্দ্রে বসবাস করতো। তবে পূর্বে বর্ণিত সমুদয় জাতিকে পরাস্ত করে যারা এ অঞ্চলে বসবাস স্থাপন করেন–তাঁদের বংশধরেরাই বর্তমানকালের ব্রাহ্মণ, বৈশ্য কায়স্থ প্রভৃতি উপজাতির পূর্ব পুরুষ।

অধ্যাপক ড. আব্দুর রহমান সিদ্দিকী 'বরেন্দ্রভূমির চিরায়ত বাসিন্দা' প্রবন্ধে লিখেছেন আদি পোদ নামটির বিকল্প বা তথ্য উচ্চারণ হিসেবে, স্বসমাজে অথবা তাদের প্রতিবেশী সমাজে পুঁড় নামক শব্দটি প্রচলিত ছিল। এই পুঁড় শব্দটি ক্রমশ পুণ্ড্রা বা পুঁড়ো প্রভৃতিতে রূপলাভ করে। বস্তুত কালের পরিক্রমায় পোদ জাতি গোষ্ঠীর নাম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পোদ > পুঁড় > পৌণ্ড্র > পুণ্ড্র প্রভৃতিতে পরিণত হয়েছে। যারা অবশেষে একটি

www.pathagar.com

কৃষিজীবী প্রাগ্রসর জনসমাজ রূপে পরিচিতি লাভ করে। উইলিয়াম হান্টার ও ম্যালেসহ অনেক খ্যাতিমান প্রশাসক গবেষকের মতে পোদ জাতি ছিল বরেন্দ্র অঞ্চলের চিরায়ত বাসিন্দা। তারা এই ভূখণ্ডটিকে 'পোদদের দেশ হিসেবে অভিহিত করেছেন। বিগত শতকের শেষ দিকে চলনবিলের নিভৃত এলাকায় পুন্ডরি বা পুণ্ড্রী নামক একটি ক্ষুদ্র অথচ স্বতন্ত্র জাতি গোষ্ঠীর বসবাসের কথা উল্লেখ করেছেন। আজও বরেন্দ্র নানা স্থানে এবং তার বাহিরে সেই পোদ বা পুঁড়া সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। যাহোক বরেন্দ্র বা তৎসন্নিহিত এলাকাসমূহে যে ধীবর পোদ সম্প্রদায় বিদ্যমান রয়েছে তাদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য প্রটোঅস্ট্রালয়েড উপ-নরগোষ্ঠীর প্রলক্ষণসমূহ খুবই সহজেই পরিলক্ষিত হয়।

হিন্দু সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত পোদ-রা এখন নিজেদের পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় বলে দাবি করে। এরা প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের মেদেনীপুর, হাওড়া ও চব্বিশপরগনা জেলায় বাস করে। শ্রী অতুল সুর অনুমান করেন যে, এরা প্রাচীন পুণ্ড্রজাতি হতে অভিন্ন। তাহলে এও মানতে হয় যে, বিশেষ কোন চাপের মুখেই তারা নিজেদের মাতৃভূমি ছেড়ে ওইসব দূরবর্তী জেলায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। তিনি বলেন, "পোদদের সঙ্গে মুসলমানদের বিশেষ নৃতাত্ত্বিক প্রভেদ নেই"। পোদরা হলো এককালের মহাপরাক্রমশালী পৌণ্ড্রদেরই বংশধর।

সম্ভবত খ্রিষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে নরগোষ্ঠীর কোন কোন শাখা মৎস্যশিকারী বা অরণ্যচারী জীবনধারা পরিত্যাগ করে জুম আকারে চাষাবাদের বা কৃষি কাজের গোড়াপত্তন করে। কালের পরিক্রমায় এই গোষ্ঠীই কৃষিজীবী পুণ্ড্রজন হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের আবাস ভূমিই পুণ্ড্রদেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পুণ্ড্র তথা বরেন্দ্র অঞ্চলে তাদের উৎপাদিত ধান, পান, লাউ, কচু, কলা, কুমড়া, হলুদ, বেগুন, মরিচ ইত্যাদি ফসলের নামগুলি অস্ট্রিক ভাষা থেকে উদ্ভূত। কাজেই তারা অস্ট্রিক ভাষাভাষী জন হিসেবে স্বীকৃত। তারা ছিল প্রোটো-অস্ট্রালয়েড গোষ্ঠীর মানুষ। পোদ বা পুণ্ড্র জাতির ন্যায় শবরগণ বরেন্দ্রের আদিম অধিবাসী। শবরগণও প্রোটো-অস্ট্রালয়ের গোষ্ঠীর মানুষ। পূর্বে উল্লেখিত প্রাচীন শাস্ত্রসমূহে পুণ্ড্রদের পাশাপাশি শবরদের কথা বর্ণিত আছে।

প্রাচীন বাঙ্গালায় শবরদের অনেকে জ্ঞান-গরিমায় উচ্চাসন লাভ করেছিলেন। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে দু'জন শবর পা-র নাম পাওয়া যায়। এদের প্রথমজন প্রখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত কমলশীলকে দুটি গ্রন্থ রচনায় সাহায্য করেছিলেন। এই শবর পা-কে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদের প্রথম চর্যাকার বলে মনে করা হয় । প্রাচীনকালে এই অঞ্চলটি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বিচরণ ক্ষেত্র ছিল। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বিভিন্ন বৌদ্ধবিহার ছিল তাদের সাধনার ক্ষেত্র। বর্তমানে বাংলাদেশের আর কোন জেলাতেই শবরদের দেখা মিলে না। ভারতের পশ্চিম বঙ্গের পুরুলিয়া জেলায় এরা প্রধানত বসবাস করে। প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন যুগের নানা পর্বে পুণ্ড্র তথা বরেন্দ্র অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে সম্ভবত অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠী বাস

www.pathagar.com

করেছে বলে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। এসব আদি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে–কোচ, মেচ, রাজবংশী, কৈতর্ব, হাঁড়ি, নিষাদ, বাউরি, বাশফোঁড়, পলিন্দ, ভুঁইয়া ইত্যাদি। বরেন্দ্রের লোকসমাজ গঠনে এই প্রাচীন জনগোষ্ঠীর অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়–পাল রাজাদের শাসনামলে রাজা মহিপালের রাজত্বকালে কৈবর্ত বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই বিদ্রোহে রাজা মহিপাল পরাজিত ও বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন। সেই সময় কৈবর্ত দিব্যক নামক ব্যক্তি রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এই ঘটনা বরেন্দ্রের ইতিহাসে কৈবর্ত বিদ্রোহ নামে পরিচিতি লাভ করে।

বিভিন্ন শাস্ত্রীয় প্রাচীন গ্রন্থের বর্ণনা থেকে নিশ্চিত অনুমান করা যায় যে, সেই সময় বৈদিক ধর্ম অপেক্ষা জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মবিশ্বাস জনমানসে অনেক বেশি স্থান দখল করে নিয়েছিল। গুপ্ত শাসনের পূর্বে এই অঞ্চলে বৈদিক ধর্মের প্রসার বা প্রচারের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। গুপ্ত আমলেই বৈদিক ধর্মের প্রচারণা শুরু হয় বলে জানা যায়। তবে পালরাজাদের পরাভূত করে সেনরাজারা ক্ষমতা দখল করে। ক্ষমতা দখলের পর হতেই তারা নানা কৌশলে সুপরিকল্পিতভাবে বৈদিক ধর্ম তথা হিন্দু ভাবধারার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হয়ে ওঠেন। সেই সময় বরেন্দ্র মণ্ডলের বাসিন্দা বা পুণ্ড্র কৌমের লোকেরা বিনা প্রতিরোধে বৈদিকীকরণের কাছে মাথা নত করেনি। পুণ্ড্রের শক্তিশালী জাতি হওয়া সত্ত্বেও আমাদের উন্নতর অস্ত্রবিদ্যার কাছে পরাভূত হয়, ফলে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের একটি বিপুল অংশ বৈদিক তথা হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়ে যায়। তবে পাল আমলে জাতিভেদ প্রথা শিথিল থাকায় সমাজে ব্যাপকভাবে রক্তমিশ্রণ ঘটেছিল।

ভারত তথা বাংলায় মুসলিম বিজয়ের পর হতে বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল থেকে নানা বৈশিষ্ট্যের অজস্র মানুষের আগমন ঘটে। দীর্ঘ প্রায় সাড়ে সতশত বছর মুসলিম শাসন আমলে পশ্চিমা মুসলিম নরগোষ্ঠী বাংলার সমাজে বিভিন্নভাবে মিশে যায়। এরা প্রধানত মুসলিম শাসক, ধর্ম প্রচারক, সৈন্য-কর্মচারী ও বণিক। এছাড়াও ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের অনেক মুসলিম পরিবার এ জেলায় এসে স্থায়ী বসবাস শুরু করে। ১৯৫২-৫৩ সাল থেকে বাংলার বিভিন্ন জেলার মানুষ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে।

বিচিত্র জনপ্রবাহ কালের পরিক্রমায় মন্থরগতিতে স্থানীয় জনধারায় মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। বহিরাগত জনপ্রবাহের মধ্যে 'অ্যালপাইন', 'দ্রাবিড়', 'অস্ট্রিন-মঙ্গোলয়েড' ইত্যাদি মিশ্র উপাদান বিদ্যমান। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নৃতাত্ত্বিক অন্বেষণে এদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে।

শতাব্দীর পর শতাব্দীর বিরোধ মিলনের মধ্যে দিয়ে এমন করে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের বুকে আর্যভাষী আদি নর্ডিকেরা এক সমন্বিত জন, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তোলে। সে জনের রক্তবিশুদ্ধতা আর রইল না। তার রক্তে বিচিত্র রক্তধারার স্রোতোধ্বনি রণিত হতে লাগল, কোথাও ক্ষীণ, কোথাও উচ্চ গ্রামে। এই সমন্বিত জনের নাম ভারতীয় জন। তাদের ধর্মও আর বেদ-ব্রাহ্মণের ধর্ম রইল না। সব মিলেমিশে এক নতুন ধর্ম গড়ে উঠল; তার নাম পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। তাদের বৈদিক

www.pathagar.com

আর্যভাষীর সভ্যতা থাকল না; বিচিত্র পূর্বতন সভ্যতার উপাদান উপকরণ আহরণ করে নতুন সভ্যতা গড়ে উঠল; এই সমন্বিত নতুন সভ্যতার নাম ভারতীয় সভ্যতা। সকল ধ্যান-ধারণা ও বিধি-নিষেধকে আত্মসাৎ করে গড়ে ওঠে ভারতীয় সংস্কৃতি।

আদিমকাল থেকে শুরু করে ঐতিহাসিককাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে নানা কারণে এই অঞ্চলে বিচিত্র মানব গোষ্ঠীর আগমন ঘটেছে। এর ধারাবাহিকতা এখনো অব্যাহত রয়েছে। তবে বিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের পরিক্রমায় বিচিত্র মিলন মিশ্রণের ফলে গড়ে উঠেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সমাজ।[১৫] ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১ নভেম্বর মালদহ জেলা থেকে প্রাপ্ত ৫টি থানা নিয়ে নবাবগঞ্জ মহকুমা গঠিত হয়। ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রশাসনিক সুবিধার্থে পোরশা থানাকে নবাবগঞ্জ মহকুমার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে পোরশা থানাকে নবাবগঞ্জ মহকুমা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নওগাঁ জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তাই মহকুমা থাকাকালীন নবাবগঞ্জের সাথে ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ১ মার্চ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আয়তন ও সীমার মধ্যে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। পদ্মা-মহানন্দার ভয়াবহ ভাঙনে বিলীন হয়েছে বেশ কিছু গ্রাম-জনপদ। বর্তমানে এই জেলার আয়তন ১৭০২.৫৬ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ১৬.৪৬, ৫২১। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় রয়েছে পাঁচটি উপজেলা। চাঁপাইনবাবগঞ্জের উপজেলা ভিত্তিক আয়তন, লোকসংখ্যা, পুরুষও মহিলার সংখ্যা এবং শিক্ষার হার ছকের মাধ্যমে উল্লেখ করা হলো:[১৬]

উপজেলা	আয়তন	জনসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	শিক্ষার হার
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর	৪৫১.৮ বর্গ কি.মি	৫, ৩০, ৫৯২	২, ৫৪, ৬২৯	২, ৭৫, ৯৬৩	৩৮.১
শিবগঞ্জ	৫২৫.৪৩ বর্গ কি.মি	৫,৯১,১৭৮	২, ৯৫, ৩৩৮	২, ৯৫, ৮৪০	৩২.৫
গোমস্তাপুর	৩১৮.১৩ বর্গ কি.মি	২, ৭৫,৮২৩	১, ৩৬, ৩২১	১, ৩৯, ৫০২	৩৫.৪
ভোলাহাট	১২৩.৫২ বর্গ কি.মি	১, ০৩, ৩০১	৫১, ০৩৫	৫২, ২৬৬	৩৯.২
নাচোল	২৮৩.৬৮ বর্গ কি.মি	১, ৪৬, ৬২৭	৭২, ৮৯৫	৭৩, ৭৩২	৪০.৩

বরেন্দ্র ভূমির এ জেলায় বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করে। বেশ কিছু খ্রিষ্টান এ জেলায় বসবাস করে। আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল, ওরাওঁ প্রভৃতি আদিবাসীও জেলার বিভিন্ন স্থানে বাস করে। জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগই কৃষিজীবী হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষিতের হার এখানে শতকরা ২৭ ভাগ। বাংলাদেশের সর্বত্রই এ জেলার কিছু না কিছু চাকুরীজীবী রয়েছেন।

চ. নদ-নদী ও খাল-বিল

পদ্মা : পদ্মা পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার সঙ্গে রাজশাহী তথা বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমারেখা নির্ধারণ করেছে। এই নদী রাজশাহী জেলার দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবাহিত।

www.pathagar.com

প্রবাহিত। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ ও নবাবগঞ্জ সদর উপজেলায় কিয়দংশ পদ্মার উত্তর তীরে অবস্থিত। বর্ষাকালে এই নদীর অবয়ব জলরাশি বৃদ্ধি পায় এবং স্বাভাবিক কারণেই এর কিছু প্রভাব চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় প্রতিফলিত হয়। প্রতি বছরই অল্প বিস্তর জমি নদীর করাল গ্রাসে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং পুনরায় সৃষ্টি হয় নতুন চর। পদ্মা বিধৌত ও পলি মাটিপুষ্ট এই সকল চরে ধান, পাট, কাউন, ভুট্টা প্রভুতি ফসল প্রচুর পরিমাণে জন্মে থাকে। এই কারণে মানুষ এসব নতুন চরে গিয়ে জমি নিয়ে নতুন করে বসতি স্থাপন করে।

মহানন্দা : চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার প্রধান নদী মহানন্দা। ৮০ মাইল দীর্ঘ মহানন্দা নদীর প্রায় ৩৭ মাইল এই জেলায় রয়েছে। হিমালয়ে পাদদেশে এর উৎপত্তি। ভারতের পূর্ণিয়া ও মালদহ জেলার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এই নদী রাজশাহী জেলার পশ্চিমে ভোলাহাটের নিকটে এই জেলায় প্রবেশ করেছে। তারপর পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে প্রবাহিত হয়ে গোদাগাড়ীর কাছে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই নদী ঠাকুরগাঁয়ে উপনদী 'নগর' এর সঙ্গে মিলিত হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে।

পাগলা : পাগলা চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার অন্যতম নদী। মাত্র কয়েক মাইল এই জেলায় এর ব্যাপ্তি। পাগলা ও ভাগীরথী নদীর মিলিত স্রোতধারা প্রবেশ করেছে। পাগলা শিবগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত 'তরতীপুর' নামক স্থানে মরাগঙ্গা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই সম্মিলিত স্রোতধারা আরও কিছুদুর অগ্রসর হয়ে মহানন্দায় মিলিত হয়েছে।

মহানন্দা

www.pathagar.com

মরাগঙ্গা : বর্তমানে গঙ্গানদী প্রাচীন গৌড় হতে প্রায় ২০/২২ কিলোমিটার দূরে প্রবাহিত। এককালে গঙ্গানদী গৌড় নগরীর নিম্ন দিয়ে প্রবাহিত হতো। মরাগঙ্গা তারই সুপ্ত স্মৃতি বহন করে চলেছে। প্রাচীনকালে এই নদীর তীরে বড় বড় বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। এসব বন্দর বা গঞ্জের চিহ্ন কোন কোন স্থানে পরিদৃষ্ট হয়। এখনও এই নদীর তীরে অনেক গ্রাম রয়েছে।

পুণর্ভবা : পশ্চিম দিনাজপুর হতে বের হয়ে এই নদী নওগাঁ জেলার পোরশা উপজেলার মধ্য দিয়ে গোমস্তাপুর উপজেলায় পড়েছে। রহনপুর থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরে মকরমপুর ঘাটের সন্নিকটে এই নদী মহানন্দার সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

বিল : চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলায় অসংখ্য বিল রয়েছে। বিলগুলোর মধ্যে মরিচাদাড়া, কুমিরাদহ, বিলসিংড়া, পুঠিমারি, চ্যাংমারি, বিল ভাতিয়া, বিল চোড়ল, হোগলা, শুক্রাবাড়ি, দামুস, আন্‌ল উল্লেখযোগ্য।

'শৈল্যা' নামের জলকর : গ্রামের সাধারণ মানুষ 'শৈল্যা' নামে অভিহিত করে থাকেন শিবগঞ্জ উপজেলার চককীর্তি ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামের পাশদিয়ে বয়ে যাওয়া প্রায় তিন কিলোমিটার দীর্ঘ এই জলাশয়। সুধীজনরা জানালেন, শৈল্যার শুদ্ধ নাম 'শেজুয়া জলকর'। কীভাবে এর উৎপত্তি কেউই বলতে পারেন না। তবে ৩০/৩৫ বছর আগে এর চারিদিকে দুর্ভেদ্য জঙ্গল ছিল এবং এখানে জলে কুমির ও ডাঙায় বাঘ ছিল একথা বেশ জোরেশোরেই বললেন প্রবীণ ব্যক্তিরা। পানির গভীরতা আর স্বচ্ছতা দেখে সত্যি অবাক হতে হয়। বিমর্শী গ্রামের আলহাজ্ব শফিকুল আলম জানালেন শুক্রবাড়ি দামস থেকে শৈল্যা হয়ে ভাতিয়ার বিল পর্যন্ত সংযোগ ছিল। কিন্তু বর্তমানে এর গতিরুদ্ধ হয়েছে আখহীরা গ্রামের প্রান্তে।

শৈল্যাতে প্রায় একশোরও বেশি জাতের মাছ দেখা যেতো এক সময়। এসব মাছের মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউস, চিতল, ফলি, বোয়াল, বাইটক্যা, সরপুটি, আইড়, গাগোর, বাঘাইর, শোল, গজার, টাকি (গোটি), চ্যাঙ, কই, মাগুর, শিং, ট্যাংরা, (রাম, পারুল ও কুজি), পাবদা, বাচা ম্যাটরা, ঘেরা্যা, ফাঁসা, খরি, ছ্যালং, ভ্যাদা, ধাইর‍্যা, চাঁদা, কাঁকিল্যা, চিংড়ি (গলদা, গোঁড়ল্যা, ছোট ও জালমাছ), কাঁটাপাতাসী, বামুচ, গুঁচি (ফাল ও স্যাতা), রাইখোর, ভাঙন, বাইল্যা, উড়োল, ভোলা, দাঁড়ক্যা, ধোবা, চারচোখা, কটকটি, পুটি, ঢেলি, তিত পুটি, পিয়ালি, উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে এসব মাছের অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আঁখিরা গ্রামে রমজান আলী জানালেন, কানসাটের রাজা, সাহেব গ্রামের জমিদার, মালদহ জেলার ইংরেজ সাহেবরা এবং মালদহের তৎকালীন জেলা প্রশাসকসহ উর্ধতন কর্মকর্তা হাতির বহর নিয়ে শৈল্যা ও চাঁদপুরের কাঠালে (জঙ্গলে) এসে হরিণ-বাঘ শিকার করতে আসতেন বলে জানা যায়।[১৭]

ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শিক্ষা-দীক্ষায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ ঐতিহ্যবাহী জেলা হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করলেও উনিশ শতকের প্রথমার্ধেও চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কিত

www.pathagar.com

কোন তথ্য পাওয়া যায় না। চাঁপাইনবাবগঞ্জের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারের সূচনা হয় ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে। ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দের স্থানীয় জমিদার বাবু রমাপ্রসাদ মল্লিকের প্রচেষ্টায় তাঁর পিতার নামে 'হরিমোহন ইন্সটিটিউশন' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। তারপর বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ অব্যাহত থাকে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহকুমার শিবগঞ্জ থানাধীন দাদনচক গ্রামে ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে 'আদিনা ফজলুল হক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য সে সময় চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদরসহ অন্য উপজেলাও ব্যাপক কার্যক্রম শুরু হয়। শহর ও শহরসংলগ্ন এলাকার খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রাজারামপুর হামিদুল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৪১), রাজারামপুর হাসিনা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৪০), নবাবগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৫১), নবাবগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৩৫), নবাবগঞ্জ আলিয়া (কামিল) মাদ্‌রাসা (১৯৬৪) ও কামালউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ পূর্বকালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরে দুটি কলেজ ছিল। কলেজ দুটি হচ্ছে নবাবগঞ্জ কলেজ (১৯৫৫) ও নবাবগঞ্জ মহিলা কলেজ (১৯৬৯)। মহকুমার আদিনা ফজলুল হক কলেজ ও নবাবগঞ্জ কলেজ বেশ পরিচিতি লাভ করে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা সবার হৃদয় কেড়েছিল। এখানে তাঁদের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। স্থানীয় জমিদার হরিমোহন মল্লিকের সন্তান বাবু রমাপ্রসাদ মল্লিক স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের নিয়ে তাঁর পিতার নামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জেলায় স্মরণীয় হয়ে আছেন মরহুম ইদ্রিস আহমদ মিঞা। তিনি ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে অনেক ত্যাগের বিনিময়ে আদিনা ফজলুল হক কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেই তিনি খ্যান্ত হননি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে– দাদনচক ২নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯১০), দাদনচক বেল আফরোজ ইদ্রিসী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১০), দাদনচক ১নং সরকারি প্রথমিক বিদ্যালয় (১৯১৯), দাদনচক এইচ.এম. উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৯), দাদনচক ফজলুল হক পিটিআই (১৯৩৮), দাদনচক শিক্ষা স্কুল (১৯৩৮) ও আদিনা ফজলুল হক কলেজিয়েট স্কুল (১৯৪৪)।[১৮] নবাবগঞ্জ শহরে কোন কলেজ না থাকায় ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নেয়া হয়। একই বছর ফেব্রুয়ারি মাসে স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ তৎকালীন হরিমোহন ইন্সটিটিশন মাঠে এক সাধারণ সভায় মিলিত হন। মহকুমা প্রশাসক জনাব মো. আতিকুর রেজা চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেই সভাতেই নবাবগঞ্জ শহরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং শতাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি ওয়ার্কিং কমিটি।

উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন, অ্যাডভোকেট মো. নজমুল হক, অ্যাডভোকেট মির্জা মো. কাইউম, অ্যাডভোকেট জিল্লুর রহমান, অ্যাডভোকেট মো. তোবারক হোসেন, নগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বিমলরঞ্জন সিংহ, অ্যাডভোকেট বাবু অনিলেশ চন্দ্র মৌলিক ওরফে নিতু বাবু, আব্দুল গফুর বিশ্বাস, আব্দুল লতিফ হোসেন, আবুল ফজল খান (ফজু খাঁ),

www.pathagar.com

রমেশ চন্দ্র বাগচী, যোবদুল মোক্তার, অ্যাডভোকেট সোলায়মান, অ্যাডভোকেট রইসুদ্দীন আহম্মেদ, কবিরাজ আলফাজ উদ্দীন, মো. ফিরোজ কবির, অ্যাডভোকেট তাহের উদ্দীন, ডা. তারাপদ সাহা, ডা. আইয়ুব আলী, হাজী আব্দুর রাজ্জাক, মো. আলতাফ হোসেন, সামদানী মণ্ডল, অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান, আব্দুস সাত্তার সাতকড়ি এবং আরো অনেকে।

ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক নামোশংকরবাটী গ্রামের জনাব মো. মনিমুল হককে অস্থায়ী অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাস থেকে হরিমোহন ইন্সটিটিউশনে প্রাতঃকালীন শিফ্‌টে কলেজের ক্লাস শুরু হয়। বর্তমানে এই কলেজে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহর ছাড়াও অন্যান্য উপজেলায় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– চামাগ্রাম হে.না. উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৩), কানসাট উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৭), শিবগঞ্জ মডেল উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৪৮), নাচোল (১৯৫৪), চাতরা দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৪৩), রহনপুর ইউসুফ আলী কলেজ (১৯৬৭), কানসাট সোলেমান ডিগ্রি কলেজ (১৯৬৮), চাতরা ইসলামিক কালচারার ইন্সটিটিউট (১৯৬০), কৃষ্ণগোবিন্দপুর কলেজ (১৯৭০), নাচোল কলেজ (১৯৭২), গোমস্তাপুর সোলেমান মিঞা ডিগ্রি কলেজ (১৯৮৪), ভোলাহাট মহবুল্লাহ কলেজ (১৯৮৬), শাহ নিয়ামতুল্লাহ কলেজ (১৯৮০), বালগ্রাম আদর্শ কলেজ (১৯৯২), নাচোল মহিলা কলেজ (১৯৯৩) ইত্যাদি।

জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা

জেলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য মুসলিম ও হিন্দু স্থাপত্যকলার নিদর্শন। সেই প্রাচীনকালে নির্মিত স্থাপত্যকলার নিদর্শনগুলো অযত্ন অবহেলায় এখন প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি। অনেক নিদর্শন ইতোমধ্যে ধ্বংস হয়ে গেছে, যেগুলো টিকে আছে সেগুলোর অবস্থাও করুণ। নিম্নে জেলার প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো।

ছোট সোনা মসজিদ : চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার পশ্চিম সীমান্তে শিবগঞ্জ উপজেলার ফিরোজপুর মৌজাস্থিত ছোট সোনামসজিদটি সুলতানী আমলের স্থাপত্যকীর্তিগুলোর মধ্যে শিল্প ভাস্কর্যের অন্যতম নিদর্শন। এর কারুকার্য অপরূপ। গঠনশৈলী বৈচিত্র্যময় এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে,এই মসজিদের গম্বুজগুলির মধ্যস্থলে কেন্দ্রীয় গম্বুজ হিসেবে বাংলাদেশে প্রচলিত চৌচালা গৃহের চালের মতো পরস্পর ৩ টি গম্বুজ সংযোজিত করা হয়েছে এবং দুই সারিতে ৩ টি করে দুই পার্শ্বে আরো ১২ টি গোলাকৃতি গম্বুজ মোট ১৫ টি গম্বুজ মসজিদের অপরূপ শোভা ধারণ করেছে। গম্বুজগুলির তলদেশে বিচিত্র ফুলফলের গুচ্ছ লতাপাতা প্রভৃতি নকশা দিয়ে অলংকৃত। এই মসজিদের অভ্যন্তর গৌড়ের আদিনা মসজিদের কক্ষের অনুরূপ। উত্তর-পশ্চিম কোণে মহিলাদের নামাজ পড়ার একটি স্বতন্ত্র ছাদ প্রস্তর স্তম্ভের উপরে স্থাপিত রয়েছে।

www.pathagar.com

এর একটি প্রস্তরখণ্ড স্থানান্তরিত হয়ে নিকটস্থ হযরত শাহ্ নেয়ামতউল্লাহ (রঃ)র সমাধি প্রাঙ্গণে নীত হয়েছে। মসজিদে কারুকার্য খচিত একটি মাত্র মেহরাব রয়েছে। পর্দানশীন মহিলাদের গমনাগমের জন্য উত্তর দেওয়ালে ছাদ বরাবর একটি সুপ্রশস্ত সিঁড়ি এবং এই সিঁড়ি সংলগ্ন আজান দেওয়ার সুউচ্চ মিনার রয়েছে। এই মসজিদটি দৈর্ঘ্য প্রস্থ ৮২ × ৫২ ফুট, উচ্চতা প্রায় ২০ ফুট এবং এর চারপার্শ্বে অষ্টকোন বিশিষ্ট সুউচ্চ চারটি বুরুজ আছে। মূলত এটি একটি ইটের ইমারত হলেও দেওয়ালের বর্হিভাগের অংশ পাথর দিয়ে আবৃত। ভিতরের দিকের দেওয়াল গাত্রের বেশ কিছু অংশ জুড়ে পাথর দিয়ে আবৃত। সামনের দেয়ালে সমমাপের ৫টি দরজা রয়েছে। এতদব্যতীত মসজিদ গাত্রে নানা প্রকার লতাপাতার কারুকার্য তো আছেই। মধ্যবর্তী দরাজার চারপার্শ্বের কারুকার্য বৈচিত্র্যময়। তা অধিকাংশই পাথরে খোদিত। স্থানীয় লোকেরা গৌড়ের বড় সোনামসজিদের সংগে তুলনা করে একে 'ছোট সোনামসজিদ' বলে অভিহিত করে থাকেন। সেই হিসেবে এটা ছোট সোনামসজিদ নামে প্রসিদ্ধ। ঐতিহাসিক জেনারেল ক্যানিংহামের মতে, কিছু সংখ্যক স্বর্ণশিল্পী এই মসজিদের সাজ-সজ্জার পরিকল্পনা বা নক্শা প্রস্তুত করেছিলেন। পরে এ গম্বুজগুলি সোনালি রং-এ গিল্টি করা হলে এটি সোনা মসজিদ নামে অভিহিত হয়। খান সাহেব আবেদ আলী ও স্টেপেল স্টোন প্রমুখ পণ্ডিতগণ নতুন কোন মত প্রকাশ করেননি। তবে বিভারেজ সাহেব এ সম্পর্কিত জেনারেল ক্যানিংহামের মতামত সমর্থন করেন।

বংগের গৌরবময় রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে (১৪৯৩-১৫১৯খ্রি.) ৮৯৯ হতে ৯২৫ হিজরির মধ্যে জনৈক আলীর পুত্র ওয়ালী মুহম্মদ কর্তৃক রজব মাসের ১৪ তারিখে ছোট সোনামসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

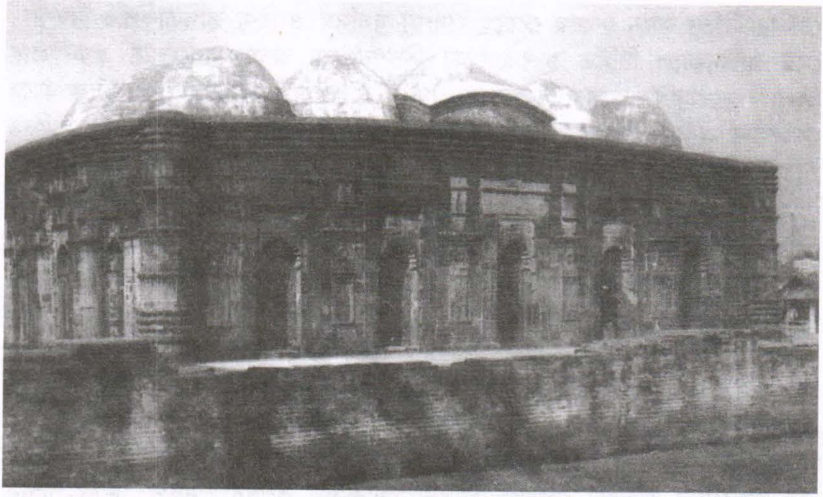

সোনা মসজিদ

www.pathagar.com

কানসাটের জমিদার বাড়ি

মসজিদের সম্মুখস্থ মধ্যবর্তী কারুকার্য খচিত দরওয়াজার উপরিস্থিত একটি শ্বেত প্রস্তরে উৎকীর্ণ আরবি শিলালিপি থেকে একথা অবগত হওয়া যায়। মসজিদের অভ্যন্তরের আয়তন ৭১ ফুট ৯ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য এবং ৪০ ফুট ৬ ইঞ্চি প্রস্থ। ৩ সারিতে বিভক্ত। প্রত্যেক সারিতে ৫টি করে পাথরের স্তম্ভ রয়েছে। কতকটা গোলাকৃতি অথচ লম্বা ৫টি মেহরাব আছে। কিন্তু মেহরাবের কারুকার্য খচিত শ্বেত পাথরগুলো বর্তমানে নেই। স্থানীয় জনশ্রুতি ও কয়েকটি বিবরণীতে জানা যায় যে, ১৮৯৭ খিষ্টাব্দের ভূমিকম্পে মসজিদের পশ্চিম দেওয়ালের বহুলাংশ ভেঙে পড়ে। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে তা কেবলমাত্র ইট দ্বারা মেরামত করা হয়। এ সময় মধ্যবর্তী মেহরাবের উপরে স্বতন্ত্র একটি শ্বেত পাথরের একখণ্ড উজ্জ্বল বস্তু ও আরো কয়েক টুকরো পাথর খণ্ড ইংরেজরা নিয়ে যায়। এমনকি পশ্চিম দেওয়ালের কারুকার্যপূর্ণ কতকগুলি দুস্প্রাপ্য ও বহু মূল্যবান শিল্প নিদর্শনও স্থানান্তরিত হয়ে বিলেতে চলে যায়।[১৯]

শাহ্ নেয়ামতউল্লাহ (রহঃ)এর মাজার : চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে (গৌড়ের পূর্বাঞ্চলে) ইসলাম বিস্তৃতির দায়িত্ব যাঁরা বহন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে স্বনামে খ্যাত সাধক হযরত শাহ সৈয়দ নেয়ামতউল্লাহ (রহঃ) অন্যতম শ্রেষ্ঠ। সুলতান শাহ সুজার রাজত্বকালে (১৬৩৯-১৬৬০ খ্রি:) তিনি দিল্লী প্রদেশের করোনিয়ার নামক স্থান থেকে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে নানা স্থান ভ্রমণ করে রাজমহলে এসে উপস্থিত হন। তাঁর

www.pathagar.com

আগমনবার্তা জানতে পেরে সুলতান সুজা তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের সংগে অভ্যর্থনা জানান এবং তাঁর হাতে বায়াত হন। পরে তিনি গৌড়ের উপকণ্ঠে (শিবগঞ্জ উপজেলার) ফিরোজপুরে স্থায়ীভাবে আস্তানা স্থাপন করেন। দীর্ঘদিন এতদঞ্চলে তিনি সুনামের সঙ্গে ইসলাম প্রচার করে ফিরোজপুরেই ১০৭৫ হিজরি (১৬৬৪ খ্রিষ্টব্দে) মতান্তরে ১০৮০ হিজরিতে (১৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দে) সমাধিস্থ হন।

হযরত শাহ নেয়ামতউল্লাহর মাজার শরীফ শিবগঞ্জ উপজেলার তোহাখানায় অবস্থিত। বার দরওয়াজা বিশিষ্ট চতুস্কোনায়তন তাঁর সমাধিটি প্রত্যেক ধানে ২/৩ টি করে দরওয়াজা আছে। এখানে যে লিপিটি আছে তা হোসেন শাহী যুগের একটি আরবি লিপি। পরবর্তীকালে সেখানে তা স্থাপন করা হয়েছে।

শাহ নেয়ামতউল্লাহর সমাধি প্রাঙ্গণে বারবাক শাহের রাজত্বকালের আর একটি শিলালিপি শিয়ার-উল-মুতাখিরিনের প্রণেতা মীর গোলাম হোসেনের সমাধিতে ভুলক্রমে স্থাপন করা হয়েছে। এই সমাধি প্রাঙ্গণে আরো কয়েকজন সাধক পুরুষের সমাধি রয়েছে। হযরত শাহ নেয়ামতউল্লাহর সমাধি চত্বর প্রাঙ্গণ বৃক্ষশোভিত ও ইটের প্রাচীর দিয়ে বেষ্টিত। প্রতিদিনই বহুলোক তাঁর মাজার দর্শন করে কৃতার্থ হন।

তিন গম্বুজ মসজিদ ও তোহাখানা : শিবগঞ্জ উপজেলার ফিরোজপুরস্থিত শাহ নেয়ামতউল্লাহ (রহঃ) প্রতিষ্ঠিত তদীয় সমাধি সংশ্লিষ্ট তিন গম্বুজ জুম্মা মসজিদটি মোঘল যুগের একটি বিশিষ্ট কীর্তি। এতে ৩টি প্রবেশ পথ এবং ভেতরে ৩টি মেহরাব রয়েছে। মসজিদের ভেতর ও বাইরে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কারুকার্য নেই। দেয়ালে কয়েকটি তাক আছে। স্থানীয় জনসাধারণ এই মসজিদে নিয়মিতভাবে জুম্মা নামাজ আদায় করে থাকেন।

এই মসজিদ সংলগ্ন দক্ষিণ পার্শ্বে সুলতান শাহ সুজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দ্বিতল ইমারতটির ভগ্নাবশেষ মোঘল যুগের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কীর্তি। এই ইট নির্মিত ইমারতটি 'তোহাখানা' নামে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে যে বঙ্গ সুলতান শাহ সুজা তাঁর মোরশেদ হযরত শাহ নেয়ামতউল্লাহর উদ্দেশ্যে (রাজত্বকাল ১৬৩৯-৫৮ খ্রি.) শীতকালীন বাসের জন্য ফিরোজপুর 'তাপনিয়ন্ত্রণ' ইমারত হিসেবে এ ভবনটি নির্মাণ করেছিলেন। সময়ে সময়ে শাহ সুজাও এখানে এসে বাস করতেন। এর দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে ১১৬ ফুট ও প্রস্থে ৩৮ ফুট। এতে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু কামরা ও উভয় পার্শ্বে বারান্দা ছিল।

জনশ্রুতি রয়েছে শাহ সুজা যখন ফিরোজপুরে মোরশেদ শাহ নেয়ামতউল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসতেন তখন উক্ত ইমারতের মধ্যবর্তী সুপ্রশস্ত কামরাটিতে বাস করতেন। গৌড়ের প্রাচীন কীর্তির মধ্যে এই শ্রেণির ইমারত এই একটিই পরিলক্ষিত হয়। কড়িকাঠের উপর খোয়া ঢালাই করে যার ছাদ ও কোঠা জমাট করা হয়েছিল।

উল্লিখিত মসজিদ ও তোহাখানার নিকটস্থ সরোবর 'দাফেউল বালাহ'র তীরে অবস্থিত। এই দুই ইমারত হতে দুইটি সিঁড়ি সরোবরের তলদেশ পর্যন্ত বিন্যস্ত। পূর্বতীর হতে উক্ত ইমারতদ্বয়ের দৃশ্যাবলি খুবই মনোরম।

www.pathagar.com

দারসবাড়ি মসজিদ : ছোট সোনামসজিদ ও কোতোয়ালী দরজার মধ্যবর্তী স্থানে ওমরপুরের সন্নিকটে দারসবাড়ি অবস্থিত। পুরুষানুক্রমে স্থানীয় জনসাধারণ এই স্থানকে 'দারসবাড়ি' বলে থাকেন। বর্তমানে এই স্থান শূন্য। দর্সের কোন ব্যবস্থা নেই। অথচ দর্সবাড়ি নামে প্রসিদ্ধ। দর্স-অর্থ-পাঠ। বোধহয় একসময় মসজিদ সংলগ্ন একটি মাদ্রাসা ছিল এখানে। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের সময় মুনশি এলাহী বখশ কর্তৃক আবিষ্কৃত একটি আরবি শিলালিপি অনুযায়ী (লিপি-দৈর্ঘ্য ১১ ফুট ৩ ইঞ্চ, প্রস্থ ২ফুট ১ ইঞ্চি) ১৪৭৯ খ্রিষ্টাব্দে (হিজরি ৮৮৪) সুলতান শামস উদ্দীন ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে তাঁরই আদেশক্রমে এই মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইট দ্বারা নির্মিত এই মসজিদের অভ্যন্তরের আয়তক্ষেত্র দুই অংশে বিভক্ত। এর আয়তন ৯৯ ফুট ৫ইঞ্চি ৩৪ ফুট ৯ইঞ্চি। পূর্ব পার্শ্বে একটি বারান্দা, যা ১০ ফুট ৭ ইঞ্চি। বারান্দার খিলানে ৭টি প্রস্তর স্তম্ভের উপরের ৬টি ক্ষুদ্রাকৃতি গম্বুজ এবং মধ্যবর্তীটি অপেক্ষাকৃত বড় ছিল। উপরে ৯টি গম্বুজের চিহ্নাবশেষ রয়েছে। উত্তর দক্ষিণে ৩টি করে জানালা ছিল। উত্তর পশ্চিম কোণে মহিলাদের নামাজ পড়ার জন্য প্রস্তর স্তম্ভের উপরে একটি ছাদ ছিল। এর পরিচয় স্বরূপ এখনও একটি মেহরাব রয়েছে। এতদ্ব্যতীত পশ্চিম দেয়ালে পাশাপাশি ৩টি করে ৯টি কারুকার্য খচিত মেহরাব বর্তমান রয়েছে। এই মসজিদের চারপার্শ্বে দেয়াল ও কয়েকটি প্রস্তর স্তম্ভের মূলদেশ ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এ মসজিদটিও বাংলার প্রথম যুগের মুসলিম স্থাপত্যের কীর্তির একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এখানে প্রাপ্ত তোগরা অক্ষরে উৎকীর্ণ ইউসুফি শাহী লিপিটি এখন কোলকাতা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। জেনারেল ক্যানিংহাম তাঁর নিজের ভাষাতে একে দারসবাড়ি বা কলেজ বলেছেন। এ ঐতিহাসিক কীর্তির মাত্র কয়েক গজ দূরে ভারতীয় সীমান্ত।

১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে এ স্থানে একটি জঞ্জাল স্তূপের নিচে মুন্সী এলাহী বখশ ১১ ফুট ৩ ইঞ্চি ও ২ ফুট ১ ইঞ্চি উঁচু একটি তোঘরা লিপি প্রাপ্ত হন। এটা এখন কলকাতা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। নম্বর- ৩১৩৯। লিপিটির বিপুল দৈর্ঘের কারণে একে দু' ভাগ করতে হয়েছে। লিপির অর্থ হচ্ছে :

"সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন : 'নিশ্চয়ই সব মসজিদ আল্লাহর, সুতরাং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না।' নবীও বলেছেন, আল্লাহর জন্য যে একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য বেহেসতে অনুরূপ একটি প্রাসাদ তৈরি করবেন।

এই জামে মসজিদ ন্যায় পরায়ণ ও মহান সুলতান, জনগণ ও জাতি সমুহের প্রভু, সুলতানের পুত্র সুলতান, তাঁর পুত্র সুলতানের পুত্র শামসুদ্দুনীয়া ওয়াদ্দীন আবুল মুজাফ্ফর ইউসুফ শাহ সুলতান, পিতা বরবক শাহ সুলতান, পিতা মাহমুদ শাহ সুলতান কর্তৃক নির্মিত। আল্লাহ তাঁর শাসন ও সার্বভৌমত্ব চিরস্থায়ী করুন এবং তাঁর উদারতা ও উপচিকীর্ষা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ুক। তারিখ ৮৮৪ হিঃ।"[২০]

খঞ্জনদিঘির মসজিদ : দারসবাড়ি মসজিদের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত বল্লাল সেন খননকৃত বালিয়া দিঘির দক্ষিণ পাড় ঘেঁষে পূর্বদিকে কিছুদূর গিয়ে চোখে পড়ে খঞ্জনদিঘির মসজিদের ধ্বংসাবশেষ। এক প্রাচীন জলাশয়ের পাশেই এ ধ্বংসাবশেষটি

www.pathagar.com

অবস্থিত। খঞ্জনদিঘির মসজিদটি অনেকের নিকট খনিয়াদিঘির মসজিদ নামে পরিচিত। আবার অনেকে একে রাজবিবি মসজিদও বলে থাকেন।

বহুকাল ধরে মসজিদটি জঙ্গলের ভেতর অজানাভাবে পড়েছিল। কিছুকাল আগে জঙ্গল কমে গেলে মসজিদটি মানুষের চোখে পড়ে। কিন্তু ইতোমধ্যে মসজিদটির প্রায় শেষ অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এখন এটিকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

বর্তমানে মসজিদটির একটি মাত্র গম্বুজ ও দেয়ালের কিছু কিছু অংশ কোন রকমে টিকে আছে। এগুলোর অবস্থাও খুব জীর্ণ। আদিতে এই মসজিদের আয়তন ছিল ৬২×৪২ ফুট। গম্বুজটির নিচের ইমারত বর্গের আকারে তৈরি। এই বর্গের প্রত্যেক বাহু ২৮ ফুট লম্বা। এটি মাঝের গম্বুজ। বড় কামরার সামনের দিকে (পূর্ব) একটি বারান্দা ছিল। ইটের তৈরি এ মসজিদের বাইরে সুন্দর কারুকাজ করা ছিল। যার নমুনা খুব সামান্য থাকলেও রয়েছে।

খঞ্জনদিঘির মসজিদ কখন নির্মিত হয়েছিল এবং কে নির্মাণ করেছিলেন সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তবে মসজিদ তৈরির নমুনা দেখে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে এটি পনেরো শতকে নির্মিত হয়েছিল।

ধনাইচকের মসজিদ : খঞ্জনদিঘি মসজিদের ধ্বংসাশেষের একটু দূরেই রয়েছে আর একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ। এই মসজিদের নাম ধনাইচকের মসজিদ। মসজিদটির পশ্চিম ও উত্তর দেয়ালের কিছু কিছু অংশ এখনও দাঁড়িয়ে আছে। আর রয়েছে কয়েকটি স্তম্ভের কিছু কিছু অংশ, এগুলো পাথরের তৈরি।

অনেককাল আগের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে জানা যায় যে, মসজিদটিতে ৩টি গম্বুজ ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালের গবেষণায় দেখা গেছে এতে ৬টি গম্বুজ ছিল। মেহরাবে ছিল অতি সুন্দর লতাপাতা ও ফুলের কাজ। এ মসজিদটিও ১৫ শতকে নির্মিত বলে পন্ডিতেরা অনুমান করেন। তবে এর নির্মাতা কে এ সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায়নি।

কানসাটের জমিদার বাড়ি : শিবগঞ্জ উপজেলার কানসাট একটি প্রাচীন গ্রাম। এখানকার জমিদারদের আদিপুরুষ প্রথমত বগুড়া জেলার 'কড়ইঝাকৈর' গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। দস্যু সরদার পণ্ডিতা ডাকাতের অত্যাচারে তাঁরা ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছাতে স্থানান্তরিত হন। পরে তাঁরা নবাবগঞ্জের কানসাটে এসে স্থায়ী হন। সূর্যকান্ত, শশীকান্ত ও শীতাংশুকান্ত এই বংশের অধঃস্তন বংশক্রম। প্রজা সাধারণের জন্য এঁরা কিছু রেখে যেতে পারেননি। এঁরা মুসলিম বিদ্বেষী জমিদার হিসেবে কুখ্যাতি লাভ করেন। বলাবাহুল্য জমিদার কার্য ছাড়াও এঁরা হাতির বেচাকেনা করতেন। আসামে এঁদের একটি 'খেদা' ছিল।

এই জমিদার পরিবারের মুসলিম বিদ্বেষের বহু দৃষ্টান্ত এতদঞ্চলে বিদ্যমান। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে স্থানীয় কাগজী পাড়ায় মুসলিম সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্রের ফলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে এক দাঙ্গা-

www.pathagar.com

হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়। ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে স্থানীয় শ্যামপুর চৌধুরী পরিবারের নেতৃত্বে বাজিতপুর গ্রামের 'আম্রকাননে' প্রায় ১২ টি ইউনিয়নের মুসলমান সম্প্রদায় একত্রিত হয়ে উক্ত ঘটনার জোর প্রতিবাদ জানায় এবং একটি মামলা দায়ের করে। এই মামলায় জমিদার শীতাংশু বাবু হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা অনুমান করে স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়কে ডেকে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং সাময়িক বিপদ হতে রক্ষা পান। এই হাংগামা সংক্রান্ত মামলার যাবতীয় কাগজপত্রের নকল স্থানীয় চৌধুরী মৌলভী আবুল ফজল সাহেবের নিকট রক্ষিত আছে।

জোড়ামঠ : চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের হুজরাপুর দু'টো মঠ বা মন্দির পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। অত্র অঞ্চলে পাশাপাশি মঠ আর কোন স্থানে দেখা যায় না। তাই এলাকাবাসীর কাছে এটি 'জোড়ামঠ' নামে পরিচিত। নবাবগঞ্জ পূর্বে হিন্দু প্রধান এলাকা ছিল, তখন প্রায় প্রত্যেক পাড়ায় বা গ্রামে বিভিন্ন আকারের মঠ গড়ে উঠেছিল। জোড়ামঠের চেয়ে ৫০০ গজ দূরে একটি ছোট মন্দির রয়েছে। তবে অত্র এলাকায় জোড়ামঠের চেয়ে বড় মঠ বা মন্দির চোখে পড়ে না। এই মঠ দুটি কখন নির্মিত হয়েছিল সে সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কোন তথ্য জানা যায় না। তবে এটা যে খুবই প্রাচীন এতে কোন সন্দেহ নেই। মঠ দুটোর উপরে পেতলের পাত দিয়ে তৈরি চূড়া রয়েছে। দীর্ঘদিন ব্যবহার না হওয়ায় মঠ দুটির চারিদিকে ও দেয়ালে নানান গাছ জন্মেছিল। কিছুদিন আগে তা পরিষ্কার করা হয়েছে। মঠ দুটি মহানন্দা নদীর তীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। এককালে এই মঠে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে পূজা উৎসব পালিত হতো একনজর দেখলেই তা বোঝা যায়। এলাকার প্রাচীন ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেও এ মঠ নির্মাণের সময় এবং নির্মাতার নাম জানা যায়নি। এই মঠ দুটোর উচ্চতা প্রায় ৪০ ফুট হবে। মন্দিরের মধ্যে 'লিঙ্গ' পূজার মত একটি দণ্ড দেখা যায়। এতে থেকে ধারণা করা যায় যে, এক সময় এখানে হিন্দু সম্প্রদায়ের লিঙ্গপূজা অনুষ্ঠিত হতো। জোড়ামঠের আশেপাশে এখনও হিন্দু সম্প্রদায়ের বাস লক্ষ করা যায়। জোড়ামঠ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য উদ্ধার করতে হলে এটা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন। তাই এ ব্যাপারে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন বলে এলাকাবাসী দাবি জানায়। তাঁদের মতে এই জোড়ামঠের মধ্যে ইতিহাস লুকিয়ে আছে তা উদঘাটন হওয়া উচিত।

ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তি

চাঁপাইনবাবগঞ্জের মানুষের জীবনে 'আন্দোলন' একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে এই এলাকার মানুষকে সংগ্রাম করতে হয়েছে অপশক্তির বিরুদ্ধে। ১৭৭২-১৭৮২ খ্রি. তৎকালীন কোম্পানির কুশাসন ও তাদের দোসর জমিদার দেবী সিং এর প্রজাপীড়নের ফলে উত্তরবঙ্গে যে প্রজাবিদ্রোহের আগুন জ্বলে' ওঠে চাঁপাইনবাবগঞ্জের মানুষ সে বিদ্রোহে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই সংগ্রামের নেতা মজনু শাহ ইংরেজ সরকারকে কর না দেয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানান। উত্তরবঙ্গের এ প্রজাবিদ্রোহের প্রভাব তৎকালীন চাঁপাইনবাবগঞ্জে ব্যাপক বিস্তার

www.pathagar.com

লাভ করে। এই আন্দোলনে সহায়তার জন্য এবং ব্যয়ভার বহনের জন্য জনগণের ওপর 'টিংখরচা' বা বিদ্রোহের চাঁদা নামে এক প্রকার কর ধার্য করা হয় এবং জনগণ তা সাগ্রহে প্রদান করেন। তৎকালীন চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকার অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা টিংখরচা দিয়ে ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহে সহায়তা করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই নীলকর সাহেবদের নীলকুঠি গড়ে উঠেছিল। যথেচ্ছভাবে তারা ব্যবহার করেছিল এদেশের মাটি ও মানুষকে। আজো এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে সাহেবদের নির্মম লোমহর্ষক কাহিনি। আরো ছড়িয়ে রয়েছে তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংঘটিত বিদ্রোহের কাহিনি।

অবিভক্ত ভারতের মালদহ জেলা জুড়ে ছিল পদ্মা ও মহানন্দা বিধৌত উর্বর সমভূমি বা দিয়াড় এলাকা। এ উর্বরভূমিই আকৃষ্ট করেছিল মেদিনিপুর জমিদার কোম্পানিকে। নীল আর রেশমকে কেন্দ্র করেই সে সময় মালদহ জেলায় বেশ কয়েকটি ব্যবসাকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। তার মধ্যে বর্তমান চাঁপাইনবাবগঞ্জের বারোঘরিয়া, রামচন্দ্রপুরহাট, সাহেব গ্রাম প্রভৃতি এলাকায় নীলকুঠি গড়ে উঠেছিল। যদিও ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে এদেশে নীল চাষের সূচনা হয়েছিল, পর্যায়ক্রমে এদেশে উর্বর এলাকা দেখে নীলকর সাহেবরা বিভিন্ন স্থানে কুঠি স্থাপন করেছিল। এভাবেই ১৮৩০-৩৫ খ্রি. রামচন্দ্রপুর ও বারোঘরিয়ায় নীলকুঠি গড়ে ওঠে। এখানে আগমন ঘটে ইংরেজ সাহেবদের। ক্রমান্বয়ে শুরু হয় বাধ্যতামূলক নীল চাষ।

ইতিহাসখ্যাত ওয়াহাবী আন্দোলনে ছিল চাঁপাইনবাবগঞ্জবাসীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। উইলিয়াম হন্টার তাঁর 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' গ্রন্থে লিখেছেন, অত্যন্ত সংগোপনে বাংলার ওয়াহাবীরা ইংরেজ বিতারণের জন্য জেহাদের ডাকে সাড়া দেয় এবং সুদূর সিন্ধুতে সৈয়দ আহমদের আস্তানায় অর্থ সাহায্য ও সৈন্য প্রেরণ অব্যাহত রাখে। বাংলাদেশে এর একমাত্র কেন্দ্র ছিল চাঁপাইনবাবগঞ্জের বর্ধিষ্ণু জনপদ নারায়ণপুর।

পদ্মানদীর ভাঙনে বিপর্যস্ত আজকের নারায়ণপুর ছিল বাংলাদেশের একমাত্র কেন্দ্র যেখান থেকে সুদূর সিন্ধু পর্যন্ত ওয়াহাবীদের সাহায্য করা হতো। ওয়াহাবী আন্দোলন ছিল মূলত ধর্মীয় সংস্কারমূলক পদক্ষেপ যা পরবর্তীতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে এবং তাদের এদেশ ছাড়ার অন্যতম প্রেরণাদায়ী শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

নারায়ণপুরের রফিক মণ্ডল এই আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। হান্টার লিখেছেন, মণ্ডল বলেতে যা বোঝায় দক্ষিণ ও মধ্য ভারতে তাকে প্যাটেল বলে।

রফিক মণ্ডল ছিলেন তহসিলদার। তসহসিলের সংগৃহীত অর্থের এক চতুর্থাংশ তিনি পেতেন। ওয়াহাবীদের জন্য অর্থ সংগ্রহকারীদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। এই কার্যক্রমের জন্য তিনি গ্রেফতার হন ও পরে মুক্তি পান। পরে এই কার্যক্রমের ভার তিনি তাঁর পুত্র মৌলভী আমির উদ্দীনের হাতে ন্যস্ত করেন।

মৌলভী আমির উদ্দীনের কর্মক্ষেত্র মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহীর বিভিন্ন অংশে বিস্তৃত ছিল। তিনি কত মুজাহিদ সংগ্রহ করেছিলেন সঠিকভাবে তা জানা না গেলেও

www.pathagar.com

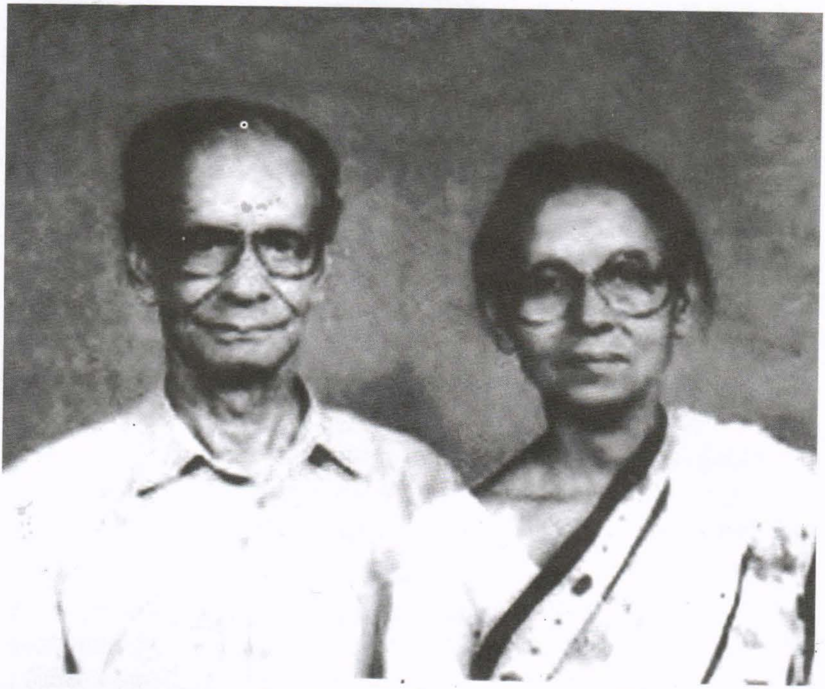

তেভাগা আন্দোলনের প্রাণ পুরুষ রমেন মিত্র ও ইলা মিত্র

এক চৌকির চার'শ ত্রিশ জনের মধ্যে শতকরা ১০ জন তাঁর এলাকার লোক ছিল বলে জানা যায়।

এই অঞ্চলে বিভিন্ন উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করা হতো : ১. জাকাতের অর্থ ২. সদকার অর্থ ৩. ফিতরার অর্থ ৫. তাঁর হুকুমে প্রত্যেক গৃহে ভাতরান্নার সময় একমুঠো চাল আলাদা করে রাখা হতো এবং প্রত্যেক শুক্রবার নিযুক্ত ব্যক্তির নিকট তা হস্তান্তর করা হতো। এমনি করে মুঠি তোলা পদ্ধতি গড়ে ওঠে এবং তাতে করে বিপুল অর্থ জমা হতে থাকে। জানা যায় এমন কোন বাড়ি ছিল না যেখানেকার তোলা মুঠির অর্থ ওহহাবী আন্দোলন কেন্দ্রে জমা হয়নি।

হান্টার আরো লিখেছেন যে, মাওলানা বেলায়েত আলী, মাওলানা এনায়েত আলী ও মাওলানা ফায়েজ আলীও আমির উদ্দীনের বাসগৃহে অবস্থান করেছিলেন। তাঁর বাসস্থান ছিল নারায়ণপুর।

র‍্যাভেন শায়ারের বর্ণনা থেকে জানা যায়, রফিক মণ্ডলের তিন পুত্র ছিল। প্রথম মাওলানা আমির উদ্দীন, দ্বিতীয় মাওলানা শুকুর মোহাম্মদ ও তৃতীয় পুত্র ছিলেন তহসীলদার। তিনি তাবলীগী কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

মাওলানা আমির উদ্দীন ইংরেজদের হাতে গ্রেফতার হন। তাঁর বিরুদ্ধে মোকাদ্দমা দায়ের হয়। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের দণ্ডাদেশ দেয়া হয়। ১৮৭২

www.pathagar.com

খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে তাঁকে আন্দামানে দ্বীপান্তর দেয়া হয়। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে আন্দামানে পৌঁছার পর সুদীর্ঘ ১১ বছর শাস্তির পর ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ তিনি মুক্তিপান এবং অন্যান্যদের সঙ্গে হিন্দুস্থান রওনা হন।

ওয়াহাবী আন্দোলনে সার্বিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে চাঁপাইনবাবগঞ্জের সংগ্রামী জনতা ব্রিটিশ শাসকদের কুদৃষ্টিতে পড়ে। বিভিন্ন সময় ব্রিটিশ বিরোধী কার্যক্রম তথা আন্দোলন চাঁপাইনবাবগঞ্জবাসী সব সময়ই সোচ্চার থাকলেও তেমন উল্লেখযোগ্য ঘটনা এখানে ঘটেনি।[২১]

১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের প্রবল উচ্ছ্বাসে সমগ্র বাংলা উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। বিদেশীবস্ত্র বর্জন এবং স্বদেশি দ্রব্য গ্রহণের পক্ষে আন্দোলন মুখর হয়ে ওঠে এ ভূ-খণ্ডের সমগ্র পরিসর। এই গ্রহণ বর্জনের ঢেউ চাঁপাইনবাবগঞ্জবাসীর মনে সাড়া জাগায়। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের প্রচেষ্টা রহিত হয়। এর পরবর্তী কয়েক বছর চাঁপাইনবাবগঞ্জের জনজীবনের রাজনৈতিক প্রবাহে ভাটা পড়ে। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে সূচিত অসহযোগ আন্দোলনের রণধ্বনি বেজে উঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থিমিতভাবটি আবার তিরোহিত হয়। মহাত্মা গান্ধীর মন্ত্রে চাঁপাইনবাবগঞ্জের জনগণ নবচেতনা লাভ করেন।

১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী ও অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় খেলাফত আন্দোলনের সূচনা হয়। এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জে গঠিত হয় খেলাফত কমিটি। এই কমিটির উদ্যোগে শিবগঞ্জ, নাচোল, রহনপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ থানার বিভিন্ন এলাকায় বেশ কিছু সভার আয়োজন করা হয়।

১৭৭২-৮২ খ্রি. তৎকালীন কোম্পানির কুশাসন ও কোম্পানির দোসর দেবী সিং এর মতো জমিদারদের প্রজাপীড়নের ফলে উত্তরবঙ্গে প্রজাবিদ্রোহ শুরু হয়। এ সময়ে মজনু শাহ, মুসা শাহ, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণী এসব কিছু ছদ্মনামধারী ব্যক্তিদের নেতৃত্বে বিদ্রোহীগণ সংগ্রামে নামেন। তবে সংগ্রামের প্রধান নেতা ছিলেন মজনু শাহ। তিনি ফকিরবেশী নেতা ছিলেন। এজন্য ঐ আন্দোলন 'ফকির আন্দোলন' নামে খ্যাত। তিনি ইংরেজ কুশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামেন এবং ইংরেজ সরকারকে কর না দেয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানান। উত্তরবঙ্গের এই প্রজাবিদ্রোহের প্রভাব তৎকালীন নবাবগঞ্জেও ব্যাপক বিস্তার লাভ করে।

মুসলমান নবাব বাদশাহদের দরবারে ফকির সুফিদের কদর ছিল। তাঁরা শাহ সুফিদের মাজারে জমায়েত হতেন (যেমন মহাস্থানগড় প্রভৃতি স্থান)। কিন্তু দেশ ব্রিটিশ শাসনের অধীনে এলে তাঁদের পর্যটনে বাধা পড়ে, এমন কি তাঁদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। চির স্বাধীন ফকিরগণ তাতে তাঁদের স্বাধিকারে হস্তক্ষেপ বলে মনে করেন। এতো দিন তাঁরা রাজকীয় সূত্রে যে সব সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়ে আসছিলেন, কোম্পানি তাতেও হস্তক্ষেপ করে ফলে তাদের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। শুধু তাই নয়, ইংরেজ সরকার আয় বাড়ানোর জন্য তীর্থ যাত্রীদের ওপর কর বসিয়ে দেয়, তখন ধর্মের

www.pathagar.com

অনুষ্ঠানে বাধা দেয়া হচ্ছে মনে করে তাঁরা বিদ্রোহী হন। ইংরেজদের সংগে তাঁদের সংঘর্ষ বাধে এবং সংঘর্ষে ক্যাপ্টেন টমাস নিহত হন।

সুবে বাংলার স্বাধীন নবাব আলীবর্দী খাঁ ফকির সন্ন্যাসীদের খুব শ্রদ্ধা করতেন। অন্য রাজা ও মহারাজাগণও তাঁদের বিশেষ ভক্তি করতেন। নাটোরের রাণী ভবানীর মতো ক্ষমতাসম্পন্ন জমিদারও (১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন রেনেল সাহেবের ম্যাপ অনুসারে রাণী ভবাণীর জমিদারীর পরিমাপ ছিল ১২,৯৯৯ বর্গ মাইল। শাসন ব্যবস্থার সুবিধার জন্য মুর্শিদকুলী খান বাংলাকে যে ১৩ টি চাকলায় বিভিক্ত করেন, রাণী ভবানীর জমিদারী ছিল তার ৮ টি চাকলা বিস্তৃত। বর্তমান বাংলাদেশের বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা, দিনাজপুর, বগুড়া, কুষ্টিয়া, যশোর ও রংপুর জেলা এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, বীরভূমি, মালদহ ইত্যাদি জেলায় বিস্তৃতি ছিল। রাণী ভবাণীর জমিদারী) ফকিরদের বাধা দেননি, এমনকি তাঁদের দমনের জন্য কোম্পানিকে কোন সাহায্য করেননি। ইংরেজ কোম্পানির হাতে ১৫০ জন নির্দোষ ফকির নিহত হওয়ার পর ফকির নেতা মজনু শাহ রাণী ভবাণীর কাছে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন। ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে রাণী ভবানীর কাছে মজনু শাহ যে আবেদন করেন তাতে তিনি বলেন- 'আমরা দীর্ঘকাল ধরে এ দেশে ভিক্ষা করছি এবং বাংলাদেশেও আমাদের বরাবর অভ্যর্থনা জানিয়েছে। আমরা কাউকে গালি দিই না, কিন্তু তা সত্বেও আমাদের ১৫০ জন নির্দোষ ফকিরকে হত্যা করা হয়েছে, তাদের পরিধেয় বস্ত্র এবং খাদ্য পর্যন্ত কেড়ে নেয়া হয়েছে। এসব গরিব লোকদের হত্যা করে কি লাভ হয় তাদের? পূর্বে ফকিররা এমনি ভিক্ষা করে বেড়াতো, এখন তারা দলবদ্ধ হয়েছে। ইংরেজগণ তাদের ঐক্য পছন্দ করে না, তারা ফকিরদের উপাসনায় বাধা দেয়। আপনি আমাদের প্রকৃত শাসক, আপনার মঙ্গলের জন্য প্রার্থণা করি। আপনার নিকট সাহায্য লাভের আশা করি।

মজনু শাহের মৃত্যুর পর তাঁর যোগ্য শিষ্য ও ভ্রাতা মুসা শাহ ফকির বিদ্রোহের নেতা হন। তাঁরা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসের শেষের দিকে তারা রাজশাহীতে প্রবেশ করেন। রাণী ভবানীর বরকন্দাজের সংগে তাদের সংঘর্ষ হয়। এতে বরকন্দাজ বাহিনী পরাজিত হয়। আবার ১০ চৈত্র জমিদারদের একটি দল ও ৩০ জন সিপাহী মিলিতভাবে তাঁদের বিতাড়িত করে। খণ্ডযুদ্ধে গ্রামবাসীরা বিদ্রোহী ফকিরদের সহায়তা করে। বিদ্রোহীদের প্রতি গ্রামবাসীদের সমর্থনের জন্য স্থানীয় শাসন কর্তাগণ গ্রামবাসীদের কঠিন শাস্তিদানের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তা সত্বেও গ্রামবাসী মুসাকে বাধা না দিয়ে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। পলায়নের পর গ্রামবাসী তাঁদের ফেলে যাওয়া দ্রব্য সামগ্রী যত্নে তুলে রাখে এবং পরে তাঁরা ফিরে এলে তা ফিরিয়ে দেয়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, গ্রামবাসী তাঁদের সব সময়ের জন্য সমর্থন জানিয়েছে।

ফকির আন্দোলন পাক-ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগতিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিল। ফকিরদের অনুরূপ পেশার সন্ন্যাসীদেরও কোম্পানির রোষানল থেকে মুক্তি ছিলনা, তাই অনেক ইতিহাস গবেষক আন্দোলনকে 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' নামেও অভিহিত করে থাকেন। এ আন্দোলনে সহায়তা করার জন্য এবং ব্যয়ভার বহণের জন্য জনগণের

www.pathagar.com

ওপর 'টিং খরচা' বা বিদ্রোহের চাঁদা নামে এক প্রকার কর ধার্য করা হয় এবং জনগণ তা স্বেচ্ছায় প্রদান করে। তৎকালীন নবাবগঞ্জ এলাকার অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা টিং খরচা দিয়ে ফকির ও সন্ন্যাসীদের আন্দোলনে সহায়তা করতেন বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। কারণ তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, এসব ফকির সন্ন্যাসীরা ছিলেন এদেশের স্বাধীনতাকামী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি।

নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনি সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে রয়েছে। আর এদের অমানবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে ও বিদ্রোহও হয়েছে বারবার। কিন্তু সব বিদ্রোহ ও বিদ্রোহীদের কাহিনি ইতিহাসের পাতায় ঠাঁয় পেয়েছে এমন কথা বলা যায় না। এমনি এক নীল বিদ্রোহের ইতিহাস লুকিয়ে আছে চাঁপাইনবাবগঞ্জে।

অবিভক্ত বাংলাদেশের মালদহ জেলা জুড়ে ছিল পদ্মা ও মহানন্দা বিধৌত উর্বর সমভূমি বা দিয়াড় এলাকা। এ উর্বর ভূমি আকৃষ্ট করেছিল মেদিনীপুর জমিদার কোম্পানিকে। নীল আর রেশমকে কেন্দ্র করেই সে সময় মালদহ জেলার কয়েকটি জায়গায় ছোট খাটো ব্যবসা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। তার মধ্যে ইংরেজ বাজার বা ইংলিশ বাজার, নুরপুর, বারোঘরিয়া, লহালামারি (সাহেবগ্রাম), রামচন্দ্রপুর অন্যতম। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এ সমস্ত এলাকায় নীলকুঠি গড়ে ওঠে। যদিও ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দেই এদেশে নীল চাষের সূচনা হয়েছিল। পর্যায়ক্রমে এ দেশে উর্বর এলাকা দেখে নীল কুঠিয়ালরা বিভিন্ন স্থানে কুঠি স্থাপন করেছিল। এভাবেই ১৮৩০-৩৫ খ্রিষ্টাব্দে রামচন্দ্রপুর ও বারোঘরিয়ার প্রথর নীলকুঠি গড়ে উঠে। ইংরেজ সাহেবদের আগমন ঘটে। ক্রমান্বয়ে শুরু হয় বাধ্যতামূলক নীলচাষ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পাওয়া মেদিনীপুর জমিদার কোম্পানির পক্ষে এখানে আসেন ইংরেজ সাহেব জন ক্লাউন ও তাঁর স্ত্রী। জমিদারের পত্তনী এলাকা লক্ষ্মীপুর, মহারাজপুর,বারোঘরিয়া, কৃষ্ণগোবিন্দপুর, রামচন্দ্রপুরের নিরীহ কৃষকদের উপর নেমে আসে নির্মম অত্যাচার। কুঠিয়াল সাহেব জোরপূর্বক দাদন দিয়ে ভাল জমিগুলোতেও নীলচাষ করতে বাধ্য করতেন তাদের। নীলচাষ করতে যারা সামান্যতম আপত্তি জানাতো তাদের উপর চলতো অমানুষিক দৈহিক অত্যাচার। প্রথমে বেত্রাঘাত, তারপর মাথার উপর কাদা দিয়ে নীলের বীজ বপন করা হতো। চারা না গজানো পর্যন্ত মাথা থেকে কাদা নামানো হতো না তাদের। এতেও কোন কাজ না হলে তাদের ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ করা হতো। বাড়ি-ঘরে আগুন লাগিয়ে সব ছারখার করা হতো। সবশেষে বিদ্রোহী কৃষকের মৃত্যু ঘটে। ইংরেজ সাহেবদের লোমহর্ষক অত্যাচারের কাহিনির নীরব সাক্ষী হয়ে আজো দাঁড়িয়ে আছে রামচন্দ্রপুরহাটের কুঠিবাড়ি ও কাছারিবাড়ির ধ্বংসাবশেষের যোখিরা পুকুর আর সুরঙ্গ পথ।

ব্রিটিশের পরিকল্পনায় দেশবিভাগের পর মালদহ জেলার ৫টি থানা পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের সাথে তথা রাজশাহী জেলার সাথে যুক্ত হয়। এর মধ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ থানা ও নাচোল থানা অন্যতম। এই এলাকার সাঁওতাল পরগণা জুড়ে বিক্ষুব্ধ সাঁওতাল কৃষকদের ওপর ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারের ইতিহাসে রক্তাক্ত অধ্যায় সৃষ্টি করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই প্রকৃতপক্ষে ঘটেছিল এর অভ্যুদয়। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল ঢেউ এসে মালদহের সাঁওতালদের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা

www.pathagar.com

জাগিয়েছিল। মহাজনদের অত্যাচার বন্ধের জন্য জিতু বোটকা ও মানুর নেতৃত্বে শহর থেকে আট মাইল দূরে আদিনা মসজিদের কাছে সাঁওতালদের স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলিত হয়েছিল ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে। লাঠি, বল্লম, তীর-ধনুকের হাতিয়ার নিয়ে সাঁওতালরা বৃটিশের আগ্নেয়াস্ত্রের কাছে পরাজিত হয়। কিন্তু ১৬ বছর পর '৪৮ খ্রিষ্টাব্দে নাচোলের কৃষকদের মধ্যে জেগে ওঠে সেই প্রেরণা। নাচোলের চণ্ডীপুর গ্রামের সাঁওতাল নেতা এবং সাঁওতালদের মধ্যে প্রথম কমিউনিস্ট সদস্য পঞ্চাশোর্ধ বয়সের মাতলা মাঝির বাড়ি ছিল কৃষক আন্দোলনের ও কৃষক সমিতির মূল কেন্দ্র।

দেশবিভাগের প্রথম থেকেই জোতদার, ইজারাদার, জমিদার, মহাজন প্রভৃতি শোষকদের বিরুদ্ধে শোষিত কৃষক সমাজের বিক্ষোভকে সংগঠিত করার কাজ করে যাচ্ছিল কৃষক সমিতি। কৃষকদের নিজস্ব জমি ছিল খুব কম। সব জমি ছিল জোতদারদের দখলে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই এক একজন জোতদার দুই তিন বিঘার মালিক ছিল। স্বভাবতই সর্বহারা কৃষকদের মধ্যে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ ও ইজারাদারী বন্ধ করার দাবিতে উত্তরবঙ্গ জুড়ে আন্দোলন যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল সেই পর্যায়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলে তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়। তেভাগার দাবির সাথে 'লাঙল যার জমি তার' এই দাবি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

ইতোমধ্যে সমগ্র নাচোলের আশেপাশে পুলিশের তৎপরতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। রমেন মিত্র, ইলা মিত্র, মাতলা মাঝিসহ কয়েকজনের নামে হুলিয়া বের হয়। রহনপুর স্টেশনের ধারে গ্রাম ছেড়ে আসা বহু সাঁওতালের মাঝে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ইলা মিত্রও বসে পড়েন। সাঁওতাল রমণীর বেশে সজ্জিত ও সাঁওতালী ভাষায় কথা বললেও ইলা মিত্রের চোখ দেখে গোয়েন্দা পুলিশের সন্দেহ হয় যে, তিনি সাঁওতাল নন। তাঁকে অন্যান্য সংগ্রামীসহ গ্রেফতার করে নাচোল থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। অকথ্য নির্যাতন চালানো হয় তাঁদের ওপর। তারপর নবাবগঞ্জ থানায় প্রেরণ করা হয়। ১৫/১৬ দিন সেখানে রাখার পর ২১ জানুয়ারি ইলা মিত্রকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে নেয়া হয়। ৫০ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের দিকে সরকার পক্ষ থেকে নাচোল আন্দোলনের তথাকথিত আসামীদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান পেনাল কোডের ১৪৮,৩০২,১৪৯ এবং ৩৩৩, ৩৩৪ ধারার অভিযোগ আনা হয়।

তৎকালীন জেলা সেশনস জজ জনাব এস. আহমেদ পাকিস্তান পেনাল কোডের ৩০২,১৪৯ ধারা অনুযায়ী আসামীদেরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এই রায়ের তারিখ ছিল ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দের ১১ জানুয়ারি। বিচারক তাঁর রায়ে বলেন, যদিও আসামীদের সকলেই আনলফুল অ্যাসেমব্লীতে অংশগ্রহণ করেছিল তথাপি যেহেতু নির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি যে, সঠিক কার বা কাদের আঘাতে মৃত্যু সংঘটিত হয়েছে সেহেতু কোর্ট সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান থেকে বিরত থাকছে। অর্থাৎ ফাঁসির আদেশের পরিবর্তে তাঁদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। এভাবেই চাঁপাইনবাবগঞ্জের কৃষক আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে।

২১ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ রেসকোর্স ময়দানে উর্দুর পক্ষে ঘোষণার তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ জানান ছাত্রসমাজ। এই ঘোষণা পরবর্তী আন্দোলনের কর্মসূচি

www.pathagar.com

অবগত হওয়ার জন্য চাঁপাইনবাবগঞ্জের ছাত্রসমাজ রাজশাহী জেলার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জে সে সময় ছিল রাজশাহী জেলার নিকটবর্তী মহকুমা। তাই আন্দোলনের যাবতীয় নির্দেশনা সমস্তই রাজশাহী থেকে আসত। তবে ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১১ মার্চের কর্মসূচির পর থেকে ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারির পূর্ব পর্যন্ত চাঁপাইনবাবগঞ্জে তেমন কোন কর্মসূচি পালিত হয়নি। মাঝে মাঝে অবশ্য রাজশাহী থেকে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার যৌক্তিকতা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে শরিক হওয়ার জন্য আহ্বান জানাতেন।

১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের সূচনা থেকেই চাঁপাইনবাবগঞ্জের হরিমোহন ইনস্টিটিউশনের ছাত্রদের মধ্যে আন্দোলন তথা ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র ধর্মঘটকে সফল করে তোলার প্রস্তুতি শুরু হয়। তাঁরা বেশ কটি গোপন বৈঠক করেন। 'নুরুল আমিনের ফাঁসি চাই' ইত্যাদি স্লোগান লিখে দেয়ালে পোস্টার টাঙানো এবং দেয়াল লিখনও ব্যাপকভাবে চলতে থাকে। হরিমোহন ইনস্টিটিউশনের তৎকালীন ছাত্র মসিউল হক চাঁপাইনবাবগঞ্জের ছাত্রদের নেতৃত্ব দিতেন। তাঁর প্রধান সহযোগীদের মধ্যে মরহুম গোলাম মোহাম্মদ (শংকরবাটি নিবাসী, নবাবগঞ্জ শহরে আব্দুল্লাহ ফার্মেসির মালিক ডাক্তার হিসেবে পরিচিত রয়েছে) শহরের গোয়ালপাড়ার মো. হাফিজুর রহমান (মরহুম), পুরাতন বাজার স্বর্ণকারপট্টির মো. আব্দুল মতিন (দৈনিক সংবাদের চাঁপাইনবাবগঞ্জের নিজস্ব সাংবাদদাতা হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন, ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন), মো. আবু সাঈদ ফজল কেনু মিয়া (বর্তমানে নবাবগঞ্জ শহরের ইসলামপুর মহল্লায় বসবাস করছেন), গানু মিয়া (বর্তমানে কাপাসিয়া পাড়ায় বসবাস করছেন) অন্যতম। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে চাঁপাইনবাবগঞ্জের ছাত্রদের সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন রাজশাহী কলেজের তৎকালীন ছাত্রনেতা গোলাম আরিফ টিপু (রাজশাহী কোর্টের আইনজীবী)। রাজশাহী কলেজের অপর ছাত্র ওয়াসেক উদ্দিন নিরু মিয়া (বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জের কৃষ্ণগোবিন্দপুর গ্রামে, রাজশাহীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন, ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে পরলোকগমন করেন)। মমতাজউদ্দিন আহমেদ (প্রখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা, বাড়ি নবাবগঞ্জের ভোলাহাট থানায়), ডা.আ.আ.ম. মেসবাহুল হক (রাজশাহী মেডিকেল স্কুলের ছাত্র ছিলেন, বর্তমান চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের চিকিৎসক, দীর্ঘদিন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন), আহমদ উল্লাহ চৌধুরী (১৯৫২খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহী কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন, বর্তমানে শহরের বিশিষ্ট আইনজীবী), মুজিবুর রহমান (অবসরপ্রাপ্ত প্রকৌশলী, বর্তমানে শহরের পাঠানপাড়ায় বসবাস করছেন), মোশাররফ হোসেন (ভোলাহাট নিবাসি), মঈনুদ্দিন আহমেদ বোনা (বিনোদপুর নিবাসী)। গোলাম আরিফ টিপু রাজশাহী রাষ্ট্রভাষা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালনের ফাঁকে ফাঁকে সাংগঠনিক সফরে চাঁপাইনবাবগঞ্জে আসতেন।

www.pathagar.com

বায়ান্নর ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আহূত ছাত্র ধর্মঘট চাঁপাইনবাবগঞ্জে শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়। কিন্তু সন্ধ্যায় ঢাকায় ছাত্র মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণের খবর এসে পৌঁছলে শহরে শোকের ছায়া নেমে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে পড়ে শহরের জীবনযাত্রা। সকল শ্রেণির মানুষ ঢাকার বিস্তারিত খবরাখবর জানার জন্যে অধীর হয়ে ওঠেন। ছাত্র নেতৃবৃন্দ এর প্রতিবাদে কর্মসূচি ঘোষণা করেন। কিন্তু পুলিশ আগে থেকেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। শহরে পুলিশের টহল ও তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। প্রতিবাদ মিছিল বের হওয়ার আগেই রাতে পুলিশ অতর্কিতে হামলা চালিয়ে মিছিলের অন্যতম সংগঠক ছাত্র নেতা মসিউল ইসলামকে গ্রেফতার করে। তারা ভেবেছিল মিছিলের প্রধান সংগঠকদের গ্রেফতার করলে হয়তো মিছিল বেরুবে না। কিন্তু শত বাধা উপেক্ষা করে ২২ (মতান্তরে ২৩) ফেব্রুয়ারি সকালে শহরের হরিমোহন ইনস্টিটিউশন থেকে ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। ছাত্ররা কালোব্যাজ ধারণ করে শোক প্রকাশ করেন। মিছিলটি পুরানো কোর্ট (বর্তমান ডিসি মার্কেট) অতিক্রম করার সময় পুলিশ হঠাৎ হরিমোহনের ছাত্র আবুল হোসেন ও কুতুবুল আলমকে (লোকসংগীত গম্ভীরা গানের শিল্পী) গ্রেফতার করে। এতে ছাত্রদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয়। অল্পসময়ের মধ্যে সমগ্র শহর ও আশেপাশের গ্রামে খবর ছড়িয়ে পড়লে গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তির দাবিতে মিছিল বের হয়। শহরের অদূরে অবস্থিত বর্ধিষ্ণু গ্রাম রাজারামপুরের হামিদুল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্ররাও দল বেঁধে মিছিল বের করে। স্কুলের ছাত্র ওবাইদুল হক ও আবু তাহের এই মিছিলের নেতৃত্ব দেন। হরিমোহন ইনস্টিটিউশন ও রাজারামপুর হামিদুল্লাহ্ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দু'টি মিছিল গ্রেফতারকৃত ছাত্রদেরকে আটকে রাখা হাজতকে ঘিরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে এবং অবিলম্বে তাঁদের মুক্তি দেয়ার দাবি জানায়। ছাত্রদের এই অসহায় অবস্থায় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা চুপ করে বসে থাকতে পারেননি। তাঁরা স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বন্ড দিয়ে গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তির কথা বলা হয়। কিন্তু সংগ্রামী ছাত্ররা প্রশাসনের প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করে এবং স্লোগানে স্লোগানে চারদিক কাঁপিয়ে তোলেন। ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়তে থাকে। এতে বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ সন্ধ্যার সময় গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তি দেয়। সমবেত ছাত্ররা মুক্তিপ্রাপ্ত ভাষা সৈনিকদের ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে মিছিল সহকারে হরিমোহন ইনস্টিটিউশন মাঠে নিয়ে আসেন এবং সভার আয়োজন করেন।

এভাবে ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র নিহত হওয়ার প্রতিক্রিয়া চাঁপাইনবাবগঞ্জের ব্যাপকতা লাভ করে। এখানকার ছাত্ররা পুরো ফেব্রুয়ারি মাস স্কুল বন্ধ করে ধর্মঘট পালন করেন। তাঁরা সবসময় কালোব্যাজ ধারণ করে চলাফেরা করতেন। হরিমোহন ইনস্টিটিউশনের ছাত্র শহরের ইসলামপুর মহল্লার সিরাজুল ইসলাম বুলু আবেগ আপ্লুত হয়ে শহিদদের শোক প্রকাশের জন্য শরীরের চামড়ার সাথে সেপ্টিপিন দিয়ে কালোব্যাজ লাগিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

ভাষা আন্দোলনের কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে বেশ সমস্যায় পড়তে হয়েছে। লিফলেটের মাধ্যেমে আন্দোলন সম্পর্কে প্রচার করতে গিয়ে বিপাকে পড়েন ছাত্ররা। চাঁপাইনবাবগঞ্জের কোন প্রেসই লিফলেট ছাপিয়ে দিতে রাজি ছিল না। তাই বাধ্য হয়েই স্থানীয় ছাত্রনেতারা লিফলেট ছাপানোর জন্যে গোলাম মোহাম্মদ ও অপর একজন ছাত্রকে রাজশাহী পাঠান। কিন্তু সেখানেও বিপদ ঘটে। রাজশাহীর গোয়েন্দা পুলিশের হাতে তাঁরা আটক হন। কিন্ত চাঁপাইনবাবগঞ্জের এক ব্যবসায়ীর অনুরোধে রাজশাহীর এক প্রভাবশালী ব্যক্তির তদবিরে সেদিনই তাঁরা মুক্তি পান।

২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্রমিছিলে গুলি চালানোর প্রতিবাদে এবং শহিদদের স্মরণে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ঈদগাহ ময়দানে ২৫ ফেব্রুয়ারি এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় প্রায় ৪০০০ লোক উপস্থিত ছিলেন। সেদিন চাঁপাইনবাবগঞ্জে হরতালও পালিত হয়। এছাড়া রাণীহাটি হাইস্কুল, শিবগঞ্জ মডেল হাই স্কুল ও মনাকষা স্কুলেও ধর্মঘট পালিত হয়। রাণীহাটি ঈদগাহ ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আশরাফুল হক ঢাকায় সংঘটিত ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনা বিবরণ দিয়ে বক্তব্য রাখেন। সভার শুরু এবং শেষে মিছিল বের হয়।

স্থানীয় কোন পত্রিকা না থাকায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের কর্মসূচির সংবাদ প্রকাশের সুযোগ ছিল না। তবে স্থানীয় প্রতিনিধিদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দৈনিক আজাদ পত্রিকায় বেশ ক'টি সংবাদ প্রকাশিত হয়। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ১২ মার্চ বুধবার দৈনিক আজাদ পত্রিকায় ৩য় পৃষ্ঠার ৪র্থ কলামে 'নিহতদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, বিভিন্ন স্থানে হরতাল ও সভানুষ্ঠান' শিরোনামে চাঁপাইনবাবগঞ্জে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভার একটি সংবাদ ছাপা হয়। সংবাদটি ছিল :

চাঁপাইনবাবগঞ্জ (রাজশাহী)-৬ই মার্চ ঢাকায় নিহত ছাত্রদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনকল্পে গতকল্য স্থানীয় হাইস্কুল মাঠ হইতে ছাত্রদের এক বিরাট মিছিল বাহির হইয়া নীরবে সমস্ত শহর প্রদক্ষিণ করে। বেলা ৪ ঘটিকায় জনাব মজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে স্কুল মাঠে এক বিরাট সভা হয়। সভায় বিভিন্ন বিশিষ্ট বক্তা বক্তৃতাদানক্রমে একটি বিষয়ে সকলকে সতর্ক করিয়ে দেন যে, রাষ্ট্রের অনেক চক্র নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য ছাত্রদের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে চাহিবে। কিন্তু ছাত্রগণ যেন সব সময় তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া দেন। সভায় নিহত ছাত্রদের রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয়।

শুধু চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহকুমাতেই নয় ঢাকা ও রাজশাহীতে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য হিসেবে চাঁপাইনবাবগঞ্জের সন্তানেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এসব সংগ্রামী ছাত্র নেতাদের মধ্যে ওসমান গনির নাম উল্লেখযোগ্য। ৫২-র মহান আন্দোলনের সময় তিনি ঢাকায় অবস্থান করছিলেন।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে চাঁপাইনবাবগঞ্জের কয়েকজন ছাত্র রাজশাহী সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা হলেন গোলাম আরিফ টিপু, ডা. আ.আ. ম. মেসবাহুল হক, মমতাজউদ্দিন আহমেদ, আহমদ উল্লাহ চৌধুরী, মো. আব্দুস শুকুর, মজিবুর রহমান, মোশারারফ হোসেন, মঈনুদ্দিন আহমেদ বোনা প্রমুখ। এঁদের মধ্যে গোলাম আরিফ টিপু রাজশাহী রাষ্ট্রভাষা ছাত্র

www.pathagar.com

সংগ্রাম পরিষদের যুগ্মআহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মেসবাহুল হক বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বক্তা হিসেবে জ্বালাময়ী বক্তব্য দিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

২১ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাতে রাজশাহী কলেজ হেস্টেল গেটের সামনে রাজশাহীর প্রথম শহিদ মিনার (সংগ্রামী ছাত্ররা যার নাম দিয়েছিলেন 'শহিদ স্মৃতি স্তম্ভ') নির্মিত হয়। এই শহিদ মিনার নির্মাণে যাঁদের ভূমিকা ছিল অগ্রণী তাঁদের মধ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোলাম আরিফ টিপু, মমতাজউদ্‌দীন আহমদ, মেসবাহুল হক ও আহমদ উল্লাহ চৌধুরী ছিলেন অন্যতম। ২৯ ফেব্রুয়ারি পুলিশ ২৫/২৬ জন সংগ্রামী ছাত্রকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠায়। এঁদের মধ্যে গোলাম আরিফ টিপু, মমতাজউদ্‌দীন আহমদ, আহমদ উল্লাহ চৌধুরী ও মোশাররফ হোসেন ছিলেন অন্যতম। তাঁরা সকলে চাঁপাইনবাবগঞ্জের। অবশ্য অল্পদিনের মধ্যেই তাঁরা মুক্তি পান এবং আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট হন। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষের দিকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণি কর্মচারীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে রাজশাহীতে হরতাল আহবান করা হয়। কিন্তু হরতালের আগেই ২৪ এপ্রিল দিবাগত রাতে রাজশাহী কলেজ হোস্টেল থেকে এবং বিভিন্ন নেতার বাড়িতে হানা দিয়ে ১৫ জন ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করা হয়। এসব ছাত্রনেতাদের মধ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জের ৩জন ছিলেন। এরা হচ্ছেন : গোলাম আরিফ টিপু, মমতাজউদ্‌দীন আহমদ ও মেসবাহুল হক।

ভাষা আন্দোলনের কর্মসূচি পালিত হয়েছে ভোলাহাটের মাটিতেও। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দ হতে নানাভাবে ভাষা আন্দোলন চলতে থাকে। তৎকালীন সময়ে এলাকায় মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীরও বামপন্থীর খুবই প্রভাব ছিল। আওয়ামী লীগের প্রভাব খুব কম ছিল না। সে সময় যারা ভাষা আন্দোলনে জড়িয়ে ছিলেন তাঁরা হলেন, বজরাটেক সবজা জুনিয়র স্কুলের প্রধান শিক্ষক (ঈশ্বরদী নিবাসী, এবং সাবেক এম.পি) আ. বারী সর্দার, সৈয়দ মহসিন আলী (গোপিনাথপুর), মো. ইয়াহিয়া (চামুশা), মতিউর রহমান, মইনুদ্দিন আহমদ, মো. ওমর আলী (সোনা) প্রমুখ।

১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ভোলাহাটের মাটিতে সর্ব প্রথম শহিদ মিনার নির্মিত হয় ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে ১৯শে ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে। ভোলাহাট রামেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়ের আমতলায় তৈরি করা হয় ঐ শহিদ মিনারটি। স্কুলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইট দিয়ে মাটির গাড়ার সাহায্যে রফিক মিস্ত্রি, মফিজউদ্দিন, লাল মোহাম্মদ মিস্ত্রি ও পেশরাজ গফুরকে দেয়া হয় শহিদ মিনার নির্মাণের দায়িত্ব। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন বাহাদুরগঞ্জ গ্রামের ওমর আলী সোনা ও মো. তাহাউদ্দিন।

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে স্কুল কর্তৃপক্ষ শহিদ মিনারটি ভেঙে ফেলে। চাপা ক্ষোভ ও টান টান উত্তেজনা নিয়ে আবারো গোপন মিটিং এর মাধ্যমে ২০ ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাত্রেই ভাঙা শহিদ মিনারটিকে মেরামত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কথামত কাজ। ঐরাতেই পুনরায় জোড়া তালি দিয়ে মেরামত করা হয় শহিদ মিনারটি এবং রাতেই শহিদ মিনার বেদীতে ফুল দিয়ে, কালোব্যাচ ধারণ করে ৫২ ভাষা শহিদদের

www.pathagar.com

প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে উদ্বোধন করা হয়। পরবর্তীকালে শহিদ মিনারটির অস্তিত্ব ছিল কিনা তা জানা যায়নি। এরপর ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ ভোলাহাট মোহবুল্লাহ কলেজ প্রাঙ্গণে আরো একটি শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়।

রাজনৈতিক ব্যক্তি : চাঁপাইনবাবগঞ্জে অনেক কৃতী রাজনীতিবিদের জন্ম হয়েছে, যাঁরা দেশ ও জাতির কল্যাণে অবদান রেখেছেন। এঁদের মধ্যে মহারাজপুরের দিয়ানতুল্লাহ চৌধুরী (১৮০১-১৯০৬) নীলবিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। নারায়ণপুরের রফিক মণ্ডল ও আমির উদ্দীন ওয়াহাবী আন্দোলনের স্থানীয় শীর্ষ পর্যায়ের নেতা ছিলেন। ইলা মিত্র চাঁপাইনবাবগঞ্জে সংঘটিত তেভাগা আন্দোলনের (১৯৪৭-৫০খ্রি.) নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর জন্ম এ জেলায় না হলেও তাঁর শ্বশুরবাড়ি সদর উপজেলার রামচন্দ্রপুর হাটে। এই সংগ্রামে তাঁর স্বামী রমেন মিত্র হাবুবাবু প্রথম সারির নেতা ছিলেন। এছাড়াও অনিমেষ লাহিড়ী, মাতলা মাঝি, আজাহার আলী এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। মোনাকষার ইদ্রিস আহমদ বহু জনহিতকর কাজ করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে রইস উদ্দিন মিয়া, খালেদ আলী মিঞা, হামিদুর রহমান, ডা. আ. আ. ম মেসবাহুল হক বাচ্চু ডাক্তার, ডা. মঈন উদ্দিন আহমেদ মন্টু, অধ্যাপক মনিমুল হক, আবদুল মান্নান সেন্টুর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে।

ঞ. মুক্তিযুদ্ধ

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘদিনের শোষণ থেকে অব্যাহতি লাভ করে '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর পৃথিবীর বুকে 'বাংলাদেশ' একটি নতুন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। স্বাধীন বাংলাদেশের অধিবাসী হিসেবে আজ আমরা যে গৌরব বোধ করি তা বাস্তবায়নের পেছনে এক ভয়াবহ সংগ্রামের ইতিহাস বিদ্যমান, সে সংগ্রাম পরম বেদনার। প্রায় ত্রিশ লক্ষ মানুষের জীবন বিপর্যয়ের ফল স্বরূপ আমরা আজ স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করছি।

মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে চাঁপাইনবাবগঞ্জবাসীর গৌরবময় ভূমিকা রয়েছে। স্থানীয় মুক্তিপাগল সন্তানেরা নিজের জীবন উৎসর্গ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন উপমহাদেশের সেরা সেনাবাহিনী আর তাদের দোসর রাজাকার, আলবদর, আল্‌শামস্‌ আর শান্তি কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে। সহযোদ্ধা বাঙালি ইপিআরদের সাথে একাত্ম হয়ে বিভিন্ন অভিযানে অংশ নিয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ মুক্ত করতে এঁরা যে ভূমিকা পালন করেছেন এখানকার মানুষ তা আজীবন স্মরণ রাখবে। স্বাধীনতা সংগ্রামে এখানকার মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রচণ্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে। বঙ্গবন্ধু ঘোষিত অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে এখানকার ছাত্র-শিক্ষক, কৃষক-শ্রমিক, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষ। সে সময়ের ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন ছাত্র চাঁপাইনবাবগঞ্জে এসে এখানকার যুব-তরুণদের স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য দীক্ষিত করতে শুরু করেন।

www.pathagar.com

স্বাধীনতার স্মারক, বারোঘরিয়া

www.pathagar.com

স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মী ও ছাত্র নেতাদের সহায়তায় সেই সব স্বাধীনচেতা ছাত্রবৃন্দ দেশ মাতৃকার চরম দুঃসময়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে এলাকার মানুষকে স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। গ্রামে গ্রামে গিয়ে এরা এই উদ্বুদ্ধকরণের কাজ চালিয়ে যান। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এঁরা স্বাধীন বাংলাদেশের মন্ত্রে দীক্ষিত বেশ ক'টি দল গড়ে তুলতে সক্ষম হন। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর এভাবেই কার্যক্রম এগিয়ে চলে। মানুষ রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে দেশে কি ঘটতে যাচ্ছে তা দেখার জন্য।

২৫ মার্চ বিকেলে ইপিআর সেক্টর হেড কোয়ার্টার রাজশাহী থেকে ১৫/১৬ জন অবাঙালি ইপিআর একজন সিকিউরিটি সহ চাঁপাইনবাবগঞ্জে আসে। এ সময় চাঁপাইনবাবগঞ্জে ইপিআর-এর ৬নং উইং ছিল। ২৫ মার্চ সকাল থেকেই বাঙালি ইপিআরদের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয়ার জন্য উইং কর্মকর্তারা চেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু বাঙালিদের মনে সন্দেহ জাগায় অস্ত্র জমা দিতে তারা অস্বীকৃতি জানায়। ২৫ মার্চ রাতে ৩ জন ক্যাপ্টেনসহ ২৫/৩০ জন পশ্চিম পাকিস্তানি ইপিআর রহনপুর ইপিআর পস্নাটুন হেড কোয়ার্টারে হামলার উদ্দেশ্যে রওনা হয় এবং রাত প্রায় দেড়টার সময় সেখানে হামলা চালায়। রহনপুর ক্যাম্পে বাঙালি ইপিআররা জীবন রক্ষার্থে ওদের উপর পাল্টা আক্রমন চালায়। ওদের ৩ জন আহত হয়। ২৬ মার্চ পাকিস্তানিরা রহনপুর বাজারে কিছু অসহায় মানুষকে গুলি করে হত্যা করে।

২৬ মার্চ চাঁপাইনবাবগঞ্জ ক্যাম্পের সমস্ত বাঙালি ইপিআরকে নিরস্ত্র অবস্থায় ৩/৪ বার 'ফল-ই' করানো হয়। কিন্তু কিছু সংখ্যক বাঙালি অস্ত্রসহ বাইরে গণ্ডগোলের ওজুহাতে ক্যাম্পের আশেপাশে থাকে। সেদিনের ঘটনা সম্পর্কে হাবিলদার মোহাম্মদ অসিউদ্দীন বলেন, "আমাদের ফলইন করিয়ে উইং কমান্ডার বলেন যে, আমরা যদি বাইরে জনসাধারণের সঙ্গে সহযোগিতা করি তাহলে আমাদের কঠোর সাজা দেয়া হবে। কথা প্রসঙ্গে পশ্চিমা সুবাদার মেজর দাদু খান বলেন, তোমাদের ট্যাঙ্কের সাহায্য মাটিতে মিশিয়ে দেয়া হবে।"

২৬ মার্চ দিনের বেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জ ক্যাম্পে অবস্থানরত ইপিআররা চট্টগ্রাম থেকে ইপিআর অয়ারলেসে খবর পান যে, ঢাকাতে বাঙালি ইপিআরদের খতম করা হয়েছে। বাইরে যারা আছে তাদেরকে আত্মরক্ষার্থে সতর্ক করে দেয়া হয়।

হাবিলদার ফসিউদ্দীন জানান, ২৬ মার্চ সন্ধ্যে ৭টায় আমরা কয়েকজন বাঙালি এনসিও হাবিলদার মোস্তফা কামাল, হাবিলদার জমজম আলী, হাবিলদার সিদ্দিকুর রহমান, হাবিলদার সৈয়দ আলী তালুকদার এবং কিছু সংখ্যক নায়েক সিপাহী পাকিস্তানি কয়েকজন এনসিও'এর সাথে আলাপ করছিলেন। হঠাৎ ব্যাটালিয়ান হাবিলদার মেজর গুলজার খান পশ্চিম পাকিস্তানিদের চোখের ইশারায় ডেকে নেন। তাদের এহেন আচরণে আমরা সন্দিগ্ধ হলাম। আমরা আরো সতর্ক হই। কিছুক্ষণ পর রাজশাহী সেক্টর হেড কোয়ার্টার থেকে একটি মেসেজ আসে। সেটা ছিল পাকিস্তানি সমস্ত অফিসার ও জোয়ানদের পরিবারকে রাজশাহীতে সরিয়ে ফেলার জন্য এবং বাঙালিদের খতম করে রাজশাহীর দিকে যাবার জন্য। আমাদের বাঙালি অপারেটার এ মেসেজ বাঙালিদের জানিয়ে দেয়। এ মেসেজ উইং কমান্ডারের হাতে পড়ার সাথে সাথেই আমাদের উপর

www.pathagar.com

হামলা শুরু হয়। গোলাগুলির মধ্যেই তিনজন অফিসার পরিবারসহ রাজশাহীর দিকে পালিয়ে যায়। প্রায় ২ ঘণ্টা গোলাগুলির পর পরিস্থিতি বাঙালিদের আয়ত্তে আসে এবং বহু অস্ত্রসহ পশ্চিম পাকিস্তানি জেসিওকে বন্দি করা হয়।

ক্যাম্পকে সম্পূর্ণরূপে নিজ দায়িত্বে নেয়ার পর ইপিআরগণ বাইরের জনসাধারণকে খবর দেয়। ১০/১৫ মিনিটের মধ্যে ২/৩ হাজার লোক ক্যাম্পে আসে ইপিআরদের সাহায্য করার জন্য। জনতা ও ইপিআর এর মিলিত বাহিনীর হাতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরে অবস্থানরত বেশকিছু অবাঙালি ইপিআর নিহত হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহর হানাদার মুক্ত হবার পর পরই নওগাঁ থেকে ক্যাপ্টেন গিয়াস চাঁপাইনবাবগঞ্জ এসে পৌঁছেন এবং বাঙালি ইপিআর, পুলিশ, আনসার ও রাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নিয়ে রাজশাহী শহর হানাদার মুক্ত করার জন্য অগ্রসর হন।

পরবর্তী সময়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহর পুরোপুরি হানাদার মুক্ত থাকে। অনেকেই শহরে অবস্থান করতে থাকেন। তবে বহু লোক পরিবার পরিজনসহ গ্রামের দিকে আশ্রয়ের সন্ধানে চলে যান। শহর হানাদার মুক্ত থাকলেও সব সময়ই এখানে একটা থমথমে ভাব বিরাজ করতে থাকে।

১৯ এপ্রিল পাক সেনারা অতর্কিত আক্রমণ করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহর পুনঃদখল করে নেয়। প্রাথমিকভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এখানকার বাঙালিদের প্রতিরোধ শক্তি। তারা এসেই তছনছ করে ফেলে শহর। জ্বালিয়ে দেয় বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট। নিরীহ মানুষ মুখ থুবড়ে পড়ে রাস্তায় ওদের অস্ত্রের গুলিতে। গ্রামের পথে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে শহুরে মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। খাঁ খাঁ প্রান্তরে পরিণত হয় শহর।

পাক হানাদার কর্তৃক দখল হয়ে যাবার সাথে সাথেই চাঁপাইনবাবগঞ্জকে শত্রুমুক্ত করার পরিকল্পনা শুরু হয়। আর এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মালদহ জেলার গৌড় বাগান নামক স্থানে শুরু হয় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ। মালদহতে তখন একটি বাংলাদেশ তথ্য অফিস খোলা হয়েছিল। বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা ও তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ডা. আ.আ.ম. মেসবাহুল হক সেই তথ্য অফিসের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জের অভ্যন্তর থেকে মালদহতে যাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের গৌড় বাগানের মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিতেন। সেখানে বেশ কিছুদিন প্রশিক্ষণ দানের পর উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের শিলিগুড়ি ট্রেনিং সেন্টারে পাঠানো হয়। সেখানে প্রায় দেড় মাস ধরে নানা অস্ত্র ব্যবহার ও যুদ্ধ কলাকৌশল শিক্ষা দেয়ার পর এক একটি মুক্তিযোদ্ধাদলকে ট্রানজিট ক্যাম্প তরঙ্গপুরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ইপিআর সুবেদার মেজর আব্দুর রউফ সাহেব তখন তরঙ্গপুরের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর সহকারী ছিলেন সুবেদার আব্দুল গফুর। তরঙ্গপুরে ১০/১২ দিন রাখার পর মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীরের অধীনে কাজ করার জন্য প্রেরণ করা হয়। তিনি তখন মালদহ জেলার মোহদীপুর সীমান্তের কাছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাকসেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন।

১৯ এপ্রিল চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহর দখলের পর মহকুমার প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত পাকসেনারা ছড়িয়ে পড়ে। সীমাহীন দুঃখ দুর্দশার মধ্যে হাজার হাজার মানুষ কোনভাবে

www.pathagar.com

জীবন বাঁচিয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ শেষ হতে বেশ কিছুদিন কেটে যায়। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর দেশ প্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণের প্রস্তুতি নেয় দখলদার বাহিনীর উপর। শুরু হয় মরণপণ সংগ্রাম।

দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের শেষপ্রান্তে ১৩ ডিসেম্বর ছিল চাঁপাইনবাবগঞ্জে মুক্তিযুদ্ধের উল্লেখযোগ্য দিন। মুক্তিযোদ্ধাদের সাঁড়াশি আক্রমণে এ দিনই পাক সেনারা শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়। বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে রাজাকার, আলবদর ও পাকবাহিনীর পদলেহনকারীরা আত্মগোপন করেছিল। ১৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় শহরের অনতিদূরে অবস্থিত হরিপুর পুলের কাছে তাদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে ইপিআর-এর নায়েক মোহাম্মদ নবীর উদ্দীন বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হন। এই যুদ্ধে ৯ জন গ্রামবাসী নিহত হয়। পাকসেনাদেরও কয়েকজন হতাহত হয় বলে জানা যায়। ১৩ ডিসেম্বর মোহদীপুর সীমান্ত থেকে ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠে মহানন্দা নদীর অপর প্রান্তে এসে পৌঁছে। তারপর নদীর কূল বরাবর বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নিয়ে শহরের বিভিন্ন লক্ষ্যস্থলে আক্রমণ চালাতে থাকে মুক্তিযোদ্ধারা। ১৩ ডিসেম্বর রাতে শত্রু বাহিনীর তেমন কোন সাড়া না পেয়ে বিরাট বাহিনীকে ৩ ভাগে ভাগ করেন ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর। একটি বাহিনী লেঃ রফিক ও লেঃ কাইউমের নেতৃত্বে (যাঁরা দলদলি সাব সেক্টরে যুদ্ধ করছিলেন) বালিয়াডাঙ্গায় মহানন্দা নদী পার হয়ে শহরমুখী অভিযানে এগিয়ে যায়। অপরটি মেজর গিয়াসের নেতৃত্বে কালীনগর ঘাটে মহানন্দা নদী পার হয়ে শহরমুখী অভিযানে এগিয়ে যায়। ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর তাঁর বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে মহানন্দা নদী অতিক্রম করে রাতের আঁধার পুরোপুরি কেটে যাবার আগেই শহরের রেহাইচর এলাকায় পজিশন নেন। শত্রুদের বাংকারে তখন শুধু রাজাকার অবস্থান করছে একথা মুক্তিযোদ্ধারা জানতো না, তাদের ধারণা পাক সেনারা বোধ হয় বাংকারে অবস্থান নিয়েছে। রেহাইচর ঘাটের কাছে শত্রুদের অবস্থান নির্ণয় করার পর সহযোদ্ধাদের সাহায্যে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে তাদের বাংকার দখল করেন। এসময় তাঁর সহযোদ্ধা অধ্যাপক শাহজাহান আহত হন। অসীম সাহসী জাহাঙ্গীর সামনের দিকে এগিয়ে চলেন একাই। শত্রুপক্ষের একটি অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে সিএন্ডবি ঘাটের উপরে রাস্তার ধারে একটি বাড়ির জানালা থেকে আসা একটি গুলি তাঁর কপালে বিদ্ধ হয়। ঘটনাস্থলেই তিনি শহিদ হন। পরক্ষণেই মুক্তিযোদ্ধারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তার বদলা নেয়। তখনও ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়েনি। শহিদ জাহাঙ্গীরের লাশ পাঠিয়ে দেয়া হয় মোহদীপুরের সেই ছোট সোনামসজিদ প্রাঙ্গণে যেখানে কেটেছে তাঁর পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে অসীম বীরত্বে যুদ্ধ করার সেই গৌরবময় দিনগুলি। ছোট সোনা মসজিদের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত) সামনের চত্বরে সমাধিস্থ করা হয় তাঁকে।

ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর শহিদ হওয়ার পর পরই মেজর গিয়াস উদ্দীন চৌধুরী, লে. রফিকুল ইসলাম ও লে. আব্দুল কাইউম খান স্ব স্ব বাহিনী নিয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরে প্রবেশ করেন। ১৫ ডিসেম্বরের সোনালি সকালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হয়ে যায়।

www.pathagar.com

দীর্ঘ ৯ মাসের যুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর সোনালি সকালে বিজয়ীর বেশে বিভিন্ন স্থান থেকে মুক্তিসেনারা চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরে প্রবেশ করেন। এদিন চাঁপাইনাবগঞ্জ কলেজ মাঠে মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধের সংগঠক ও শহরবাসীদের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর গিয়াস উদ্দীন চৌধুরী চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠে শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীরের নামানুসারে চাঁপাইনবাবগঞ্জের নামকরণ করেন 'জাহাঙ্গীরাবাদ'। আজ সময়ের সীমায় সেদিনের সে ঐকান্তিক ইচ্ছের বাস্তবায়ন হয়নি। সেই ইচ্ছেই শুধু নয়, দীর্ঘ ৯ মাসের যুদ্ধে যাঁরা শহিদ হয়েছেন তাঁরাও আজ স্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছেন। তাই চাঁপাইনবাবগঞ্জের শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা মেলেনা। আজ সময় এসেছে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান জানানোর নইলে জাতি হিসেবে আমরা আগামীতে আমাদেরই চিনতে পারবো না।[২২]

ট. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

জামুরুদ্দিন বিশ্বাস সরকার (১৮৫৭-১৯৫২)

লোককবি জামুরুদ্দিন বিশ্বাস আলকাপ গানের পুরাতন দিনের শিল্পী ও দর্শক-শ্রোতাদের কাছে অতি পরিচিত নাম। তিনি ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন মালদহ জেলার চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের অদূরে রাজারামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম আইনুদ্দিন বিশ্বাস। জামুরুদ্দিন বিশ্বাসের শিক্ষাগত যোগ্যতা ম্যাট্রিকুলেশন। তিনি ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে আলকাপ দল গঠন করেন। তিনি মুখে মুখে গান রচনা করতেন, সুর দিতেন এবং গাইতেন। তাঁর দলে শিল্পীরা কেউ বেঁচে নেই। এই খ্যাতিমান শিল্পী ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তাঁর দলের শিল্পীদের নাম :

শ্রী নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (বেহালাবাদক), শ্রী মনিন্দ্রনাথ ঘোষ (তবলাবাদক), দোস্ত মোহাম্মদ পণ্ডিত (হারমোনিয়াম বাদক), শ্রী রতিরাম ঘোষ (ছোকরা), শ্রী মনিন্দ্রনাথ শীল (ছোকরা), শ্রী ভুবন মোহন কর্মকার (কাইপ্যা), মো. ফাইজুদ্দিন মিয়া (দোহারি), মো. মহিরুদ্দিন (দোহারি), মো. লুৎফল হক (দোহারি), মো. বদিউজ্জামান (দোহারি), মো. হামেদ আলী (দোহারি), মো. ইউনুস আলী (দোহারি), মো. হাসুরুদ্দিন (দোহারি), মো. আসুরুদ্দিন (দোহারি)।[২৩]

মোহাম্মদ সফিউর রহমান ওরফে সুফি মাস্টার (১৮৯৪-১৯৮৩)

প্রখ্যাত গম্ভীরা রচয়িতা ও গম্ভীরা গানের আধুনিক সংস্করণের জনক মোহাম্মদ সফিউর রহমান ওরফে শেখ সফিউর রহমান ওরফে সুফি মাস্টার ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে অভিভক্ত ভারতের মালদহ জেলার ইংরেজ বাজার থানার ফুলবাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ বেশারত। সুফি মাস্টার মালদা জিলা স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। পড়াশুনা ত্যাগ করেছিরেন নানান সমস্যার কারণে, তারপর যোগদেন ডাক বিভাগের পোস্টম্যান পদে। চাকুরীর পাশাপাশি তিনি সংগীত চর্চা অব্যাহত রাখেন।

www.pathagar.com

সুফি মাস্টার

মহবুব ইলিয়াস

মাহবুবুল আলম

www.pathagar.com

সুফি মাস্টার ছিলেন স্বভাব কবি। প্রথমে তিনি পালা গান, নিমাই সন্ন্যাস, রাধার মানভঞ্জন ইত্যাদি রচনা করেছেন। একসময় তিনি মালদহের খ্যাতনামা আলকাপ সরকার আকবর খলিফার আলকাপ দলে যোগদান করেন। পরবর্তী সময়ে কিশোরী মোহন চৌধুরী ওরফে কিশোরী পণ্ডিতের গম্ভীরা দলে যোগ দেন। শেষে তিনি নিজেই গম্ভীরা দল গঠন করেন। দেশ বিভাগ পূর্বকালে তাঁর পালা গম্ভীরা গানের প্রতিটি চরিত্র ছিল ব্রিটিশবিরোধী। তাঁর গম্ভীরা গানে স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনা লক্ষ্য করে ব্রিটিশ সরকার সুফি মাস্টারের মাথার জন্য এক হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল।

দেশ বিভাগের সময় ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার বা Option নিয়ে শেখ সফিউর রহমান মালদহ থেকে রাজশাহীর চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহকুমার রহনপুরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এখানে এসে তিনি গম্ভীরা চর্চায় মনোনিবেশ করেন এবং পালা গম্ভীরাকে নানা-নাতির ভূমিকায় রূপ দিয়ে ডুয়েট আধুনিক গম্ভীরায় নবরূপায়ণ করেন। এই রূপান্তর প্রক্রিয়ায় তিনজন ব্যক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এঁরা হচ্ছেন– সোলেমান মোক্তার, কালু মোক্তার ও পশুপতি মোক্তার।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী গম্ভীরা গানকে মোটেও পছন্দ করত না। তাই ১৯৪৮-৪৯ খ্রিষ্টাব্দে চাঁপাইনবাবগঞ্জের তৎকালীন পাঞ্জাবি মহকুমা প্রশাসক গম্ভীরা গানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞাকে সুফি মাস্টার উপেক্ষা করে গম্ভীরা গান পরিবেশন অব্যাহত রাখেন।

গম্ভীরা গানে বন্দনা অংশে শিবকে উপস্থিত করিয়ে তাঁকে সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করে সুফি মাস্টার যেমন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, ঠিক তেমনি স্বাধীনতা-উত্তর 'অপসন'-এ চাকুরি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) চাঁপাইনবাবগঞ্জে এসে ইসলামীয় প্রভাবে দেবতা শিবকে পরিবর্তন করে 'নানা-নাতি'-র Form তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব। অর্থাৎ অবিভক্ত ও বিভক্ত বাংলার আধুনিক গম্ভীরা গানের আঙ্গিক প্রকরণের তিনিই স্রষ্টা। তাছাড়া হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্যবোধ জাগরণে তাঁর উদার মানসিকতা বিস্ময়কর।

সুফি মাস্টার রচিত 'গম্ভীরা সঙ্গীত' নামে একটি গম্ভীরা সংকলন মালদা থেকে বাংলা ১৩২৯ সনে প্রকাশিত হয়। এতে শিব বন্দনা, টাকা ও বিদ্যার বিবাদ, বাঙালি সৈন্যগণের মহাদেবকে সেনাপতিত্বে বরণ করে যুদ্ধে আহবান, চাষার ছেলের স্কুলে ভর্তি হবার কামনা, ব্রিটিশ সৈন্যের জয়, বিলাতি বাবুদের প্রতি ভৎর্সনা, লাট দরবার ভোটে বিভ্রাট, দুজন গ্রাম্য লোকের ডুয়েত ইত্যাদি বিষয় উপস্থাপিত হয়েছিল।

গম্ভীরা গান রচনার কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন সুফি মাস্টার। তাঁর গান শুনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রশংসা করেছেন। ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে কবিগুরু তাঁকে সোনার মেডেল উপহার দিয়েছিলেন পাবনা সাহিত্য সম্মেলনে। শুভেচ্ছা পেয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর নিকট থেকে। জীবনের শেষভাগে ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি রাজশাহী থেকে 'মাদার বখ্শ সাহিত্য সংস্কৃতি পুরস্কার' এবং ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে 'উত্তরা সাহিত্য মজলিস পুরস্কার' লাভ

www.pathagar.com

করেন। আধুনিক গম্ভীরা গানের রূপকার সুফি মাস্টার ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে পরিণত বয়সে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার রহনপুরে ইন্তেকাল করেন।[২৪]

সৈয়দ মোহাম্মদ সোলেমান ওরফে সোলেমান (১৯০৮-১৯৭৯)

গম্ভীরা গানের অন্যতম রূপকার সৈয়দ সোলেমান ওরফে মোহাম্মদ সোলেমান ওরফে সোলেমান ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ মার্চ অবিভক্ত ভারতের মালদহ জেলার পুরাতন মালদার (ওল্ড মালদা) জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম সৈয়দ ফাইমুদ্দিন।

সোলেমান ডাক্তার পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। পেশায় ছিলেন চিকিৎসক। প্রথমে ইংরেজ বাজারের পুড়াটুলিতে হাজী ডাক্তারের ডাক্তারখানায় হাতে খড়ি। এই ডাক্তারখানায় অ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি উভয় ঔষধই দেয়া হতো। এখানে কিছুকাল অবস্থান করে তিনি চিকিৎসা পেশায় অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তারপর চিত্তরঞ্জন বাজারের পাশে দোকান খোলেন। সেখান থেখেই ডাক্তার হিসেবে তাঁর পরিচিতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহকুমা শহরে চলে আসেন।

সোলেমান ডাক্তার একজন স্বভাব কবি ছিলেন। তিনি প্রায় সহস্রাধিক গম্ভীরা গান রচনা করেছেন। সামাজিক বিষয় অপেক্ষা দেশের রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কিত গম্ভীরা গান রচনায় তাঁর অধিক আগ্রহ লক্ষ করা যায়। তাঁর রচিত গানের অধিকাংশই আজ হারিয়ে গেছে। তিরিশের দশকে তাঁর গানের বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটে। প্রখ্যাত শিল্পী ও সংগীত রচয়িতা বিশ্বনাথ পণ্ডিত তাঁর দলে ছিলেন, পরে উভয়ের মধ্যে মতান্তর হওয়ার পর বিশ্বনাথ পণ্ডিত পৃথক দল গঠন করেন।

বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে ধর্মের বন্ধন মুক্তি তথা রাজনীতি বিষয়ক গম্ভীরা গানে সুফি মাস্টারে সঙ্গে সোলেমান ডাক্তার এক স্মরণীয় নাম। তাছাড়া অধুনা বাংলাদেশে এসে চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে গম্ভীরা গানের প্রচার-প্রসারে তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। সোলেমান ডাক্তার পরিণত বয়সে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরে পরলোকগমন করেন।[২৫]

কুতুবুল আলম (১৯৩৬-১৯৯৯)

বাংলাদেশের গম্ভীরা গানের কিংবদন্তির শিল্পী কুতুবুল আলমের জন্ম ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জুন চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরে। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্ব শামসুর রহমান, বি.এ, বি.টি তিনি এজন শিক্ষাবিদ ও সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন।

কুতুবুল আলম বি.এ পর্যন্ত পড়লেও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেননি। কর্মজীবনে প্রবেশ করেন ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে । প্রথমে সচিবালয়ে রিলিফ এন্ড বিহ্যাবিলিটেশান বিভাগের নিম্নমান সহকারি পদে চাকুরি করেন। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে কৃষি তথ্য সংস্থায় মহকুমা পর্যায়ে 'মাঠ সংগঠক' পদে যোগদান করেন। ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বদলি হয়ে আসেন। তারপর বিভিন্ন জেলায় চাকুরি করার পর সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা হয়ে অবসর গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

একজন অভিনেতা হিসেবে তাঁর সাংস্কৃতিক জীবনের সূচনা। অভিনয় করেছেন অসংখ্য নাটকে। চলচ্চিত্রেও তাঁর ঘটেছে সরব পদচারণা। গম্ভীরা গানের হাতে খড়ি ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে । ঐতিহ্যবাহী হরিমোহন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালীন সময়ে তিনি প্রথম গম্ভীরা করেন। ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আমৃত্যু তিনি বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে গম্ভীরা করেন। গম্ভীরা গানে 'নানা' হিসেবে অভিনয় প্রতিভায় জীবদ্দশায় তিনি প্রবাদ প্রতিম। লাভ করেছেন অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা। এসব পুরস্কারের মধ্যে রাজশাহী বরেন্দ্র একাডেমী, বৃহত্তর রাজশাহী জেলা সমিতি, ঢাকা, নবাবগঞ্জ শিল্পকলা একাডেমী, রাজশাহী সংগীত ভবন, পদ্মা থিয়েটার, বাংলাদেশ ফোকলোর কেন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত সম্মাননা উল্লেখযোগ্য। তিনি দেশের বাইরেও গম্ভীরা পরিবেশন করেছেন। ১৯৯৪-৯৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ভারতের দিল্লী, কলকাতা, বর্ধমান, হলদিয়া, ডায়মন্ড হারবার প্রভৃতি স্থানে গম্ভীরা পরিবেশন করেন। গম্ভীরার এই প্রবাদপ্রতিম শিল্পী ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর ঢাকায় পরলোকগমন করেন।[২৬]

মহবুব ইলিয়াস সরকার (১৯২৯-২০০৪)

মহবুব ইলিয়াস সরকার ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন মালদহ জেলার নবাবগঞ্জ থানার নামোশংকরবাটী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মোহাম্মদ আলী বিশ্বাস। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আলকাপ দল গঠন করেন এবং রাজশাহী জেলার নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে বিভিন্ন স্থানে আলকাপ গান পরিবেশন করে খ্যাতি অর্জন করেন। আলকাপ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে তিনি বহু কাপ, মেডেল ও সার্টিফিকেট লাভ করেন। তাঁর দলের অন্যান্য শিল্পীরা হচ্ছেন–

শ্রী নকুল চন্দ্র কর্মকার (হারমোনিয়াম বাদক), শ্রী দাস রবিদাস (তবলা বাদক), শ্রী তারাপদ দাস (বেহালা বাদক), মো. ফসিউদ্দিন (বাঁশি বাদক), শ্রী গংগা প্রসাদ দাস (ছোকরা), শ্রী মন্টু মোহন দাস (ছোকরা), শ্রী শ্রীকান্ত কর্মকার (কাইপ্যা), মো. ফাইজুদ্দীন (অভিনেতা), মো. আবদুল মালেক (অভিনেতা), মো. সুজাউদ্দিন (অভিনেতা), শ্রী গণপতিসাহা (অভিনেতা), শ্রী যোগেন্দ্রনাথ কর্মকার (অভিনেতা), মো. লতিফুর রহমান (অভিনেতা ও ছড়াকার), শ্রী শশধর সাহা (দোহারি). শ্রী দাসুদাস (দোহারি), ইউনুস আলী (ব্যবস্থাপক) ও মো. ধল্লু রহমান (সহকারী)।[২৭]

রকিবুদ্দীন (১৯৪২-২০০৫)

বাংলাদেশের গম্ভীরা গানের অন্যতম জনপ্রিয় শিল্পী (নাতি) রকিবুদ্দীনের জন্ম ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মালদহ জেলার ফুলকুড়ি গ্রামে ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে । তাঁর পিতার নাম সাবের আলী। দেশ বিভাগের পর তিনি পিতার সঙ্গে মালদহ থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ চলে আসেন।

রকিবুদ্দীনের পিতা ছিলেন বিখ্যাত গম্ভীরা রচয়িতা (নতুন আঙ্গিকের গম্ভীরা গানের রূপকার) শেখ সফিউর রহমান ওরফে সুফি মাস্টারের ভাই। তিনি গম্ভীরা দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পিতার অনুপ্রেরণা তাঁকে গম্ভীরা গানের প্রতি অনুরক্ত করে তোলে। এককথায় বলা যায় গম্ভীরাগান উত্তরাধিকার সূত্রে রকিবুদ্দীনের রক্তে মিশে আছে।

www.pathagar.com

রকিবুদ্দীন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছেন হরিমোহন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি খেয়াল, ঠুমরি ইত্যাদি গান গাইতেন, পাশাপাশি অভিনয় করতেন নাটকে। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন সমবায় মন্ত্রী মতিউর রহমান চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলে তাঁর সম্মানে গম্ভীরা গানের আয়োজন করা হয়। সেই গম্ভীরায় প্রথমবারের মতো নাতি হিসেবে আবির্ভূত হন রকিবুদ্দীন। তারপর আর পিছন ফিরে তাকানো নয়। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই বাংলাদেশ বেতারে গম্ভীরা পরিবেশন শুরু করেন। ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ টেলিভিশনের শিল্পী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন।

১৯৯৪ এর ১৮ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯৫ এর ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি ভারতের দিল্লি, কলকাতা, বর্ধমান, হলদিয়া, ডায়মণ্ড হারবার এ গম্ভীরা পরিবেশন করেন। কুতুবুল আলমের মৃত্যুর পর তিনি পর্যায়ক্রমে বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, মাহবুবুল আলম ও সাইদুর রহমানকে নানা করে দল গঠন করেন। তিনি ৬ নভেম্বর ২০০৫ চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের বাসুনিয়াপট্টির নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন।[২৮]

সিরাজুল ইসলাম (জ.১৯৪২)

বাংলাদেশের অন্যতম খ্যাতিমান গম্ভীরা রচয়িতা মো. সিরাজুল ইসলাম ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে অবিভক্ত ভারতের মালদহ জেলার (বর্তমান বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা) নবাবগঞ্জ থানার বারঘরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নবাবগঞ্জ শহরের হরিমোহন ইন্সটিটিউশন থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, নবাবগঞ্জ কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রি এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সপ্তাহে জাতীয় পর্যায়ে সিনিয়র গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে রংপুর জেলার গাইবান্ধা থানার পলাশবাড়ি ডিগ্রি কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। তারপর বিভিন্ন সময়ে শিবগঞ্জ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে এবং শাহ্ নেয়ামতুল্লাহ কলেজের অধ্যাপক হিসেবে চাকুরি করেন। তিনি বাংলাদেশ বেতার রংপুর ও রাজশাহীর শিল্পী হিসেবে খ্যাতিমান। বর্তমানে তিনি রাজশাহী বেতারে স্পেশাল গ্রেডের রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী। তিনি তিন শতাধিক গম্ভীরা গান রচনা করেছেন।[২৯]

মাহবুবুল আলম (জ.১৯৫২)

বাংলাদেশের গম্ভীরা গানের বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় শিল্পী নানা মাহবুবুল আলম। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার দূর্গাপুর গ্রামে ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ৮ জুলাই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সাদাতুল ইসলাম। মাহবুবুল আলম চাঁপাইনবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ থেকে ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে বি.এ পাশ করেন। তারপর শাহ্ নেয়ামতুল্লাহ কলেজে গ্রন্থাগারিক হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ১৯৯৬ এ গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিষয়ে ডিপেস্নামা করেন। তিনি ছাত্র জীবন থেকে সংস্কৃতি অনুরাগী। যখন তিনি ৪র্থ শ্রেণির ছাত্র তখনই স্কুলে গম্ভীরা গান করে সবাইকে মুগ্ধ করেন। তবে গম্ভীরা গান অনুশীলন শুরু করেন ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে থেকে। শহরের বিশিষ্ট আলকাপ শিল্পী বীরেন্দ্রনাথ ঘোষকে নাতি বানিয়ে তিনি গম্ভীরা গাওয়া শুরু করেন। ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে

www.pathagar.com

তাঁর দল বাংলাদেশ বেতার রাজশাহীর তালিকাভুক্ত হয়। বীরেন ঘোষকে নিয়ে তিনি বাংলা একাডেমী, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীসহ বিভিন্ন জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে গম্ভীরা গান পরিবেশন করেন।

বীরেন ঘোষের মৃত্যুর পর কিছুকাল তিনি রকিবুদ্দীনের সঙ্গে গম্ভীরা জুটি বাঁধেন। পরবর্তী সময়ে ২০০০ সালে তিনি ফাইজুর রহমান মানি নামে তরুণ এক শিল্পীর সঙ্গে জুটি বাঁধেন এবং অদ্যাবধি তাঁর দলটি জেলার শীর্ষস্থানীয় দল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

মাহবুব-এর 'চাঁপাই গম্ভীরা' এ পর্যন্ত ছয় শতাধিক গম্ভীরা পরিবেশন করেছে, অর্জন করেছে ব্যাপক প্রশংসা। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লাভ করেছেন পুরস্কার ও সম্মাননা। এসব সম্মাননার মধ্যে রয়েছে-জাতীয় সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার, রোটারী ক্লাব সনদ, কুতুবুল নানা স্মৃতি সংসদ সম্মাননা। মাহবুব গম্ভীরা ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের আঞ্চলিক গান পরিবেশন করে ইতোমধ্যে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছেন।[৩০]

তথ্যনির্দেশ

১. আবুল কাসেম নূর মোহাম্মদ, নবাবগঞ্জ পরিচিতি, রাজশাহী জেলা কাউন্সিল, রাজশাহী, ১৩৭৩, পৃ. ৫
২. মালেকা বেগম, ইলা মিত্র, ২য় সংস্করণ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৩৯
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬
৪. তসিকুল ইসলাম রাজা, রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলন, রাজশাহী, ১৯৯০, পৃ. ১৫৭
৫. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১২৫
৬. আবুল কাসেম নূর মোহাম্মদ, নবাবগঞ্জ পরিচিতি, রাজশাহী জেলা কাউন্সিল, রাজশাহী, ১৩৭৩, পৃ. ৭
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
৮. অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, গৌড়ের কথা, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৩৯০, পৃ. ২১
৯. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাঙলা সাহিত্যের কথা, ঢাকা, ১৯৬৩, পৃ. ১২৭
১০. তাসাদ্দক আহমেদ, নবাবগঞ্জ জেলার লোকসঙ্গীত : গম্ভীরা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪ পৃ. ১
১১. তাসাদ্দক আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-৯
১২. শহীদ সারওয়ার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ মডেল পৌরসভা : ইতিহাস ও লোকসমাজ, চাঁপাইনবাগঞ্জ পৌরসভা, চাঁপাইনবাগঞ্জ, পৃ. ৩০
১৩. আ.কা.শ. নূর মোহাম্মদ, নবাবগঞ্জ পরিচিতি, রাজশাহী জেলা কাউন্সিল, রাজশাহী, ১৩৭৩, পৃ. ৮
১৪. মুহম্মদ এলতাস উদ্দিন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ পরিচিতি ও লোকসংস্কৃতি, রাজশাহী, ২০১২, পৃ. ২২
১৫. মতিয়ার রহমান সরকার, 'বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার', যুব নাট্য উৎসব, নাটোর, ১৯৮৫, পৃ. ১১৩
১৬. মাযহারুল ইসলাম তরু, চাঁপাইনবাবগঞ্জের লোকসাংস্কৃতি পরিচিতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২৬

www.pathagar.com

১৭. আদমশুমারী, ২০১১
১৮. মাযহারুল ইসলাম তরু, গৌড় থেকে চাঁপাই, প্রাইম পাবলিকেশনস, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ২০০৭, পৃ. ৭২
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩-৪৪
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫২
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯
২৪. মহবুব ইলিয়াস, পিতা-মরহুম মোহাম্মদ আলী, মাতা-মরহুম আলিফ বেগম, গ্রাম-নতুন ইসলামপুর, পোস্ট-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৭৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-প্রাথমিক, সংগ্রহের তারিখ-০৫/০৩/২০০৪ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
২৫. মাহবুবুল আলম, পিতা-সাদাতুল ইসলাম, মাতা-বিলকিস বানু, গ্রাম-চাঁপাই-দূর্গাপুর, পোস্ট-উপররাজারামপুর, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৬০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ-২১/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা
২৬. মাযহারুল ইসলাম তরু, হাজার বছরের গম্ভীরা, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৮৮
২৭. সুজাতুল আলম কল্লোল, পিতা-মরহুম কুতুবুল আলম, গ্রাম-পাঠানপাড়া, পোস্ট-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৪০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ-১৮/১২/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা
২৮. মেহবুব রাজা, পিতা-মহবুব ইলিয়াস, মাতা-সুরাইয়া বেগম, গ্রাম-নতুন ইসলামপুর, পোস্ট-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৬৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-উচ্চ মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ-২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
২৯. সিরাজুল ইসলাম, পিতা-মরহুম মোজাফ্ফর হোসেন মিয়া, মাতা-মরহুম মালেকা বেগম, গ্রাম-বারোঘরিয়া, পোস্ট-বারোঘরিয়া, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৭২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতকোত্তর, সংগ্রহের তারিখ-২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৩০. তাহেরা ইসলাম, স্বামী-সিরাজুল ইসলাম, মাতা-মরহুম জায়েদা বেগম, গ্রাম-বারোঘরিয়া, পোস্ট-বারোঘরিয়া, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৬২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-উচ্চ মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ-২৭/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

www.pathagar.com

লোকসাহিত্য

লোকসাহিত্য সকল দেশেই প্রাচীনকাল থেকে মানব জাতির ঐতিহ্যগত পরম্পরায় মূল্যবান সাংস্কৃতিক উপাদান। পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির ইতিহাস এবং সংস্কৃতির বিকাশে লোকসাহিত্যের অবদান রয়েছে। যে কোনোও জাতির স্মৃতি-সম্ভার পরীক্ষা করলেই আমরা অনেক উপাখ্যান, প্রবাদ এবং মন্ত্রের সন্ধান পাব। তাই লোকসাহিত্যকে অস্বীকার করে কোনোও জাতির সংস্কৃতিকে বিশ্লেষণ করা চলে না।[১] লোকসাহিত্য মৌখিক ধারার সাহিত্য, যা অতীত ঐতিহ্য এবং বর্তমান অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে রচিত হয়। একটি বিশিষ্ট ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে একটি সংহত সমাজ মানস থেকে লোকসাহিত্যের জন্ম হয়। যে সমাজের মানুষের ভাষা আছে, ভাব আছে, আবেগ-কল্পনা আছে, সৃষ্টি ও প্রকাশের ক্ষমতা আছে, সেই সমাজের মানুষ লোকসাহিত্যের অধিকারী হয়। অক্ষর জ্ঞান ও শিক্ষা না থাকায় তারা তাদের সৃষ্টিকে লিপিবদ্ধ করতে পারে না। কেবল স্মৃতির উপর নির্ভর করে বিশাল জনগোষ্ঠী এই বিচিত্র শ্রেণীর ও বিপুল আয়তনের সাহিত্য ভাণ্ডারকে লালন ও বহন করে।[২] লোকসাহিত্য স্বতঃস্ফূর্ত ও কৃত্রিমতা বর্জিত। বাংলাদেশ লোকসাহিত্যে সমৃদ্ধ একটি রাষ্ট্র। চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর একটি ক্ষুদ্র জনপদ। আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও এ অঞ্চলটি লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানে ঋদ্ধ।

ক. লোকগল্প/কিস্‌সা/কাহিনি/রূপকথা/উপকথা

বাংলাদেশে সকল গ্রামাঞ্চলেই রসাত্মক ছোট ছোট গল্প প্রচলিত আছে। এগুলো কখনো উদহারণের জন্য, কখনো বা রঙ্গ-রসের জন্য পরিবেশন করা হয়ে থাকে। এই গল্পগুলোকেই লোকগল্প বলা হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জের লোকগল্পগুলোতে একদিকে যেমন অশিক্ষিত নিম্নবিত্তের কথা প্রতিফলিত হয়, অপরদিকে তেমনি প্রতিফলিত হয় মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তের কথাও। অর্থাৎ এগুলো সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে সমানভাবে জড়িয়ে রয়েছে। লোকে কাজের ফাঁকে, অবসর সময়ে কখনো বৈঠকখানায় বসে রসের গল্প করে থাকে। আবার সময় সুযোগ মতো যত্র তত্র এগুলো ব্যক্ত হয়ে থাকে। গল্পগুলোতে কখনো বাস্তবতা আবার কখনো বাস্তবতাশূন্য রসালো বাগাড়ম্বর লক্ষণীয়। তবে একথা সত্য যে, বাস্তবতা কিংবা কল্পকথন যাই থাকুক না কেন গল্পগুলো সব মিলিয়ে বেশ উপভোগ্য।

মোল্লার হার

এক সরল কৃষক জমি চাষ করে লাঙল কাঁধে জমির আল পথে বাড়ি ফিরছিল। সাথে তার মুখে মোখাড় দেয়া এক জোড়া গরু। হঠাৎ গ্রামের প্রভাবশালী ধুলু মোল্লা গরু

www.pathagar.com

জোড়া আটক করে। কারণ কৃষকের গরু মুখের বাঁধন খুলে গেলে ফসল নষ্ট করত। কৃষক বোঝালো, শক্ত বাঁধন খোলার প্রশ্নই উঠেনা। তবুও ধুলু মোল্লা তার গরু জোড়া নিয়ে চেয়ারম্যানের কাছে হজির হলো। চেয়ারম্যান সবকিছু শোনার পরে বলল, ঠিকই তো যদি ধান খেত। এখন ক্ষতি পূরণ দিতে হবে। বেচারা কৃষক কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফেরার পথে তার চাচার সাথে দেখা হলো। চাচাকে সব বৃত্তান্ত শোনালো। চাচা জেদি মানুষ। সে বাঁশ কেটে ধান শুকানো লাঠি তৈরি করছিল। সেই লাঠিখানা হাতে করে ভাস্তেকে সাথে নিয়ে চেয়ারম্যান ও ধুলু মোল্লার কাছে ইউনিয়ন পরিষদে গেল। বলল, যদি সে ধুলু মোল্লার বোনকে বিয়ে করতো তাহলে ধান খাওয়া জমিটা তার ভাগে পড়তো। অতএব খেয়ে থাকলে তার ভাগের জমির ধান খেয়েছে। এখন গরুতো নেবেই, সাথে জমির অংশও দাবি করল। নিরুপায় ধুলু মোল্লা শেষে নিজের ভুল স্বীকার করে গরু জোড়া ফেরৎ দিল।[৩]

তোমাকেও একখান পাকা কথা দিলাম

ইউনিয়ন পরিষদ ভোটের সময় চার জন চেয়ারম্যান প্রার্থী হয়েছে। সবাই জনগণের নিকট ভোট চাইছে। কালু শেখের নিকট এক চেয়ারম্যান প্রার্থী এসে বলল, চাচা আমাকে কিন্তু ভোটটি দিতে হবে– কথা দেন। শেখের পো বলল, আমিতো গতরাতে আরেক প্রার্থীকে পাকা কথা দিয়েছি। চেয়ারম্যান প্রার্থী বলল, ভোটের ব্যাপারে কথা দিয়ে কথা না রাখলেও চলে। কালু শেখ বিড়িতে শুকদম দিয়ে বলল, যাক বাবা বাঁচা গেল, তোমাকেও একখানা পাকা কথা দিলাম।[৪]

আজ না ঈদ

ফরিদ সাহেবের ক্লাশ টু-তে পড়া ছেলে মাকে এসে বলল, মা, পঞ্চাশটা টাকা দাও না; আমি বেলুন আর হাওয়ায় লাড্ডু কিনব। মা বলল, পঞ্চশ টাকার দাম আছে না? গত ঈদেই তো তোকে পঞ্চাশ টাকা দিলাম। ছেলে বলল, মা আজকেও তো ঈদ। মা রেগে বলল, দুর বোকা ছেলে! আজ ঈদ হতে যাবে কেন? ছেলে বলল, তাহলে যে–

মা বলল, তাহলে যে কী? ছেলে বলল, তাহলে কেন তিন তলার ঘরে আব্বু কাজের আন্টির সাথে কোলাকুলি করছে?[৫]

ভাত কুরকুরায় (চাঞ্চল্য) না যৈবন কুরকুরায়

কলেজে প্রথম বর্ষে পড়া মেয়ে পাড়ার এক বখাটে ছেলের প্রেমে পড়েছে। প্রেম ব্যাপারটি তার কাছে দারুণ উপভোগ্য মনে হয়েছে। শেষে ছেলেটাকে একেবারে নিজস্ব করে পাওয়া আশায় মায়ের কাছে বিয়ের কথা উপস্থাপন করেছে। মা তার বাবাকে বলেছে। বাবা শুনে ভীষণ ক্ষীপ্ত। ছেলে একেতো বেকার তার উপর গাঁজা-গুল-ফেন্সি খোর। বিয়ে দেবে না। মেয়েও নাছোড় বান্দা। শেষে বাবা মেয়েকে বলে, বাপের ঘাড়ে বসে বসে খাচ্ছ। ছেলেটিও তাই। খাবার না পেলে প্রেম পাবে কোথায়? বুঝতে পারছিনা, তোমার আসলে ভাত কুরকুরায় না যৈবন কুরকুরায়? মেয়ে উত্তর দেয়, বাবা যৈবন কুরকুরায়। মুখের উপর এই কথা শুনে বাপ মনে খুব দুঃখ পায়। রেগে গিয়ে

www.pathagar.com

মেয়ের মাকে বলে, মেয়েকে খাবার না দিয়ে ঘরের মধ্যে দুই দিন তালা বন্দি করে রাখ। দু দিনেই ক্ষুধায় মেয়ের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। জানালা দিয়ে এক থালা ভাত দেওয়ার জন্য মাকে অনুরোধ করে। তখন বাবা জিজ্ঞেস করে, এবার বলতো, আসলে ভাত কুরকুরায় না যৈবন কুরকুরায়? মেয়ে কাঁদ কাঁদ হয়ে বলে, বাবা যৈবন নয়, ভাত কুরকুরায়। আমি বিয়ে করব না, ভাত খাব।[৬]

কুটুম কুটুম করো আর ইজ্জত মারো

গ্রামাঞ্চলে বিয়ের দিন বর কনের বিয়ে হওয়ার পর কনেকে বরের সঙ্গে শ্বশুর বাড়ি যেতে হয়। কনের মনে সাহস যোগানোর ও টুকিটাকি ফাইফরমাসের জন্য সঙ্গে যায় কনের দাদি-নানি অথবা ছোট ভাই বোন। এমনি একটি বিয়ের পর কনের সঙ্গে কনের ক্লাশ ফাইভে পড়া ছোট ভাই তার বোনের সঙ্গে যায়। এতটুকু ছেলে শুতে দেবে কোথায়? শেষে বাসর ঘরে আলাদা বিছানায় তাকে শুতে দেওয়া হয়। সে মাঝ রাতে উঠে দেখে, তার বোনের উপর বর শুয়ে লাফালাফি করছে। দুই জনই উলঙ্গপ্রায়। তার কাছে ব্যাপারটি লজ্জা জনক ও খারাপ মনে হয়। সকালে উঠে ছেলেটির মন খুব খারাপ। ফলে দুলাভাই তাকে এটা সেটা কিনে দেওয়ার জন্য বাজারে নিয়ে যায়। দোকানি ছেলেটির ব্যাপারে প্রশ্ন করলে দুলাভাই উত্তর দেয়, এটি তার বড়ো কুটুম। কুটুম শুনে ছেলেটি আরো রেগে ওঠে। সবার সামনে চিৎকার দিয়ে বলে, কুটুম কুটুম মারচ্ছ! সারা রাত ধরে আমার বোনকে উলঙ্গ করে ইজ্জত মারলে, আর আমাকে কুটুম বানাচ্ছ। দুষ্টু মানুষ কোথাকার![৭]

যতই গলা খাকারি দাও, আর কমাবো না

গরিব দুই বন্ধু মিলে বউ দেখে এসেছে। এবার কনে পক্ষ ঘর-বর দেখতে এসেছে। বলাই বাহুল্য যে, কনে পক্ষ শিক্ষিত ও অবস্থা সম্পন্ন। তাদের তুলনায় পাত্র পক্ষ অচল। পাত্র তার বন্ধুকে শিখিয়ে দেয়, আমার সম্পর্কে তুমি সবকিছু বাড়িয়ে বলবে। বাড়িয়ে বলার মাত্রা বেশি হয়ে গেলে আমি গলা খাকারি দিলে তুমি কিছুটা কমিয়ে দেবে।

কনে পক্ষ বলে, তোমার নাম?

– মো. আব্দুল মালেক।

সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুটি বলে, শুধু তাই নয়, তার নাম মরহুম মো. আব্দুল মালিকে জাহান। পাত্র কাশি দেয়। কনে পক্ষের পরের প্রশ্ন, কাশছ যে, তোমার ঠাণ্ডা লেগেছে?

– হ্যাঁ, একটু ঠাণ্ডা লেগেছে। বন্ধুটি বলে আরে ঠাণ্ডা মানে, কাশি দেখছ না? যথারীতি যক্ষ্মা, রাজ রোগ গো রাজ রোগ– বড়ো লোকদের রোগ তো!

কনে পক্ষ জিজ্ঞেস করে, তোমারদের জমিজমা কতটুকু?

–খাবার সমান দু-দশ বিঘা আছে। বন্ধুটি বলে, দু-দশ বিঘা মানে পুরো উপজেলাটাই তো এদের জমি। পাত্র গলা খাকারি দেয়।

www.pathagar.com

–তা ঠিক নয়, ঐ এক হাজার বিঘা মতো হবে আরকি। পাত্র আবার গলা খাকারি দেয়।

–তা ঠিক নয়, ঐ এক'শ বিঘা মতো আরকি। পাত্র আবার গলা খাকারি দেয়। কিন্তু বন্ধুটি আর নিচে নামে না। বলে তুমি যতই গলা খাকারি দাও আমি আর নামছি না, আমার বলারও তো একটা ইজ্জত আছে?[৮]

গোপল ভোগ

'৭১ এর মুক্তি যুদ্ধের সময় চাঁপাইনবাবগঞ্জে এক বাগানে গেছেলরা আম ভাঙছিল। হঠাৎ করে সেখানে দু জন পাক সেনা হাজির হয়। ভয়ে সবাই তটস্থ। পাঞ্জাবিরা তাদের অভয় দিয়ে বলে তারা আম খাবে। গাছ থেকে গোপাল ভোগ আম পেড়ে তাদেরকে খাওয়ানো হয়। গোপালভোগ আম সুস্বাদু বলে সেটি তাদের মনে ধরে। এই ঘটনার এক সপ্তাহ পর ঐ দুজন সেনা অন্য বন্ধুদের আম খাওয়াতে নিয়ে আসে। সেদিন কোন বাগানেই গেছেলরা ছিল না, আর আমের নামটিও তাদের মনে ছিল না, শুধু মনে ছিল গোপাল। এসে এক গ্রামবাসীকে জিজ্ঞেস করে, গোপাল কাঁহা হে? সে ভয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উত্তর দেয়, হামি নাহি জান্‌তা হাজুর! শেষে তার পাছার উপর দু লাঠি কষে ছেড়ে দেয়। পরে আরেক গ্রামবাসীকে ধরে বলে, গোপাল কাঁহা হে? সে উত্তর দেয়, গোপাল তো হেন্দু হায়।

সে ইন্ডিয়া ভাগ গায়া হায়। তখন তারও পাছায় দু ঘা কষে, হাত ধরে টানতে টানতে বাগনে নিয়ে যায়। তখন সেই গাছটি তাদের চোখে পড়ে যায়। তখন গাছ দেখাতেই বেচারা উত্তর দেয়, গোপালভোগ হায়? –হাঁ হাঁ গোপালভোগ হায়। কিন্তু গাছে কোন আম ছিল না। তখন তারা হতাশ হয়ে বলে, গোপাল ইন্ডিয়া ভাগতা হায়, গোপালভোগ ইন্ডিয়া ভাগতা হায়। শেষ পর্যন্ত বেচারারা গোপালভোগ না খেয়েই ফিরে গেল।[৯]

মেরে আন্ধাসা ফোলা

চাঁপাইনবাবগঞ্জের এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে নওগাঁয়। বর শ্বশুর বাড়ি বেড়াতে আসলে তার শ্বাশুড়ি তাকে আন্ধাসা (তেল পিঠা) ভেজে খেতে দেয়। খাওয়ার পর খাদ্য বস্তুটি তার খুব মনে ধরে। আন্ধাসা নামটি খুব ভালো করে মনে রাখে। বাড়ি ফেরার সময় সে জমির আল পথ ধরে হাঁটছিল। মাঝ পথে গিয়ে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। তার মুখ থেকে 'এ যাহ্' শব্দ বেরোয়। সে আন্ধাসা শব্দটি বেমালুম ভুলে গিয়ে 'এ যাহ্' শব্দটি মনে করে রাখে। বাড়ি ফিরে গিয়ে বউকে 'এ যাহ' বানিয়ে দিতে বার বার তাগিদ দেয়। বউ কথাটি বুঝে উঠতে না পেরে, সেটিকে ঠাট্টা হিসেবে নেয়। তাতে স্বামীর সম্মানে খুব বাঁধে। তখন সে বউকে আচ্ছা মতো পেটায়। শ্বাশুড়ি খবর পেয়ে মেয়েকে দেখতে আসে। মেয়ের শরীরে মারের দাগ দেখে কাঁদে আর বলে, মেয়েকে এমন করে মেরেছে, একেবারে আন্ধাসা ফোলা করে ফুলিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে জামাই বলে ওঠে 'এ যাহ্ নয় রে, এ যাহ্ নয়, আমাকে আন্ধাসা ভেজে দে।[১০]

www.pathagar.com

আমি খুশি

হাসি আর খুশি যমজ দুই বোনের মধ্যে বড়ো বোন হাসির বিয়ে হয়েছে। নতুন বর শ্বশুর বাড়ি এসে পোশাক দেখে শালী আর বউকে আলাদা করছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে বউকে একা পেয়ে সহসা বর আদর করতে শুরু করে। তখন মেয়েটি নিজকে ছাড়ানোর জন্য বলে ওঠে, আমি খুশি, খুশি...তখন বর বলে, তুমি খুশি তো আমিও খুশি। আদরের মাত্রাটা আরেকটু বেড়ে যায়।[১১]

তিন আহম্মকের গল্প

একদা এক দরবেশ আলখেল্লা পরিহিত অবস্থায় রাস্তা দিয়ে পথ চলছেন। এমতাবস্থায় তিন ব্যক্তি রাস্তার ধারে বসে গল্প করছে। তিনজনেই বিবাহিত। তাদেরকে দরবেশ সাহেব সালাম জানিয়ে বিদায় নিলেন। দরবেশ বিদায় নিলে তিনজনই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে থাকে যে, দরবেশ আমাকে সালাম জানিয়েছে। এক পর্যায়ে তারা দরবেশের নিকট ছুটে যেয়ে বলে, 'দরবেশ সাহেব আপনি আমাদের তিন জনের মধ্যে কোন জনকে সালাম দিয়েছেন?' দরবেশ তিনজনের মুখের পানে চেয়ে উত্তর দিলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে আহম্মক, তাকে সালাম দিয়েছি।' তিনজন আবার প্রশ্ন করলো-আমাদের মধ্যে আহম্মক কে? দরবেশ তিনজনকে বললেন, 'তোমরা শ্বশুর বাড়ি গিয়ে ফিরে এসে বলবে তোমরা শ্বশুর বাড়ি যেয়ে কী কী কাণ্ড করে এসেছো?' তারপর আমি তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেব।

তিনব্যক্তি শ্বশুর বাড়ি যেতে প্রস্তুত হলো, শ্বশুর বাড়ি যাবার পূর্বে প্রত্যেককেই তাদের মায়ের কাছে গিয়ে বলল, 'মা শ্বশুর বাড়ি যাবো।' প্রথম ব্যক্তিকে তার মা বলল, 'বাছা শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে যখন তোমাকে খেতে দেবে তখন একটু উঁচুতে বসে খেয়ো।' সে ব্যক্তি হ্যাঁ মা বলে শ্বশুর বাড়ির উদ্যেশ্যে যাত্রা করলো। শ্বশুর বাড়িতে আহারের সময় সকলে রান্না ঘরে বসে আহার পরিবেশন করছেন এমন সময় জামাই বাবু মায়ের কথা মোতাবেক উঁচু জায়গা খুঁজছে। রান্না ঘরে হাড়ি রাখার জন্য যে মই রাখা ছিলো সেখানেই বসে আহার পরিবেশন করলো। তাতে তার শরীর হাড়ির কালিতে ভরে গেল। বাড়ির লোকজন জামাইয়ের মূর্খতা দর্শনে হো হো করে হেসে উঠলে। দ্বিতীয় ব্যক্তিও প্রথম ব্যক্তির অনুরূপ শ্বশুর বাড়ি যাবার জন্য মায়ের নিকট প্রার্থনা জানালে মা তাকে বারবার সর্তক করে বললেন, 'বাছা শ্বশুর বাড়িতে একটু উঁচুতে শুয়ো। রাত্রে খাওয়া দাওয়া খেয়ে জামাইবাবুকে চৌকিতে শুতে দেওয়া হলো। জামাইবাবু মায়ের কথা স্মরণ করে শুবার জন্য উঁচু স্থান খুঁজতে খুঁজতে মই দিয়ে ঘরের চালের উপরে উঠে সেখানে ঘুমাতে থাকে। রাত্রে বেঘোরে ঘুমাতে ঘুমাতে চাল থেকে পড়ে সে পানি পড়ার ছাঁচেই ঘুমায়। বাড়ির লোক জন জামাইয়ের নির্বুদ্ধিতার পরিচয় পেয়ে হো হো করে হাসলেন।

তৃতীয় ব্যক্তিও মায়ের নিকট শ্বশুর বাড়ি যাবার জন্য অনুমতি চাইলে মা তাকে বললেন, বাবা শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছ যাও। তবে তোমার ছোট ছেলে রয়েছে। তার জন্য কিছু মিষ্টি-মণ্ডা হাতে করে যেয়ো। তৃতীয় ব্যক্তি আচ্ছা বলে শ্বশুর বাড়ি যাত্রা করল।

www.pathagar.com

শ্বশুর বাড়ি গিয়ে সে দেখল, তার শিশু পুত্র কান্না কাটি করছে। সে তার মায়ের কথামতো শিশুর হাতে মিষ্টি-মণ্ডা দিলো। কিন্তু শিশু আর কিছুতেই কান্না থামালো না। তারপর যখন তার স্ত্রী শিশুর মুখে মাই অর্থাৎ স্তনের বোটা গুজে দেয় তখন শিশুর মনের আনন্দে দুগ্ধ পান করতে থাকে। শিশুর মাতৃস্তন্য পান করা দেখে তার মনে বিস্ময় জাগে। স্ত্রী-স্তনে এমন কী সুস্বাদু খাবার আছে যা শিশু পরমানন্দে পান করছে। তাই সে স্ত্রীকে ধরে জোরপূর্বক তার স্তন্য পান-করে।

এবার তিন ব্যক্তি দরবেশ সাহেবের নিকট ফিরে এসে নিজ নিজ কর্মের কথা বলল। দরবেশ মহাশয় বললেন, তোমাদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি আহম্মক, যে তার স্ত্রীর স্তন থেকে দুগ্ধ পান করেছে। আমি তাকেই সালাম দিয়েছিলাম।[১২]

ডিমের বাচ্চার দাম না দেওয়া

পিতা পুত্র হোটেলে ডিম দিয়ে ভাত খাচ্ছিল। পুত্রের ডিমে বাচ্চা থাকায় সে পিতাকে বলল, বাপুজি ডিমের মধ্যে ছা। তখন পিতা তার পুত্রকে বলল, বেটা তাড়াতাড়ি খেয়ে ফ্যাল, যদি মালিক জানতে পারে তাহলে বাচ্চার দামও কেটে নেবে। তখন পুত্র চুপচাপ খেয়ে নিল।[১৩]

পাছায় পণ্য ঢুকানো

একদা একটি হাটে বিভিন্ন ফলবিক্রেতা আসে। এদের মধ্যে অনেকেই হাটের ইজারদারদেরকে খাজনা ফাঁকি দিয়ে বিক্রিত মালের খাজনা না দিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে, হাটের ইজারদারদের কড়া প্রহরায় ধরা পড়ে। এসব ধৃত ব্যক্তিদেরকে উদ্দেশ্য করে ইজারদারদের প্রধান বললেন, শালারা খাজনা দেওয়ার ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। তারা যে যে জিনিস নিয়ে এসে ছিলো সেগুলো তাদের পাছার মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। তাদের মধ্য হতে দুজন হেসে উঠলে ইজারদারদের প্রধান বলে যে, শালারা কিজন্য হাসছিস? তাদের ভিতর একজন বলে, ভাই আমি তো সুপরি নিয়ে এসেছি, তা আমার পাছার মধ্যে সহজেই ঢুকে যাবে। দ্বিতীয় জন বলল, 'আমি তো শসা নিয়ে এসেছিলাম সেটাও না হয় কষ্ট হলেও পাছার মধ্যে ঢুকে যাবে, কিন্তু কাঁঠালওয়ালার কী হবে? কাঁঠাল তো তার পাছার মধ্যে ঢুকবে না। তার জন্যই হাসলাম।[১৪]

অন্যান্য অঞ্চলের মতো এই অঞ্চলেও কিছু চুটকি প্রচলিত আছে, যেগুলো ভদ্র সমাজে অশালীন বলে মনে হতে পারে। তথাপি লোকসমাজের গ্রাম্য বা শহুরে মানুষ (কখনো কখনো শিক্ষিতজনরাও) এসব গল্প একান্ত পরিবেশে বন্ধু সমাজের নিকট পরিবেশন করে থাকে। লোকসাহিত্যে এসবের গুরুত্ব আছে।

বাঘ শিকার

দুই বন্ধু গভীর জঙ্গলে বাঘ শিকার করতে যেয়ে একবন্ধু আরেক বন্ধুকে বলছেন, 'বন্ধু তোমার বন্দুকটা দাও, সামনে বাঘ, গুলি করি।' তার বন্ধু বললেন, 'বন্ধুক আনতে ভুলে গেছি। এবার দ্বিতীয় বন্ধু প্রথম বন্ধুকে বললেন, তোমার বন্দুকটি দাও। সেটি দিয়ে

www.pathagar.com

বাঘকে গুলি করি। দ্বিতীয় বন্ধু প্রথম বন্ধুর মতোই জবাব দিলেন, বন্দুক আনতে ভুলে গেছি। তখন প্রথম বন্ধু দ্বিতীয় বন্ধুকে রেগে গিয়ে বললেন, তা হলে- বাড়া (লিঙ্গ) দিয়ে বাঘ মার। বাঘ তাদের সব কথা শুনছিলো। সব ধরনের অস্ত্রের কথা বাঘ শুনেছে। যেমন-বন্দুক, পিস্তল, রাইফেল ইত্যাদি। কিন্তু 'বাড়া' নামক অস্ত্রের নাম সে ইতোপূর্বে শুনে নি। ভাবে, না জানি এটা কী অস্ত্র! ভয়ে বাঘ সেখান থেকে দ্রুতবেগে দৌড় দিল। দৌড়াতে দৌড়াতে অনেক দূর গিয়ে, আশি বৎসরের এক বুড়ির সাথে তার দেখা হয়। বুড়ি বাঘ দেখে ভয়ে পালাতে ব্যস্ত। এমন সময় বাঘ বুড়ির পথ ঘিরে বলে, বুড়ি মা, আমি অনেক অস্ত্রের নাম শুনেছি– বন্দুক, পিস্তল, রাইফেল, বোমা। কিন্তু 'বাড়া' কী অস্ত্র, যা দিয়ে নাকি বাঘ শিকার করা যায়? তখন বুড়ি তার পরনের কাপড় উঠিয়ে বাঘকে দেখিয়ে বলল, বাবা 'বাড়া' মারাত্মক অস্ত্র! আজ থেকে পঁয়ষট্টি বছর আগে, আমার স্বামী 'বাড়া' দিয়ে এই যৌনাঙ্গে আঘাত করেছে, যার ঘা এখনো শুকায় নি। বাঘ এ কথা শুনে, আরো দ্রুতবেগে পালাতে থাকে।[১৫]

নির্বোধ জোলা

একদা এক জোলার বাড়ি চোর ঢুকলে, জোলা চোরের লিঙ্গ ধরে টানাটানি করে এবং একটু পরেই ছেড়ে দেয়। স্ত্রীকে বলে, আমি তাকে চিনে ফেলেছি।' তার স্ত্রী বলে, কী দেখে চিনলে? সে বলে, 'আমি চিনেছি ওকে ছেড়ে দাও।' চোর চলে গেল। পরের দিন জোলা গ্রামের মড়লের নিকট বিচার দিল। মড়ল গ্রামের লোকজন নিয়ে বিচারে বসলেন। তিনি জোলাকে বললেন, চোর কই? চোরকে তুমি চিন? তখন জোলা বলল, হ্যাঁ তার একটি নুনু ছিলো। আমি তার নুনু (লিঙ্গ) ধরে ছিলাম। সেটি নেতানো ও কালো রঙের। তখন বিচারের সবাই হোঁ হোঁ করে হেসে ওঠে।[১৬]

খ. কিংবদন্তি

আবহমানকাল ধরে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত অর্থাৎ সাধারণ মানুষ পূর্ব পুরুষের কাছ থেকে শুনে অন্যদের কাছে বর্ণনা করেছে আমরা সে ধরনের ঘটনাকে কিংবদন্তি (Legend) বলে থাকি। সে সব প্রচলিত কাহিনির উপাদান, উপকরণ দেবতার, স্বর্গের গুণাগুণকে ছাড়িয়ে মানুষ ও প্রকৃতির উপাদান উপকরণে সমৃদ্ধ থাকে।

কিংবদন্তি লোকসাহিত্যের অন্যতম শাখা। চাঁপাইনবাবগঞ্জে বিভিন্ন কিংবদন্তি ছড়িয়ে রয়েছে।

'চাঁপাই' নামকরণ সম্পর্কিত কিংবদন্তি

১. বর্তমান নবাবগঞ্জ শহর থেকে ৫/৬ মাইল দূরে মহেশপুর নামে একটি গ্রাম রয়েছে। নবাব আমলে এই গ্রামে নাকি 'চম্পাবতী' মতান্তরে চম্পারাণী বা চম্পাবাঈ নামে এক সুন্দরী বাঈজী (নৃত্য শিল্পী) বাস করতেন। তাঁর নৃত্যের খ্যাতি আশে-পাশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি নবাবদের প্রিয়পাত্রী ছিলেন। তারই নামানুসারে স্থানের নাম 'চাঁপাই' হয় বলে অনেকে মনে করেন।

www.pathagar.com

২. চাঁপাই নামকরণের আর একটি প্রচলিত মত হচ্ছে এ অঞ্চল রাজা লক্ষীন্দরের বাসভূমি ছিল। লক্ষীন্দরের রাজধানীর নাম ছিল 'চম্পক' একথা সকলেই স্বীকার করেন। এখনও চম্পক নগরীর প্রকৃত চৌহদ্দী তথা অবস্থান কোথায় এ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। যা হোক নবাবগঞ্জ জেলায় আমরা চসাই, চান্দপুর, বেহুলা গ্রাম আর বেহুলা নদীরও সন্ধান পাই। অবশ্য এ বেহুলা নদী আজ মালদহ জেলায় প্রবাহিত। বিভাগ পূর্বকালে এ চাঁপাই মালদহ জেলার অধীনে ছিল। রাজশাহীর কৃতিসন্তান প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় (১৮৬১-১৯৩০) বলেছেন, বেহুলা তার স্বামীকে ভেলায় নিয়ে মহানন্দার উজান বেয়ে ভেসে গিয়েছিল। প্রখ্যাত ভাষাবিদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুলাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) এর 'বাঙলা সাহিত্যের কথা' ১ম খণ্ডে বর্ণিত লাউ সেনের শত্রুরা জামুতিনগর দিয়ে গৌড়ে প্রবেশ করে। বর্তমান ভোলাহাট উপজেলার জামবাড়িয়া পূর্বে জামুতিনগর নামে পরিচিত ছিল। এসবের ওপর ভিত্তি করে গবেষকগণ চাঁপাইকে বেহুলার শ্বশুরবাড়ি চম্পকনগর বলে স্থির করেছেন। তাছাড়া নবাবগঞ্জ-গোদাগাড়ীর মধ্যবর্তী গ্রামগুলোতে বেহুলা, চাঁদ সওদাগর ও লক্ষীন্দরের নাম এতই প্রবল যে চাঁপাইকে চাঁদ সওদাগরের রাজবাড়ি না বলে পারা যায় না। আসলে সেখানকার পুরাকালের অনেক ঘর-বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখেই এরূপ অনুমান করা হয়েছে বলে মনে হয়।[১৭]

ঐতিহাসিক ছোট সোনামসজিদের নাম সংক্রান্ত কিংবদন্তি

১. জনৈক খোঁজা (নপুংসক) কর্তৃক এই মসজিদ প্রতিষ্ঠিত। সেজন্য এর নাম "খোঁজা কি মসজিদ"।

২. মালদহের জনৈক জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মতে এই মসজিদটি সুলতানের রাজকীয় পরিবারের খাজাঞ্চি কর্তৃক নির্মিত।

৩. ১৩০৪ বাংলা খ্রিষ্টাব্দের ভূমিকম্পে মসজিদের পশ্চিম দেওয়াল ভেঙে পড়লে কয়েকটি পাথরের মূর্তি আবিস্কৃত হয়ে পড়ে। মূর্তিগুলি নাকি কলকাতা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এসব মূর্তি শিব, ভবানী ও স্বরসতীর মূর্তি বলে অনেকে অনুমান করেন।

৪. মসজিদের পশ্চিম দেওয়াল ভেঙে পড়ায় বহু মূল্যবান শ্বেতপাথর ও কারুকার্য খচিত সম্পদ পাওয়া যায়। পরবর্তিতে সে শিল্প নিদর্শন বিলেতে স্থানান্তরিত হয়।

৫. মসজিদের সামনের প্রবেশ পথে যে একটি বিরাট ইট নির্মিত তোরণের অবশিষ্টাংশ রয়েছে, ভূমিকম্পের আগে তার সর্বাংগ বিবিধ রং এর পাথরখণ্ডে অলংকৃত ছিল।

৬. বেনারস থেকে আগত শিল্পীদের দ্বারা এই মসজিদের কারুকার্য সম্পাদিত হয়েছিল।

৭. মসজিদের পূর্ব-উত্তর-কোণে মঞ্চাবস্থায় পরস্পর সন্নিহিত যে দু'টি পাথর নির্মিত অজ্ঞাত সমাধি (দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট ও প্রস্থ ১০.৫ ফুট) রয়েছে তা একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠাতা ও আরেকটি নাকি প্রতিষ্ঠাতার আত্মীয়ের সমাধি। মতান্তরে এই দু'টি কাল্পনিক কবর বরং মসজিদ প্রতিষ্ঠাতার এতে গুপ্তধন রক্ষিত রয়েছে। দুটি সমাধির শিয়রে আলাহর নাম ও কালেমা উৎকীর্ণ আছে। বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য।

www.pathagar.com

"এক প্রহর বেলা পর্যন্ত সোনা বর্ষিত হয়েছিল মতান্তরে প্রচুর সোনা পাওয়া গেছে সেজন্য স্বর্ণপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক এখানে দিঘি খনন ও মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়ে 'সোনামসজিদ' নামকরণ হয়েছে।[১৮]

তোহাখানা সম্পর্কিত কিংবদন্তি

শাহ্ সুজা যখন ফিরোজপুরে মোরশেদ শাহ্ নেয়ামতউলাহর সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসতেন তখন উক্ত ইমারতের মধ্যবর্তী সুপ্রশস্ত কামরাটিতে বাস করতেন। গৌড়ের প্রাচীন কীর্তির মধ্যে এই শ্রেণির ইমারত এই একটিই পরিলক্ষিত হয়। কড়িকাঠের উপর খোয়া ঢালাই করে যার ছাদ ও কোঠা জমাট করা হয়েছিল।

উল্লেখিত মসজিদ ও তোহাখানার নিকটস্থ সরোবর 'দাফেউল বালাহ্'র তীরে অবস্থিত। এই দুই ইমারত হতে দুইটি সিঁড়ি সরোবরের তলদেশ পর্যন্ত বিন্যস্ত। পূর্বতীর হতে উক্ত ইমারতদ্বয়ের দৃশ্যাবলি খুবই মনোরম।[১৯]

দাফেউল বালার মাহাত্ম সম্পর্কিত কিংবদন্তি

কথিত আছে শাহ নেয়ামতউলাহর সময়ে বিশেষ কারণে এ পুকুরের পানি নষ্ট হয়ে যায়। মানুষ কিংবা অন্য কোন পশু বা জীব-জন্তু এ পানি পান করলেই মারা যেত। শাহ সাহেব কয়েকজন মুরিদসহ এখানে উপস্থিত হন এবং সকলে মিলে পুকুরের পানি পান করেন। সঙ্গে সঙ্গে পানি ভাল হয়ে যায়।

মতান্তরে এসম্পর্কে আরো এক গল্প প্রচলিত রয়েছে। হযরতের ইমান পরীক্ষার জন্য যখন বাদশাহ তাঁকে একগ্লাস বিষাক্ত শরবত পান করতে দেন তখন সকলেই তাঁকে বাধা দেন। কিন্তু তিনি অর্ধেক শরবত পান করে বাকি অর্ধেক এই পুকুরে ফেলে দেন। সঙ্গে সঙ্গে পুকুরের মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী মরে ভেসে ওঠে। হযরত কেরামতি বলে সবকে বাঁচান এবং এ পানি বিষমুক্ত করে পানের উপযোগী করেন। এর মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কিছু আছে কিনা ঠিক ভাবে বলা যায় না। কেউ কেই মনে করেন, বাদশাহ স্বয়ং শরবতে তহুরা পান করতেন। তিনি তাঁর কন্যাকে পাত্রস্থ করার জন্য মনে মনে তাঁর নিজের চেয়ে বেশি ঈমানদার লোক খুঁজছিলেন, তাই নতুন অতিথিকে এ শরবত পান করতে দিতেন। অনেকেই সহ্য করতে না পেরে শরবত পানের সঙ্গে সঙ্গে মারা যেতেন।[২০]

গ. লোকপুরাণ

লোকপুরাণ লোকসাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ ধারা। এক কথায় বলা যায়, মানবজাতির শৈশবস্থার প্রতিচ্ছবি লোকপুরাণ।[২১] লোকপুরাণে মানব জীবনের প্রাচীনতম স্তরের অনেক স্মৃতি স্তরীভূত হয়ে আছে।[২২] লোকপুরাণগুলো সংস্কৃতির লোকায়ত এবং ধ্রুপদী দুটি পরস্পর সাপেক্ষ ঐতিহ্যের মধ্যে মেলবন্ধন করে বলে গবেষকগণ মনে করেন।[২৩] আমাদের মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অসংখ্য লোকপুরাণ রয়েছে। এসব কালজয়ী

www.pathagar.com

কাহিনির মধ্যে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গলের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই কাহিনিগুলো আঞ্চলিক লোকপুরাণ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। বিশ্বের সৃষ্টি, প্রলয়, বিশিষ্ট রাজা, ঋষি, দেবতা, দৈত্য প্রভৃতির বংশ বিবরণ এবং বিভিন্ন বংশীয় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির কীর্তিকলাপ বর্ণনা ও মন্বন্তর লোকপুরাণের বিশেষ লক্ষণ।[২৪]

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রয়েছে সাঁওতাল ও ওরাওঁ সম্প্রদায়ের বসবাস। এই দুই জাতিসত্তার বেশ কিছু পুরাণ আছে যা বংশ পরম্পরায় যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এখানে এই দুই নৃগোষ্ঠির কয়েকটি লোকপুরাণ উদ্ধৃত করা হলো।

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোকপুরাণ

পৃথিবীর সৃষ্টি কথা

এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আদিতে ছিল নিরাকার এবং মহাশূন্য। এই নিরাকার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঠাকুর জিউ মারাংবরু ও অন্যান্য দেবতাগণ শুধুমাত্র বিরাজমান ছিলেন। দেবতাকূল নিরাকার মহাশূন্য এবং অসীম জলরাশিতে রাজত্ব করতেন। এই সময় দেবতাদের মধ্যে থেকে এক দেবতা ঠাকুর জিউকে বললেন, মানুষের জন্ম হলে খুব ভালো হতো। তখন দেবতাদের প্রধান অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা ঠাকুর জিউয়ের মনে কথাটা খুব ভালো লাগলো। ঠাকুর জিউ তখন স্বর্গের মালিনী বুড়িকে দুটি মনুষ্য মূর্তি তৈরি করার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পাওয়া মাত্র মালিনী বুড়ি দুটি মানুষের মূর্তি তৈরি করে ফেললো। কাদামাটি দিয়ে তৈরি মানুষের মূর্তি দুটো রোদে শুকোতে দেওয়া হলো। এমন সময় স্বর্গের ঘোড়া নিরাকারের মধ্যে পানি পান করতে নামছিল। মানুষের মূর্তি দুটো চোখে পড়া মাত্র স্বর্গের ঘোড়া মূর্তিগুলোকে লাথি মেরে ভেঙে ফেললো। ঠাকুর জিউ এ ঘটনায় খুব দুঃখ পেলেন এবং মালিনী বুড়িকে পুনরায় মূর্তি দুটো মেরামত করার নির্দেশ দিলেন। মালিনী বুড়ি মূর্তি দুটো আগের মতোই মেরামত করে ফেললো। তখন ঠাকুর জিউ মূর্তি দুটোয় প্রাণ সঞ্চারের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ঠাকুর জিউ মালিনী বুড়িকে বললেন, 'আমার ঘরে দুটো প্রাণ ঝোলানো রয়েছে, একটা প্রাণ ঝোলানো আছে ঘরের দরজার সাথে এবং আর একটা প্রাণ ঝোলানো আছে ঘরের চালের সঙ্গে।' এই কথা বলে ঠাকুর জিউ মালিনী বুড়িকে সতর্ক করে দিলেন দরজার সঙ্গে ঝোলানো প্রাণ না আনার জন্য, কারণ সেই প্রাণ মানুষের প্রাণ নয়। চালের সঙ্গে ঝোলানো প্রাণই হচ্ছে মানুষের প্রাণ। কিন্তু মালিনী বুড়ি ছিল বেঁটে, তাই সে চালের সঙ্গে ঝোলানো প্রাণ আনতে ব্যর্থ হলো। তাই সে ঘরের দরজার সঙ্গে ঝোলানো যে প্রাণ ছিল তাই নিয়ে এলো। ঠাকুর জিউ বুঝতে পারেননি মালিনী বুড়ি কোন প্রাণটা নিয়ে এসেছে। না বুঝে ঠাকুর জিউ ঐ মূর্তি দুটোর মধ্যে মালিনী বুড়ির আনা প্রাণ প্রবেশ করিয়ে দিলেন। আর তক্ষুণি কাদামাটি দিয়ে তৈরি মানুষের মূর্তি দুটো পাখি হয়ে ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল। পাখি দুটো মহাশূন্য এবং অসীম জলরাশির উপর দিয়ে উড়তে থাকলো। এই পাখি দুটো ছিল রাজহাঁস জাতীয়। এই রাজহাঁস দুটো অসীম জলরাশিতে কোথাও নামার মতো জায়গা পেল না, কারণ তখনো পৃথিবীর সৃষ্টি হয়নি। এই ঘটনায় ঠাকুর জিউ মালিনী বুড়ির চালাকি বুঝতে পেরে ভীষণ রাগান্বিত হলেন এবং মালিনী বুড়িকে ঠাকুর জিউ পেত্নী বানিয়ে দিলেন।[২৫]

www.pathagar.com

দেবতাদের অনুরোধে ঠাকুর জিউ পাখি দুটোর বসবাসের জন্য জায়গা করে দিতে রাজি হলেন। দেবতাকূল তখন জিউয়ের সামনে এক সভায় মিলিত হলো। দেবতারা সাগরের কুমিরকে ডেকে বললো, পাতাল থেকে মাটি নিয়ে আসতে, সেই মাটিতে হাঁসা আর হাঁসির জন্য স্থান করে দেয়া হবে। দেবতাদের কথামতো কুমির সাগরের তলদেশে ডুব দিয়ে পিঠে করে মাটি আনতে চেষ্টা করলো। কিন্তু উপরে উঠতে উঠতে মাটি আবার ধুয়ে সাগরে পড়ে গেল। দেবতারা তখন চিংড়ি মাছকে বললেন মাটি আনতে, কিন্তু চিংড়ি মাছও মাটি আনতে পারলো না। তারপর রাঘব বোয়ালকে বলা হলো মাটি আনতে, কিন্তু রাঘব বোয়ালও মাটি আনতে ব্যর্থ হলো। এরপর কাঁকড়াকে বলা হলো মাটি আনতে, কিন্তু কাঁকড়াও মাটি আনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। দেবতারা তখন মহাভাবনায় পড়ে গেলেন। কিন্তু কোন ভাবনাতেই কিছু হলো না। তখন কেঁচো দেবতাদের পরামর্শ দিলো কচ্ছপের চার পা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখতে আর কেঁচো কচ্ছপের পিঠের উপর মাটি তুলবে, তাতে মাটি আর সাগরে পড়বে না। তখন দেবতারা রৈমত লেঙোং অর্থাৎ কেঁচোর পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং কেঁচোকে নির্দেশ দিলেন সমুদ্রের তলদেশ থেকে মাটি তুলে আনতে। কিন্তু কেঁচো আপত্তি জানিয়ে বললো, 'আমি মাটি তুলে আনতে পারবো কিন্তু সাগরের মাছ যদি আমাকে খেয়ে ফেলে? একটা চোঙা পুঁতে দিলে আমি চোঙার ভিতর দিয়ে গিয়ে সাগরের তলদেশ থেকে মাটি নিয়ে আসবো।' তখন দেবতারা সাগরের মাঝখানে একটা চোঙা পুঁতে দিয়ে একটা কচ্ছপ ধরে নিয়ে এসে তার পা চারটা খুঁটির সঙ্গে কষে বাঁধলেন। তখন কেঁচো চোঙার ভিতর দিয়ে সাগরের তলদেশ থেকে মাটি তুলে এনে কচ্ছপের পিঠে মাটি ওঠাতে থাকলো। মাটি উঠাতে উঠাতে অনেক মাটি একইভাবে কচ্ছপের পিঠের উপর জমা হতে লাগলো। মাটি সূর্যের তাপে শুকিয়ে গেল। দেবতারা সেই মাটিতে মই দিল। যে সকল জায়গায় ঠিকমতো মই পড়েনি, সেখানে উই ঢিবি হয়ে থাকলো। এই ঢিবিগুলোই পাহাড়-পর্বত হিসেবে পরিচিত হলো। দেবতারা সেই মাটিতে ঘাস ছিটালো, গাছ রোপণ করলো এবং বিভিন্ন রকম ফুল ও ফল ধরলো সেই গাছগুলোতে। এইভাবে ফুল, ফল ও বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো সেই কচ্ছপের পিঠ– যাকে পৃথিবী বলা হলো। সাঁওতালরা বিশ্বাস করে, যখন কচ্ছপ নড়াচড়া করে তখনই ভূমিকম্প হয়।

মানুষের সৃষ্টি কথা

যখন পৃথিবীর সৃষ্টি হয়ে গেল, তখন সেই রাজহাঁস ও হাঁসি নদীর ধারে বড় বড় ঘন ঘাসের মধ্যে বাসা বাঁধলো। সেই বাসাতে হাঁসি দুটো ডিম পাড়লো। একদিন সেই ডিম দুটো থেকে দুটো মানবশিশু জন্ম নিল। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। মানবশিশু জন্মের পর হাঁসা আর হাঁসি আনন্দে গান গেয়ে উঠলো:

হায়! হায়! সাগরের জলরাশিতে
হায়! হায়! এই দুটো মানবশিশু
হায়! হায়! ডিম থেকে বাচ্চা হলো
হায়! হায়! এই দুটো মানবশিশু

www.pathagar.com

হায়! হায়! কোথায় রাখা হবে
হায়! হায়! ঠাকুর জিউ ঠাঁই দেবে
হায়! হায়! কোথায় রাখা হবে?

তারপর হাঁসা আর হাঁসি মানবশিশু দুটোকে ঠাকুর জিউয়ের কাছে নিয়ে আসলো। ঠাকুর জিউ তখন পাখি দুটোকে পরামর্শ দিলেন, 'তোমরা যে ফল খাও, সেই ফলের রস তুলার মধ্যে করে করে শিশুদের মুখে দিয়ে দাও।' ঠাকুর জিউয়ের পরামর্শ মেনে পাখি দুটো শিশুদের ফলের রস খাওয়ালো। এইভাবে শিশু দুটো বড় হতে থাকলো। ক্রমে তারা হাঁটা শিখলো। পাখি দুটো তখন ভাবতে থাকলো এই শিশুদের কোথায় রাখা যায়। কারণ পাখির বাসা কোন মতেই মানবশিশুর জন্য উপযুক্ত নয়। ঠাকুর জিউ তখন আবার পরামর্শ দিলেন, 'তোমরা শিশুদুটোকে পিঠে করে উড়ে যাও, খুঁজে দেখো কোথায় বসবাসের মতো জায়গা পাওয়া যায়।' পাখি দুটো তখন শিশুদের পিঠে করে যে দিকে সূর্য ডোবে সেই দিকে উড়ে গেল। একটা জায়গা তাদের পছন্দ হলো, যার নাম 'হিহিড়ি পিপিড়ি'। এই হিহিড়ি নামক স্থানে পাখি দুটো শিশুদের রেখে আসলো। এই জায়গা কেউ কোনদিন দেখেনি।

এই স্থান বা'বুল দেশে। এখানে শিশু দুটো বড় হলো। শিশু থেকে তারা হলো যুবক আর যুবতী। একজনের নাম হলো পিলচু হাড়ম আর একজনের নাম হলো পিলচু বুড়ি। এই হিহিড়ি পিপিড়ি নামক স্থানে তারা শ্যাম ঘাস আর বিভিন্ন রকম ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করতে থাকলো। কিন্তু তারা পোশাক কাকে বলে তা বুঝতে শেখেনি। তারা সব সময় উলঙ্গ থাকতো। তাদের মনে কোন লজ্জা-সংকোচ ছিল না। তারা সুখে শান্তিতে দিন কাটাতে থাকলো।

পিলচু হাড়ম আর পিলচু বুড়ির দিনগুলো কিন্তু বেশ কাটছিল। একদিন তাদের জীবনে আবার নতুন করে ওলটপালট হয়ে গেল। পাহাড়ের দেবতা মারাংবরু একদিন ছদ্মবেশে পিলচু হাড়ম আর পিলচু বুড়ির কাছে গেলো। তাদের জিজ্ঞাসা করলো, 'নাতি-নাতনি তোমরা কেমন আছো? আমি তোমাদের নানা হই। তোমাদের দেখতে এলাম।' পিলচু বুড়ি আর পিলচু হাড়ম তো অবাক, তাদের যে কোন আত্মীয়স্বজন আছে তা তাদের জানাই ছিল না। যা হোক, তারা দুজনেই ছদ্মবেশী দেবতা মারাংবরুকে সাদরে গ্রহণ করলো।

মারাংবরু তাদের ঘাসের বীজ থেকে ভাত তৈরি করতে শেখালো আর বনের ভেতর থেকে একরকম গাছের শিকড় কেটে তার রস দিয়ে ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে হাঁড়িতে পাতা দিয়ে ঢেকে রাখতে বললো। পাঁচদিন পর মদ তৈরি হলো। মারাংবরু তাদের বললো, ঐ হাড়িতে পানি ঢেলে দাও। আমার নামে পূজা দাও, আর তোমরা মনের সুখে পান করো। আমি আগামীকাল আবার আসবো।' পিলচু বুড়ি তিনটা পাতা নিয়ে আসলো। একটা পাতা দিয়ে মারাংবরুর নামে পূজা করলো আর দুটো পাতা দিয়ে নিজেদের নামে পূজা দিলো, তারপর দুজনে হাঁড়িতে তৈরি মদ পান করতে শুরু করলো। দুজনের আনন্দ আর ধরে না।

www.pathagar.com

তারা নাচ-গান আর আনন্দ করতে করতে হাঁড়ির সব মদ পান করে ফেললো। তারা তখন বেহুঁশ হয়ে পড়লো এবং দুজনে জড়াজড়ি করে শুয়ে পড়লো। আগে কিন্তু তারা এরকম কোনদিন করেনি। পরের দিন সকালে বেশ বেলা হয়ে গেছে, তবু তাদের ঘুম ভাঙে না।

এমন সময় মারাংবরু আবার এসে হাজির হলো। মারাংবরু তাদের ডেকে বললো, 'নাতি-নাতনি তোমরা ঘুম থেকে ওটো। এদিকে এসো।' ঘুম ভেঙে পিলচু হাড়ম ও পিলচু বুড়ি দেখলো তারা দুজনেই উলঙ্গ। তখন তারা খুব লজ্জা পেল। তারা তখন মারাংবরুকে বললো, 'দেবতা মারাংবরু, আমরা খুবই লজ্জা পাচ্ছি, আমরা কাল রাতে কি যেন করেছি।' দেবতা মারাংবরু তাদের বললো, 'এটা কোন খারাপ কিছু না।' এরপর মারাংবরু গাছের পাতা দিয়ে তাদের লজ্জা নিবারণ করতে শেখালো।[২৬]

ওরাওঁ সম্প্রদায়ের লোকপুরাণ

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত লোকপুরাণ

কেঁচো পাতাল থেকে মাটি তুলে কচ্ছপের পিঠে ফেলে। পরে মই দিয়ে ঐ মাটি সমান করে দেয়া হয়। এক্ষেত্রে কোথাও সমতল কোথাও পাহাড়-পর্বত হয়। কচ্ছপের মুখের সামনে নাগিনী সাপ ফণা তুলে থাকে যেন কচ্ছপ নড়াচড়া করতে না পারে। কচ্ছপ নড়াচড়া করলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। তাই যখনই নড়ার চেষ্টা করে তখনই নাগিনী ফণা তোলে।[২৭]

গোত্রের উদ্ভব সম্পর্কিত পুরাণ

আদিতে ওরাওঁ সমাজে গোত্র বিভাগ ছিল না। ছিল দেওয়ান, পাহান, মাহাতো, এমনি ধরনের সমাজ-প্রধানদের পরিচিতি। এভাবেই চলছিল দীর্ঘদিন। এক সময় পাহান দেওয়ানকে বললো– এভাবে চলতে পারে না। সব সমাজের মানুষের গোত্র পরিচয় আছে আমাদেরই বা থাকবে না কেন? দেওয়ান তখন সমাজের কতিপয় মানুষকে ডেকে বললো–তোমরা আজ প্রত্যেকেই একেক দিকে যাবে। আর তোমাদের সামনে প্রথমে যে যা দেখবে তাই নিয়ে এসে পুটলিতে বেঁধে ঐ বটগাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখবে। দেওয়ানের পরামর্শ মতো কেউ গেল পূর্বে, কেউ পশ্চিমে, কেউ উত্তরে, কেউ বা গেল দক্ষিণে।

কিছুদূর যাওয়ার পর কেউ পেলো বাঘ, কেউ বানর, কেউ ইঁদুর, কেউ বন্য কুকুর, কেউ কাক, কেউ চড়ুই পাখি, কেউ কেঁচো, কেউ ঘাস, কেউ ধান, কেউ বা কিছুই না পেয়ে পরিত্যক্ত শূকরের নাড়িভুড়ি নিয়ে ফিরে এলো। এগুলো তারা পুটলিতে বেঁধে বটগাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখলো। তারপর দেওয়ান সমাজের সবাইকে ডেকে তাদের সামনে সংগ্রহ করা পুটলিগুলো খুলতে শুরু করলো। দেওয়ান পুটলির দ্রব্যাদির নামানুসারে একেক জনের গোত্র পরিচয় নির্ধারণ করে দিলো। এমনিভাবে নিজ নিজ কর্মের মধ্য দিয়ে নিজ নিজ গোত্র পরিচয় নির্ধারিত হয়ে গেল।[২৮]

www.pathagar.com

ঘ. কবিগান

লোকনাট্যের এক বিশিষ্ট ধারার নাম কবিগান। এ গান কোনো জনপ্রিয় ঘটনা, পৌরাণিক প্রসিদ্ধ কাহিনি এবং ধর্মীয় বিষয়বস্তু নিয়ে তাৎক্ষণিক সৃষ্টি হয়। বাক্যবিন্যাস, যথার্থ শব্দ প্রয়োগ, উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরাই এ গানের স্রষ্টা। চাঁপাইনবাবগঞ্জের কবিদলের চারণভূমি পলশা। এখানে বিভিন্ন সময় বহু কবিদল ও কবিয়াল বসবাস করে আসছেন। যাঁরা এ জেলায় কবিগান গেয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁরা হলেন– চাঁপাই পলশা গ্রামের আ. সালাম কেরামত ও নসিপুরের সনজয় কুমার।[২৯]

পরিবেশনা: কবিগান দুই দলের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কবিগানে তিনটি পর্ব থাকে। প্রথমত, বন্দনা বা ভূমিকা, দ্বিতীয়ত, প্রশ্নোত্তর এবং তৃতীয়ত, পরস্পরের প্রশ্নের প্রতি শ্রদ্ধা এবং একাত্ম হয় মিলন পর্ব। আসরে জয়-পরাজয়ের ব্যবস্থা থাকে। প্রতি দলে একজন করে দলপতি থাকেন। তিনি তার দলের আসর নিয়ন্ত্রণ করেন।

কয়েকজন থাকেন দোহার। গানের মাঝে মাঝে দোহারিরা ধুয়া তোলেন। আসর চলাকালে কবি নিজের গান বাঁধেন। খোলা মঞ্চ, কখনো শামিয়ানা, কখনো গাছের নিচে মঞ্চে দাঁড়িয়ে দুজন কবিয়াল গান গেয়ে একে অপরকে প্রশ্ন করেন এবং উত্তর দেন। ঢোল, কাঁসর, হারমোনিয়াম কবিগানের ব্যবহৃত প্রধান যন্ত্র। বর্তমানে এ অঞ্চলের কবিগান বিলুপ্তির পথে।

কবিগানের নমুনা

চাপান: এই দুটা পোলাপান
এদের সাথে কিসের গান।
এরা গানের কি জানে
আসরে ঠাইস্যা গল্প টানে ॥
উতোর: আমরা পোলাপানে কি জানি
জোয়ানের কাম, বুড়ার কেবল হাতানি।
বুড়া কেবল হাতানি আর কচলানি
আমরা পোলাপানে কি জানি ॥

কবিগান পরিবেশনা নিয়ে কথোপকথন

প্রধান সমন্বয়কারী: আপনার নাম বলুন।

কেরামত সরকার: আমার পুরো নাম মো. আবদুস সালাম, ডাকনাম কেরামত। সবাই কেরামত সরকার বলে ডাকে।

প্রধান সমন্বয়কারী: আপনার নিবাস কোথায়?

কেরামত সরকার: চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার পলশা গ্রামে।

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী: আপনার পড়াশুনা সম্পর্কে জানতে চাই।

কেরামত সরকার: আমি ছাত্র হিসেবে ভালো ছিলাম। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর ডিগ্রিতে ভর্তি হই। কিন্তু পারিবারিক সমস্যার কারণে বি.এ পড়া সম্পন্ন করতে পারিনি।

প্রধান সমন্বয়কারী: আপনার জন্ম সাল কত?

কেরামত সরকার: আমার জন্ম ১৯৬২ সালের ৪ ঠা মে।

প্রধান সমন্বয়কারী: আপনার মাতা-পিতার নাম বলনু।

কেরামত সরকার: আমার পিতার নাম-মো. মালেক উস্তর আর মায়ের নাম-মোসা. জুবাইদা খাতুন।

প্রধান সমন্বয়কারী: আপনার ছেলে মেয়ে কয়টি?

কেরামত সরকার: আমার ছেলে ১টি ও মেয়ে ১টি। ছেলের নাম সোহাগ আলী আর মেয়ের নাম হাসিনা।

প্রধান সমন্বয়কারী: কবিগান বলতে কি বুঝেন?

কেরামত সরকার: একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে গানের মাধ্যমে পালাক্রমে কবিদের যে লড়াই হয় তাকেই কবিগান বলে।

প্রধান সমন্বয়কারী: কবিগানের সৃষ্টি কীভাবে হয়েছে–এ সম্পর্কে আপনার ধারণা বলুন।

কেরামত সরকার: কবিগান চাঁপাইনবাবগঞ্জের তথা গৌড়ীয় অঞ্চলে অত্যন্ত প্রাচীন লোকসংগীত। এখানকার কবিদের সঙ্গে বিখ্যাত গুমানী দেওয়ানের গানের পাল্লা হয়েছিল। সেই অতীতের ধারাবাহিকতায় এখনও এখানে কবিগানের চর্চা অব্যাহত রয়েছে।

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনি কীভাবে কবিগানের সঙ্গে যুক্ত হলেন?

কেরামত সরকার: আমি মূলত আলকাপ গানের সরকার। আলকাপ পালা করতে গিয়ে যখন দুই পক্ষের বির্তক মূলক কথাবার্তা হয়, তখন দর্শক-শ্রোতারা তা খুব উপভোগ করে। এটা দেখেই আমার মনে হয় কবিগান এখানকার দর্শক-শ্রোতারা আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করবে। তাই আমার গুরুজনদের কাছ থেকে অতীতের কবিগানের কথাবার্তা শুনে আমার দল গঠন করি।

প্রধান সমন্বয়কারী: আপনার দলে কারা আছেন?

কেরামত সরকার: আমার দলে কবি হিসেবে আছে সঞ্জয় কুমার সনজিত। ঢুলি আছে রতন আর দোহারি হিসেবে আছে নৃপন চৌধুরী, নিরঞ্জন চৌধুরী ও আবুল কাসেম।

প্রধান সমন্বয়কারী: আপনি সন্তানদের কবিগান গাওয়ার কাজে আনতে আগ্রহী?

কেরামত সরকার: আমি যেহেতু গান ভালোবাসি, সেহেতু আমি আমার সন্তানদের কবিগানে যুক্ত করতে আগ্রহী। কিন্তু পারিবারিকভাবে আমার স্ত্রী এ ব্যাপারে তেমন

www.pathagar.com

আগ্রহী নন। তিনি চান না যে তারা কবিগান করুক। আমি যেহেতু উদাসী মানুষ সেহেতু গান ছাড়া আমার দিন কাটে না।

প্রধান সমন্বয়কারী: কবিগান কিভাবে পরিবেশিত হয়? বিস্তারিত বলুন।

কেরামত সরকার: কবিগানে দুজন কবিয়াল থাকেন। প্রথমে একজন কবিয়াল মঞ্চে আসেন। তিনি বন্দনা পরিবেশন করেন। বন্দনা শেষ করে তিনি দর্শক-শ্রোতাদের সামনে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন এবং কোন বিষয় নিয়ে কবির লড়াই হবে তা উপস্থাপন করেন। প্রথমে সে সরকার বা কবিয়াল মঞ্চে উঠবেন তিনি বিষয়ের পক্ষে অবস্থান নিবেন। দ্বিতীয় জন তার প্রতিপক্ষ হবেন। মনে করেন বিষয় নির্ধারিত হলো 'গ্রাম ও শহর'। প্রথম কবিয়াল গ্রামের পক্ষ নিয়ে গান পরিবেশন করবেন। তিনি গ্রামের ভালো দিকগুলো তুলে ধরার পাশাপাশি শহরের খারাপ দিকগুলো তুলে ধরে গ্রামকেই শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করবেন। তারপর প্রতিপক্ষের জন্য একটি প্রশ্ন রেখে তার পালা শেষ করবেন। এরপর দ্বিতীয় কবিয়াল মঞ্চে এসে শহরের গুণাগুণ তুলে ধরে গ্রামের চেয়ে যে শহরই শ্রেষ্ঠ তা প্রমাণের চেষ্টা করবেন। বিভিন্ন যুক্তি ও রূপকের সাহায্যে কখনো গানের মাধ্যমে, কখনো কথায় তিনি তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করে শেষে প্রতিপক্ষের প্রশ্নের জবাব দিয়ে প্রতিপক্ষের জন্য প্রশ্নবান নিক্ষেপ করে বসে পড়েন। এরপর আবারো প্রথম কবিয়াল মঞ্চে আসবেন, এভাবে একাধিকবার যুক্তি তর্ক উপস্থাপনের পর এক পর্যায়ে দুই কবিয়াল মিলনগান গেয়ে কবিগান শেষ করেন। মিলনগান গাওয়ার সময় দুই সরকার কোলাকুলি করেন আর হাত মিলান। দর্শকরা এতে খুবই আনন্দ পান। তাঁদের হাততালি আর হর্ষধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হয়ে ওঠে।

ঙ. লোককবিতা

চাঁপাইনবাবগঞ্জের এক শ্রেণির কবি আছেন যারা সম্পূর্ণ আঞ্চলিক ভাষায় লোকজ কবিতা রচনা করে থাকেন। কবিতাগুলো অতিদীর্ঘ নয়। এই কবিতা রচিত হয় স্থানীয় সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহ মানুষের জীবন জীবিকা, আবহাওয়া এবং আর্থ সামাজিক বিষয় নিয়ে। কবিতাগুলো রচনা করে কবিরা স্বকণ্ঠে পাঠ করে থাকেন স্থানীয় অনুষ্ঠানে, যেমন–বৈশাখি মেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিবাহ, জন্মদিন ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠানে। এধারার কবিতা বেশ গ্রামে-গঞ্জে জনপ্রিয়। কবি আমানুল হক, মো. রেজাউল্লাহ, মহবুব ইলিয়াস, কেরামত সরকার, মাহবুবুল আলম, মো. শাহজামাল, ফাইজুর রহমান মানি প্রমুখ আঞ্চলিক ভাষায় কবিতা রচনা করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।[৩০]

১

লদ্দির কিন্নারে সাঁন্ধে জ্যাইলা ছিঁড়া জাল বান্ধে
শিমুলের ফুল ঝৈর‍্যা পড়ে।
লা খানটা চলে পালে মাঝি বৈস্যা পিছের হালে
হোট্টিটি ডাকে বালুর চরে।
ডাহুক ডাকে ঝোপের আড়ে কাইয়্যার দল বাঁশঝাড়ে

www.pathagar.com

কোকিলের ডাক টুঘুঘি ডালে
ঢের মাছে বোগলা কানা লদ্দি ভরা কৈচ্যাপানা
দুলছে হাওয়ায় ঢেউয়ের তালে।
কাক্ জোন্হাকে ঝিঁ ঝিঁ পোঁকা ডালে আম থোকা থোকা
ভূত-প্যারতের ভয়ডর জানে।
মাচানে সুত্যা বাঁইড়্যাল ব্যাটা সঁতে গাঁয়ের বুধা ঠ্যাঁটা
লক্ কৈর‍্যা কহিছে কথা কানে।
বাড়ির ঘুরে গরুর পাল কিরস্যান যখন ছাড়ে হাল
ধুলাতে আন্ধার গাঁয়ের ডহর
খুল্লায় মুরগা দিছে বাঁক গুজর ঘাটে রাহীর হাঁক
দ্যাশেতে পৈড়্যাছে দ্যাখো কহর।
ফুলে ফলে খরা গাছ জালে উঠে ভ্যাদা মাছ
কাজিয়্যা লাইগ্যাছে যখন গ্যাঁয়ে
যও মাইড়্যা দরগার মাঠে বাংগি বেচতে যায় হাটে
নিতায়ের বাপ বলদেব চাঁয়ে।
কিরস্যান ফলায় কাঁকড়ি ডাঁঠা পাইঠ বান্ধে আঢ়ি ঝাঁটা
পানি কৈর‍্যা গতরের লহু
গাঁয়ে ঠকির লাইগলো বিহ্যা সারারাইত গীদ গ্যাহ্যা
ডবহ্যানে সুত্যাছে কানার বহু।
মগরবের আজান পড়ে চ্যারাগ কুপি জ্বালায় ঘরে
ঢেঁকিতে পাহাড় বন্দ কৈর‍্যা
বহু-বেটি সাঁটে ধান মুখে গুঁজ্যা খিলি পান
কাঁখেতে কলসি আনে ভৈর‍্যা।
মক্তব ঘরে পঁহাত ভোরে কায়দা পঢ়ে জোরে জোরে
টগরী, টেপি আর দুখা
জহক মূলবি কমচী হাতে চোখ বুলায় সিফারাতে
পঢ়া পানি লিতে আইলো শুখা
ব্যাল তলায় গুঁকা টানে টুকার বহু মরা জানে
কাশ্তে কাশ্তে করে বমি
বছর বছর ছাইল্যা লিতে পাঁচ বেটির বিহ্যা দিতে
বেচ্যাখ্যালে টুকা সব জমি।
কাঙালের নাইখো কাম খাইদ পানির আক্রা দাম
দুপ্পহরে জুটে মুখে দানা
পিন্ধনেতে ছিঁড়া ঠেঁটি ঘরে বৈস্যা আঁড়ি বেটি
দু-চোখ আন্ধারে যেনে কানা।
ভরা ভাদরের লদ্দি কুলে বৈস্যা দ্যাখো যুদি

www.pathagar.com

কে কহিবে চৈতে ছিল চর।
জীবন লদ্দির কান্ধায় সুখ দুখ লিজ ধান্দায়
গঢ়িছে ভাংছে কত ঘর।
মহানন্দা লদ্দির বাঁকে কত যে গাঁ লুকিয়্যা থাকে
দুখের কাহানি লিয়্যা বুকে
যুগযুগ তেমনি কৈর‍্যা কাঁন্দে লদ্দি চোখ ভৈর‍্যা
কহিতে পারে না কতা মুখে॥

২

আশ্বিনের ম্যাঘে যখন লাইগলো ডাওর
চাইর দিন বাংড়িয়্যা গেলেও হয়নি ঠাওর।

দা খান্‌টা হাতে যেমনি চল্‌লো কালু কামে
খিচ্চা বেটির কান্দন শুইন্যা ঘাঁটায় থামে।

ক্ষেদ বুকে কালু ফের সোঝা দ্যায় হাঁটা
ভোকের জ্বালায় মানে না কুনু ডহরের কাঁটা।

গামছায় মানে না যেনে আসমানের পানি
গরু খানটা পায়নি খ্যাতে ক'দিন থেক্যা সানি।

মহাডাঙ্গা গাঁয়ে য্যায়্যা মোড়লঘের বাড়িতে
কামের শ্যাষে আইন্‌বে খাইদ ব্যাঁদের আঢ়িতে।

শুখ্‌খা মুখে কালু ভাবে কাম যুদি না জুটে
আঁহেড়্যা বালোসেরঘে আন্যা কি দিবে আইজ মুখে।

খিঁচ্চা খানটা মায়ের দুধে পার করছে দিন
শুখ্‌খা চাইলে পার করে আর বেটি তিন।

ভাব্‌তে ভাব্‌তে দা'ও হাতে একলা চলে কালু
এত পানির মইধ্যের অর শুখিয়্যা যায়খো তালু।

পঁহাতে গিথাইন গেছে কামে পিন্ধা মিঞারঘে বাড়ি
আইগ্‌ল্যা বছর কিনা একখানে ছিঁড়া কাঁপা শাড়ি।

খাইদ পানি আর ঠেঁটির পায়স্যা জুট্‌বে কুঠে থেক্যা
কি কহিবে গায়ের মাইন্‌ষে উদাম গতর দেখ্যা।

আজক্যাও যুদি অরঘে প্যাটে না পারি দিতে দানা
কাঁন্‌তে কাঁন্‌তে ব্যাটারা হাঁর হয়্যা য্যাবে কানা।

ফুটা চালের পান্‌তে হাঁরা ভিজছি ক'দিন থেক্যা
খিচ্চা খান্‌টার গা গরম আনু আজক্যা দেখ্যা।

www.pathagar.com

ভাবতে ভাবতে কালু যখন পৌঁহছে মোড়লঘের বাড়ি
সামনের গোলতে দ্যাখে একখানা লতুন বলদের চাঁড়ি।

মোড়লঘের বাড়িতে নাইখো দু'দিন থেক্যা কেহু
বাভুনডাঙায় গেছে সভাই দেখতে ব্যাটার বহু।

কাম না প্যায়্যা কালু চোখে দ্যাখে তারা
ভাইব্ছে আইজ জীবন বুঝি এখানেই হোবে সারা।

কালুর নজর হঠাৎ পড়ে বল্ক্ষে চাঁড়ির দিকে
শ্যামা বরণ মুখখানটা হয়্যা যায়গো ফিকে।

চাঁড়িতে রাখা পঁচা পানতা গরুরই খাবার
ফূর্তি গামছায় বাইন্ধা কালু করিলো সাবাড়।

পাঁকই ভরা গাঁয়ে কালু সোঝা দ্যায় হাঁটা
ঘাড়ের গামছার পানতার পানি ভিজিয়্যা দ্যাখো ঘাঁটা।

পানতার গন্ধে ভুখা কালুর জিহ্বায় আসে লাল
শুখ্খা মুখে চাভলীর সঁতে ভিঁড়্যা গেছে গাল।

বুধার দোকান থেক্যা একটু চ্যাহ্যা লিবে নুন
উপাস প্যাটে খাবে সভাই এ্যাতেই দিবে গুণ।

দু'দিন পরে ব্যাটারা হাঁর ভাত খ্যাতে পাবে
ফূর্তি চল্তে চল্তে কালু পিছলা রাস্তায় ভাবে।

শুখনি হলো কালুর বহু মোড়লঘের বাড়িতে
উঠ্ঠা কামের পরে প্যালো আঁইঠো কিছু পাতে।

ভুখা প্যাটে আঁইঠো ভাত সারার ভিতর
গামছায় বাইন্ধ্যা ধরে শুখনি বাড়ির ডহর।

মানপাতা মাথায় মানেনাখো পানি
বাছারা হাঁর ভুখা প্যাটে কি করছে না জানি।

ফুটা চালের উদাম ঘরে পৌঁহছে কালুর গতর
দ্যাখে শুখ্নির গামছায় ঢাকা খিচ্চা খানটার ছতর।

নিথর শুখ্নির বোবা চোখে ডাওরের পানি ঝরে
কালুর খিঁচ্চা সখের বেটি ফিরবে না আর ঘরে।

৩

পঁহাতে উঠ্যাছি মা কহলি ধুতে গা
গদ্দির নামোতে য্যায়্যা ঘাটে
আঁইঠ্যাল মাটি দিয়্যা কচলিয়্যা গতর ধুয়্যা
গরু লিয়্যা সোঝা গেনু মাঠে।

www.pathagar.com

চিক্যাশ ডুব্যাচ্ছে কখন মাথায় নাই হুঁশ তখন
ভোকে প্যাট চোঁ-চোঁ কৈর‍্যা জ্বলে
কান্টায় গরু ঘের‍্যা লিয়্যা ঘুর‍্যা আনু তখন য্যায়্যা
দেখি তোকে গলি খানটার কোলে।

বাপধন ব্যাটা হাঁর গতরেতে লিয়্যা জ্বর
লাহারী ছাড়া সোঝা গেলি মাঠে
জানখান হাঁর আনচান্ করে কখন তুই ফিরবি ঘরে
ভাটিবেলা য্যাতে হৈতো হাটে।

পুধন পাটিতে বৈস্যা পানতার আমানি চুষ্যা
মার দিকে মুখতুইলা রহে
দিনখানটা উপাস পাইড়্যা হাঁড়ি খানটা আজোড় কৈর‍্যা
খাওয়ালি হাঁকে মন হাঁর কহে।

আঁচলে ঢাঁকতে মুখ উদাম হয় মায়ের বুক
শ্যায় হয় পান্তার আমানি
মা-পুতের চোখের পানি অভাবের হাতছানি
ক'ঝরা হামরা তা জানি।

পুধনের চোখে আশা মা'র মুখের বোবা ভাষা
কে দিবে দু'বেলা দু'টা দানা
বাপ মৈর‍্যা মা বুড়া জন্ম্যাই কপাল পুড়া
ভাইব্যা কষ্ট মনে সহে না।

মা কহে শুন ব্যাটা সারাদিনের আঁঠো ক'টা
দিয়্যাছে মোড়লের বহু
জিয়েতে চাহে না হাঁর ভাত আর আঁঠো মাড়
হোক তোর গতরের লহু।

জাঙ্গোর চলে না হাঁর তাও মনে করছি জোর
ইস্কুলে পড়িতে হোবে তোকে
কুটির কাম কৈর‍্যা যুদি পাই কুনু চাইল খুদী
শিক্ষইত হবি দেখবে গাঁয়ের লোকে।

তোর বাপের ছিল ইচ্ছা বেটা হামার লেখবে কিচ্ছা
করিয়াল হোবে হয়্যা মরদ
মরা মানুষের সখ পূরণ করবো নাইখো ধক
ভাইবা বাইড়ছে বুকের দরদ।

যখন বাপ তোর ছিল বাঁইচ্যা বোরার ভুঁয়ের পানি ছেঁইচ্যা
আইনতো ধান আর টাকাকড়ি

www.pathagar.com

তোর যখন যেটা লাগে কিনতো বাপ তোর সেটা আগে
বেচ্যা হাটে কুমড়ার বড়ি।
হাঁকে একখান দিতে শাড়ি কইরতো কত জোরাজুরি
শংখ্যায় কহিনি কুনু কথা
আইজ পিন্‌ধি ছিঁড়া শাড়ি হাতে নাইখো টাকাকড়ি
ত্যাল শুখ্‌খা দেখি তোর মাথা।

ভ্যাস কৈর‍্যা কাপড় পিন্‌ধ্যা বাপের বাড়তে য্যায়্যা
উঠ্‌তুন যেদিন সাঁঝের বেলায়
গাঁয়ের কতক লিচ্ছড়েরা কহিতক ক্যামুন ঢং কৈর‍্যা
গিদ্যারী কাইল আসিস মেলায়।

সুখ হাঁরঘে ছিল ব্যাটা মনে নাই তোর ছিঁটাফোটা
তুই ছিলি তখন খুব ছুটু
গরুই ভরা ছিল কান্টা বাপে ভৈর‍্যা রাইখ্‌তো মনটা
কুনুদিন কহেনি কথা কটু।

নুরফত বেওয়ার কোলে পুধন নিন্ধে পড়ে ঢলে
রাইত তখন হয়্যাছে ভারী
চাপা বুকে নুরফর বেওয়া ভাবেতে অজানা হাওয়া
চাঁইপ্যা ধরে বুকে আলগা শাড়ি।

৪

বরিন্দের জমি জামতলায় আয়ুর আয়ধড় য্যাবে
কালাইয়ের আঁটা বান্ধে গামছায় বরিন্দ য্যায়্যা খ্যাবে ॥

ফজর অক্তে গড়ি জুড়্যা কাঠায় লিয়্যাছে ছাতু
পুয়ালের উপর গাদলা প্যাড়্যা শুয়্যাছে ব্যাটা পাতু ॥

চইলছে গাড়ি, টাইনছে বলদ, ফ্যাঁপড়া মুখে ঝরে
ধুরী চাকায় কঁচ্‌কঁ করে রাইতের লিহর পড়ে ॥

পাঘা ধৈর‍্যা সাঁটা হাতে বস্তার উপড় বৈস্যা
আয়ধর নবির নিঁদ নাই চোখে দ্যাখে অংক কৈস্যা ॥

আসমানের পানি নাইাখো আইগল্যা বছর থেক্যা
পানি ব্যাগের চাঁড়া মাটির ফসল গেছে পাক্যা ॥

ধানের শিষে নাইখো দানা শুখখা চিট্যা খালি
ভাইব্যা আইধর নবির চোখের তলায় পড়ে কালি ॥

ডাইং জমির বিঘ্যা ফুরান চাইব মন জোতদার প্যাবে
সবই দিলে বহু বেটি বছর ধৈর‍্যা কি খাবে?

খাটনি খালি বেকার গ্যালো কহর পড়্যাছে দ্যাশে
খরার গনে এব্যার হাঁরা মুরবো নাকি শ্যাষে?

মিঞার পাঁ খান ধরবো চ্যাপ্যা কোহবো রহম করেন
এবাকার মতন যা ফৈল্যাছে সেটুকু আইজ ধরেন ॥

নিঁদের ঘোরে বেটা বাপুজী কহ্যা ডাকে
চমক্যা উঠ্যা আয়ুর নবির ঘোরটা তখন কাটে ॥

আউড়ের আঁটি পালা করা খৈল্যানে নাখো ধান
দেখ্যা আয়ুর নবির য্যানে বারিহ্যা য্যাবে জান্ ॥

ফি-বছর পাড়নের ধান দেখ্যা ভরতো বুক
দেখা আয়ুর নবির ফুর্তি ল্যাইগতো উজ্জল থাইকতো মুখ ॥

বুঢ়া আয়ধড় আধেক গাড়ির বস্তার ধান লিয়্যা
ঝুজ্‌কি ভোরে পৌহছে যখন জোতদার বাড়ি গিয়্যা ॥

হাত পা ধৈর্যা কাইন্দ্যা কাইট্যা জোতদারকে সে কহে
ফুরান পুরিয়্যা দেওয়া এবার একটুও সম্ভব লহে ॥

জোতদার কহে ঠিক আছে টুক্যা রাখনু লেখ্যা
সামনের বছর পুড়িয়্যা দিও জমি আসব দেখ্যা ॥

বছর ঘুইরতে বিয়্যাদি আর খরা হৈলো ভারী
আয়ধর নবির ঘুর্যা যাওয়া হয়নি জোতদার বাড়ি ॥

৫

আসমানে ঘোলা ম্যাঘ পুবে উঠ্যাছে দ্যাখ
ঝড় পানি এই বুঝি আইলো
আইলো বৈশাখ মাসখানটা ধুক্ ধুক্ করে খালি জানটা
ঘরের চালটা কখন উড়্যা গ্যালো।

চাঁন্দি ফাটা রৈদ পড়ে দুপ্পহরে যখন ঘরে
গাজলের কুনুই উদিস নাই
খিড়ক্যা দিয়্যা ভাঠিব্যালা ধুলা ঝড়ে পানির ঠ্যালা
অবলা আর মাইন্‌ষের জানটা খায়।

চৈত-বৈশাখ মাস এমনি এই শুখ্‌খা এই পানি
ঠাণ্ডা-গরম মিল্ল্যা দোস্তি করে
শুখ্‌খা পাতা ভরা মাঠ ডালে ডালে কাইয়্যার ঠাঁট
ন্যাংটা গাছ রস নাইখো জড়ে।

ফাটা মাঠে শুখা দুবড়া হালখাতা বিহ্যার থুবড়া
ত্যাল ঘাম এক সঁতে বহে

www.pathagar.com

শীল পড়া পানি ঝড়ে টিন গাছ উপড়্যা পড়ে
গরিব-গোরবা কতই দুঃখ সহে।

ডালাই দৈ বাঁহুক ঘাড়ে খাজাআলা হাঁক ছাড়ে
গাঁয়ের ডহর-কানটায় দুপ্পহরে
হাকাবাকা লাড়ু শনপাঁপড়ি কটকটি বরফ কুলচাঁপড়ী
ছাইল্যা বহু কিনে চাইলের দরে।

ফুরকির মা গুজর ঘাটে পাইকড় তলায় একলা হাঁটে
লা খানটা ওপ্পারেতে বাঁধা
ঘাটে নাইখো ঢেলুয়া মাঝি খাল ঘাটের কালু হাজি
ধুইছে ঘাটে খাঁজাড়ী ভেড়ের কাদা।

মসলা ঘুঁটনি চোঙা লিয়া মায়ের চোখ ফাঁকি দিয়্যা
আম বাগানে জড়ো দলে দলে
চোঙার মৈধে আম কুঁচলা সঁতে নুন ত্যাল মসলা
ঝিনাই ঘৈস্যা চাকুর কাম চলে।

নানা-লাতি বৈশাখ মাসে বৈশাখি মেলা দেখতে আসে
ছাতু আর পিঁয়্যাজের গাঁঠ্ঠা লিয়্যা
চিক্যাশ ভোরে পানতা খ্যায়্যা গাড়ি জুড়্যা হাল ব্যাহ্যা
গঞ্জে পৌহ্ছ মাথল মাথায় দিয়্যা।

ম্যাঘ দেখ্যা ডালি লিয়্যা ছিচ্ছিড়িয়্যা দৌড় দিয়্যা
একদমে আম বাগানে ফুরকি
ব্যাইড়াল ব্যাটার মুখ কাইল্যা বাগান ভরা কত ছাইল্যা
কুঢ়ায় আম যেনে মুড়ি মুড়কি।

ঝড় পানির আন্ধারেতে বিজলি পৈড়্যা যেদিন রাইতে
ফুরকি লিলে বিদায় গাঁ থেক্যা
আম-কুঢ়ার যত স্বাদ ক'টা বছর গ্যালো বাদ
চামাগাঁয়ে যাইয়্যা আইসো দেখ্যা।

৬

ভুট্টু মোলবির আদি নিবাস বারঘৈর্যা গাঁয়ে
বরিন্দ দিয়্যাড় ঘুর্যা ব্যাড়ায় দিনমান খালি পাঁয়ে

মক্তব পৈঢ়্যা পীর হয়্যাছে বছর দশেক আগে
ব-কলম সব মুরিদ যোগায় যখন যা তার লাগে।

কম্বল আর জাম্বিল ঘাড়ে কুঁজা হয়্যা হাঁটে
ছাইলার দলসব পাছে লাগে বারঘৈর্যার ঘাটে।

www.pathagar.com

পানের পুটলি ভরা মুখে মাড়ি খানটা লাল
তরমুজ বিচির বরণ দাঁত দাড়ি ভরা গাল।

খানদান আর বংশের গৌরবে সদা মুখে মুখে
ব্যাটা-বেটি পরিবারকে থাকতে দ্যায় না সুখে।

মুরিদ করতে গেলে বরিন্দ বিশ দিন নাইখো খবর
বগলে থাকে ফেকার কেতাব সুর লেহান তার জবর।

বহু-বেটি কেমন থাকে কখনও পড়ে না মনে
মোসাল্লাম দিয়্যা খিচঁড়ি খায়, দেখিয়্যা তস্‌বী গুনে।

মোলবী ভুটু বাড়ি ঘুরে কামে পড়লে ভাটা
মাইগ তখন ত্যাড়্যা যায় হাতে লিয়্যা ঝাঁটা।

মুখে কহে মিন্‌সা তুই এতদিন কুণ্ঠে ছিলি?
খিল্‌খি কৈর‍্যা ভুটু হাঁসে মুখে পানের খিলি।

বহু বেটির শুখা মুখ কাপড়ে পড়ে তালি
স্বামী থাইকতে ভুটুর বহু মাজে পরের থালি।

আয়্‌কান গায়ে সুরমা চোখে খায় সবার আগে
গিন্নির ভাব বেহাল দেখলে সময় থাকতে ভাগে।

সংসারটাকে অভাবে ফেল্যা মুরিদ ঢুঁড়ার কাজে।
বহুর গাইলে বরিন্দ হাঁট্‌তে গুল দিয়্যা দাঁত মাজে

দোওয়া কালাম ফেকার কেতাব করিতে বয়ান
রাস্তা-ঘাট-নদী নৌকায় যখন যাকে পান।

জান্নাত গেলে ভুনা গোসতো খ্যাবে ভুটু ভাবে
বিহ্যার জাফত প্যালে ভুটু আগেভাগে য্যাবে।

দুনিয়ায় ভোগের হিকমত লিয়্যা চিন্তা করে যারা
ভুটু ভাবে জাহান্নামের বাসিন্দা হোবে তারা।

ভোগে-রোগে, রোগে-শোক, শোকেতে বিনাস
স্বর্গ ভোগের আশায় ভুটু হয়নি নিরাশ।

সংসার ধর্ম পার্থিব কর্ম পূর্ণ কর্ম বটে
এমনটির বয়্যানে ভুটু অগ্নিসম চটে।

জান্নাত হলো হাতের মুঠে ইস্‌মে আজম জানা
পায়স্যা ফেল্লেই দেখবে হুর হলেও মুরিদ কানা।

ভুটু মোলবীর কেরামত দেখতে আসে দুরের লোক
কেরামত দিয়্যা পারে না খালি ভৈর্‌তে প্যাটের ভোক।

www.pathagar.com

৭
বাখারী মোড়লের জোড়া বেটি জন্ম্যাছিল পিঠাপিঠি
ধুমধাম কৈর‍্যা এ্যাখখি দিনে বিহ্যা
গরিব-গোরবা ছিল গাঁয়ে লড়েনিখো ডাহিন বাঁয়ে
সাঁইট্যা খ্যালে গুষ্টিসুদ্ধা লিয়্যা।
টাক্‌লড়া বলদের ছ্যাঁচড়া খ্যায়্যা বুধার খোশ-পাঁচড়া
রাইত-বিরাইতে গ্যালো খুবই বাইঢ়্যা
কালাইয়ের ডাইল পুট্‌ঠার গুদ্‌দা টান্যাছিল লল্লি সুদ্ধা
ডোলে সরুয়া খায়্যাছিল কাঢ়্যা
জান বুঝি যায় রাইতে মাইগের গাইল খ্যাতে খ্যাতে
ধ্যাড়ানির ঠ্যালায় গোলতে বৈস্যা রহে
প্যাট ফুইল্যা ঢোল হৈলে বিহ্যাবাড়ির গন্ডগোলে
নাপাক গতরে জোরে কলমা পঢ়ে
কষির মাইগ, আরব,নূরফত বিহ্যার কামে পায়নি ফুরসত
টুটি তক্ ওঝড়ী ঠুসে রাইতে
ছিল যাদের জনম কষা ঝুযকি ভোরে একই দশা
জানটা বুঝি গ্যালো জাফত খ্যাতে।
হেকিম কালু টিপে নাড়ি পৌঁহছে যখন গহিলবাড়ি
গাজেবান আর রাব্বে চুষ লিয়্যা
ধ্যাড়ানি-উব্বান গেছে থ্যাম্যা ছ্যাঁচড়া-ডাইল গছে ন্যাম্যা
গঁয়ঢ়ার মৈধে কলার পাতার দিয়্যা।

৮
ঠক্‌ঠক কৈর‍্যা ঠারে কাঁপে কাঙালের গতর
নাইখো পাইস্যা কি দিয়্যা ঢাঁইক্‌বে ছতর
এত জাড়ে একখানা জামা
হাত পাঁ সেঁক্যা যায় না থামা
দুখ দেখ্যা কুনু মাইন্‌ষের হয় না দরদ
বাপ বাঁইচ্যা থ্যাকলে স্যাক্‌না পিন্ধতে গরদ।
পৌষ-মাঘে দিনে রাইতে ঠাণ্ডা হাওয়া বহে।
চাদ্দর দিয়্যাও কন্‌কন্যা বাতাস গতরে না সহে
লেহেলী খানটা ছিঁড়া ফাটা
ঘরের ঠাটি উত্তরে কাটা
হল্‌হুলিয়্যা ঢুইকছে ঘরে উত্তরের বাতাস
জাড়ের রাইতে কম্বল ব্যাগর সখিনা হতাশ।
ভুখ-দুকের জ্বালা বুকে শীতেরই কাঁপন

www.pathagar.com

ভাঙা ঘওে ঠাটির গায়ে আলগা বাঁধন
ফুটা চালে উদাম ঘরে
ফোঁটা ফোঁটা লিহর পড়ে
জাড় বুঝি লিবে কাঢ়্যা কাঙালের জীবন
খোদা ক্যানে পায়না শুইন্‌তে অরঘে কাঁন্দন।

ধনী-গরিব, উঁচা-নিচা এ্যাত ক্যানে দ্যাশে
সাহেবেরঘে এ্যাত পাস্যা কুণ্ঠে থেক্যা আসে
সারা জীবন হাঁরা কাঙাল
বাংলাদেশের কত বাঙাল
ভুখা প্যাটে খালি গায়ে ছিন্নি ভিন্নি ঘরে
ধড়ে জীবন থাক্‌তে কাঙাল ধিকি ধিকি মরে।

৯

ছিরামপুরের বাবলা তলায় নজর পাইঠের বাড়ি
পাইঠের পাইস্যার আধেক দিয়া রোজ খায় তালের তাড়ি।

বড় বহুর দু'খান বেটি ব্যাটা খানটা কোলে
ছোট বহু পুয়াতি ছিল নাম হলো তার গোলে।

হাতে ঝ্যাটা কোরে ব্যাটা বড় বহু ফুলি
গাইলের চোটে ছোট বহুর রোজ খায় মাথার খুলি।

ছোট বহুর ছিঁড়া ঠেঁঠি গতরে নাইখো লহু
পুয়াতিকালে ভালমন্দ দেওয়ার নাইখো কেহু।

আধেক উদাম গতর লিয়া ফুলি ঝাঁইস ঝাড়ে
ছোট খানটা লঘি লিয়া গাছের আমড়া পাড়ে।

নজর ব্যাটা একখান ঠ্যাঁটা তাড়ির গোঁধানী সাটে
টলতে ঠলতে গামছা ঘাড়ে সোঝা যায়গো হাটে।

চাইল-ত্যাল নুনের পায়স্যা গুণতে পকেট খালি
ঘুরিয়্যা লুঙ্গি পিন্‌ধে নজর সামনে কৈর‍্যা তালি।

নেশার ঘোর গেছে উড়্যা গাঁইটের পায়স্যার সঁতে
লুগনির মৈধে বাজার লিয়্যা পোঁহছে বাড়ি রাইতে।

কাক-জোনহাকের নিঝুম রাইতে একলা উঠ্যা গোলে
ফ্যাঁপড়া মুখের নজরের মাথা তুল্যা লইলো কোলে।

মুখের ফ্যানা মুছ্যা গোলে বেহুঁশ পতিকে কহে
এমনি কৈরা জীবন চইল্‌লে ইজ্জত মান কি রহে?

ম্যালা দিনের পরে নজর প্যায়্যাছে আদর ভারী

www.pathagar.com

ক্কিরা খ্যালে প্যাটের ব্যাটার খ্যাবে না তালের তাড়ি।

পঁহাত ভোরে নজর ফের শিমুলতলা গাঁয়ে
কাম ঢুড়তে উঠলো য্যায়্যা বালিয়াডাংগার লা'য়ে।

পালশা গাঁয়ে কাম সাইর‍্যা পাইস্যা ক'টা লিয়্যা
ফের খ্যায়্যাছে এক ভাঁড় তাড়ি আধেক পাইস্যা দিয়া।

দু'দিন পরে ছোট বহু পঁহাতে ছট্‌পটি করে
লহু নাইখো ফিক্যা গতর অসাড় পৈড়্যা রহে।

দাই লিয়্যা নজর যখন পৌহছে নিজের ঘরে
নিথর গোলে শুয়্যা আছে জান নাইখো ধড়ে।

গোর কাফন কইরলো গুটিক দশে গাঁয়ের লোকে
নজরের নজর ঝাপসা হয় ছোট বহুর শোকে।

প্যাটের ছাইল্যার ক্কির‍্যা কাইট্যা ফের খ্যায়াছিনু তাড়ি
আল্লা হাঁর মরণ দাও আর ফিরবো না বাড়ি।

ছাইল্যা বহুর গোর ছুঁইয়্যা কসম করে নজর
জীবনে আর ছুঁবে না তাড়ি তখন সময় ফজর।

খোদার কাছে হাত তুল্যা ধরে নজর মেল্যা
বেহেশত য্যানে পায় হাঁর বহু আর ছাইল্যা।

১০

রাজধানী গৌড় ছিল প্রাচীন শহর
নবাবগঞ্জের আদি নাম চম্পকনগর।

চম্পা বাঈয়ের চাঁপাই পাশেই বিদ্যমান
চাঁপাইনবাবগঞ্জ আজও বাংলার সম্মান।

নসিপুরের দৈ রহনপুরের খৈ
আজাইপুরের পিতল-কাঁসা
ভোলাহাটের রেশম কল্যাণপুরের পশম
শিবগঞ্জের চমচম খাসা।

দিয়্যাড়ের পাট বারঘরিয়ার ঘাট
বাগডাঙ্গার কালাইয়ের রুটি
সোনাইচণ্ডির হাটে বিলভাতিয়ার মাঠে
মহানন্দার ডিম ভরা পুঁটি।

আদিনা কলেজ ছড়ালো নলেজ
বিদ্যাবুদ্ধি ভরা বিজ্ঞজন
লাহারপুরের তাঁতী গম্ভীরার লাতি

www.pathagar.com

নবাবগঞ্জের মাটিতে সৃজন।

ইলা মিত্রের দেশ নাম যশ বেশ
ইতিহাস অতীব প্রাচীন
পাল-সেন বংশ ইতিহাসের অংশ
জানেনাকো আজকের নবীন।

মিষ্টি মণ্ডার শহর গরুগাড়ির বহর
গঞ্জটাই আমের বাগান
কদমতলার ঘাটে বটতলার হাটে
টমটম আর আলকাপের গান।

পদ্মচাকার পাতা সুজনী নকশি-কাঁথা
বাবু ডাইং অপরূপ টিলা
সাঁতালপাড়ার শালুক জমিদারের তালুক
নবাবগঞ্জের অতীত লীলা।

সোনামসজিদ চেনা পাশেই তহাখানা
বীরশ্রেষ্ঠ শহিদের মাজার
বালিয়াদিঘি আছে নেয়ামতুল্লার কাছে
বসেছে এলসি'র বাজার।

ইদ্রিশ, করিম, কুতুবুল ক্ষণজন্মার নেইকো তুল
মনির, এমাজ, আলতাফ হোসেন
দেশবাসী শুনেন অনুরোধটা রাখেন
ইতিহাসে নামটা টুকেন।

কবি-ওলি কত ভাই মহানন্দার কিনারায়
কালে-যুগে হয়েছেন বড়
বিদ্যাগুণ যত যাঁর বাংলাদেশের অন্যপার
ছড়িয়ে তা পড়ুক আরও।

মহানন্দা পাগলার বাঁকে জ্ঞানী গুণী ছড়িয়ে থাকে
বিধ্যার ভাণ্ডার ভরা বুকে
যুগযুগ বহে নদী ভাঙ্গাগড়া নিরবধি
জীবনটা কাটে সুখে-দুখে।

অস্তাচলের সূর্য পুনঃ উদয় হবে কি আজি
মহানন্দা গরবী সুর উঠক আজিকে বাজি।

১১

কালু মামু হেকিম ছিল
হাঁটতো রোজ পনরো কিলো।

www.pathagar.com

অসুখ বিসুখ হলেই কারো
কালু মামু তখন খাড়ো।

চার ধরনের অষুধ বড়ি
সব রোগেতেই ধনন্তরী।

পেট ভুটভাট শ্বাস-কাশ
রাব্বে চুষ চ্যাবনপ্রাশ।

গাঁজেবান বাদিয়ান সুধা
সেবনে যায় মৃত্যু-ক্ষুধা।

আপাদমস্তক সর্ব রোগে
যদি কোন মারিজ ভোগে

কালু মামু খবর পেলে
হাজির হয় সাচ্চা দেলে।

লম্বা ঝোলায় বোতল ভরা
সব ওষুধই নিজের গড়া।

লক্ষ্ণৌ ফিরিঙ্গি মহল হতে
আদিম যুগের হেকিম মতে।

ভক্তেরা সব ওষুধ পাঠায়
তাই তো মামু সুখে কাটায়।

মামুর মুখের খোট্টা বুলি
শুনতো সবাই হৃদয় খুলি।

ভান করা সে কান্না মুখে
চোখে পানি নেইতো দুঃখে।

মুখের কথা মিষ্টি ভারি
আসতো সদায় বুবুর বাড়ি।

আসলে সবাই জটকা করে
মামুকে সব ধরে ঘিরে।

অতীত দিনের গপ্‌পো কতো
সত্য-মিথ্যে মিশিয়ে যতো।

করতো জাহির নিখুঁত করে
শুনতো সবাই ধৈর্য ধরে।

বুলানীর মা'র মাজার ব্যথা
রবি পেয়াদার ব্যায়ামোর কথা।

শুনতো মামু গভীর মনে

www.pathagar.com

বড়ি দিতো একটা দিনে।

খেলেই যদি রোগটা সারে
মামুর ওষুধ সবই পারে।

অসুখ সারতে দেরি হলে
মামু ওষুধ পাল্টে ফেলে।

রোগের ধারা কঠিন যখন
পাত্তা মামুর নাইখো তখন।

মুচ্‌কি হাসি সদাসুখী
ফুচ্‌কি দাড়ি নিম্নমুখী।

আরবি, ফারসি, উর্দু ভাষা
রপ্ত করে এসব খাসা।

তবেই হবে হেকিমগিরি
মজুদ নওভেল্‌মে কস্তুরী ।

ওষুদের দাম যে যাই দিতো
হাসি মুখে সেটাই নিতো।

বলতো মুঘল-পাঠান যারা
তার ওষুধেই পাগলপারা।

ভাগ্নে সাদী কালু মামুর
পেলে খেতো হামুর কামুর।

বোতলটুকু এক নিঃশ্বাসে
সাবাড় করে সদ্‌-বিশ্বাসে।

দেখে মামু করে তাড়া
বলে ব্যাটা যাবে মারা।

বোতলে রং চিনির শিরা
দারুচিনি-লং আর জিরা।

মামুর জীবন দুঃখে ভরা
দুঃখ তার যায় না ধরা।

কমলা হলো মামুর ছেলে
মা-মরা তাই মাওড়া বলে।

মামু যায়নি দ্বিতীয় দারে
ক'জন এ ত্যাগ করতে পারে।

চোখে মুখে সদা হাসি
টাটকা কথা নয়কো বাসি।

www.pathagar.com

শেষ বয়সে সন্ধ্যা হলে
দেখা হলো অন্তিম কালে।

দেখি মামুর চোখে পানি
মনে ব্যথা কি না জানি।

শীতের রাতে পান্তা থালে
কাঁপা মুখে আস্তে বলে।

ছেলে-বউয়ের সুখে কাটায়
কখনও না এদিক তাকায়।

দোষটা আমার বৃদ্ধ আমি
অর্থ-সম্পদ নেইকো জানি।

জীবন ভরে আমি যা কিছু করেছিনু উপার্জন
মা মরা সন্তান তরে দিয়েছিনু বিসর্জন।

তাহার লাগি এই ছিলো মোর জীবনের পথচলা
বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে মামুর হলো না বাকিটা বলা।

গেছে বহুদিন কাজের গভীরে অফিসে পেলাম খবর
শুনলাম আর কালু মামু নেই হয়েছে কালকে কবর।

বেদনা বিধূর হৃদয়ে তখন ভেসে উঠে মামুর স্মৃতি
হাসি মুখে মামু দিয়েছিল কত হৃদয় ভরা প্রীতি।

১২

আকাশে ছিল না মেঘ পুবালি ঝড়ের বেগ
ছিল শুধু ঝিরঝিরে হাওয়া
হাসিমুখে তপনের দিন যেন স্বপনের
প্রাণঢালা ভালবাসা পাওয়া।
মনেতে খুশির রেশ তখনও তো ছিল বেশ
পদ্মার বাঁধানো সে ঘাটে
প্রকৃতি-প্রেমিক কত সাজানো বাগানে শত
বালুকা বেলায় শুধু হাটে।
ওপারেতে বালুচর কৃষাণের ক'টা ঘর
পদ্মার নীল ঢেউ বহে
মন চায় ছুটে যায় সুদূরের ঠিকানায়
প্রাণপণ শতটান মোহে।
ভাবিনিকো পাবো তারে দেখিনি স্বপনে যারে
ঘুরে ফিরে পদ্মার তীরে
সচকিত ফিরে চায় কে যেন ডাকিল হায়

www.pathagar.com

হৃদমাঝে স্মৃতি ধরিবারে।
পথিমাঝে পরিচয় কিছু পরে মিলে যায়
রেশ তার থাকে মনোমাঝে
কথাটুক এইছিল কবিতায় স্মৃতিগুলো
ধরা পড়ে যেন শত কাজে।
নদীতীরে আজো যায় বারে বারে ফিরে চায়
আছে সব ঠিক যেন সেথা
স্মৃতির পাতাটি আর খুলিবে কি পুনর্বার
গতদিনে ছিল যারা হেথা।
এমনি জীবনে কত ব্যথা আর স্মৃতি শত
ফিরে আসে ফিরে যায় চলে
ক'জনই বা রাখে মনে সুদূরের পরিজনে
তিথি ক্ষণ পল অণূপলে।

১৩
সে এক প্রাচীন কাহিনি বলি-

ধরিত্রীর ঝাঁঝালো বায়ে বরিন্দের লাল মাটি
অজানা কালের রুক্ষভূমি সেদিনও ছিল না খাঁটি।

ফুটেনিকো ফুল ফলেনিকো ফল তপ্ত মরুর হাওয়া
ঠন্‌ঠন্‌ করা চৌচির মাটি স্বস্তি যেতো না পাওয়া।

কৃষাণের দুখ-ফলে নাকো ধান জীর্ণ কুটির বাস
তপ্ত মাটির রুক্ষ মেজাজে গজাতো কেবলই ঘাস।

এমনি দুখের সাগরে পারায়ে বরিন্দ দুখিনী মাতা
কালে যুগে শুদু কপালেরে দুষি সয়েছে সকল ব্যথা।

প্রাচীন আজিকে নবীন বেশে-

বিনা মেঘে যেন বজ্র পাতের মতই ঘটেছে সব
যুগান্তরের অচলায়তন ভেঙে তা উঠেছে রব।

ভূমি তলে ছিল সুশীতল বারি উপরে দখিনা হাওয়া
জানিত না কেহ বরিন্দ মাটিতে এসব যাবে গো পাওয়া।

গাছপালা ভরা পাখির কাকলি কুহুতান কোকিলের
কলকল রবে খালে বহে পানি ভরা মাছ পুকুরের।

সবুজ মাঠে শ্যামলিমা আর পাকা ধান দোল খায়
ভোরে গিয়ে চাষা মাড়া ধান লয়ে দিনে বাড়ি ফিরে যায়।

পাকা সাতদিন লাগিত যেথায় বরিন্দ ঘুরিতে আগে

www.pathagar.com

গ্রাম শহরের তফাৎ ঘুচায়ে বরিন্দ আজিকে জাগে।

বিজলি আলোর ঝিলিক্ এখন চাষী ঘর আলো করে
যাঁতের বদলে যন্ত্রের পানি ক্ষেতে অবিরাম ভরে।

সাঁওতাল আর ধাঙ্গড় বুনো অচ্ছুৎ ছিল যারা
কাজের মাঝে জীবন পেয়ে সকলে আত্মহারা।

লেখাপড়া শিখে মিঠে পানি পিয়ে রুদ্র মটির ছেলে
দেশের কাজে খাটে সারাদিন বিকেলটা হেসে খেলে।

বরিন্দ হৃদয়ে তিলে তিলে জমা শতাব্দীর যত আশা
পূর্ণ করিল দুলালী বরিন্দ ইতিহাস গড়ে খাসা।[৩১]

১৪
বাপটা তার বুড়িয়্যা গেছে
কোঁকড়া হোয়্যা হাঁটে
হুকুর হুকুর কাশে খালি
বেকার দিন কাটে।

ছোট কালের ম্যালায় কথা
য্যাছে মনে পোড়্যা
হাটে যাইতোক বাপের সোঁতে
বাপের ঘাড়ে চোড়্যা।

হাল বাহিতে য্যাতোক বাপু
বাড়ির কান্টাতে
পান্তা ভাতের লাহারি খাইতোক
বোস্যা বাপ ব্যাটাতে।

পরের জমি চাষ কোর‍্যা
ফসল আনতোক ঘরে
তাও অভাব লাগ্যা থাকতোক
মা বাপের সংসারে।

শত অভাব থাক্যাও বাপু
পড়াইতে ভুলেনি
ল্যাখা পড়ার লাগ্যা ছাল্যার
কুনু অভাব থয়নি।

ল্যাখা পড়া চাকরির লাগ্যা
বাপুর ম্যালা ধার
আইজ ছাল্যা বড় জাগার
বড় আপিসার।

www.pathagar.com

বিহ্যা কোর্য্যা বহু লিয়্যা
থাকে বড় শহরে
মা বাপ থাকে অজ গাঁয়ে
খ্যাড়ের কুঁড়্যা ঘরে।

সুখের বাতাস লাগিয়্যা গায়ে
ঘুরে চোড়্যা গাড়িতে
খোঁজ খবরের হয়ন্যা সময়
মা বাপের বাড়িতে।

অরও একটা ব্যাটা হোয়্যাছে
একদিন মানুষ হ্যোবে
অর ব্যাটাও কি অর মতোন
বাপকে ভুল্যা য্যাবে।

চিন্ত্যায় চিন্ত্যায় দিন কাটে
গ্যালো অবসরে
সব হারিয়্যা ঘুর্যা আইলো
বুড়া বাপ মা'র ঘরে।

১৫
হাঁরঘে বাড়ির কান্টার কড়ে
জয়গুনেরঘে ঘর
অভাব কষ্টো অরঘে ওপোর
যেনে কোর্য্যাছে ভর।

তিন বছর পঙ্গু হোয়্যা
বাপটা আজো খাটে (বিছানায়)
সরমে মা যায়ন্যা কামে
না খায়্যা দিন কাটে।

দুটা বহিন ভাতার ছাড়ি
মা বাপের ঘরে
আরাক বহিন দুখের জালায়
ফাঁসি দিয়্যা মরে।

এক ভাই গাঞ্জা খায়
আরাক ভাই চোর
বেশির ভাগই থাকে তারা
জেলখানার ভিতোর।

রূপে গুণে জয়গুন
সাত গেরামে নাই

www.pathagar.com

একবার দেখ্যা জি ভরেনা
ফের ঘুর্যা তাকায়।
হয়নি বিহ্যা আজো তার
যৌতুকেরই গোনে
আর কুনুদিন হ্যোবে কিন্যা
ওপোর আলায় জানে।

১৬
মুক্তিযুদ্ধ বাধ্যাছিলো
উনিশশো এখাত্তরে
জান দিয়্যা ইজ্জত দিয়্যা
মুক্ত হ্যোলো ষোল্লই ডিসেম্বরে।
সে দিনগালার কথা
আইঝোও মনে পড়ে
হানাদারেরঘে ভয়ে
জান থাকেনি ধড়ে।
কতযে মানুষ মার্যাছে
পাক হানাদার
অরঘে সোঁতে ছিলো
দ্যাশেরই রাজাকার।
ন'মাস যুদ্ধ কোর্যা
জয় আস্যাছিলো ঘরে
মনে পড়ে সেগল্যা কথা
বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে।[৩২]

১৭
সাতান্ন সালে ভাবছি দেলে হলো বড় জ্বালা
ইলা মিত্রের আন্দোলনে হইল কঠিন ঠেলা
কি বলিব দুঃখের কথা শুনেন শ্রোতাগণ
ইলা মিত্রের কথা আমি করিব বর্ণন
১৯৫৭ সালের কথা বলি ভাই
জোতদারের যন্ত্রণাতে কৃষক বাঁচা দায়
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কৃষক করে চাষ
বর্গাদারের দাম দেয় না করে রাখে দাস
শ্রমিক যারা দিন মজুর খেটে এনে খায়
তাদের কষ্ট বসে বসে দেখা নাহি যায়
নানা অত্যাচার করে যত জোতদার ছিল
বিশকে তিন আড়ি জিন(মজুরী) মজুরদের দিল

www.pathagar.com

এতো কষ্টের উপার্জন তাদের কিছু নাই
তাই দেখিয়া হাবুবাবু এসে হাজির হয়
বহরম বাড়ি তাহার শুনেন শ্রোতাগণ
ইলা মিত্র তাহার স্ত্রী ভারি বিচক্ষণ
স্বামী-স্ত্রী দুইজনাতে যুক্তি করে ভাই
আইন তৈরি করে এলো নাচোল থানায়
সাঁওতাল জাতি ভালো কৃষক এই ভাবিয়া মনে,
সব সাঁওতালে সাড়া দিয়া বসিল নির্জনে
মাতলা নামে এক সাঁওতাল ছিল ধরমপুরাতে
সবার মধ্যে ভাল কৃষক জানাই গো সভাতে
শুন শুন কৃষক ভাই আমার নিবেদন
দাবি করব আমরা সবে যত আছে মহাজন
জমির ফসল মোট করে তিন ভাগ করিব
দুভাগ কৃষক নিবে জোতদারকে একভাগ দিব
শ্রমিক মজুরের জিন ভাই সাত আড়ি নিব
এইভাবে আমরা সবাই ভাগ যে করিব
এই বলিয়া সাঁওতাল গোষ্ঠী করে আন্দোলন
তা না হলে আমাদের ভাই বাঁচবেনা জীবন
এই কথা যত জোতদার যখনই শুনিল
যুক্তি করে সব জোতদার থানাতে আসিল
দারোগাকে বলে তরা শুনেন অফিসার
যত টাকা লাগে দিব ভাবনা নাহি আর
সাঁওতাল গোষ্ঠীর উচিৎ সাজা করে আমরা চাই
আর এই আইন যে করিল সে আছে কোথায়
হাবুবাবু ইলা মিত্র স্বামী স্ত্রী দুইজন
লুথুমিয়ার বাথানেতে বসে সাঁওতালগণ
ধরমপুরা বাথানেতে নিয়ে কয়েক পুলিশ সংগে করে
দারোগা গিয়ে মাতলা মাঝিকে নিল ধরে
তার সঙ্গে কয়টি সাঁতাল প্রতিবাদ করিল
ইলা মিত্র হাবুবাবু লুকাইয়া গেল
এমন মাইর শুরু হইলো সাঁতালের উপর
যাকে ধরে তাকে মারে বহে রক্তের লহর
বাথানের সামনে একটা পাকুড় গাছ ছিল
মাতলা মাঝিকে তারা ঝুলাইয়া দিল
বলে ইলা মিত্র কোথায় আছে সত্য করে বল
নইলে সাঁতালের উপরে এখন জুড়ব যাঁতিকল
জোতদারের হুকমে চণ্ডিপুরে করলো থানা

www.pathagar.com

হাতে পায়ে বেঁধে সাঁতাল রাখলো বন্দিখানা
সাঁতালের নারীদের উপর চালাই নির্যাতন
কয়েক গ্রামের সাঁতালের উপর করে নিপীড়ন
জোঁকা আরও জৈপুরা কুসমাডাঙ্গা ধরমপুরা
আরও দুটি গ্রাম আছে কেন্দুয়া ঘাসুড়া
দারোগা ও পুলিশের মাইর যখন সহিতে না পেরে
মাতলা মাঝি হুকুম দিলো সব সাঁতালেরে
তীর ধুনুক লয়ে তারা তৈয়ার হইল
এই দেখিয়া পুলিশ আরও মারিতে লাগিল
অসহ্য হইয়া সাঁতাল জীবন করলো পণ
দুই পুলিশ এক দারোগা ধরিল তখন
তিনজনকে মারতে মারতে আধমরা করিয়া
ধরমপুরা বাথানের সামনে দিল যে পুতিয়া
লুথুমিয়ার বাথানের সামনে তিনজনকে পুতিল
তখন হতে পুলিশ বাহিনী আরও ক্ষেপে গেল
ইলা মিত্র চিন্তা করে কি করি উপায়
যেখানে যত সাঁতাল আছে ভারতে পালায়
হাবুবাবু তখন ভাইরে আত্মগোপন করে
ইলা মিত্র স্বামী হারিয়ে আসলো রাস্তার পরে
ভারত পার হয়ে যাবে স্থির করিল
বডারে বডারে পুলিশ ভাই মোতায়েন ছিল
ছদ্মাবেশী হয়া মিত্র রহনপুরে ভাই
পুলিশের হাতে ইলা মিত্র ধরা পড়ে যায়
ধরে নিয়ে পুলিশ তখন চালায় নির্যাতন
স্বীকার করাইতে যোনিদ্বারে গরম ডিম ঢুকাইল
মরার মত লাশ খানি ছিল মেডিক্যালে
এ রুগী বাঁচবেনা তখন ডাক্তারেরা বলে
দুই মাস পরে মিত্র জ্ঞান ফিরে পেল
ডাক্তারেরা পক্ষে হয়ে তাকে ভারত পার করিল
এই তো সাঁতাল পালার ঘটনা
বীরেন সরকার ভাবছে জগতে কত রকম খেলা
সাতান্ন সালে ভাবছি দেলে হলো বড় জ্বালা।[৩৩]

১৮

কম্পানি মহারাণী হুকুম যে দিলোরে
আধা মাটি হামি লিবোরে
হামি লিবোরে আধা মাটি হামি লিবোরে

www.pathagar.com

হামার ভাই-ভায়াদি নাইরে
হামার কাকা-খুড়া নাইরে
আধামাটি হামি লিবোরে
হামারও জীবনটা কোন কিছু হয়তো
এক কোদাল মাটি দিয়োরে
আধা মাটি হামি লিবোরে।[৩৪]

চ. ভাটকবিতা

বিশেষ কোন ঘটনা বা কাহিনিকে উপজীব্য করে নিজের কল্পনার জগতকে প্রসারিত করে গ্রামের স্বল্পশিক্ষিত এক শ্রেণির কবি কবিতা রচনা করেন। এই কবিতা পায়ার ছন্দে অনেকটা গীতিকবিতার আদলে রচিত হয়। কবিতার আকার হয় দীর্ঘ। কাগজে চারভাঁজ করে এই কবিতা ছাপানো হয়। প্রথম অংশে প্রচ্ছদ সেখানে হাতে আঁকা ছবি এবং কবির নাম ও ঠিকানা। ২ পৃষ্ঠা থেকে ৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কবিতা। এসব কবিতা কবি নিজেই বিভিন্ন হাট-বাজার, লঞ্চ-স্টিমার, ট্রেন, বাস বা কোন জনবহুল স্থানে দাঁড়িয়ে অনেকটা পুথিপড়ার মতো করে পড়েন। এভাবে ঘুরে ঘুরে আসর জমিয়ে ভাটকবিতা বা হাটুরে কবিতা বিক্রি করেন কবি নিজেই। হাটুরে কবিতার প্রচলন মধ্যযুগ থেকে লক্ষ করা যায়। লোকসাহিত্যের বিলুপ্ত প্রায় এই হাটুরে কবিতার ধারা অনেকেই ধরে রেখেছে।[৩৫]

হাটুরে কবির সাক্ষাৎকার

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনার নাম?
হাটুরে কবি: মো. আব্দুল মালেক।

প্রধান সমন্বয়কারী: আপনার বয়স কত?
আব্দুল মালেক: ৭৬ বছর।

প্রধান সমন্বয়কারী: আপনার মা-বাবার নামসহ গ্রাম, উপজেলা ও জেলার নাম বলুন।
আব্দুল মালেক: আমার মায়ের নাম-আম্বিয়া খাতুন, বাবার নাম-মরহুম আমানুল্লাহ। গ্রাম-মোহনপুর, চামাবাড়িয়া চৌমহনী, ডাকঘর-টিকরামপুর, উপজেলা-চাঁপাইনবাগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

প্রধান সমন্বয়কারী: আপনার বাবাও কি আপনার মতো কবি ছিলেন?.
আব্দুল মালেক: না। আমার বাবা একজন কৃষক ছিলেন। তিনি নিজের জমিতে চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

প্রধান সমন্বয়কারী: আপনার ছেলে-মেয়ে কয়জন?
আব্দুল মালেক: ৪ ছেলে ৫ মেয়ে।

প্রধান সমন্বয়কারী: আপনার ছেলেরা কি আপনার মতো কবি হয়েছে?
আব্দুল মালেক: না তারা কেউ কবি হয়নি। মেয়েদের বিয়ে দিয়েছি। ছেলেরা ব্যবসা-বাণিজ্য করে।

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী: আপনি তো কবিতা পড়ে হাটে-বাজারে বই বিক্রি করতেন, এখনও করছেন। এই কবিতাগুলো কার লেখা?

আব্দুল মালেক: আমি আমার লেখা কবিতা ছাপিয়ে বিক্রি করি।

প্রধান সমন্বয়কারী: আপনি কয় বছর ধরে কবিতা বিক্রি করছেন?

আব্দুল মালেক: বয়স যখন ২০/২৫ তখন থেকেই কবিতা লেখি, ছাপিয়ে বিক্রি করি।

প্রধান সমন্বয়কারী: সে সময় কত দামে কবিতা বিক্রি করতেন?

আব্দুল মালেক: তখন এক একটার দাম এক আনা ছিল। কিছু কম দামেও বিক্রি করতাম।

প্রধান সমন্বয়কারী: এখন দাম কত?

আব্দুল মালেক: এখন ৪/৫ টাকা দামে বিক্রি করি।

প্রধান সমন্বয়কারী: এখন কি আগের মতো কবিতা বিক্রি হয়?

আব্দুল মালেক: এখন বই তেমন বিক্রি হয় না। সারা দিনে ২০/২৫ টা বিক্রি হয়। তবে তেমন লাভ হয় না।

প্রধান সমন্বয়কারী: আপনার লেখা কবিতাগুলোর নাম বলুন।

আব্দুল মালেক: বয়স তো অনেক হয়েছে সবগুলোর নাম মনে নেই। আমার লেখা কবিতার মধ্যে সাপুরের মেয়ে জরিনা, সৎমায়ের লীলা, পোড়াগাঁয়ের ডাকাতি, মামলার সাক্ষী ময়না পাখি মনে পড়ছে। আর মনে করতে পারছি না।

প্রধান সমন্বয়কারী: আপনি এ পর্যন্ত কতগুলো কবিতা লিখেছেন?

আব্দুল মালেক: প্রায় ২ শরও বেশি।

প্রধান সমন্বয়কারী: আপনার ওস্তাদের নাম কি?

আব্দুল মালেক: আমার কোন ওস্তাদ নেই। ছোটবেলায় হাটে কবিতা শুনে ইচ্ছে হলো লিখার, তাই লিখি।

প্রধান সমন্বয়কারী: কবিতা ছাপাতে কে আপনাকে সাহায্য করেন?

আব্দুল মালেক: উদয়ন হলের মোড়ের আনন্দ বুক স্টলের মালিক বাকিমুদ্দীন আমাকে সাহায্য করে।

প্রধান সমন্বয়কারী: আপনি কি অন্য কারো কবিতা বিক্রি করেন?

আব্দুল মালেক: না আমি শুধু নিজের কবিতাই বিক্রি করি।

প্রধান সমন্বয়কারী: আপনি কোথায় কোথায় কবিতা বিক্রি করেন?

আব্দুল মালেক: বয়স অনেক হওয়ায় আমি তেমন কোথাও যেতে পারিনা। শুধু নতুনহাট আর বটতলাহাটেই বেচি।

প্রধান সমন্বয়কারী: কবিতা বিক্রি করা ছাড়া আর কি করেন?

আব্দুল মালেক: কবিরাজী ওষুধ বিক্রি করি।

প্রধান সমন্বয়কারী: কবিতা ছাড়া আপনি আর কি লিখেন?

আব্দুল মালেক: আমি আলকাপ গান করতাম। তাই আলকাপের বন্দনা ছড়া আর খ্যামটা লিখতে পারি।

www.pathagar.com

লোককবি আবদুল মালেকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন প্রধান সমন্বয়কারী

কবি আব্দুল মালেকের দুটি ভাট বা হাটুরে কবিতা দেয়া হলো :

মামলার সাক্ষী ময়না পাখি

কবিতা

লোককবি: আ. মালেক
মোহনপুর, টিকরামপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

কবিতা আরম্ভ

শোনেন বন্ধুগণ ২ দিয়া মন আশ্চর্য ঘটনা
মামলার সাক্ষী ময়না পাখী কবিতার বর্ণনা
ঘটনা নবগঞ্জ জিলায় ২ ভোলাহাট থানাটির আধীনে
গ্রামের নামটি শ্রীনাথপুর রাখিবেন সবাই মনে
আছে এক মাতব্বর ২ নামটি তার জেকের আলী মিঞা
ছোট ভাই তার কাসেম আলি আই এ পাশ করিয়া।
বেড়ায় ঘুরে ঘুরে ২ খাঁচায় পুরে ময়না পাখি পোষে

www.pathagar.com

জীবনের চেয়ে অধিক ভাল পাখিটিরে বাসে।
শিখায় বাংলা ভাষা ২ ইংলিশ ভাষা আরও উর্দু ভাষা
মিষ্টি মিষ্টি কথা পাখি বলছে কেমন খাসা।
একদিন জেকের মিঞা ২ রাগ করিয়া কাশেমকে বলিল
পাখি পুষলে চলবে না ভাই, রুজি না করিলে।
নাহি জমিদারী ২ চিন্তায় মরি সংসার চলবে কিসে?
লক্ষ্মীছড়ার মত ঘুরলে চলবে না আর শেষে
ভাইরে রাগ দিখিয়া ২ কাশেম মিয়ার রাগ হইল মনেতে
বাড়ী হইতে যায় চলিয়া পাখি নিয়ে সাথে।
গেল সে মেদিনীপুরে ২ বেড়ায় ঘুরে চাকরি নাহি মেলে
তিন দিন ধরে অনাহারে বসে গাছের তলে।
তখন ক্ষুধার জ্বালায় ২ পাখিটা হায় ঢলে ঢলে পড়ে
কাশেম আলি উঠায় হাত আল্লাহর দরবারে।
বলে মালিক সাঁই ২ কেহ নাই তুমি বিনে আর
বিপদ ভঞ্জন তুমি প্রভু নিজে কর তার।
কর কৃপা দান ২ বাচাও প্রাণ ক্ষুধায় যাচ্ছি মরে
স্কুলে হতে একটি মেয়ে এলো ধীরে ধীরে।
বয়স তার হবে বারো ২ কিম্বা তেরো তার বেশী নয়
পূর্ণিমারই চাঁদের মত অঙ্গের শোভা পায়
মেয়ের নাম মতিজান ২ পড়ে কোরআন সুন্দর স্বভাব
চলন হাঁটন দেখলে সতীত্বরই ভাব।
মতিজান আসে বাড়ী ২ তাড়াতাড়ি বেলা বারোটায়
রোদের তাপে অস্থির হয়ে দাঁড়ায় গাছতলায়।
পাশে একটি লোক দাঁড়ানো জলে ভরা আঁখি।
পাখি করুণ সুরে ২ বলে তবে শুনেন আম্মাজান
খাবার কিছু দিয়া মোদের রক্ষা করেন প্রাণ।
আছি অনাহারে ২ তিন দিন ধরে এই টাউনে ঘুরি
পিতা আমার চাকুরি খুঁজে পেলনা চাকুরি।
মেয়েটি তাই শুনিয়া ২ বাড়ী গিয়ে মায়ের কাছে কয়
ময়না পাখি খেতে মাগো আমার কাছে চায়।
যদি খোরাক বিনে ২ প্রাণে মরে ঐ বিদেশি ছেলে
খোদার কাছে পাপী হইব বুঝে দেখ দেলে।
মেয়ের মুখের বাণী ২ মা জননী শুনে তখন কয়
ছেলেটিকে ডেকে আন আমাদের আওলায়
মায়ের বাক্যে শ্রবণ করে ২ কিছু পরে বিবি মতিজান
কাশেম আলীকে ডেকে এনে বসতে দেয় বিছানা।

www.pathagar.com

বসায় বৈঠকখানায় ২ দেখতে পায় চেহারায়।
ভাবে মনে মনে ২ উহার সনে মেয়ে বিয়ে দিব
বিয়ে দিয়ে জামাই নিয়ে বাড়ীতে রাখিব।
তখন কাশেমের ২ ধীরে ধীরে করে জিজ্ঞাসন
বিদেশেতে তুমি বাবা এলে কি কারণে।
কথা বলে যখন ২ এল তখন মতিজানের পিতা
নামটি তাহার ওসমান গণি শুনেন যত শ্রোতা।
তিনি অতি ধনী ২ মানে মানি করেন যে কারবার
বড় মহাজন বলিয়া নামটি আছিল তাহার।
গিন্নি বলিতেছে ২ স্বামীর কাছে শুনেন প্রাণনাথ
তিনদিন হইল ঐ ছেলেটির পেটে নাইকো ভাত।
করছে আই এ পাশ ২ ছেড়ে দেশ চাকুরির আশে
সঙ্গে একটি পোষা পাখি ঘোরে দেশ বিদেশে।
বলে ওছমান গণি ২ ওগো গিন্নি ভাগ্য মোদের ভাল
মতিজানের জোড়া বুঝি খোদায় এনে দিল।
তখন বলে বাবা ২ কোথায় যাইবা চাকুরি খুঁজিবারে
আছে কত কর্মচারী আমারই আন্ডারে।
তাদের হিসাব নিকাশ ২ খাটাইবা থাক মোর বাড়ি
আমার যত খাতা পত্র বুঝে নিবা তারি।
কথাটি বলে যখন ২ শুনে তখন খুশি হইল দেলে
কাশেম ভাবে খোদার কৃপায় দুঃখ গেল চলে।
কারবার বুঝে নিল ২ পাকা বাড়ি তেতলায় শয়ন
কাঙ্গালে পাইল যেন মানিক ও কাঞ্চন।
যেমন আষাঢ় মাসে ২ পানি আসে নতুন নৌকা যায়
দু'ঘন্টা পাল দেয় খাটাইয়া কিসের ভাবনা তার
ছাড়ি রসের কথা ২ বলি হেথা ঘটনার বিষয়
কাশেম আলি বিছানাতে গভীর নিদ্রা যায়।
তখন স্বপ্নে আসে ২ কাছে বসে বড় ভাই তার
কেন্দে কেন্দে যাদু শুনসমাচার।
যদি বড় ভাই হইতে ২ বুঝতে পারতে ছোট ভায়ের কি মায়া
কেমন রয়েছে ভাইজান আমারে ভুলিয়া।
দেখে এ স্বপ্ন ২ কাশেম তখন উঠিল কান্দিয়া
ভাই ভাই বলিয়া কান্দে চুল ছেঁড়ে হাত দিয়া।
নিশি ভোর হলে ২ কাশেম বলে শ্বশুরের তরে।
বড় ভাই আমার জন্যে কাঁদিছে অন্তরে
শুনে ওসমান গণি ২ খয় তখনি শুন বাছাধন।

www.pathagar.com

খোদার কৃপায় সুখে থাক এই নিবেদন।
শুনে কাশেম মিঞা ২ চুমে যাইয়া শ্বশুরের গায়
স্বামী স্ত্রী হয় রওয়ানা পাখিটিকে নিয়ে।
গেল স্টেশন ঘরে ২ মেদনদীপুরে কাশেম আলি মিঞা
ফাস্টক্লাশে করিল টিকিট নোট ভাঙ্গাইয়া।
দুইজন চলে গেল ২ রাত বাজিল বারটা তখন
রামমগরের স্টেশনে নামিল দুইজন।
যায় নদীর তটে ২ পানসি ঘাটে নৌকা একখানা
নৌকার উপর বসে আছে মাঝি দুইজনা।
মাদি দস্যু সর্দ্দার ২ সেই দুরাচার মতিজানকে দেখে
রূপেতে মোহিত হয়ে কাশেমকে কয় ডেকে।
আপনি যাবেন কোথায় ২ রাত বারোটায় দেখি নদী তটে
কাশেম বলে যাব আমরা রঘুনাথপুর ঘাটে।
ভাড়া চুক্তি হইল ২ টাকা ষোল করিল গমন
নৌকায় উঠে কাশেম আলি করিল শয়ন।
সঙ্গে মতিজান ২ নিদ্রা যান জেগে নাহি রয়
মাইল পাঁচেক দুরে গিয়া পাছার মাঝি কয়।
শুন খালেক ভাই ২ আজ যাহা পাই সোনা রূপা টাকা
ভাগাভাগি না করিব নিয়া যাইব একা।
আমি ভাগ লইব না ২ কাঁচা সোনার মত বিবির মুখ
একে নিয়ে ঘরে গিয়ে করব মহাসুখ।
ইহা যুক্তি করি ২ তাড়াতাড়ি মাঝি দুইজন
ঘুমের ঘোরে কাশেমেরে করিল বন্ধন।
বান্ধে হস্তপদ ২ মনের মত মজবুত করিয়া।
নিদ্রা ভেঙ্গে কাশেম আলি উঠিল কাঁন্দিয়া।
দেখে দুইজনে ২ নিচ্ছে টেনে নৌকার আগায়
কাশেম বলে ও মাঝি ভাই ধরি তোমার পায়।
আমার দিওনা ফেলে গহীন জলে প্রাণে মরবো ভাই
আমার জন্য হবে পাগল আমার বড় ভাই।
আর মতিজান ২ জানের জান ভালবাসা ময়না
আমাকে না পাইলে ওরা প্রাণেতে বাঁচবেনা।
এইরূপ কান্না করে ২ নাহি ছাড়ে মাঝিরা দুইজন
জলের ভিতরে তারে তখন দিল বিসর্জন।
যখন কেন্দে উঠল ২ টের পাইল বিবি মতিজান
পতির শোকে ব্যাকুল হয়ে কেন্দে উঠে প্রাণ।
বলে মালেক সাঁই ২ গতি নাই তুমি বিনে আর
সতীর ধর্ম রক্ষা কর পাক পারোয়ার।

www.pathagar.com

সতী ব্যাকুল দেলে ২ এই বলে করিতেছে রোদন
পাছার মাঝি বলে তুমি কান্দ কি কারণ।
যাবে আমার বাড়ী ২ প্রাণেশ্বরী কেন্দনা কেন্দনা
তোমায় দিব 'একুশ' ভরি সোনার গহ্না।
দুষ্টের বাক্য শুনে ২ সতীর প্রাণে লাগিছে আঘাত
সতী কান্দে খোদার কাছে কয় স্বামীর সাত।
তুমি অন্তর্যামী ২ জগৎ স্বামী জগতের সার
পড়েছি আজ ঘোর বিপদে করহে উদ্ধার।
এরইরূপ আরাধনা পাক রাব্বানা করিল কবুল
মাঝি মাল্লার দিক বিদিকের হয়ে গেল ভুল।
যাবে কোন দিকেতে ২ কুয়াশাতে আচ্ছন্ন হয়েছে
নদীর ভিতর প্রবল বেড়ে তুফান উঠে গেছে।
হইল দিশেহারা ২ দুই চার কষে মারে-দাঁড়
অস্থির হইয়া গেল না পাইল কিনার।
গেল বেহুশ হইয়া ২ রয় বসিয়া বইঠা দিল ছেড়ে
ভাসিতে ভাসিতে নৌকা লাগিল কিনারে।
দেখে বিধির লীলা ২ আজ খেলা তুফানের চোটে
নৌকা গিয়া চাপিয়াছে জেকের আলির ঘাটে
এদিকে জেকের আলি শোনেন বলি রাত বারটার পরে
তাহাজ্জত পড়তে আইল অজু করিবারে।
তখন দেখে বসি ২ নৌকা আছে নদীর কিনারায়
ময়না পাখি নৌকায় থাকি চিনিছে তাহায়
বলে ও চাচাজান ২ বাপজনেরে প্রাণ মাঝিরা বধিছে
নৌকার ভিতর এসে দেখেন মা কাঁদিতেছে।
পাখি ডাকে যখন ২ এল তখন জেকের আলি মিঞা
বলে এই পাখিটির সঙ্গে কাশেম যায় চলিয়া।
হায়রে কি সর্বনাশ ২ কাশেমের লাশ কোথায় ভেসে গেল
ভাই ভাই বলিয়া তখন কাঁদিতে লাগিল।
হায়রে প্রাণের ভাই ২ তোকে হারাই আপনারই দোষে
কেন তোরে গালি দিলাম তুই গেলি বিদেশে।
বলে মাঝি দুইজন ২ বাঁচাই জীবন ধরি আবার দাঁড়
লাঠি মেরে জেকের আলি ভাঙ্গিল একটির ঘাড়।
এলো চৌকিদার ২ দফাদার বান্ধে দুই বেটারে
মার পিঠ করিল কত নিয়া বাড়ীর পরে
তখন মতিজান ২ কেন্দে কন যতক বিষয়
শুনিয়ে ভাই সে সব কথা পাষাণ গলে যায়।
সবে হায় হায় করে ২ কেমন করে বধিল তার প্রাণ

www.pathagar.com

তোফাজ্জল কয় ধর্ম পথে আল্লা মেহেরবান।
কাশেম ভেসে যায় ২ ভোর বেলায় লাগে নদীর ঘাটে
দারোগা বাবু স্নান করিতে আসে নদীর ঘাটে।
লাশটি দেখতে পেল ২ কাছে যেয়ে তখন দেখে
মরার চিহ্ন নাইকো লাশের নিশ্বাস চলছে নাকে।
খোদা বাঁচায় যারে ২ মারতে তার কেহ নাহি পারে।
আয়ু থাকতে এ সংসারে কেহ নাহি মরে।
স্কুলে পড়তো যখন ২ কাশেম তখন সাঁতার শিক্ষা করে
চব্বিশ ঘণ্টা থাকত নিজে হাত পা বন্ধন করে।
এইরূপ সাঁতার দেখে ২ প্রাইজ তাকে দিল কত জনা
সেই গুনেতে কাশেম আলি পানিতে ডুবে না।
বন্ধনখুলে দিল ২ নিয়ে গেল থানার উপরেতে
দারোগা বাবু ডাইরি লেখে আসামি ধরিতে।
ডাইরি লেখে যখন ২ এল তখন জেকের আলি মিঞা
চৌকিদার দফাদার দুইজন আসামি লইয়া
পাঁচজন হাজির হলো ২ দেখতে পেল জেকের আলী মিঞা
ছোট ভাই তার কাশেম আলি থানাতে বসিয়া
ভাই ভাই বলিয়া জেকের কেন্দে ব্যাকুল হইল।
দুঃখ প্রকাশ করে ২ ভাইয়ের তরে জেকের আলি মিঞা
দুই আসামি দিল যে যে হাজতে পাঠাইয়া।
মামলা জজকোটে ২ লোক জোটে হাজারো হাজার
ময়না পাখি সাক্ষী দিবে সাক্ষী শুনতে চমৎকার।
পাখি সাক্ষী দেয় ২ বলে যায় ইংরেজিতে বাণী
হাকিম বাবু হল তাজ্জব পাখির বুলি শুনি।
তারপর বাংলা পরে ২ জিজ্ঞাসা করে যতেক বিষয়
বাংলাতে সেই সব কথা পাখি বলে যায়।
কবিতা ইতি হইল ২ রায় লিখিত জজ সাহেব তখন
দুই মাঝির কারাদণ্ড হয় যাবত জীবন।
ধন্য পাখির ভাষা ২ শুনতে খাসা খুশী সর্বজনে
পাখিকে করিল দান যাহার যাহা আছে প্রাণে।
দেখলাম একুনেতে ২ হইল তাতে টাকা নয় হাজার
ধন্য ধন্য সতী নারী ধন্য পতি তার, ধন্য ময়না পাখি।[৩৬]

সাপুড়ে মেয়ে জরিনা সুন্দরীর
কবিতা

লোককবি: মো. আবদুল মালেক
মোহনপুর ' টিকরামপুর' চাঁপাইনবাবগঞ্জ

www.pathagar.com

কবিতা আরম্ভ

বলি ভাইরে ভাই ২ বলে যাই আজব এক ঘটনা,
সাপ খেলে সাপুড়ের কন্যা নামেতে জরিনা।
জরিনার মা নাই ২ বাপ নাই দাদির সাথে ঘোরে,
বেহুলা লক্ষীন্দর গানে পরান পাগল করে।
জরিনার বয়স ষোল ২ হাতে ছিল প্লাস্টিকের চুড়ি,
গলায় ছিল পুথির মালা পরনে লাল শাড়ি।
বরণ কাঁচা সোনা ২ হাত দু খানা লাউ লতিকার ডগা,
ভুরুতে বিজলি মাখা চাহনী স্বপন আঁকা।
ঠোটে মধু মাখা ২ আঁকা বাঁকা পথ ধরিয়া চলে,
দেখতে ভাল গঠন ছিল যে দেখে সেই বলে।
হাসিতে জগৎ মাতায় ২ সুন্দর গায়ে সবুজ ব্লাউজ আছে,
ভ্রমর কাজল আউলা কেশ পিছনে দুলিছে।
যেমন মধুর চাক ২ দেখতে অবাক মুনির মন হরে,
সারাট দিন সাপ খেলে সন্ধ্যায় আসে ফিরে,
তাদের ডিঙ্গি নায় ২ সেদিন হয় পূর্ণিমা রজনী,
খাওয়া দাওয়া অন্তে তামাক সাজে বিনোদিনী।
দিল দাদীর হাতে ২ মন খুশীতে দাদি তামাক খায়
মধ্য গাঙ্গে কলার ভেলা ধবধবে জ্যোস্নায়।
ভেসে যায় স্রোতের বেগে ২ জরিনা দেখে দাদির ডাকিল।
সাপে কাটা মানুষ ২ দেখতে হাউস হইল জরিনার
দাদী বলে যাক না ভেসে কি আছে দরকার।
জরিনা মানে না মানা ২ ডিঙ্গিখানা দিল ভাসাইয়া,
কলার ভেলার নিকট যখন গেল সে পৌছিয়ে।
ভেলার নিকটেতে ২ সত্য বটে সাপে কাটা মানুষ
চাদর দিয়ে আছে ঢাকা মেয়ে নয়ত পুরুষ।
দাদি চাদর তুলে ২ দেখে বলে বড় লোকের ছেলে,
বুকের সাথে কাগজ বাধা নিল হাতে তুলে।
জরিনা পড়ে দেখে ২ কয় দাদিরে বাড়ি সান পুকুরে,
ছয়দিন হল কেটেছে সাপে সঙ্গে সঙ্গে মরে।
সাপ মারা পড়ে নাই ২ আর ছেলে নাই একটি মাত্র ছেলে,
এম, এ ক্লাশে পড়তে ছিল ভাগ্য গেলে টলে।
পত্রে লেখা আছে ২ আমার ছেলেকে যে বাঁচাতে পারে,
পনের হাজার নগদ টাকা বকশিস দিব তারে।
দাদি চিন্তা করে ২ অনেক পরে জরিনাকে কয়,
ডিঙ্গির সাথে বান্ধে ভেলা মনে সন্দেহ হয়।
ছেলেটি বাঁচতে পারে ২ রাত্রি ধরে ঝাড়া ফোকা করে,

www.pathagar.com

ডাকে জরিনারে ২ তারে চাচারে জলদি ডেকে আন।
কাল সাপ করেছে দংশন যে অনুমান।
কড়ি চালান দিব ২ সাপ আনিব যে সাপে দংশিল
সাদা রং্এর খাসি দরকার কোথায় পাই বল।
দুধ চাই আধ মণ ২ কোথায় এখন নগদ টাকা পাই,
জরিনা কয় দুল বেচিব টাকার ভাবনা নাই।
জরিনার চাচা এল ২ সব শুনিল যায় সে ধাওয়া ধাই,
এইদিনে গেলে সাতদিন হবে আরতো আশা নেই।
বেলা দুপুর হল ২ যোগাড় হ'ল খাসি , দুধ আধ মন,
জল ডওড়া হতে দাদি তুলে আনে তখন।
একটি মাটির পাতিল ২ মুখে তার নীল কাপড় বাঁধা ছিল।
ধূল পড়া দিয়ে পাতিলের মুখ খুলিয়া দিল।
গর্জন শুনা যায় ২ হায়রে হাঁয় কানে লাগে তালা।
ভয়েতে গায়ের লোক শিউরে উঠে ঢাকনিতে দেয় ঠেলা।
দাদির অঙ্গ কাঁপে ২ হস্ত কাঁপে গলায় বস্ত দিয়,
দোহাই দিয়া পাতিলের সামনে খাড়া হইল গিয়া।
দর্শক হাজার হাজার ২ গাঙ্গের কিনার লোকে লোকারণ্য,
শুধু শোনা যায় গর্জন দাদীর ঘন ঘন
দোহায় দেয় মনসার ২ কিছুতে আর থামে না গর্জন,
ছত্রিশ কাহন সাপের মন্তর সব হলো খতম।
দাদি অস্তির হলো ২ দাঁড়াইল গলায় কাপড় দিয়া।
আমার হায়াতে এবার বুঝি শেষ হইল গিয়া
উলঙ্গ হইয়া মাজার সুতা ফেলিল ছিড়িয়া।
বেহুলার গান ধরিল ২ থেমে গেল দুরন্ত গর্জন,
আধ হাত এক সাপ ঢাকনির উপরে তখন।
দাড়াল ফণা করে ২ ঢাকনির উপর তিনটি কড়িছিল,
তিন কড়ি তুলে জরিনা তিন দিকে ফেলে দিল।
সাপ চললো ছুটে ২ ধন্য বটে ধন্য বেদের মেয়ে,
দর্শকগণ প্রশংসা করে হাতে তালি দিয়ে।
দুপুর গড়ে গেল ২ দাঁড়াইয়া রইল জরিনা একভাবে,
নাভি ভরা পানি তার কোন বস্ত্র নাই অঙ্গেতে।
দাঁড়ায়ে হস্ত জুড়ে ২ উচ্চারণ করে আল্লা নবীর নাম,
হাজার হাজার লোক দাঁড়ানো রইল নিরাসাম।
সবাই চেয়ে থাকে ২ হঠাৎ দেখে ঐ যে বহু দুরে,
কি যেন আসিতেছে পানি দুভাগ করে।
গর্জন সোনা যায় ২ দেখে হায় বিরাট অজগর,
আধ হাত সেই সাপটি তার মাথার উপর।

www.pathagar.com

অজগর ছুটে আসে ২ ভেলার পার্শ্বে ঘোরে চতুর্দিকে,
মাথা উঁচু করে মশারীর মধ্যে গেল সে ঢুকে।
লাসের পা যেদিকে ২ সেদিক ফণা ধরে দাঁড়াল,
হা করিয়া ছোবল দিয়া গিলিয়া ফেলিল।
পায়ের বৃদ্ধ আঙ্গুল ২ যে আঙ্গুল দংশনের দাগ ছিল,
মুখের ভিতর দিয়া আঙ্গুলের বিষ চুষিয়া নিল।
আঙ্গুল ছেড়ে দিল ২ ছুটে এল যেথায় দুধের থালা,
মুখ ডুবাতে আধ মন দুধ হয়ে গেল কালা।
তখন ফণা ধরে ২ গর্জন করে ভীষণ সে গর্জন
সাদা কাসী এনে জরিনা সামনে ধরে তখন।
সাপ হা করিয়া ২ ছোবল দিযা ধরে খাসির গলায়,
লেজ দিয়া পেচাইয়া ধরে উড়াল ছেড়ে যায়।
জরিনা জলদি করে ২ হুশ করে দাদির তখন,
মশারি উচু করিয়া দেখে জহির অচেতন।
তখন হুঁশ ফেরে নাই ২ বলে সবাই কি হ'ল কি হ'ল
মাথার কাছে বসে দাদি তিনটি থাপড় দিল।
কলার ভেলার পরে ২ নামটি ধরে ডাকে জোরে জোরে।
উঠো উঠো সোনার জহির উঠো জলদি করে।
জহির চেতন হলো ২ চোখ মেলিল আল্লা আল্লা বল,
মা মা বালিয়া জহির কাঁদিয়া উঠিল।
কোথায় মা আমার ২ দাদি জহিরের মাথায় বুলায় হাত,
কাঁচা মাটির পাতিলে জরিনা রেন্ধে আনে ভাত।
খাওয়ায় দুধ দিয়া ২ বেলা ডুবিয়া রাত্রি হলো,
সারা রাত্রি জরিনা জহিরের শুশ্রুষা করিল।
শেষ রাত্রি বেলা ২ ঘুম ভেঙ্গে যায় জহির চেয়ে রয়,
কে তুমি সুন্দরি কন্যা বল আমি কোথায়।
জরিনা সব বলিল ২ জহির শুনিল তাজ্জব হইয়া।
প্রাণ বাচলে তুমি মোরে যাবো না ভুলিয়া।
সাক্ষী রাতের আঁধার ২ আর দরিয়ার পানি কাষ্ঠের নাও
আকাশেতে যত তারা তোমরা সাক্ষী হও।
জরিনার ঋণ শোধিবো ২ জীবন দিব যে জীবন বাঁচায়
হাতের আংটি খুলে আঙ্গুলে পড়ায়।
নিশি প্রভাত হলো ২ টেলিগ্রাম করলো জরিনার চাচায়।
সানপুকুরে বিরাট ধনী জহিরের আব্বায়।
টেলিগ্রাম পায় দুপুরে ২ কাগজ তুলে দেখে লেখা আছে।
নিয়ে যান আপনার ছেলে সুস্থ হইয়া গেছে
জহির প্রাণ পেয়েছে ২ সুস্থ আছে হৈ চৈ পড়িল

www.pathagar.com

আত্মিয় স্বজন বন্ধু বান্ধব যে যেখানে ছিল।
সবাই ছুটে এল ২ ভাড়া করিল ১২ খানা পানসি,
কোথায় সে বাদিয়ার বহর? কোথায় বেথুয়া নদী।
চলে খোঁজ করিয়া ২ যমুনা ছাড়িয়া ধলেশ্বরী দিয়া,
খোজ পেল পাগলা নদী শিবগঞ্জ গিয়া।
রাত্রি ফজর হইল ২ সাড়া পড়িল জহিরের বাপ এলো,
ঘুমে ছিল সোনার জহির জরিনা ডাকিল।
জহিরের ঘুম ভাঙ্গিল ২ চেয়ে দেখিল ১২ খানা পানসি
শোকে জড়সড় বাপ মা সাতদিন উপবাসী।
জহির যায় ছুটিয়া ২ পড়ে লুটিয়া মা-বাপেরও পায়,
বল বাবা জহির উদ্দিন কে বাঁচায় তোমায়।
বকশিস দিব তারে ২ টাককড়ি সাধের জমিদারি,
দাবী বলেএ পুরস্কার প্রাপ্য জরিনার।
জরিনার অছিলায় ২ খোদা তালায় বাঁচায় তোমার ছেলে,
তাহাতেই আজি পুত্র ধনের মুখ দেখিতে পাইলে।
এস মা জরিনা ২ চঁদের কণা লহ পুরস্কার,
জরিনা কয় টাকা প্রাণ বাঁচাইলাম যার।
আমি তারেই চাই ২ আরজ জানাই মিটাও মনের আশা,
জহিরের আব্বা বলে মাগো ছাড়ো এ দুরাশা।
টাকা লও পঁচিশ হাজার ২ বিয়া দিব আর দিব ঘরবাড়ি,
বেদের মেয়ে তুমি যে মা তাই আপত্তি করি।
জরিনা কয়না কথা ২ নীচু মাথা না করিল,
ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া ডিঙ্গিতে চড়িল।
কেহই হয়না রাজী ২ শরীফ কাজী ধনী জমিদার,
কি করে পাঁচ দিন কেটে যায় লয়না পুরস্কার।
জহির কয় মা জননী ২ শোন তুমি না হয় বেদের মেয়ে,
জরিনাকে না পেলে জীবনে করবো নাকো বিয়ে।
জরিনা সাথে ছিল ২ পা ধরিল বলি আম্মাজান,
না পেলে প্রাণের জহিরকে ত্যাজিব এ প্রাণ।
বেথো নদীর জলে ২ রাত্রিকালে এই ঘটনা হ'ল,
একমাত্র পুত্র জহিরের বাপ মা রাজি হলো।
বাজে সাদিয়ানা ২ তিনশো খানা বেদের নৌকা সাজে
১২ খানা পানসি নৌকা চলছে আগে পাছে।
মাঝি জহির করিয়া ২ পানসি খানা সাজায় কি বাহার,
পানসির সাথেই বেন্ধে দিল ডিঙ্গি দাদীমার।
দাদিমা নামাজ পড়ে ২ মোনাজাত করে ওগো দয়াময়,
দাম্পত্য জীবন জরিনার কর মধুময়, কবিতা সাংগা হ'ল।[৩৭]

www.pathagar.com

সাপুড়ে মেয়ে জরিনা সুন্দরীর কবিতা

কবিঃ মোঃ আবদুল মালেক

মোহনপুর, চামাবাড়িয়া মোড়, টিকরামপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

www.pathagar.com

ছ. লোকছড়া

ছড়া সাহিত্যের তথা লোকসাহিত্যের আদিমতম নিদর্শন। প্রত্যেক দেশের লোকসাহিত্যে ছড়া একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। লিখিত সাহিত্য যখন স্বকীয় ভাব-সুসমামণ্ডিত হয়নি, যখন আধফোটা ছিল, বস্তুজ্ঞান ছিল অত্যন্ত হালকা, তখনই এই ছড়া সাহিত্যের সৃষ্টি। ছড়া শিশুতোষ রচনা হিসেবে পরিচিত। শিশুর মনোরঞ্জন, অবসর যাপন, জ্ঞান ও নীতি শিক্ষা ইত্যাদি কারণে ছড়ার চর্চা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে লোকছড়া কেবল শিশুর জন্য রচিত হয়নি, শিশু-কিশোর, তরুণ-যুবক, বয়স্ক সকল শ্রেণির জন্য রচিত।

ছড়া লোকসাহিত্যের শুধু আদিমতম শাখাই নয়, সবচেয়ে জনপ্রিয়ও বটে। লোকসংগীত, ধাঁধা, প্রবাদ ইত্যাদির মতো ছড়া বর্তমানকালেও বহুল প্রচলিত, সমাদৃত ও জীবন্ত।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ লোকছড়ায় সমৃদ্ধ। এখানে প্রচলিত ছড়াগুলোতে উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যামান। এখানে ক্রীড়া, নৈসর্গিক ও ছেলে ভুলানো ছড়াই সমধিক প্রচলিত। মেয়েলি ব্রতের ছড়া এখানে নিতান্তই কম। ঐন্দ্রজালিক ছড়াগুলোর মধ্যে সাপের মন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, বৃষ্টির ছড়া, ম্যাজিক বা যাদু কিছু পরিমানে লক্ষ্য করা যায়। ছেলেমেয়েকে ঘুম পাড়াতে, দুধ খাওয়াতে, সান্ত্বনা দিতে, গোসল দেয়াতে বা ছেলে মেয়েদের খেলানোর সময় নানা প্রকার ছড়া সুর করে আবৃত্তি করা হয়ে থাকে।[৩৮] এবারে চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রচলিত ছড়াসমূহ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের ছড়াগুলোকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে–

১. শিশু বিষয়ক ছড়া
২. খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদের ছড়া এবং
৩. বিবিধ বিষয়ক ছড়া।

১

হাবুৎ হাবুৎ গোসল করে আমার সোনামণি
হাত নাড়াইয়া পাও নাড়াইয়া কতই টুনাটুনি ॥
গোসল করে হাসস্যা
পানির উভুর ভাস্যা।

২

আয় রে আয় মিনি
খোকার দুধ চিনি
দুধ খাবে না রাগ করেছে
আমার যাদু মণি।
এইতো খোকা খাইল দুধ
আচ্ছা বেটা বাপের পুত।

www.pathagar.com

৩
ঘুঘুটি জিতুটি
কি ছাইল্যা হলো ?
ব্যাটা ছাইল্যা।
ছাইল্যা কই ?
মাছ মারতে গ্যালো।
মাছ কই ?
চিলে লিলো।
চিল কই ?
ডালে বসলো।
ডাল কই ?
পুইড়্যা পুইড়্যা মরলো।
ছাই কে লিলে ?
ধোবাইন লিলে।
ধোবাইন কই ?
কাপড় কাঁচতে গ্যালো।
একটা কাপড় ডুবে
ধোবা মেয়ে কাঁদে,
একটা কাপড় ভাসে
ধোবা মেয়ে হাসে। ইত্যাদি।

৪
খোকন যাবে শ্বশুর বাড়ি
সঙ্গে যাবে কে ?
লাল জামা ছেড়া জুতা
নুরু সাইজ্যাছে।[৩৯]

৫
আয় চান আয়
কালো গাইয়ের দুধ দিব
দুধ খাবার খোরা দিব
মাচার তলে জাগা দিব
সানকি ভরা খাবার দিব
চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা।

৬
কাল বাদুরের ছারে ৷৷
কালাই উস্যা খা ...

www.pathagar.com

কালাইয়ে ক্যানে পোকা
বাইছ্যা বাইছ্যা খা।
আমার মানিককে নিন্দ দিয়্যা যা ॥

৭
আইনিন্দ, বাইনিন্দ
পাইকরের পাত
ল্যাজ কাটা শিয়াল এলো
লক করা থাক ॥[৪০]

৮
ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি
চামের ব্যাটা লক্ষিন্দর
লক্ষিন্দরের বাড়িতে উড়ন্ত কবিতর
সে কবিতর মারা পড়লো খোপের ভিতর
... ইত্যাদি।

৯.
বাগুন কুটে ফালা ফালা
ইল্‌সা মাছের পেটি
চৈতমাসে ধরা পড়লো
হাজী সাহেবের বেটি।
হাজী সাহেবের বড় বেটি
বড় ভাগ্যমান
দুলদুলিতে বিয়ে হল
হাতী পেল দান।

১০
আম ধরে থোকা থোকা
কলা ধরে কাঁদি
গয়না বেঁচে বাগান লাগায়
খেঁদির বড় দাদী।
পোতা আসে লাতিন আসে
আসে বেটির ব্যাটা
কলা বেঁচে রাঁধে বুড়ি
তিল ভরা পিঠা।

১১
ম্যাঘ আয় ম্যাঘ আয় হাকরইল দিয়্যা
ছাগলের লাদি-পাদি বাভুনের বিহা

www.pathagar.com

বাভুনকে লিয়া গ্যাল তাল তলা দিয়্যা
তালের গাছে গামছা
দেখরে বুড়ি তামশা[৪১]

১২
আয় বৃষ্টি ঝাঁ'প্যা
ধান দিব লা'প্যা
নেমুর পাতায় করমচা
ঐ ম্যাঘ খান বরিন যা।[৪২]

১৩
মাগে মা, ও গে মা
কোন দ্যাশে বিহা দিলি কাইয়্যা উড়েনা
বাঁশের পাতা লড়ে চড়ে
মাকে ক'হ্যা মনে পড়ে
মাগে মা ও গে মা
কোন দ্যাশে বিহা দিলি ক্যাইয়্য উড়েনা[৪৩]

১৪
সেল কাবাটি আগানে
মুরগা কাটি বাগানে
কচু কাটা গাই
লাইগ্যা যারে ভাই।[৪৪]

১৫
বাতাস আয় বাতাস আয়
কুলা ভইরা বাতাস আয়।
হাতির মার পচা কান
কুলা ভইরা বাতাস টান।[৪৫]

১৬
আইঠ্যাল মাটির ঘর
আম ধড়া ধড় পড়।[৪৬]
আইরে বাতাস লইড়্যা
হাত্থির ওপর চইঢ়্যা
হাত্থি করে লট পট
আম পড়ে ভট ভট।[৪৭]

১৭
আসরা পাসরা
ধান তোসরা

www.pathagar.com

কাঁঠানি গেল কাঠ কুড়াইতে
নিমানি গেল নিম কুড়াইতে
তে বুড়ি পান্তা।[৪৮]

১৮
রোদ হচ্ছে মেঘ হচ্ছে
খ্যাঁক্ শিয়ালির বিহা হচ্ছে
কলার গাছে ধাপধুপ
চনচ'ন্যা রোদ উঠ।[৪৯]

১৯
গাইল দিলি ভালো করলি
যাবো না তোর ঘাটে
রাতে রাতে কল চালাবো
তোর বোহিনের গাভীন প্যাটে।[৫০]

২০
ভাতার গেছে তাতার পুরে
মাথার কিরা্যা দিয়া
আসছে ভাতার যাচ্ছে নাঙ
তাকধিনা ধিন ধিনা।[৫১]

জ. পুথিসাহিত্য ও পুথিপাঠ

চাঁপাইনবাবগঞ্জের লোকসংস্কৃতির অন্যতম উপাদান পুথিপাঠ। এ অঞ্চলে পুথিপাঠের প্রচলন সুদীর্ঘকালের। কোনো কাহিনি বা বিষয়কে অবলম্বন করে বিশেষ ছন্দে লিখিত এই পুথি সুর করে একটু দুলে দুলে পড়া হয়। প্রচুর ফারসি-উর্দু-হিন্দি শব্দের মিশ্রণ থাকায় এই পুথিকে দোভাষী পুথিও বলা হয়। সাধারণত এ পুথিগুলো পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত। কখনো থামক, তোটক ও চৌপদীও ব্যবহার করা হয়। এতে প্রথমে হামদ ও পরে নাত দিয়ে শুরু করা হয়। একসময় চাঁপাইনবাবগঞ্জে সন্ধ্যার পর মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে আসর করে পুথি পাঠের দৃশ্য এ অঞ্চলে লোকজনের অন্যতম উপাদান ছিল। তাছাড়া এ অঞ্চলে গয়নার নাওয়ে যাত্রীদের চলার পথে মনোরঞ্জনের জন্যও পুথিপাঠের প্রচলন ছিল। তবে গয়নার বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এ ধারারও বিলুপ্তি ঘটে। ইউসুফ-জোলেখা, রহিম বাদশা-রূপবান কন্যা, গাজী-কালু-চম্পাবতী, সোনাভান, জঙ্গনামা; আমি হামজা, কাছাছুল আম্বিয়া, হাকীকাতুল আম্বিয়া, ফয়ছাল আহকাম, জিকরনামা প্রভৃতি পুথিপাঠের প্রচলন ছিল এ অঞ্চলে। এই অঞ্চলে অতীতে পুথিপাঠের ব্যাপক প্রচলন থাকলেও বর্তমানে নেই বললেই চলে।

পরিবেশনা: কোনো বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই পুথিপাঠ করা হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে পুথিপাঠক পুথি পাঠ করেন আর দর্শক-শ্রোতারা তাঁর চারদিকে পরিবৃত্ত হয়ে বসেন। পুথি পরিবেশনের

www.pathagar.com

জন্য বিশেষ কোনো মঞ্চের প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন না সাজসজ্জারও। পুথিপাঠের সময় পুথিপাঠক একটু একটু দুলে পুথিপাঠ করেন আর দোহারিরা ধুয়া তোলেন। কাহিনির বিশেষ বিশেষ ঘটনা বর্ণনার সময় দর্শকরা বাহবা দিয়েথাকেন। কখনোবা কোনো করুণ কাহিনির বর্ণনা শুনতে শুনতে শ্রোতাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। নারী-পুরুষ সবাই এর দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকতে পারে। চাঁপাইনবাবগঞ্জে পুথিপাঠ করে খ্যাতি লাভ করেছেন মাহবুবুল আলম। তাঁর কাছ থেকে সংগৃহীত কয়েকটি পুথি নিচে দেয়া হলো–

১

শোনেন শোনেন যত শ্রোতা শোনেন দিয়া মন
হারিয়ে যাওয়া পুথি আমি পাঠ করি এখন ॥

হারিয়ে গেল কেসসা বলা জারী সারী গান
আলকাপ গম্ভীরা শুনে জুড়াতো যে প্রাণ ॥

মনসা কীর্ত্তন কবিগানে পড়লে বাড়ি ঢোলে
ঘরে বসে থাকতোনাকো কেহ বাড়ির কোলে ॥

হারিয়ে গেল ডাংগুলি আর মজার কুতকুত খেলা
শিশুকালে খেলে খেলে কেটে যেত বেলা ॥

এসব কথা বলব কত মনে বড় লাগে
সাংস্কৃতিক উৎসবে আজ সবই মনে জাগে ॥

দুঃখের কথা মনের ব্যথা শুনুন শ্রোতাগণে
অনুষ্ঠানে বলছি আমি পুথিরো বয়ানে ॥

নববর্ষে মাঠে বসত বৈশাখি মেলা
নানা রকম আয়োজন আর কত রকম খেলা ॥

যাত্রা সার্কাস পুতুল নাচ দোকান মনোহারি
পাকে পাকে দোল খাইতাম নাগর দোলায় চড়ি ॥

বৈশাখ মাসে গাছে গাছে গজায় নতুন পাতা
আগের মত হয়নাতো আর শুভ হাল খাতা ॥

দাদার সাথে যাইতাম মোরা হালখাতার দোকানে
মণ্ডা মিঠাই খাইতাম কত খুশি হইতাম মনে ॥

এখন দেখি হালখাতা হয় বার মাসই
এসব দেখে সয়ে গেছে পাইনাকো আর হাসি ॥

লেপা পুছা হাঁড়ি পরিস্কার করতো দাদি-নানি
নতুন নতুন জামা কাপড় পরতো সবাই আনি ॥

সাজ সাজ রব পড়িতো সকল গাঁও গেরামে
নানা রকম পিঠা পায়েস খাইতো আরামে ॥

www.pathagar.com

নিজ নিজ আত্মীয় আর যত কুটুম বাড়ি
বেড়াইতো যাইতো সবাই জুড়ে গরুর গাড়ি ॥

মোড়ল বাড়িতে কলের গান জুড়তো সন্ধ্যা হলে
এ পাড়া ও পাড়ার লোক আসতো দলে দলে ॥

কারো বাড়ির আঙ্গিনাতে কিসসা কাহিনি
খেতে দিতো গুড়ের ক্ষীর আর কুয়ার ঠাণ্ডা পানি ॥

পাল্টে গেল সকল কিছু বদলে গেল দিন
মনের মাঝে বাজেনা আর শান্তি সুখের বীণ ॥

দিনে দিনে বদলে গেল বাঙালি সংস্কৃতি
সব জায়গাতে ভর করেছে অপ-সংস্কৃতি।

পোশাক আশাক চলন বলন যত খাওয়া দাওয়া
বাঙালির গায়ে লেগেছে বিদেশিদের হাওয়া ॥

যুব শক্তি উন্নয়নের সফল হাতিয়ার
এই শক্তিকে ভালো রাখা একান্ত দরকার ॥

অবক্ষয়ের পথটি ধরে যুব শক্তি গেলে
চিন্তা করো মোদের কি আর ভাল জাতি মেলে ॥

যুব শক্তিকে ধ্বংস করছে এমন অপশক্তি
দিনে দিনে গ্রাস করিবে হবেনাতো মুক্তি ॥

দুর্নীতির করাল গ্রাসে আচ্ছাদিত দেশ
এটাকে রোধ না করিলে সবই হবে শেষ ॥

সবার তরে করজোড়ে করি অনুরোধ
এখনওতো সময় আছে মনে জাগাও বোধ ॥

তাইতো বলি ও বাঙালি সবাই করো হুঁস
দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাগো দেশের সব মানুষ ॥

সাংস্কৃতিক উৎসবে আজ একটা কথায় বলি
নিজ কৃষ্টি কালচারের পথ ধরে যেন চলি ॥

সংস্কৃতি মানে নয়কো শুধু বাজনা গান
যা দেখে চেনা যাবে বাঙালির প্রমাণ ॥

এই আসরে শ্রদ্ধা ভরে করি নিবেদন
দেশীয় সংস্কৃতি চর্চায় দাওগো সবাই মন ॥

তা না হলে হারাইবে নিজ পরিচয়
আপন সংস্কৃতি ধরো মাহবুব আলম কয় ॥

www.pathagar.com

দেশজ সংস্কৃতির করো সব লালন
তবেই সার্থক হবে এই উৎসব আয়োজন ॥

হারিয়ে যাওয়া পুথির সুরে বললাম কিছু কথা
এই ধৃষ্টতার জন্য কেও নিওনা মনে ব্যথা ॥

ভুল হইলে করিও ক্ষমা বয়ান করি শেষ
সুখ শান্তিতে ভরে উঠুক মোদের প্রিয় বাংলাদেশ ॥[৫২]

২

শোনেন শোনেন দেশবাসী শোনেন ওরে ভাই
রাজনীতি আর ভোটের কথা আমি বলে যায় ॥

বাংলাদেশে জনসংখ্যা প্রায় ষোল কোটি
রাজনৈতিক দলের সংখ্যাও কম নয়কো মোটই ॥

সঠিক হিসাব পাওয়া যায়না দলের সংখ্যা কত
নিজের নিজের আদর্শ আর মত আছে যত ॥

স্বার্থে আঘাত লাগলে পরে দল ভেঙ্গে দল গড়ে
বাহির হোয়্যা দোষ চাপায় অন্য দলের ঘাড়ে ॥

রাজনীতিরও কোপানলে পড়ে জনগণ
দুঃখ কষ্ট ভোগ করে হিসাব অবর্নন ॥

সব দলই চাহে শুধু আম জনতার ভালো
জনগণ দেখতে পায়না সুখের কোন আলো ॥

স্বার্থের লাগি দলে দলে বিভেদ বিচ্ছেদ
জনগণের সুখ শান্তি হয়যে উচ্ছেদ ॥

জনগণের চাইলে ভালো কেন এত অমিল
তাহা হলে হওনা কেন এক কাতারে সামিল ॥

হানাহানি মারামারি কত রক্তপাত
রাজনীতির মানে কি ঘাত প্রতিঘাত ॥

পাঁচ বছর পরে যখন দেশে আসে ভোট
দলে দলে দল গড়ে বাঁধে সবাই জোট ॥

কেহ করে ঐক্যজোট কেহ অন্যজোট
রাজনীতির ডামাডোলে হয় কি না ভোট ॥

সবার মুখে একই কথা কি দেখছি দেশে
কি হইতে কি হইবে দেখার আছে শেষে ॥

www.pathagar.com

বর্তমানে দেশ এখন জোটে জোটে বিভক্ত
ভোটের আগে বইবে নাকি বানের মত রক্ত ॥

একজোট বলছে সময় মত হবে দেশে ভোট
সব ঠিকঠাক না হইলে রুখবে অন্যজোট ॥

এম পি হবে মন্ত্রী হবে জনগণের ভোটে
পাশ করিয়া খোঁজ রাখেনা জনগণের মোটে ॥

চালের দরে ধান কিনি গামছা লুঙ্গির দরে
মন্ত্রী এমপি আমলা গামলা টাকার পাহাড় গড়ে ॥

আম জনতা যায় পড়ে মিঠা কথার ফাঁদে
ভোট দিয়া রাজা বানাইয়া আবার তারা কাঁদে ॥

জনগণের কাছে দাবি বাঁধো জনতার জোট
ভাল মানুষ বেছে বেছে এবার দাও ভোট ॥

দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথায় আর কেহ ভুলোনা
চোর ছ্যাচ্চোড় গরীব মারাদের আর ভোট দিওনা ॥

মোটা ভাত মোটা কাপড় আম জনতা চায়
ইহার চেয়ে বেশি কিছু আর চাওয়ার নাই ॥

এই বলিয়া যায় চলিয়া পুঁথি করি শেষ
সুখ শান্তিতে ভরে উঠুক সোনার বাংলাদেশ ॥[৫৩]

৩

এত বলি মারে তেগ উপরে কুফ্ফার ॥ দুই খান হয়ে পড়ে হুকুম আল্লার* ফের এক কুফর যে আইল নেকালিয়া ॥ জাফর দোজখ রাহা দিল দেখাইয়া* এই রূপে একে একে যতেক কুফ্ফার ॥ জাফর কাছে না ফিরিল আর* ঘড়িতে সত্তর লোকের গরদান কাটিল ॥ আখেরে পিয়ামে জোর ছাতি শুখাইল* ইমামের কাছে এসে কহিল কাতরে ॥ মারিব কুফর আগে পানি দেহ মোরে* ইমাম বলে শুন জাফর পাহালওয়ান ॥ মেরা কাছে নাই পানি না জান সন্ধান* রাসূলুল্লাহ্ আপনার মোবারক হাতে ॥ পেলাইবে পানি সেই রোজ কেয়ামতে* শুনিয়া জাফর আসি হাজির হইল ॥ একদমে কাফেরের শত গিরাইল* নিদানে পিয়াসে গলা গেল শুখাইয়া ॥ তকত নাহিক তার আগু হৈয়া* কুফর সকলে এসে শহিদ করিল ॥ জাফর পাহালওয়ান মদ্দ বেহেশতেতে গেল* এই রূপে আছিল যতেক পাহালওয়ান ॥ শহিদ হইল দেখ আল্লাহ ফরমান* ইমাম হোসাইন তবে ডাহিন বামেতে ॥ নজর করিয়া শাহা লাগিল বলিতে* ইয়ার আমার কেন নাহি সালামত॥ দেখিয়া কাতর বড় হইল হজরত* কাসেম হাসানের বেটা সওয়ার ॥ একাদশ বৎসর বয়স তাহার* হুকুম চাহিল এসে চাচার সাক্ষাতে ॥ দেখিয়া হোসাইন শাহা লাগিল কান্দিতে* কহিল ইহাকে ভেজি কেমনে ময়দানে ॥ মদদ ইহার পরে কেবল আপনে* কাসেম কুদায় ঘোড়া ময়দান উপর ॥ ইয়াদ পড়িল এক বাত হাসানের* সেই

www.pathagar.com

ঘড়ি হোসাইন ডাকিয়া কহেন বাত ॥ শুন বাবা কাসেম এক খবর নেহাত* জেন্দেগী থাকিতে ভাই এক কওল করে ॥ কওলে খালাস যে করিয়া যাও মোরে* কহিল আমারে শেষ বাত হাসান ভাইয়া ॥ কাসেমে আপন বেটী দেলাইবে বিয়া* এ কওলে বন্দি আছি দুনিয়া ভিতরে ॥ কওল হইতে যে খালাস খালাস দেহ মোরে* কহেন কাসেম, চাচা আরজ আমার ॥ কওল খালাস তবে কর আপনার* শুনিয়া ইমাম বৈসে মজলিস করিয়া ॥ সোয়া ঘড়ি লগন তারে নিলেক ডালিয়া* আনিল সেহরা ফুল বান্ধা জরির হার ॥ যেয়সা ভাতে আছে সব দুনিয়া বেভার* শাদীর সামানা সবে করে খোশালিতে ॥ ক্ষণেকের তরে সবে হয়ে আনন্দিতে* এই রূপে সোয়া ঘরি গোজারিয়া গেল ॥ নেকা পড়াইয়া সে জলুয়া দেখাইল* সকিনারে সঁপে দিল কাসেমের তরে ॥ দুইজনে বৈসে গিয়া খিমার ভিতরে* খোশালিতে দুইজনে রহিল সেথায় ॥ এউ রূপে ঘোড়া ঘড়ি গোজারিয়া যায়* মউতের পিয়ালা যে আইল কাসেমেরে ॥ মালেকুল মউত এসে পৌছিল হুজুরে* দেখিয়া কাসেম খাড়া মালেকুল মউত ॥ বিবীকে মিনতি করে কহেন বহুত* কাসেম কহেন বিবী কহি তেরা তরে ॥ আমারে বিদায় দেহ মহিম উপরে* কাসেমের এয়সা বাত কিছু না শুনিল ॥ পেরেশান হৈয়া বিবী কহিতে লাগিল* বড় বে-দর্দ্দী শাহা কি বলি তোমারে* কেমনে যাইতে চাহ মহিম খাতেরে* আগে মোরে শহিদ করহ নিজ হাতে ॥ তবে গিয়া কর জঙ্গ কারবালাতে* অনাথিনী করে যাবে দুনিয়া ভিতরে ॥ আমার দরদ কে বা বুঝিবে সংসারে* কাসেম কহেন বাত শুনহ আমার ॥ রোজ কেয়ামতে দর্দ্দ করিব তোমার* আপন জামার অস্তিন কাসেম ফাড়িল* সকিনার তরে যে নিশান সেই দিন দিল* কাসেম উঠাই ঘোড়া আইল ময়দানে ॥ খোদার তারিফ করে আরবী জবানে* লানত কুফর পরে কহিল হাকিয়া ॥ কে আছ পাহালওয়ান মর্দ্দ আইস নেকালিয়া* নহেত পানি রাহা দেহত ছাড়িয়া ॥ কে আছ পাহালওয়ান মর্দ্দ আইস নেকালিয়া* নহেত পানি রাহা দেহত ছাড়িয়া ॥ মরিল খেলওয়াত খানা পানি না পাইয়া* পানি পানি করে কাসেম ঘোড়া কুদাইল ॥ বেহুশ হইয়া মর্দ্দ কাটিতে লাগিল* বে হিসাব এজিদানে দালিল মারিয়া ॥ আখেরে আজেজ হৈল পানি না পাইয়া* বেতার হৈল কাসেম পানির খাতেরে ॥ ঘিরিয়া কাফের লোক মারিল তাহারে* পানি পানি মউত হৈল সাবাকার* বিষম কারবালা জমি পানি নাই তাতে ॥ কেবল আছিল পানি ফোরাত নদীতে* কুফর করিল বন্ধ দাও নাহি তায় ॥ এখাতেরে এতেক সীপাই মারা যায়*

৪.

ত্রিপদী* কাসেম শহিদ পাইল, হোসাইন কাতর হৈল, শোকে ছাতি গেল শুখাইয়া ॥ চাহিলেন চারিধাররে, নাহি কেহ বেরাদরে, সবে গেল শহিদ হইয়া* দেখিল শাহা হোসাইন, আপন লাড়কার গঠন, চারিজন বিনে কেন নাই ॥ এক আলী আকবর, আর আলী আসগর, আব্দুল্লাহ আকবর আর ভাই* জয়নাল আবেদনী চারি, দুনিয়ার অধিকারী, সবে কেবল এই চারি জিয়া ॥ দেখিয়া ইমাম শাহা, মুখে বলে আহা আহা, শোক দুঃখে ফাটে তার হিয়া* সেই আলী আকবর, যেয়সা সেই পয়গম্বার, রাসুলের গঠন গায়ে তার* বয়সে বছর ষোল, দুনিয়া কারেছে আলো, চাঁদ যেন আলী বরাবর*

www.pathagar.com

যীউ এয়সা জানিতেন, বিবি উম্মে সালেমান, উম্মে কুলসুম আর যত ॥ সবার জানের সাথী, মায়ের গলার মতি, সব গুণ ধরে নানা মত* দেখিল সম্মুখে বাপ, পয়লা বিষম তাপ, কি করিবে ভাবিছে কাতরে ॥ জানিয়া কমর বান্ধে, দেখিয়া জননী কাঁন্দে, সাজওয়াল পরিল অঙ্গ পরে* কমরে জিঞ্জির পাটি, জরির পটকা আটি, তার পরে বান্ধে তলওয়ার ॥ খঞ্জর কাটারী ছুরি, ডাহিন বামেতে ধরি, গোশ্বায় বলেন মার মার* শিরেতে লোহার টোপ, মারিতে লাগিল কোপ, কামান ধরিল বাম হাতে ॥ দোন আখি অতি লাল, পিঠ পরে বান্ধে ঢাল, কহে কিছু বাপের স্বাক্ষাতে* হুকুম করহ তুমি, এবার মহিমে আমি যাইয়া ঘুচাবো মনের স্বাদ ॥ দোয়া কর মোরে বাপ, ঘড়িতে ঘুচাই তাপ, কি খাতেরে ভাব পরমাদ* শুনিয়া বেটার বাত, হোসাইন জুড়িয়া হাত, ইলাহীর মোনাজাত করে ॥ শোকেতে কাতর হাতি, যেন বরিষন নিতি, অশ্রুধারা মুখ বেয়ে পড়ে* ।[৫৪]

তথ্যনির্দেশ

১. মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন কাসিমপুরী, প্রসঙ্গ কথা, লোকসাহিত্যে ছড়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮,
২. ড. ওয়াকিল আহমদ, 'লোকসাহিত্য', বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, সম্পাদনা, প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা-১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৫৫২
৩. সাক্ষাৎকার : মো. ইমরান হোসেন(বয়স-২৩), পিতা-আবল কাশেম, গ্রাম ও ডাক- গোবরাতলা, উপজেলা ও জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। সাক্ষাতের তারিখ-০৩.০২.২০১২
৪. সাক্ষাৎকার : মো. আনিসুর রহমান(বয়স-২৩), পিতা-রাব্বিল হোসেন, গ্রাম ও ডাকঘরঃ গোবরাতলা, উপজেলা ও জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। সাক্ষাতের তারিখ-০৫.০২.২০১২।
৫. সাক্ষাৎকার : বাবু (বয়স-৪৭), পিতা-ফজলুর রহমান, গ্রাম-অনুপনগর, উপজেলা ও জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। সাক্ষাতের তারিখ-০৩.০৩.২০১২
৬. তদেব
৭. তদেব
৮. তদেব
৯. তদেব
১০. তদেব
১১. তদেব
১২. সাক্ষাৎকারঃ আব্দুল ওয়াদুদ (বয়স-৪২), পিতা- মাও. গিয়াস উদ্দীন, গ্রাম- রেহাইচর, ডাক- উপজেলা ও জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। তারিখ-২২.০৫.২০১২
১৩. সাক্ষাৎকারঃ একরামুল হক (বয়স-৪৮), পিতা-আলফাজ উদ্দীন, গ্রাম-ফৌজদারপাড়া, ডাক- হাটবাকইল, উপজেলা-নাচোল, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। সাক্ষাতের তারিখ-২০.০৫.২০১২
১৪. সাক্ষাৎকারঃ মো. আনিসুর রহমান, প্রাগুক্ত
১৫. সাক্ষাৎকারঃ রফিকুল ইসলাম (বয়স-৫০), পিতা-আবুল কালাম, গ্রাম ও ডাক- রহনপুর, উপজেলা-গোমস্তাপুর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। তারিখ-০৩.০২.২০১২
১৬. সাক্ষাৎকার : আব্দুল কাইউম (বয়স-৫৭), পিতা-সাইফুদ্দীন মণ্ডল, গ্রাম-কলমা, ডাক- চোরখোর, উপজেলা-তানোর, জেলা-রাজশাহী। সাক্ষাতের তারিখ-০৫.০৫.২০১২

www.pathagar.com

১৭. আ.কা.শ. নূর মোহাম্মদ, নবাবগঞ্জ পরিচিতি, রাজশাহী জেলা কাউন্সিল, রাজশাহী, ১৩৭৩, পৃ. ২২
১৮. মাযহারুল ইসলাম তরু, গৌড় থেকে চাঁপাই, প্রাইম পাবলিকেশনস, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ২০০৭, পৃ. ৪৫
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭
২১. ড. দুলাল চৌধুরী, 'প্রাচীন সভ্যতায় লোকপুরাণ', 'লোকপুরাণ ও সংস্কৃতি' সম্পাদক, ড. পল্লব সেনগুপ্ত, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৫৩
২২. প্রাগুক্ত
২৩. ড. পল্লব সেনগুপ্ত,'লোকপুরাণঃ মুখবন্ধ', 'লোকপুরাণ ও সংস্কৃতি' পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৭
২৪. দিনেশ কুমার সরকার, 'মিথ ও লোকাচার', 'লোকপুরাণ ও সংস্কৃতি' সম্পাদক, ড. পল্লব সেনগুপ্ত, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ১০
২৫. দেবীলাল টুডু, পিতা-বিরু টুডু, মাতা-সীতা হেমব্রম, গ্রাম-দেলবাড়ি, ডাকঘর-গোবরাতলা, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স ২৫ বছর
২৬. কর্ণেলুইস মুর্মু, গ্রাম-দেলবাড়ি, ডাকঘর-গোবরাতলা, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স ৪৯ বছর
২৭. ডা. মদন বারোয়ার, গ্রাম-রাজবাড়ি, ডাকঘর-নাচোল, উপজেলা-নাচোল, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স ৬০ বছর
২৮. উত্তম বারোয়ার, পিতা-মঘেনাদ বারোয়ার, গ্রাম-রাজবাড়ি, ডাকঘর-নাচোল, উপজেলা-নাচোল, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স ৪৫ বছর
২৯. আবদুস সালাম কেরামত, পিতা-মো. মালেক উস্তুর, মাতা-জুবাইদা খাতুন, গ্রাম-পলশা, পোস্ট-চাঁপাই, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৫২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-উচ্চ মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ-২৫.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৩০. সিরাজুল ইসলাম, পিতা-মরহুম মোজাফ্ফর হোসেন মিয়া, মাতা-মরহুম মালেকা বেগম, গ্রাম-বারোঘরিয়া, পোস্ট-বারোঘরিয়া, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৭২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতকোত্তর, সংগ্রহের তারিখ-২৬.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৩১. আমানুল হক, পিতা-মরহুম আলহাজ নুরুল হক, মাতা-মৃত মালেকা খাতুন, গ্রাম-বারোঘরিয়া, পোস্ট-বারোঘরিয়া, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৫৯ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতকোত্তর, সংগ্রহের তারিখ-২৬.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:৩০ টা
৩২. মোহাঃ রেজাউল্লাহ, পিতা-মোহাঃ সানাউল্লাহ, মাতা-মাহমুদা বেগম, গ্রাম-চতুরপুর, পোস্ট-শিবগঞ্জ, উপজেলা-শিবগঞ্জ, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৫২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ-২১.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা
৩৩. সাক্ষাৎকারঃ বংশীরঞ্জন পাল (বয়স-৮৯), পিতা-যতীন্দ্রনাথ পাল, গ্রাম ও ডাক- বারঘরিয়া, উপজেলা ও জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ। সাক্ষাতের তারিখ- অক্টোবর-নভেম্বর মাসের বিভিন্ন সময়, ২০১১

www.pathagar.com

৩৪. এনামুল হক(বয়স-৪৬), পিতা- আলহাজ সোহরাব আলী, গ্রাম- বিশালপুর, ডাক-হাটরাজবাড়ি, উপজেলা-নাচোল, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৩৫. মো. আব্দুল মালেক, পিতা-মরহুম আমানুল্লাহ, গ্রাম-মোহনপুর, পোস্ট-টিকরামপুর, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৭৬ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-পঞ্চম শ্রেণী, সংগ্রহের তারিখ-২১.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা
৩৬. মো. আব্দুল মালেক, পিতা-মরহুম আমানুল্লাহ, গ্রাম-মোহনপুর, পোস্ট-টিকরামপুর, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৭৬ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-পঞ্চম শ্রেণী, সংগ্রহের তারিখ-২১.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা
৩৭. মো. আব্দুল মালেক, পিতা-মরহুম আমানুল্লাহ, গ্রাম-মোহনপুর, পোস্ট-টিকরামপুর, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৭৬ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-পঞ্চম শ্রেণী, সংগ্রহের তারিখ-২১.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা
৩৮. মাযহারুল ইসলাম তরু, চাঁপাইনবাবগঞ্জের লোকসংস্কৃতি পরিচিতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৯৪-৯৫
৩৯. মোঃ শামশুদ্দিন, পিতা-মরহুম লোকমান বিশ্বাস, মাতা-মরহুম হাসিনা বেগম, গ্রাম-মহারাজপুর, পোস্ট-মহারাজপুর, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৪৭ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতকোত্তর, সংগ্রহের তারিখ-২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৪০. তাহেরা ইসলাম, স্বামী-সিরাজুল ইসলাম, মাতা-মরহুম জায়েদা বেগম, গ্রাম-বারোঘরিয়া, পোস্ট-বারোঘরিয়া, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৬২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-উচ্চ মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ-২৭.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৪১. মো. আব্দুর রহমান(বয়স-৫০), পিতা- সলেমান মণ্ডল, গ্রাম ও ডাক-হাট বাকইল, উপজেলা-নাচোল, জেলা-চাঁপাইনববাগঞ্জ। সাক্ষাতের তারিখ-০১.০১.২০১২; সাহেলা বেগম,(বয়স-আনু ৭৬), স্বামী- মুনির বিশ্বাস, বসনী টোলা, চৌডালা, উপজেলা-গোমাস্তাপুর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ। সাক্ষাতের তারিখ- ০৭.০৫.২০১২
৪২. সাক্ষাৎকারঃ মো. আনিসুর রহমান (বয়স-২৩), পিতা- মো. রাব্বিল হোসেন, গ্রাম ও ডাক- গোবরাতলা, উপজেলা ও জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ। সাক্ষাতের তারিখ- ১১.০২.২০১২
৪৩. সাক্ষাৎকারঃ মো. আনিসুর রহমান, প্রাগুক্ত।
৪৪. সাক্ষাৎকারঃ ক. আব্দুল মান্নান(বয়স-৫৫), পিতা-ঝাটু মণ্ডল, গ্রাম ও ডাক- হাট বাকইল, উপজেলা নাচোল, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। সাক্ষাতের তারিখ-০১.০১.২০১২। খ. মোসাঃ মুল্লিকা(বয়স-১৪), পিতা- মো. রাব্বিল হোসেন, গ্রাম ও ডাক- গোবরাতলা উপজেলা ও জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। সাক্ষাতের তারিখ-১১.০২.২০১২
৪৫. সাক্ষাৎকারঃ ক. আব্দুল মান্নান, প্রাগুক্ত। খ. সাদিকুল ইসলাম অপেল(বয়স-৪৯), পিতা-মুনির বিশ্বাস, গ্রাম- বসনিটোলা, ডাক- চৌডালা, উপজেলা-গোমাস্তাপুর জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। সাক্ষাতের তারিখ- ০৭.০৫.২০১২
৪৬. সাক্ষাৎকারঃ মোসাঃ আসেক খাতুন(বয়স-আনু ৪৯), পিতা- ফানেস বিচ্ছু, গ্রাম-চামাগ্রাম, ডাক-বারঘরিয়া উপজেলা ও জেলা- চাঁপাইনাবাবগঞ্জ। সাক্ষাতের তারিখ-০৪.০৫.২০১২
৪৭. সাক্ষাৎকারঃ মো. আনিসুর রহমান, প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

৪৮. সাক্ষাৎকারঃ আব্দুল কাইউম (বয়স-৫০), পিতা-লাল মোহম্মদ পণ্ডিত, গ্রাম ও ডাক- হাট বাকইল, উপজেলা নাচোল, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। সাক্ষাতের তারিখ-০২.০১.২০১২; মো. আনিসুর রহমান, প্রাগুক্ত
৪৯. সাক্ষাৎকারঃ আব্দুল কাইউম, প্রাগুক্ত; মো. আনিসুর রহমান, প্রাগুক্ত
৫০. সাক্ষাৎকারঃ আব্দুল কাইউম, প্রাগুক্ত; আকলাকুল (বয়স-৪৬), পিতা-মুনির বিশ্বাস, গ্রাম-বসনিটোলা, ডাক- চৌডালা, উপজেলা-গোমাস্তাপুর জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। সাক্ষাতের তারিখ- ০৭.০৫.২০১২
৫১. সাক্ষাৎকারঃ বংশীরঞ্জন পাল (বয়স-৮৯), পিতা-যতীন্দ্রনাথ পাল, গ্রাম ও ডাক- বারঘরিয়া, উপজেলা ও জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ। সাক্ষাতের তারিখ- অক্টোবর-নভেম্বর মাসের বিভিন্ন সময়,২০১১; এনামুল হক(বয়স-৪৬), পিতা- আলহাজ সোহরাব আলী, গ্রাম- বিশালপুর, ডাক- হাটরাজবাড়ি, উপজেলা-নাচোল, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৫২. মাহবুবুল আলম, পিতা-সাদাতুল ইসলাম, মাতা-বিলকিস বানু, গ্রাম-চাঁপাই-দূর্গাপুর, পোস্ট-উপররাজারামপুর, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৬০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ-২১.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা
৫৩. মাহবুবুল আলম, পিতা-সাদাতুল ইসলাম, মাতা-বিলকিস বানু, গ্রাম-চাঁপাই-দূর্গাপুর, পোস্ট-উপররাজারামপুর, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৬০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ-২১.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা
৫৪. শাহ্জাহান প্রামাণিক, পিতা-মরহুম রুস্তম প্রামাণিক, মাতা-দুলু বিবি, গ্রাম-মসজিদপাড়া, পোস্ট-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৫৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ-২৬.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

www.pathagar.com

গ্রাম/স্থান নামকরণ

নলুয়াপাড়া/ লোল্যাপাড়া : নবাব আলীবর্দী খাঁর সময় বর্গীর আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে কিছু মানুষ নবাবগঞ্জ শহরের প্রাণকেন্দ্রে মহানন্দা নদীর তীরে এসে বসতি স্থাপন করে। এখানে এসে তারা নলখাগড়া দিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করতো। এই নলখাগড়ার 'নল' থেকে 'নলুয়া' শব্দটি এবং তার সাথে 'পাড়া' যুক্ত করে নলুয়া পাড়া নামকরণ করা হয়। স্থানীয় মানুষের ভাষায় পরিচিত হয়ে পড়ে তা লোল্যাপাড়ায় রূপান্তরিত হয়।[১]

আজাইপুর : নবাবগঞ্জ শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত আজাইপুর এক সময় সৌর্যবীর্যে এলাকার মধ্যে শীর্ষস্থানে ছিল। বাহুবল, শিক্ষা-দীক্ষার দিক দিয়ে কেউ তাদের পরাজিত করতে পারতো না। তাই 'অজয়' শব্দটি থেকে আজাইপুরের নামকরণ করা হয়।

বারোঘরিয়া : মহানন্দা নদীর তীরে অবস্থিত বারোঘরিয়া নবাবগঞ্জ শহর গড়ে ওঠার আগে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই জনপদের নামকরণ প্রসঙ্গে প্রবীণ শিক্ষাবিদ আমির হোসেনের সূত্রে জানা যায় যে, বসতির সূচনালগ্নে এই ভূখণ্ডে কৃষক, জেলে, তাঁতি, ধোপা, মুচি, কামার, কুমার, কলু, ছুতার সহ মোট বার পেশার মানুষ বসবাস শুরু করে। বার পেশার মানুষের ঘর তথা বসবাসের কারণে গ্রামের নাম 'বারোঘরিয়া' হয়।[২]

পাঠানপাড়া : নবাবগঞ্জ শহরের প্রাণকেন্দ্রে পাঠান সম্প্রদায়ের বসবাসের এলাকা পাঠান পাড়া নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। বর্তমানে পাড়া দুইভাগে বিভক্ত –পূর্ব পাঠান পাড়া পশ্চিম পাড়া।[৩]

ফকিরপাড়া : অত্যন্ত প্রাচীনকালে নবাবগঞ্জ শহরের একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে পীর-ফকির তথা কামেল ব্যক্তিদের আবাস গড়ে ওঠে। কামেল পীররা এ অঞ্চলে ফকির নামে পরিচিত। এই কারণে এ পাড়ার নাম 'ফকির পাড়া' হয়েছে।

চুনারীপাড়া : ফকির পাড়ার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে চুন প্রস্তুতকারীদের বসবাস ছিল। তাদের পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে এলাকার নাম চুনারী পাড়া রাখা হয়।

চুড়িআলী পাড়া : ফকিরপাড়া ও চুনারী পাড়ার মাঝামাঝি স্থানে সৌখিন সামগ্রীর ব্যবসায়ীদের বসবাস ছিল। মূলত চুড়ি ছিল তাদের প্রধান পণ্য। কাঁচের চুড়ির কদর ছিল খুব, ব্যবস্যা ছিল জমজমাট। চুড়ি বিক্রির জমজমাট ব্যবসার কারণে গ্রামের নাম চুড়িআলী পাড়া রাখা হয়।[৪]

www.pathagar.com

বটতলাহাট : চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের দক্ষিণ দিকে প্রকাণ্ড একটি বটগাছ ছিল। এই বটগাছের নিঠে হাট বসতো। এত বড় হাট অত্রাঞ্চলে আর ছিলো না। বটতলার নিঠে হাট বসার কারণে জনপদটি 'বটতলাহাট' নামে খ্যাতি লাভ করে।[৫]

গোয়ালপাড়া : গোয়ালা সম্প্রদায়ের বসবাসের কারণে পুরাতন বাজার সংলগ্ন এলাকার নাম গোয়ালপাড়া রাখা হয়।

বাসুনিয়াপট্টি : কাঁসা-পিতলের জন্য চাঁপাইনবাবগঞ্জ বিখ্যাত। গোয়ালপাড়া সংলগ্ন এলাকায় ছিল কাঁসা- পিতলের বাসুনি পত্র তৈরির কারখানা। বাসুন তৈরির কারণে এ অঞ্চলকে বাসুনিয়াপট্টি নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।[৬]

কিচনিদহ : সুন্দরপুর ইউনিয়নের এই গ্রামের পাশে রয়েছে বিশাল দহ বা গভীর জলাশয়। এলাকাবাসীর সূত্রে জানা যায় এই দহে এক সময় 'কিচনি' নামে এক ধরণের নারী বাস করতো। তারা ভরদুপুরে দহ থেকে উঠে রৌদ্রে চুল শুকাতো। তারা অত্যন্ত ভয়ংকর ছিল। যদি কেউ এই দহতে গোসল করতে নামতো তাহলে তারা তাকে তাদের চুল দিয়ে পেচিয়ে ডুবিয়ে নিতো। যখন মৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হতো তখন তার পায়ে জড়ানো চুল এর সত্যতা প্রমাণ করতো। কিচনি এবং দহ শব্দ দুটিকে সংযুক্ত গ্রামের নাম কিচনিদহ করা হয়েছে।[৭]

গিধনীপাড়া : চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার গিধনী পাড়ার নামকরণ করা হয় শকুনের নামানুসারে এই পাড়ার গাছে গাছে অনেক শকুন দেখা যেত। শকুনকে স্থানীয় ভাষায় গিধনী বলা হয়ে থাকে। সেই কারণে পাড়াটি গিধনীপাড়া নামে পরিচিত।

ভূতপুকুর : চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের পূর্ব-উত্তর কোণে একটি অত্যন্ত পুরাতন পুকুর রয়েছে। কথিত আছে এই পুকুরে ভূত-প্রেতসহ বিভিন্ন অশরীরি আত্মা বসবাস করে। পুকুরের আশেপাশে কোন বসতি ছিলনা। পরবর্তীতে যখন বসতি গড়ে ওঠে, তখন পাড়ার নাম ভূতপুকুর রাখা হয়।[৮]

চামাগ্রাম : চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদরে উপজেলার বারোঘরিয়া ইউনিয়নে অবস্থিত একটি গ্রামের নাম চামাগ্রাম। 'চামা' অর্থ অনুর্বর। একসময় সবদিক দিয়েই গ্রামটি পিছিয়ে পড়েছিল। তখন এলাকাবাসী গ্রামের নাম 'চামাগ্রাম' রাখেন।

লক্ষীপুর : বারোঘরিয়া ইউনিয়নে একটি গ্রামের নাম লক্ষীপুর। হিন্দু এলাকা হওয়ায় গ্রামের নামকরণ দেবী লক্ষীর নামানুসারে লক্ষীপুর রাখা হয়।

দূর্গাপুর : চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভায় অবস্থিত একটি গ্রামের নাম দূর্গাপুর। হিন্দুপ্রধান এলাকা হওয়ায় দেবী দূর্গার নামে গ্রামের নাম 'দূর্গাপুর' রাখা হয় বলে এলাকাবাসী জানান।[৯]

কানসাট : শিবগঞ্জ উপজেলার একটি সমৃদ্ধ জনপদ কানসাট। এখানে একসময় বৃহৎ আকারের কাঁসার হাট বসতো। সংস্কৃত কংশ হট্ট শব্দ থেকে কানসাট নামকরণ করা হয়েছে বলে অভিজ্ঞ মহল জানান।

রসিকনগর : শিবগঞ্জ উপজেলার রানীহাটি ইউনিয়নের একটি সমৃদ্ধশালী গ্রাম 'রসিকনগর'। এই গ্রামে ছিল কানসাটের জমিদার (কুজা রাজা) এর গোমস্তার বাড়ি।

www.pathagar.com

এখানকার মানুষ ছিল সাহিত্য-সংস্কৃত রসিক। বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি হতো এখানে। রস-রসিকতায় এই এলাকার মানুষের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই কারণেই এলাকার নাম রসিকনগর রাখা হয়েছে বলে এলাকার প্রবীণ সাংবাদিক তসলিম উদ্দিনের ধারণা।[১০]

রানীহাটী : কানসাটের রাজার সঙ্গে রানীহাটী এলাকার যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত নিবিড়। রানীহাটীর ওপর দিকে একটি সড়ক ছিল। যাতায়াতের জন্য তা ছিল একমাত্র বড় সড়ক। কানসাট রাজার রানী এই অঞ্চলটি খুব পছন্দ করতেন। তাই তাঁর প্রতি সম্মান জানিয়ে এলাকার নাম রানীহাটী রাখা হয় বলে জানা গেছে।

তথ্যনির্দেশ

১. আবুল কাশেম শেখ নূর মোহাম্মদ, নবাবগঞ্জ পরিচিতি, রাজশাহী জেলা কাউন্সিল, রাজশাহী, ১৩৭৩, পৃ. ২৩

২. মো. আবদুস সালাম ফিরোজ, পিতা-ফজলুল করিম, মাতা- রৌশন আরা বেগম রুনু, পোস্ট- বারোঘরিয়া, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৪৬ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ-২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

৩. মো. মোসফিকুর রহমান, পিতা- মরহুম রেজাউর রহমান, মাতা- মরহুম ফাতেমা বেগম, গ্রাম- পাঠানপাড়া, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৫৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতকোত্তর, সংগ্রহের তারিখ- ২২/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা

৪. মো. জুয়েল আখতার মানিক, পিতা-মো. আবেদ আলী, মাতা-আকতারী বেগম, গ্রাম- ফকিরপাড়া, পোস্ট-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-২৬ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ-২২/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা

৫. সেলিম, পিতা-মো. লোকমান হোসেন, গ্রাম-বটতলাহাট, পোস্ট-বটতলাহাট, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৪৬ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-উচ্চ মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ-২৩/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা

৬. মো. মুরাদ আলী, পিতা- মো. নজরুল ইসলাম, মাতা- মরহুম মেটকী বেগম, গ্রাম- আরামবাগ, পোস্ট-বটতলাহাট, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-২০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-উচ্চ মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ-২৪/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা

৭. মো. দুরুল হোদা, পিতা- জোবদুল হক, মাতা- মোসা. আমেনা খাতুন, গ্রাম- কিচনীদহ, পোস্ট- সুন্দরপুর, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৫০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতকোত্তর, সংগ্রহের তারিখ-২২/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা

৮. মোস্তাক হোসেন, পিতা-আবুল হোসেন, মাতা-হামিদা বেগম, গ্রাম-ভূতপুকুর, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৩৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ-২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা

www.pathagar.com

৯. মাহবুবুল আলম, পিতা- সাদাতুল ইসলাম, মাতা- বিলকিস বানু, গ্রাম- চাঁপাই-দূর্গাপুর, পোস্ট-উপররাজারামপুর, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৬০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ-২১/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা

১০. মো. তসলিম উদ্দীন, সাংবাদিক- দৈনিক ইত্তেফাক, গ্রাম-রসিকনগর, পোস্ট- রানীহাটি, উপজেলা- শিবগঞ্জ, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৬৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ-২১/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা

www.pathagar.com

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি

পুথিগত শিক্ষার বাইরে আমাদের গ্রামীণ অশিক্ষিত কারিগররা যে সমস্ত বস্তু উদ্ভাবন ও সৃষ্টি করে এবং সেই বস্তু যখন সমগ্র সমাজের ও দেশের সামগ্রী হয়ে ওঠে সেগুলোকে আমরা বস্তুগত লোকসংস্কৃতি বলে থাকি। যেমন–গরুর গাড়ি, মহিষের গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, নৌকা ইত্যাদি। এছাড়া লোকশিল্প অর্থাৎ Folk Arts and Crafts এর সামগ্রিক আবেদন বস্তুকে কেন্দ্র করে প্রতিভাত হয় বলে এগুলো বস্তুগত লোকসংস্কৃতি। বস্তুগত লোকসংস্কৃতির বিস্তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রখ্যাত ফোকলোরবিদ ড. মযহারুল ইসলাম বলেছেন, বস্তুগত লোকসংস্কৃতি পূর্ব পুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষের নিকট, সমাজের একজনের একটি থেকে সমগ্র সমাজের নিকট এবং এক দেশ বা সমাজ থেকে অপর দেশে বা সমাজে কতকগুলো উপায়ে প্রচারিত, প্রবর্তিত বা অনুসৃত হয়–

ক. মুখে মুখে শুনে অনেক জিনিস প্রস্তুত করার পদ্ধতি প্রচারিত হতে পারে।
খ. দেখেও শিখতে পারে–যেমন ঘরবাড়ি, বেড়া, লাঙলে, মই ইত্যাদি প্রস্তুত পদ্ধতি।
গ. অনেক সময় অনুকরণের মাধ্যমেও শিখতে পারে। যেমন একটি মাটির পাত্রে নকশা করা বা Folk Arts and Crafts এর অন্তর্গত উপকরণসমূহ।[১]

লোকশিল্প

লোকশিল্প লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত একটি অন্যতম প্রধান ও বর্ণাঢ্য শাখা। লোকশিল্পের সংজ্ঞা ও পরিধি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ নানা প্রকার মতামত ব্যক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে বারীন্দ্র মজুমদার বলেন, শিল্পের জন্যই হলো ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদে। কিন্তু সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে বুদ্ধি বিকাশের ফলে শিল্পীর কুশলতাও বেড়েছে, উপকরণও অনেক বেশি জুটেছে তার হাতে। শিল্পীর চেতনা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক একটি শিল্পরূপ তার নিজস্ব চরিত্র অর্জন করতে করতে বিশিষ্ট হয়ে ব্যবহারিক তাৎপর্যটুকু আর থাকেনি। কিন্তু তার স্মৃতিটুকু থেকে গেছে অপভ্রংশের আকারে। প্রত্যক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতীক। কামনার প্রতিচ্ছবিকে রূপ দেওয়ার চেয়ে কারিগরের দিক তখন বেশি লক্ষ্য। লোকশিল্পের আধার হচ্ছে সেই আদিম-আচার-অনুষ্ঠানের স্মৃতির ভগ্নাংশ, কিন্তু তাতে লোক উপকরণের আবির্ভাব ঘটেছে তখনই, যখন সমাজ তার দৃঢ় ভিত্তি গেঁথেছে একটা নির্দিষ্ট শ্রেণির ওপর। বিভিন্ন শ্রেণির বিন্যাসে সংঘঠিত সমাজে জন সাধারণ যে শিল্পরূপের মাধ্যমে তাদের রূপসৃষ্টির প্রকাশকে অবধারিত করে তাকেই বলি লোকশিল্প।[২]

চাঁপাইনবাবগঞ্জ লোকশিল্পে সমৃদ্ধ জনপদ। এ অঞ্চলের লোকশিল্প অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় যা মানুষের গভীর অনুভূতি থেকে উৎসারিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে এবং মানুষের

www.pathagar.com

চাহিদা ও উপযোগিতা পূরণে সাহায্য করেছে। এসব লোকশিল্পের মধ্য দিয়ে মানুষেরই প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। এসব শিল্পকর্মে শিল্পী তার জীবনাচরণ, কায়িক পরিশ্রম, সৃজনশীল কর্মকাণ্ড, অনুভব, চেতনা ও অভিপ্রায় ধারণ করেছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার লোকশিল্পের মধ্যে তামা-কাঁসা-পিতল, মৃৎশিল্প, বস্ত্রবয়ন, নকশী কাঁথা, ভেড়ার লোমের কম্বল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১.মৃৎশিল্প

একটি দেশের সমাজবদ্ধ মানুষের পরিচিতি ও গৌরবের বিষয় হচ্ছে তার সংস্কৃতি। অনুশীলনের মধ্য দিয়ে দেহ-মন-হৃদয় ও আত্মার উৎকর্ষই হচ্ছে সংস্কৃতি। কোন দেশ ও জাতির পরিচয় বহন করে সেই দেশের সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির একটি ধারা লোকসংস্কৃতি। সংস্কৃতি শব্দের আগে পারিভাষিক শব্দ 'লোক' যুক্ত হয়ে 'লোকসংস্কৃতি' শব্দটি হয়েছে। "এই লোক বলতে শুধুমাত্র জনসাধারণ গ্রামীণ বা লোকায়ত সমাজের অধিকাংশ নিরক্ষর মানুষ; কিন্তু তারা অশিক্ষিত নয় এবং যারা কৃষিকেন্দ্রিক সংহত জনগোষ্ঠীর শরিক। আবার ভৌগোলিক সান্নিধ্যে অথবা জীবিকার বন্ধনে পরস্পর দৈনন্দিন আদান-প্রদানের অংশীদার।[৩]

"আদিম শিল্প অর্থাৎ Primitive Art থেকে কৃষিভিত্তিক সমাজে বিভিন্ন কর্মাদিকে মানুষ তার প্রয়োজনীয় ঘরবাড়ি, তার আসবাবপত্র, গৃহস্থালী দ্রব্য, তার আচার-অনুষ্ঠান, তার ভৌগোলিক ও নৈসর্গিক পরিবেশের অনুকূল ধ্যান-ধারণায় তৈরি ব্যবহারিক রূপের অতিরেকে (Surplus Value) নান্দনিক চেতনায় যে সব দ্রব্য আত্মপ্রকাশ করে তাই লোকশিল্প।[৪] এমনি এক লোকশিল্প চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মৃৎশিল্প।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের সদর উপজেলার মহানন্দা নদীর তীর ঘেঁষে গড়ে উঠা জনপদ বারঘরিয়া। এই বারঘরিয়া এক সময় ব্যবসায়িক কারণে বিখ্যাত ছিল। এখানে আনুমানিক ১৭৫ থেকে ১৮০টি পরিবারের প্রায় ৯০০ জন লোক মৃৎশিল্পের সাথে জড়িত। পুরুষানুক্রমে তারা এ পেশায় নিয়োজিত। কোন কোন পরিবারের ছেলে মেয়েরা আধুনিক শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করে চাকুরীতে যোগদান করেছে; কিন্তু এমন সংখ্যা খুবই কম। স্কুল কলেজগামী ছেলে-মেয়েরা অবসর সময়ে বাবা মা বা পরিবারের অন্যান্য মৃৎশিল্পীদের সাথে বিভিন্ন মাটির পাত্র কিম্বা পুতুল গড়তে সহায়তা করে থাকে।

বারঘরিয়ার একজন মৃৎশিল্পী গোপাল চন্দ্র পাল (৬৮), অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখা পড়া করা একজন অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী।[৫] তিনি যখন চাকুরিরত ছিলেন, তখনও অফিস থেকে এসে অবসর সময়ে মৃৎশিল্পের কাজ করতেন। এখন অবসর জীবনের পুরো সময়টায় তিনি এই মৃৎশিল্পের কাজে ব্যস্ত থাকেন। পুরুষানুক্রমে তিনি পেয়েছেন এই পেশা। তাঁর বড় ছেলে মৃণাল কান্তি পাল (২৫), এম.এ বর্তমান বারঘরিয়া ইউনিয়ন পরিষদের সচিব পদে কর্মরত। তিনিও অবসর সময়ে বাবাকে মাটির বিভিন্ন পাত্র তৈরি করতে যেমনঃ ব্যাংক, ছোট ছোট বিভিন্ন পুতুল ও রঙ করার কাজে সহযোগিতা করে থাকেন।

এই পেশার শিল্পীদের সম্পর্কে গোপাল বাবু বলেন যে, আগের তুলনায় এখন এই পেশার শিল্পীরা অর্থনৈতিকভাবে ভালো আছেন। কেউ কেউ আবার ভিন্ন কথা বলেন।

www.pathagar.com

এমন একজন মৃৎশিল্পী নাড়ু গোপাল পাল (৬০)।[৬] তিনি সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন। তারই নাতনি ডলি রানী পাল (১৮), মাটির টব তৈরি করে[৭] এবং বাড়িতে বসেই সে এগুলো বিক্রি করে। সে পড়ালেখা করেছে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত। অভাবের তাড়নায় আর স্কুলে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। অতঃপর যা হবার তাই হয়েছে। বাবা মানিক চন্দ্র পালের (৪০) সাথে সংসারের হাল ধরতে পুরুষানুক্রমে পাওয়া এ পেশাকে আনন্দের সাথে গ্রহণ করেছে। স্কুলে যেতে না পারা নিয়ে তার মনে কোন ক্ষোভ নেই। হাসতে হাসতেই তার সাথে কথা হচ্ছিল। প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর ডলি হেসে হেসেই ছড়া কেটে বলে "ময়না ময়না ময়না, সতীন যেন হয় না" আর বিক্রি করে ফুলের টব।

ডলি রানী পাল

আর এক শিল্পী নাথুরাম পাল (২৫)।[৮] পড়ালেখা করেছেন ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত। তারপর আর সুযোগ না হওয়ায় সেই দুরন্ত কৈশর থেকেই এ পেশায় নিয়োজিত। আজ আর এ নিয়ে তার কোন আক্ষেপ নেই। কেননা এ পেশায় তিনি তার পরিবারের লোকজন নিয়ে স্বাচ্ছন্দে আছেন। তিনি পরিবারের সবাইকে নিয়ে কাজ করার সম্পর্কে সুন্দর একটি প্রবাদ শোনালেন, "ছায়ে পোয়ে কুমার তিনজনতে কামার।" চুনারিপাড়ার এই শিল্পী বিভিন্ন পাত্র তৈরির পূর্বে কীভাবে মাটি তৈরি করতে হয় সেই অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন। প্রথমে মাটি কিনতে হয়। এক ভ্যান (আনুমানিক ১০/১২ বস্তা) মাটির দাম ১০০ থেকে ১৫০ টাকা। মাটি কেনার পরে সেই মাটিকে একদিন জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হয়। মাটি ভিজলে পরে সেই মাটিকে কোদালের সাহায্যে ছোট ছোট অংশে ভাগ (কুমার=(মৃৎশিল্পী), ছায়ে-পোয়ে=(ছেলে-মেয়ে) করে নিতে হয়। মাটি ভালোভাবে ভিজলে সেই মাটিকে পাত্র তৈরির উপযুক্ত করার জন্য পুনরায় জল আর বালি দিয়ে ভালো করে তৈরি করতে হয়। মাটির ভাঁড় বা গ্লাস তৈরি করার জন্য

www.pathagar.com

প্রয়োজন হয় চিকন বালি এবং অন্যান্য পাত্র যেমন: টব, চারি ইত্যাদি তৈরি করতে লাগে মোটা বালি। বিভিন্ন পাত্র তৈরির উপযোগী মাটি তৈরি করতে সময় লেগে যায় তিন থেকে চার দিন। অনেক শ্রমের বিনিময়েই তৈরি হয় নানা জাতের পাত্র।

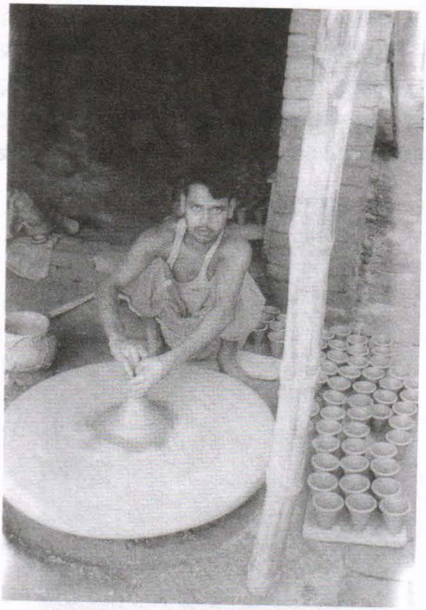

নাথুরাম পাল

বেশিরভাগ মৃৎশিল্পীদের সাজানো গোছানো কোনো দোকানঘর নেই। বাড়িতে ঢোকার প্রবেশ পথের পাশেই রাখা থাকে তাদের তৈরি পাত্রগুলো। রাত নামলে কেউ কেউ বাঁশের তৈরি ঝাঁপ দিয়ে বন্ধ করে দেয় সেই স্থান। আবার কারো কারো দোকান উন্মুক্ত থেকে যায়। কেউ কেউ আবার উঠানে কিম্বা ঘরের বারান্দায় রেখে দেয় তাদের পাত্রগুলো। দোকানঘর যে একেবারেই নেই তা নয়। এমনি এক দোকানের সন্ধান মিলল চুনারিপাড়াতে। দোকানের মালিক সনাতন পাল (৩৫)।[৭] দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছেন। তার দোকানের বয়স দশ বছর। বিবাহিত এই সনাতন পালের সংসার পরিকল্পিত। দুই মেয়ের বাবা। ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করতেই তিনি হেসে বললেন, "এরাই আমার মেয়ে, এরাই আমার ছেলে।" তার দোকানে প্রায় সব রকমের মাটির তৈরি পাত্র পাওয়া যায়। বেশি পাওয়া যায় তাওয়া বা খোলা, ঢাকনা, প্রেশার কুকারের তাওয়া, দৈ এর কাতারি বা ডাবগা ইত্যাদি। মাটির খোলা চাঁপাইনবাবগঞ্জের জনপ্রিয় লোকখাদ্য কালাইয়ের রুটি বানানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। এই কারণে এই খোলা বিক্রিও হয় বেশি। কেননা এই লোকখাদ্য কালাই-এর রুটি তৈরির জন্য আধুনিক কোন পাত্র ব্যবহার করা যায় না। একমাত্র খোলা ব্যবহার করেই এই লোকখাদ্য উপাদেয় হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

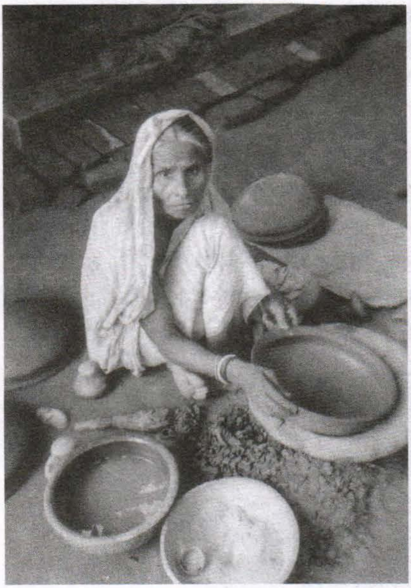

সরোজিনী পাল

সনাতন পাল

ছেলেদের পাশাপাশি সব বয়সের মেয়েরা এই পেশায় কাজ করে থাকে। সরোজিনী পাল (৬৫) এমনি একজন মৃৎশিল্পী।[১০] অক্ষর জ্ঞানহীন একজন মহিলা। স্কুল কী তা তিনি জানেন না। রান্না-বান্না আর সংসারের টুকিটাকি কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে তিনি মাটি নিয়ে বসে পড়েন। তিনি দিনে ১৫ থেকে ২০ টা খোলা বা তাওয়া তৈরি করতে পারেন। তিনি এই খোলা তৈরি করেন বেশি। এটা বিক্রিও হয় বেশি। কেননা এই খোলা লোকখাদ্য কালাই-এর রুটি তৈরিতে কাজে লাগে। এর পাশাপাশি এই পাত্র মুড়ি ভাজারও কাজে লাগে।

বারঘরিয়া, চুনাড়িপাড়া, নতুন বাজার, এসব অঞ্চলে আনুমানিক ১০০ থেকে ১২০টি পোইন/ ভাটি (পোইন/ ভাটি: সমতল ভূমি থেকে ৪/৫ হাত গর্ত করে এখানে বিভিন্ন মাটির পাত্রকে আগুন দিয়ে পোড়ানো হয়। মাটির বিভিন্ন পাত্র পোড়ানোর জায়গা) আছে। একটি ভাটিতে আনুমানিক ১০০০ থেকে ১৫০০ পাত্র পোড়ানো যায়। একটি ভাটি পুড়াতে প্রায় ৮/৯ ঘন্টা সময় লাগে।

চুনাড়িপাড়ার আর এক শিল্পী গৌর পাল (৩৫)। দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছেন। দুই মেয়ে। তারা স্কুলগামী। বাড়ির দেয়াল ঘেঁষেই তার দোকানঘর। সারাদিনই দোকান খোলা থাকে। দুপুরের সময় দোকানের ঝাঁপি ফেলে দিয়ে খাওয়া দাওয়া আর বিশ্রাম। অতঃপর আবার দোকানে গিয়ে ব্যবসা; প্রতিদিনই প্রায় ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকার বিক্রি হয়। বর্ষার সময় খোলা বিক্রি হয় বেশি। দ্বিতীয় বিক্রির তালিকায় থাকে বিভিন্ন মাপের টব। খোলা এবং টবের বিক্রি ফাল্গুন পর্যন্ত থাকে। বিভিন্ন পাত্র তৈরির ব্যাপারে তিনি

www.pathagar.com

বলেন যে, প্রথমে পাত্র তৈরির উপযোগী করে মাটি তৈরি করতে হয়। মাটি তৈরি হলে বিভিন্ন ধরনের পাত্রকে যেমন: খোলা, সানকি, টব, ব্যাংক, ঢাকনা ইত্যাদি ডিজাইন অনুযায়ী রঙ করে ভাটিতে দিয়ে পোড়াতে হয়। এখানকার পালেরা মাটি দিয়ে যেসব পাত্র তৈরি করে সেগুলো নিম্নরূপ:

হাঁড়ি-পাতিল, খোলা, তাওয়া, সরপোশ, সান্‌কি, প্রেশার কুকারের খোলা (প্রেশার কুকার বসানোর ফাঁকা একটি পাত্র), ঢাকুন, মাছ ধুবার পাত্র, দৈ'এর কাতারি, ধূপচি, ঘট, ছোট প্রদীপ, বড় প্রদীপ, গ্লাস, কোপট্যা, ভাঁড়, দেউলি, ব্যাংক ছোট, বড়, মাঝারি ধরনের টব, ন্যাদ (গরুকে খেতে দেবার বড় পাত্র)। দীপাধার, ছাইদানী, কলমদানী চারি, ফুলদানী ইত্যাদি। এছাড়াও এখানকার কুম্ভকারেরা (কুম্ভকার=মৃৎশিল্পী, এদের স্থানীয়ভাবে পাল বলে)। মাটি দিয়ে তৈরি করে নানা জাতের পুতুল, ফল ইত্যাদি।

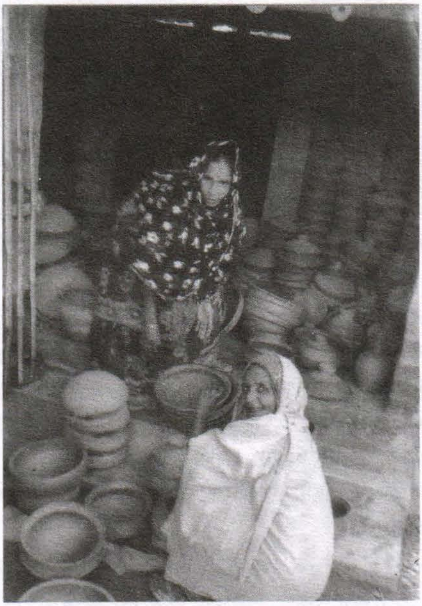

রুবিনা বেগম ও নসিমন বিবি

আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলেও এখনও গ্রামের লোকেরা বিশেষ করে নিরক্ষর লোকেরা মাটির পাত্রেই রান্না বান্না করে। তাদের পূর্বপুরুষেরা এসব মাটির পাত্রেই রান্না বান্না করত বলেই তাদের বিশ্বাস, এসব মাটির পাত্রে রান্না করা খাবার স্বাস্থ্যসম্মত। এমনি একজন ক্রেতা রুবিনা বেগম (২৫)।[১১] তার স্বামী কাউসার রাজমিস্ত্রির কাজ করে। গোহিল বাড়ি, মঙ্গলামোড়, চাঁপাইনবাবগঞ্জে তার বাড়ি। রুবিনা বলে তার স্বামী মাটির পাত্রের খাবারই বেশি পছন্দ করে। তাই সে নিয়মিত মাটির পাত্রেই রান্না করে আসছে। তার বিশ্বাস এতে খেলে নাকি খাবার হজম হয় ভাল। তাই অসুখ বিসুখ কম হয়।

www.pathagar.com

এই জেলায় কবে থেকে এই পেশা শুরু, কুম্ভকারেরা তা জানেন না। পুরুষানুক্রমে তারা এই পেশায় নিয়োজিত। কেউ বলেন তিন পুরুষ, কেউ বলেন তারো বেশি কাল ধরে এই পেশা চলে আসছে। লোকায়ত জীবনে গৃহস্থালীর নানা কাজে মৃৎশিল্পের ব্যবহার বহু প্রাচীন। সভ্যতার ক্রমবিকাশে কারখানাজাত নানা ধরনের পাত্র বা সরঞ্জামের ব্যবহার বৃদ্ধি পেলেও গ্রামে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজ ব্যবস্থায় এখনও টিকে আছে মাটির তৈরি নানা জাতের সামগ্রী।

আধুনিক জীবনে ঘর সাজানোর কাজে মাটির তৈরি নানা সামগ্রী যেমন: প্রজাপতি, টিকটিকি, পাখি ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও খাবার টেবিলে সাজিয়ে রাখা হয় নানা জাতের ফল যেমন: আপেল, আম, জাম, পাতি লেবু, কমলালেবু, কলা ইত্যাদি। এগুলো দেখে একেবারে জীবন্ত মনে হয়। এছাড়া মৃৎশিল্পীদের মাটির তৈরি নানা রঙের ছোট ছোট সব পুতুল যেমন: মা-মেয়ে, বর-বধূ, প্রেমিক-প্রেমিকা, রাধা-কৃষ্ণ, গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী-নারায়ণ, ময়ূর প্রভৃতি দৃষ্টি নন্দন জিনিস মধ্যবিত্ত সমাজে বহুকাল থেকেই ব্যবহার্য।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার কুম্ভকারদের নিপুণ হাতের তৈরি মৃৎশিল্পের নানা জাতের দ্রব্য সামগ্রী বহুকাল থেকেই পরম্পরাগতভাবেই জেলাবাসীর কাছে খুবই প্রিয়। আধুনিক নানা ধরনের রান্নার সামগ্রী দিয়ে রান্না করার সুযোগ থাকলেও গ্রামের লোকজন মাটির তৈরি হাঁড়ি পাতিলেই রান্না করতে স্বাচ্ছন্দবোধ করেন অনেক বেশি।

কুম্ভকারেরা বা মৃৎশিল্পীরা মাটির বিভিন্ন পাত্র তৈরি যে সব হাতিয়ার বা যন্ত্র ব্যবহার করে সেগুলোর নাম:

চাক (এক ধরনের ঘূর্ণি), চাক-লাঠি (চাক ঘুরানোর লাঠি), কাঠার সুতা (কাঁচা মাটির পাত্রকে সুতা দিয়ে কাটা হয়), পাত্র পালিশ করার কাটনি, পাত্র পালিশ করার ঝিনাই, মাল পালিশ করার খুড়ি, পিটনি (পাত্র পিটানোর হাতিয়ার) ইত্যাদি।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার রানীবাড়ি চাঁদপুর আর একটি গ্রাম। এই গ্রামে প্রায় ১০০ ঘর কুম্ভকার বা পালের বসবাস। এখানে প্রায় ৫০০ থেকে ৫৫০ লোক মৃৎশিল্পের সাথে জড়িত।

পুরুষানুক্রমে তারা এই পেশায় জড়িয়ে আছে। এটাই তাদের একমাত্র জীবিকার পথ। অবসর সময়ে কোন কোন মৃৎশিল্পী কৃষিকাজ করে থাকে। কেউ কেউ আবার মৌসুমী ফল আমের ব্যবসাও করে থাকে। তবে এমন মৃৎশিল্পীর সংখ্যা খুবই কম। নতুন প্রজন্মের কেউ কেউ স্কুলে গেলেও কলেজ আর যাওয়া হয়ে ওঠে না। পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত পেশায় জড়িয়ে পড়ে। এদের মধ্যে ব্যতিক্রম এক শিল্পীর দেখা পাওয়া গেল। তিনি হচ্ছেন বলরাম পাল।[১২] তাঁর ২ ছেলে ও ২ মেয়ে। এই মাটির কাজ করেই তিনি তাঁর ৪ ছেলে-মেয়েকে লেখাপড়া শিখাচ্ছেন। এছাড়াও শিবগঞ্জ উপজেলার রানীবাড়ি চাঁদপুর গ্রামে কথা হয়েছে হরেন চন্দ্র পাল,[১৩] মানিকচন্দ্র পাল,[১৪] ভূপেন চন্দ্র পাল,[১৫] লক্ষ্মীরানী পাল,[১৬] গোমস্তাপুর উপজেলার শুক্রবাড়ির চৌডালা গ্রামের উদয় চন্দ্র পাল,[১৭] উন্নয়ন চন্দ্র পাল[১৮]-এর সাথে। এরা সবাই পুরুষানুক্রমে পাওয়া এই পেশা নিয়ে সুখে-দুঃখে কাটাচ্ছে জীবন। এই পেশাকে সম্মানের সাথে ধরে রেখেছে। কষ্ট হলেও ছেড়ে যাননি।

www.pathagar.com

বিভিন্ন ধরনের মৃৎ পাত্র

সখের হাড়ি

www.pathagar.com

২. কাঁসাশিল্প

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় বেশ কিছু লোকশিল্প টিকে আছে বহুদিন ধরেই। যেসব লোকশিল্প এই জেলাকে অন্যান্য জেলা থেকে সমৃদ্ধ করে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে, তার মধ্যে কাঁসাশিল্প অন্যতম। যান্ত্রিক সভ্যতার ক্রম বিস্তারের সাথে সাথে মানুষের রুচিও ক্রমশ পরিবর্তনশীল। যার ফলে বর্তমানে কাঁসা শিল্পের ব্যবহার কমেছে সত্য। তবে একেবারে থেমে যায়নি। যুগ যুগ ধরে পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত কাঁসা শিল্পীরা যান্ত্রিক সভ্যতার সাথে পাল্লা দিয়ে টিকিয়ে রেখেছে তাদের পৈতৃক কাঁসাশিল্পকে। আর্থিক কষ্ট হলেও তারা এ পেশা থেকে একেবারে সরে যায়নি।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের রামকৃষ্ণপুর, আজাইপুর, মাঝপাড়া এসব জায়গায় প্রায় ৫০ থেকে ৬০ ঘর কাঁসারি শিল্পীদের বসবাস। তারা পুরুষানুক্রমে এই কাঁসা শিল্পের সাথে জড়িত। রামকৃষ্ণপুরের তরিকুল ইসলাম (৫০) এমন একজন কাঁসারি।[১৯] তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে, তাঁদের প্রায় ৪/৫ পুরুষের এই ব্যবসা। তিনি দাবি করেন যে, ২০/২৫ বছর আগে এখানে প্রায় ১০০ থেকে ১২৫ ঘর কাঁসারি ছিল, যা এখন নেই। জিনিস পত্রের দাম বেশি হওয়ায় অর্থাৎ কাঁসার উপকরণের দাম আগের থেকে অনেক গুণ বেশি হওয়ায় কাঁসার বাসনপত্র এখন আর লোকজন তেমন ব্যবহার করে না বিধায় সেগুলোর বিক্রি এখন অনেকগুণ কমে গেছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই বিক্রি কমে যাওয়ায় এই পেশার লোকজন ক্রমশ অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে। কিছু কাঁসারি পৈতৃক পেশাকে শ্রদ্ধা করেই এখনো টিকিয়ে রেখেছে।

রাঙ (Zink) এবং তামা (Copper) এ দুটোর মিশ্রণে হয় কাঁসা (Brus-Metal)। এগুলো আসত মালয়েশিয়া থেকে। দেশ স্বাধীন হবার পর জেলা প্রশাসন এই কাঁসার উপকরণ ঢাকা থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ আনার জন্য পারমিট প্রথা চালু করে। এই পারমিট প্রথা চালু করার পিছনে কারণ ছিল কালোবাজারি রোধ করা। কেননা ঢাকা থেকে জেলাতে এনে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী বেশি মুনাফার আশায় কাঁসা পার্শ্ববর্তী দেশে পাচার করে দিত। এখানে কাঁসার বাসন-পত্র তৈরি করে যে দাম তখন পাওয়া যেত, তার চেয়ে অনেক বেশি দাম পাওয়া যেত পার্শ্ববতী দেশে রাঙ ও তামা পাচার করে। কাঁসারি তরিকুল ইসলাম, জামিল হোসেন,[২০] মিজানুর রহমান[২১] মতে তখন থেকেই কাঁসা শিল্পের ব্যবসায় ধস নামে। কিছু অসৎ ব্যবসায়ীর অসৎ পথে অধিক মুনাফা লাভের ইচ্ছাই এই ব্যবসায় মন্দার জন্য দায়ী ছিল। তারপরে যান্ত্রিক সভ্যতার ক্রমশ অগ্রসরমান গতি এই কাঁসারি শিল্পকে আজ হুমকির মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে।

এরপরেও জেলা শহরের পুরাতন বাজারে সাতটি, আজাইপুরে চারটি এবং বটতলাহাটে সাতটি কাঁসার জিনিসপত্রের দোকান আছে। এইসব দোকানে চামচ, হাতা, খুন্তি, কুরনি, ছেচকি, বাউলি, থালা, কলসি, গ্লাস, বাটি, খুরি, ঝিনুক, বদনা/বরতন, পঞ্চপ্রদীপ, কোশাকুশি, পূজার ঘণ্টা, স্কুল কলেজে বাজানোর ঘণ্টা, পূজার রেকাবি, পরাত, গামলা ইত্যাদি জিনিসগুলো পাওয়া যায়। এইসব কাঁসার বাসনপত্রের মধ্যে কিছু কিছু এই জেলাতে কাঁসারিরা তৈরি করেন এবং কিছু কিছু বাহির থেকে (টাঙ্গাইল, ঢাকা, বগুড়া) আমদানী করে দোকানে এনে বিক্রি করা হয়। জেলার

www.pathagar.com

রামকৃষ্ণপুর, মাঝপাড়া ও আজাইপুরে তৈরি হয় থালা, বাটি-গ্লাস, হাতা, চামচ, খুন্তি, কুরনি, বাউলি, ঝিনুক, ছেচকি ইত্যাদি। বাহির থেকে বিক্রি করার জন্য কাঁসার ব্যবসায়ীরা নিয়ে আসে জগ, বালতি, বদনা, পঞ্চ প্রদীপ, কোশাকুশি, পূজার ঘণ্টা, স্কুল কলেজের ঘণ্টা, পূজায় নৈবেদ্য দিবার ছোট ও বড় রেকাবি, পরাত ইত্যাদি। জেলা সদরের দোকান ছাড়াও উপজেলার ছোট ছোট বাজারে বিভিন্ন দোকানে কাঁসার জিনিসপত্র রেখে বিক্রি করা হয়। এমনি এক দোকানের খোঁজ পাওয়া গেল রানিহাটি বাজারে। একটি জুতার দোকানে দেখা গেল পাশে একটি তাকে কাঁসার কলস, বদনা, থালা, বাটি, গ্লাস ইত্যাদি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। দোকানের মালিক আব্দুল মতিন-কে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে, বিয়ে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্নপ্রাশনে কাঁসার বাসন পত্র বিক্রি হয়। গ্রামের অনেকেই তখন আর জেলা শহরে না গিয়ে এখানে এসে কিনে তাদের প্রয়োজন মিটায়। এতে গ্রামের ক্রেতাদের সময় এবং অর্থের কিছুটা সাশ্রয় হয়।

কাঁসার বাসনপত্র তৈরির যন্ত্রপাতি: কাঁসার বিভিন্ন বাসন পত্র তৈরি করতে লাগে লেহাই (লোহ-খণ্ড), শাবল, র‍্যাত (তৈরি জিনিসকে ঘঁষে চকচকে করার হাতিয়ার), লোহানি (তৈরি জিনিসকে ছিলে বা চেঁছে ব্যবহারের উপযুক্ত করে তোলা) হাতিম বা হাফর (কয়লার আগুনকে বাতাসের সাহায্যে প্রজ্জ্বলিত করার জন্য বাতাস দেয়ার যন্ত্র), মুচি (মাটির তৈরি খোল বা ছাঁচ যার ভিতরে তামা ও রাঙ আগুনের তাপ দিয়ে গলান হয়), সাঁড়াশি, কাঠ-কয়লা, ছাঁচ বা পিড়া ইত্যাদি। এইসব যন্ত্রপাতি বা হাতিয়ার দিয়ে কাঁসারিরা বিভিন্ন ধরনের বাসন বা জিনিস পত্র তৈরি করে। এই সব বাসনপত্র তৈরি করতে যেমন লাগে পেশি শক্তি, তেমনি লাগে শৈল্পিক কৌশল।

কাঁসা শিল্পীরা ভোর হবার সাথে সাথেই তাদের কাজ শুরু করে। কোন জিনিস বানাতে ৩/৪ জন লোক লাগে। কেউ হাফর টানে, কেউ রাঙ ও তামা মুচির ভিতর দিয়ে আগুনে তাপ দিয়ে গলায় কেউ সেগুলোকে পিটিয়ে ছাঁচ অনুযায়ী ব্যবহারে উপযুক্ত করে। পরে সেগুলোকে আবার র‍্যাত দিয়ে ঘঁষে চকচকে করা হয়। এই কাজগুলো বিশেষত হাফর জ্বালিয়ে যেসব কাজ করা হয়, সেগুলো দুপুরের মধ্যেই করে শেষ করা হয়। পরে অর্থাৎ বিকেল বেলাতে মেজে ঘঁষে চকচকে করার কাজ করা হয়।

প্রস্তুত প্রণালী: রাঙ ও তামার মিশ্রণে হয় কাঁসা। আগুনের তাপে গলিয়ে এই কাঁসা তৈরি করা হয়। গ্লাস, বাটি, কলম ইত্যাদি তৈরি করতে আগে কাঁসা তৈরি করে নিয়ে, পরে ছাঁচ বা ফর্মা অনুযায়ী এসব জিনিস তৈরি করা হয়।

প্রথমে রাঙ ও তামাকে একত্রিত করে সেগুলোকে কয়েকটি মুচির (মাটি ও ধানের খোসা/ তুষ দিয়ে তৈরি এক ধরনের পাত্র) ভিতর পুরে দেয়া হয়। অতঃপর সেই মুচিগুলোকে একটি চুলার মধ্যে রাখা হয়। এই চুলাকে বলা হয় মুচিআটা। মুচিআটাতে মুচিগুলো রাখার পরে সেইগুলোর চারপাশে কাঠ-কয়লা দিয়ে দেয়া হয়। এরপরে কয়লায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে জ্বলন্ত মুচিআটাকে/ চুলাকে একটি খোলার সাহায্যে ঢেকে দেয়া হয়। এই জ্বলন্ত মুচিআটা/ চুলাকে হাপরের সাহায্যে বাতাস দিতে থাকা হয়। যাতে করে মুচি আটা সব সময় জ্বলন্ত থাকে এবং প্রয়োজনীয় তাপ পেয়ে মুচির ভিতরে থাকা রাঙ ও তামা গলে গিয়ে মিশে যায়। এইভাবে একটানা ৬-৭ ঘণ্টা তাপ দিয়ে কাঁসা বানানোর পরে এই গলিত উত্তপ্ত কাঁসাকে একটি ফর্মা বা পিরায় ঢেলে দেয়া হয়।

www.pathagar.com

এই ফর্মায় ঢালার পরে গলিত কাঁসা ঠাণ্ডা হলে আসলে একটি গুটির আকার ধারণ করে। এই কাঁসার গুটিকে একটি শক্ত কাঠের গুটির উপর রেখে হাতুর দিয়ে পিটিয়ে চ্যাপ্টা করা হয়। এই চ্যাপ্টা কাঁসার টুকরাকে বলা হয় চাকি বা চাকতি। এই চাককে আবার চুলার মধ্যে রেখে কয়লার আগুনে পুড়িয়ে উঠান হয়। লাল উত্তপ্ত অবস্থায় সেই কয়লার আগুনে পুড়িয়ে উঠান হয়। লাল উত্তপ্ত অবস্থায় সেই চাকিকে লোহার শাবলের উপর রেখে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ক্রমশ বিভিন্ন পাত্রের আকার দেয়া হয়। এই পাত্রটি ঠাণ্ডা হয়ে আসলে সেটাকে ব্যবহারের উপযুক্ত করার জন্য এবং চকচকে করার জন্য র‍্যাত দিয়ে ঘঁষা হয়। কাঁসারিদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে ধাপে ধাপে এইভাবে তৈরি হয় কাঁসার বিভিন্ন জিনিসপত্র।

কাঁসারিরা পুজির স্বল্পতার কারণে স্থানীয় মহাজনদের কাছ থেকে টাকা কিম্বা রাঙ ও তামা নিয়ে প্রথমে তৈরি করে কাঁসা এবং পরে পণ্য। এক কেজি কাঁসা দিয়ে গ্লাস তৈরি করতে কাঁসা শিল্পীরা মজুরী পায় প্রায় ২৮০-৩০০ টাকা পর্যন্ত। একদিনে তারা ২৫-৩০ গ্লাস তৈরি করতে পারে। গ্লাস থেকে কলস তৈরির প্রক্রিয়া কিছুটা ভিন্ন। আগের প্রক্রিয়ার সাথে চাকি বা চাকতি করা পর্যন্ত গ্লাস তৈরির প্রক্রিয়ার সাদৃশ্য আছে। অর্থাৎ রাঙ ও তামাকে আগুনে পুড়িয়ে ফর্মা বা পিরায় ঢেলে প্রথমে গুটি তৈরি করা হয়। এই গুটিকে লেহাই এর (লোহ খণ্ড) উপরে রেখে সেটাকে সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরে হাতুর দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে চ্যাপ্টা করে চাকি বা চাকতির আকৃতি দেয়া হয়। এই চাকতিকে পুনরায় আগুনে পুড়িয়ে হানাকামের সাহায্যে খালন (কলসির মত ছাঁচ বা ফর্মা) তৈরি করা হয়। এই কাজ যারা করে সেই সব কাঁসা শিল্পীদের হাননদার বা গড়নদার নামে ডাকা হয়। কলস তৈরি করতে শিল্পীরা একে দুটি অংশে ভাগ করে নিয়ে কলস তৈরি করে। কলসের গলার দিক অর্থাৎ উপরের অংশকে বলা হয় ছান্দা এবং নিচের অংশকে বলা হয় খুপরী। দুটি অংশকে আলাদা আলাদাভাবে তৈরি করে নিয়ে পরে উপরের অংশ ছান্দার সাথে নিচের অংশ খুপরীকে জুড়ে দেয়া হলে তৈরি হয় কলস। কাঁসা শিল্পীরা একদিনে ৫-৬টা কলস তৈরি করতে পারে।

স্থানীয় কাঁসারিরা বলেন যে, সাধারণত বিয়ে এবং অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান হলেই কাঁসার সামগ্রী বিক্রি হয়। আগের থেকে বিক্রি কম হচ্ছে। রামকৃষ্ণপুরের মিজানুর রহমান (৩২) বলেন যে, বিভিন্ন কোম্পানির মেলামাইন, স্টিল প্রভৃতির তৈরি বাসনপত্রের দাম কাঁসার চেয়ে অনেক কম পড়ে বিধায় প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্য এখন আর খুব কম লোক কাঁসার সামগ্রী কিনে থাকে। কেননা কাঁসার সামগ্রী মেলামাইন ও স্টিলের তুলনায় ব্যয়বহুল। তাই বিয়ে, অন্নপ্রাশন, কনে বিদায় এসব অনুষ্ঠান হলেই শুধু নিকট আত্মীয়রা কাঁসার তৈরি কলস, বালতি, থালা, গ্লাস, বাটি, বদনা প্রভৃতি দিয়ে থাকে। এছাড়া উপহার সামগ্রী হিসেবে বড় থালা তৈরি করে তার মধ্যে বিভিন্ন প্রতীক এঁকে এবং তার মধ্যে প্রয়োজনীয় কিছু সংক্ষিপ্ত কথা লিখে সম্মানিত ব্যক্তিদের উপহার দেওয়া হয়। এসব উপহার বিক্রির সংখ্যা বছরে দুই চার বার মাত্র। জেলার আজাইপুরের পৈতৃকসূত্রে এই ব্যবসায় জড়িত নাজমুল হোদা[২২] বলেন যে, ১৪/১৫ বছর আগের কেজি প্রতি রাঙের দাম ছিল ২৫০ টাকা এবং তামার দাম ছিল ৭৫-৮০ টাকা; কিন্তু এখন এর দাম বেড়ে হয়েছে-প্রতি কেজি রাঙ-২২০০

www.pathagar.com

টাকা এবং তামা ৫৮০/৬৮০ টাকা। তিনি আরো বলেন যে, এখন নতুন তামা ও রাঙের মিশ্রণে কাঁসা তৈরির চেয়ে পুরান কাঁসার ভাঙরি (কাঁসার বাসনপত্রের যেমন থালা, বাটি, গ্লাস ইত্যাদি) কিনে সেগুলোকে আবার আগুনে গলিয়ে নতুনভাবে কাঁসার বাসনপত্র তৈরি করা হয় কাঁসার এইসব ভাঙরি গ্রামেগঞ্জে ছোট ছোট ব্যবসায়ী অর্থাৎ হকারেরা মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুরে কিনে নিয়ে আসে এবং কাঁসার বাসনপত্র যারা তৈরি করে তাদের কাছে বিক্রি করে দেয়। এছাড়াও স্থানীয় কাঁসারিরা ঢাকা থেকেও কাঁসার ভাঙরি এনে কাঁসার বাসনপত্র তৈরি করে বিক্রি করে।

৩. নকশি কাঁথাশিল্প

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা লোকশিল্পের জন্য সমৃদ্ধ। যে সব লোকশিল্প এই জেলাকে সমৃদ্ধ করেছে তার মধ্যে কাঁথাশিল্প অন্যতম। জেলার নিরক্ষর, স্বল্প শিক্ষিত ও শিক্ষিত মেয়েরা বহুদিন থেকেই এই কাঁথা শিল্পের সাথে জড়িত। আগে কাঁথা তৈরি সখের বিষয় ছিল। বাড়ির মেয়েরা অবসর সময়ে পুরান কাপড় এবং বিভিন্ন রঙের সুতা দিয়ে বসে বসে তৈরি করত বিভিন্ন মাপ ও ডিজাইনের কাঁথা। শাশুড়ি, ননদ, বৌ-ঝিরা পান খেতে খেতে সেলাই করত কাঁথা; কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এখন মেয়েরা শুধু সখের কারণেই কাঁথা তৈরি করে না। কাঁথা তৈরি করে বিক্রি করা অর্থাৎ কাঁথা তৈরি এখন আয়ের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। জেলার অনেক মেয়ে এখন এই কাঁথা তৈরি করে আয় করে সংসার চালায়। কোন কোন সংসারে এখন এই কাঁথা বিক্রি একমাত্র আয়ের উৎস। কাঁথা বিক্রির জন্য দোকান/ প্রতিষ্ঠানও আছে জেলা শহরের ইসলামপুরে।

এই কাঁথা শিল্পে মেয়েদের ভূমিকায় প্রধান। এই কাঁথা তৈরির জন্য লাগে ছোট বড় বিভিন্ন মাপের নতুন ও পুরাতন নানা রঙের কাপড়। এর সাথে প্রয়োজন হয় বিভিন্ন রঙের সুতা ও সুঁই। এই সুঁই সুতা রাখার জন্য লাগে পাত্র যেমন বাটি বা ছোট ছোট পস্নাস্টিকের বাক্স। যাতে করে ছোট কিংবা বড় সুঁইগুলো সহজেই হাতের কাছে পাওয়া যায়। কাঁথার উপরে প্রথমে নক্সা তোলা বা আঁকার জন্য কখনো কখনো কাগজ ও পেন্সিলও লাগে। কাঁথা তৈরি বা সেলাই করার জন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। কম বয়সের মেয়েরা বড় মেয়েদের কাছ থেকে হাতে কলমে শিক্ষার মতো দেখে দেখে সেলাই করা শিখে নেয়। শিক্ষার্থীদের অর্থাৎ যারা এই কাজে প্রথম আসে তাদের প্রথমে ছোট ছোট কাঁথা সেলাই করতে দেয়া হয়। ছোট ছোট কাঁথা সেলাইয়ের মাধ্যমে তাদের হাত দক্ষ হলে পরে বড় কাঁথা সেলাই করতে দেয়া হয়।

কাঁথা শব্দটি সংস্কৃত শব্দ কম্‌থা এবং প্রাকৃত শব্দ কথ্‌থা থেকে বাংলায় এসেছে। এই কাঁথা শব্দটি অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন নামে উচ্চারণ করা হয়। যেমন কেঁথা, ক্যাঁথা, ক্যাত্যা ইত্যাদি। গ্রাম বাংলার নানা বয়সের মেয়েরা তাদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও নিজস্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে কাঁথার উপর তৈরি করে বিভিন্ন ধরনের নান্দনিক ও মনোমুগ্ধকর নকশা। বিভিন্ন রঙ ও সুতা দিয়ে দক্ষ হাতের করা এইসব নকশি কাঁথা দেখে সবারই ভাল লেগে যায়। দেখে দেখে হাতে হাতে শেখার মাধ্যমে গ্রামের নিরক্ষর মেয়েরা নানা বিষয়ের চিত্রকে সুঁই সুতা দিয়ে নকশি কাঁথাকে সুন্দর করে তোলে।

www.pathagar.com

নকশি কাঁথার ব্যবহার এখন ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। এর শিল্পনৈপুণ্য ও ঐতিহ্য এর চাহিদা দিনে দিনে বাড়িয়েছে। এর ব্যবহার প্রাচীনকাল থেকেই হয়ে আসছে। এই নকশি কাঁথার ব্যবহার মুঘল রাজাদের রাজদরবারে ছিল। এছাড়াও ময়মনসিংহ গীতিকা এবং রামায়ণ মহাকাব্যেও নকশি কাঁথার বিবরণ পাওয়া যায়। নকশি কাঁথা তৈরির জন্য খুব বেশি উপকরণ লাগে না। নতুন ও পুরান কাপড় এবং সুঁই-সুতা এই কাঁথা তৈরির প্রধান উপকরণ। আগে গ্রাম বাংলার মেয়েরা পুরান কাপড় কেটে কাঁথা তৈরির কাপড় সংগ্রহ করত এবং পুরান কাপড়ের পাড় কেটে সেই পাড় থেকে সুতা বের করে সেসব সুতা কাঁথা সেলাই এর কাজে ব্যবহার করত। এখন এই পদ্ধতির ব্যবহার খুবই কম। এখন বাজার থেকে নতুন নতুন বিভিন্ন রঙের কাপড় এবং বিভিন্ন রঙের সুতা কিনে সেই সব কাপড় ও সুতা দিয়ে বিভিন্ন ডিজাইনের নকশি কাঁথা তৈরি করা হয়।

একটি কাঁথা তৈরি করতে একাধিক কাঁথা শিল্পীর প্রয়োজন হয়। কেননা কাঁথা পাড়ার সময় অর্থাৎ কাঁথার প্রাথমিক পর্বে মাপ অনুযায়ী (যেমন ৪ হাত চওড়া ও ৫ হাত লম্বা) বিভিন্ন রঙের কাপড় কেটে মেঝেতে বা বাড়ির উঠানে কিংবা বাড়ির বড় বারান্দায় কাপড়ের টুকরাকে টান টান করে বিছিয়ে দেয়া হয়। কাঁথাকে পুরু বা মোটা করার জন্য কাঁথার উপর ও নিচের কাপড়ের মধ্যে ২-৩ পুর কাপড় ঢুকিয়ে দিয়ে সেলাই করা শুরু হয়। প্রথমে কাঁথার চারদিক শক্ত করে আটকে নেয়ার জন্য লম্বালম্বি এবং আড়াআড়িভাবে সুঁই-সুতা দিয়ে সেলাই করে আটকিয়ে নেয়া হয়। প্রাথমিকভাবে কাঁথাকে আটকিয়ে নেয়ার পর কাঁথার উপরে আঁকা নকশা অনুযায়ী কাঁথা শিল্পীরা তাদের নিপুণ হাতে সুঁই-সুতার সাহায্যে তৈরি করেন সুন্দর সুন্দর নানা ধরনের চিত্র। কখনো শিল্পীরা তাদের হাতের আঙুলের অসাধারণ নৈপুণ্যে ফুটিয়ে তোলেন নানা জাতের ফুল, কখনো নানা জাতের পশু-পাখি কখনো ঘর-বাড়ি ইত্যাদির চিত্র কর্ম। নানা রঙের কাপড় ও সুতার মিলনে এইসব কাঁথা হয়ে ওঠে দৃষ্টিনন্দন ও বৈচিত্র্যময়।

বিভিন্ন মাপ ও ডিজাইনের কাঁথা তৈরি করতে সময়েরও হেরফের হয়। কোন কাঁথা তৈরি করতে লাগে ১৫ থেকে ২০ দিন, এগুলো মাপে ছোট এবং অল্প ডিজাইনের। মাঝারি মাপের কাঁথা যেমন ৩ হাত বাই ৪ হাতের কাঁথা তৈরি করতে সময় লাগে দেড় থেকে দুই মাস। আবার বড় মাপের যেমন ৪ হাত বাই ৫ হাতের কাঁথা তৈরি করতে সময় লাগে তিন থেকে চার মাস। একাধিক কাঁথা শিল্পীর অনেক পরিশ্রমের বিনিময়ে তৈরি হয় একটি দৃষ্টিনন্দন সুন্দর নকশি কাঁথা। এইসব কাঁথা সখের চেয়ে বাণিজ্যিকভাবেই তৈরি করা হয়। জেলাতে যারা বাণিজ্যিকভাবে কাঁথা তৈরি করেন, তারা কাঁথা শিল্পীদের কাপড় ও সুতা সরবরাহ করে এবং ডিজাইন বলে দেয়। এমন একজন নকশি কাঁথার ব্যবসায়ী জেলার ইসলামপুর নিবাসী তাহারিমা বেগম। তিনি কাঁথা শিল্পীদের ডিজাইন বলে দিয়ে সেই মত কাপড় ও সুতা তাদের দিয়ে দেন। তারা কখনো কখনো তার বাসায় বসে তৈরি করে। আবার কখনো কখনো কাপড় ও সুতা নিয়ে গিয়ে তাদের নিজের বাসায় কাঁথা তৈরি করে নিয়ে এসে দিয়ে যায়। ইসলামপুরের তাহারিমার বাড়িতে বসে যারা কাঁথা সেলাই করে তারা হচ্ছে–কাজল বেগম, মোহারমি বেগম, সোনিয়া বেগম ও জাহিদা বেগম।

www.pathagar.com

বি.এ পাস এই তাহারিমা বেগম ১৯৮৩ সাল থেকে এই পেশার সাথে জড়িত। তিনি দাবি করেন যে, দশ বছর আগে যত মেয়ে এই শিল্পের সাথে জড়িত ছিল এখন তার চেয়ে অনেক বেশি মেয়ে এই পেশায় জড়িত। তিনি আরো বলেন যে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাতে প্রায় দশ হাজার মেয়ে এই কাঁথা শিল্পের সাথে জড়িত। তার মধ্যে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত উভয় সম্প্রদায়ের মেয়েরাই আছে। গৃহিণীরা ঘর সংসারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে এই নানা ধরনের নকশি কাঁথা সেলাই করে আয় করে। তাতে ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, স্বামী, শ্বশুড়-শাশুড়ি নিয়ে সংসার চলে ভালো। যে বড় কাঁথা একটি সেলাই করতে ৩ থেকে ৪ মাস লাগে। তার মূল্য প্রায় ২২০০ থেকে ৩০০০ টাকা পর্যন্ত। এই কাঁথা সেলাই করে মেয়েরা মজুরি পায় ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা পর্যন্ত। স্কুল কলেজের মেয়েরাও অবসর সময়ে কাঁথা সেলাই করে থাকে সানন্দে। এতে করে তাদের পড়ালেখার ব্যয় অনেক সহজ হয়ে যায়। জেলা শহরের বালুবাগান, মিস্ত্রিপাড়া, বেলেপুকুর, হুজরাপুর, রেহাইচর, ইসলামপুর এই সব জায়গায় স্কুল-কলেজগামী মেয়েরা কাঁথা শিল্পের সাথে জড়িত। কাঁথা শিল্পে শিল্পীরা আবেগ আর আনন্দ বেদনার অনুভূতি জড়িয়ে থাকে তাদের সেলাইয়ের ফোঁড়ে ফোঁড়ে কাঁথার গায়ে। তাইতো কাঁথা সেলাইয়ের সময় অনেকেই লিখে রাখে তাদের আবেগ অনুভূতির কথা। যেমন: স্নেহময়ী বড় বোন তার ছোট ভাইয়ের উদ্দেশ্যে কাঁথায় লিখে রাখে:

"সোনামণি ভাই আমার সুখে নিদ্রা যাইও
অভাগিনী বুবুর কথা নিরলে ভাবিও।"[২৩]

প্রতিটি মেয়ের জন্যই বিয়ের কল্পনা সুখের বিষয়। এই মিলন চিত্রের কল্পনা একটি গীতে/ ছড়াতে ধরা পড়েছে:

"সেই না কাঁথায় লিইখ্যা থইছে
হানাহানির জোড়া গো।
সেই না কাঁথায় লিইখ্যা থইছে
ময়ূর পংখীর জোড়াগো ॥"[২৪]

গ্রামের কোন বাড়িতে কোন উৎসব আয়োজন কিংবা কোন অনুষ্ঠান ছাড়াই জামাই এলে সেই বাড়ির লোকজন যথাসাধ্য জামাইকে আদর আপ্যায়ন করার চেষ্টা করে থাকে। সেই পরিবারটি যতই দরিদ্র হোক না কেন। এমনি একটি চিত্র ধরা পড়ে একটি মেয়েলী গীতে–

"এল জামাই বাড়িতে, তেল নাই খুরিতে (বাটি)
সুতে দেব কি?
ভাঙা কুলো ছেঁড়া কাঁথা, জোগাড় করেছি।"[২৫]

ইসলামপুরের আর একজন কাঁথা শিল্পী মমতাজ মহল। তিনি বি.এ পাস এবং এই পেশায় আছেন প্রায় ১৫ বৎসর। লেখা পড়া শেষ করে চাকুরীর কথা ভাবলেও বিয়ের পরে কাঁথা শিল্পের সাথে জড়িয়ে পড়েন। তিনিও দাবি করেন, দশ বছর আগের তুলনায় এখন কাঁথার চাহিদা অনেকটা বেড়েছে। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষিত মেয়েরা যুক্ত হচ্ছে

www.pathagar.com

এই শিল্পের সাথে। আগের চেয়ে অনেক বেশি। আগে শুধু গ্রাম বাংলার নিরক্ষর মেয়েরা এই কাঁথা সেলাই করত। রান্না বান্না বা ঘর সংসারের কাজ শেষ করে অবসর সময়ে ছোট ছোট কাঁথা কিংবা বসার আসন সেলাই করত। কেউ সন্তান সম্ভবা হলে সেই পরিবারের মেয়েরা আগে থেকেই অনাগত শিশুর জন্য নানা রঙের সুতা ও পুরান সব কাপড় মাপ মত কেটে কাঁথা সেলাই করতে বসে যেত। গ্রাম বাংলায় এখনো এই চিত্র দৃশ্যমান। এছাড়াও ছোট ছোট কাপড় ২ থেকে ৩ পুর দিয়ে সেলাই করে তৈরি করে খাওয়ার আসন। এখন অনেক গ্রামের রান্না ঘরে কিংবা ঘরের বারান্দায় মাটিতে সেই সব আসন পেতে বসে খেতে দেয়া হয়। সেখানে খাওয়ার জন্য কোন চেয়ার টেবিল থাকে না। এমনি একজন সূচি শিল্পী জেলা শহরের অঞ্জনা দাস। তিনি অবসর সময়ে বসার জন্য সুন্দর নকশা দিয়ে সুঁই-সুতার সাহায্যে ছোট ছোট সব বসার আসন ও বাচ্চাদের কাঁথা তৈরি করেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নকশি কাঁথা সেলাই করতে বিভিন্ন ফোঁড়ের ব্যবহার দেখা যায়। তাহারিমা ও মমতাজ মহল কাঁথা সেলাই করতে যেসব বিভিন্ন ফোঁড়ের ব্যবহার হয় তার নাম করেন। সেগুলো এই রকম : বাঁশ পাতা ফোঁড়, রান ফোঁড়, ডবল রান ফোঁড়, বেঁকি ফোঁড়, লিক ফোঁড়, পাটি ফোঁড়, তোলা ফোঁড়, গাঁট ফোঁড়, ডাল ফোঁড়, বরকি ফোঁড়, হেরিং বোন ফোঁড়, হেম ফোঁড়, বখেয়া ফোঁড়, ক্রম ফোঁড়, তারা ফোঁড়, ডালিং ফোঁড়, ডবল হেরিংবেন ফোঁড়, বোতাম ঘর ফোঁড়, চেন ফোঁড়, বার্ষিদা ফোঁড়, ডাঙ্গা ফোঁড়, ভরাট ফোঁড়, লেজি-ডেইজি ফোঁড়, বাতাম ঘর ফোঁড় ইত্যাদি। তাছাড়াও আছে বিভিন্ন ডিজাইনের সেলাই। সেগুলো হল: লিক লহরি, সুজনি, কাঁঠাল পাতা, কার্পেট, বেলি ফুল, কদম ফুল, তাজ ফুল, মরিচ ফুল, হাতি, খরগোশ, ময়ূর, বিভিন্ন জাতের ছোট ছোট পাখি ইত্যাদি।

কাঁথার শ্রেণিবিভাগ: পরিবার ও সমাজ জীবনের বিভিন্ন উদ্দেশ্যকে ও প্রয়োজনকে ঘিরে কাঁথার প্রকারভেদ হয়ে থাকে। বিভিন্ন রুচির মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী কাঁথা শিল্পীরা বিভিন্ন রকমের কাঁথা তৈরি করে থাকে। পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন তাঁর একটি প্রবন্ধে ০৭ (সাত) প্রকারের কাঁথার নাম করছেন।

ক. পানসুপারী রাখার 'খিচা'।
খ. তসবী বা জপের মালার 'থলিয়া'।
গ. ফকিরের ভিক্ষার 'ঝুলি'।
ঘ. বালিসের 'বেটন'।
ঙ. যাকিদা দোতারা রাখার 'আবরণী'।
চ. কোরআন শরীফ রাখার 'ঝোলা'।
ছ. গায়ে দেওয়ার 'কাঁথা'।[২৬]

এছাড়া ওয়াকিল আহমদ ঢাকায় বাংলা একাডেমির সংগ্রহে থাকা দশ রকমের কাঁথার কথা বলেছেন। সেগুলো হচ্ছে: নকশি কাঁথা, সুজনি কাঁথা, লেপ কাঁথা, নকশি আমন, জায়নামাজ, দস্তরখানা, গাঁটরি, বোচকা বা বুগইল, বালিশের ছাপা এবং বস্তানী।[২৭]

গুরুসদয় দত্ত তাঁর একট প্রবন্ধে ব্যবহারের ভিন্নতা লক্ষ্য করে সাত রকমের কাঁথার কথা বলেছেন। সেগুলো হচ্ছে: আরশিলতা, ওয়ার, দুর্জনি, বেটন, লেপ কাঁথা,

www.pathagar.com

সুজনি কাঁথা ও রুমাল কাঁথা। এর সাথে তিনি আবার কাঁথাগুলোর মাপ সম্পর্কেও বলেছেন। যথা : লেপকাঁথা (৬.২৫'×৪.৫০'), সুজনি কাঁথা (৬.০০'×৩.৫০'), রুমাল কাঁথা (১২'×১২'), বেটন কাঁথা (৩'×৩'), আর্শিলতা কাঁথা (৬'×১২'), ওয়ার কাঁথা (২'×১') এবং দুর্জনি কাঁথা (১০'×৬')।[২৮]

আবার দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, কাঁথা প্রধানত তিন প্রকার। যথাঃ

ক. গোলাপ

খ. বটুয়া

গ. কাঁথা।[২৯]

এই জেলাতে নকশি কাঁথা বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। নিচে সেগুলোর বিবরণ সংক্ষেপে দেয়া হল:

ক. সুজনি কাঁথা : বিছানার পাতা চাদরের উপরে এই কাঁথা দিনের বেলায় বিছিয়ে রাখা হয়। রাতে ঘুমাবার সময়ে এই সুজনি কাঁথা তুলে ভাঁজ করে রাখা হয়। বিছানার উপরে পেতে রাখলে দেখতে বেশ লাগে। ঐতিহ্য আর আভিজাত্যে ঘরটি আলাদা মর্যাদায় পৌঁছে যায়। সাধারণত বাড়িতে অতিথি এলে এই মর্যাদা সম্পন্ন সুজনি কাঁথা বেশি ব্যবহার করা হয়। এই বিখ্যাত কাঁথার মধ্যখানে পদ্ম এবং পাড়ে নানা ফুল ও লতা পাতার নকশা তোলা হয়।

খ. লেপ কাঁথা : এটি এক ধরনের মোটা কাঁথা। যা ৭-৮ পারত কাপড় দিয়ে তৈরি করা হয়। শীতকালে লেপের পরিবর্তে অনেকেই এই কাঁথা ব্যবহার করে আরাম পায়। লেপের মতই এই কাঁথা খুব পুরু ও প্রশস্ত। গ্রামের অনেক গরীব মানুষ এই কাঁথা নিজেরা তৈরি করে ব্যবহার করে থাকে।

গ. আরশিলতা কাঁথা : বিভিন্ন মাপের আয়না বা আরশি ঢেকে রাখার জন্য এই কাঁথা ব্যবহার করা হয়।

ঘ. দস্তরখানা কাঁথা : অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য এই কাঁথা ব্যবহার করা হয়। অতিথি এলে কোন কোন সৌখিন লোকেরা অতিথিদের খেতে দেবার সময় এই কাঁথা ব্যবহার করে। এতেকরে খাবার পরিবেশনা অনুষ্ঠানটি শিল্পসম্মত ও নান্দনিক হয়ে ওঠে। অতিথিদের খাওয়া শেষ হলে এই দস্তরখানা আবার গুটিয়ে রাখা হয় এবং এই দস্তরখানায় আসুন, বসুন এ ধরনের কথাসহ থালা, বাটি, গ্লাস ইত্যাদির ছবি আঁক থাকে।

ঙ. গিলাফ কাঁথা : ইসলাম ধর্মের লোকেরা তাদের পবিত্র কোরআন ও হাদিস রাখার জন্য এর ব্যবহার করে থাকে। এখানে কোন প্রাণীর ছবি থাকে না। কচু পাতার মোটিফ এ কাঁথাতে বেশি দেখা যায়।

চ. জায়নামাজের কাঁথা/ জায়নামাজ : নামাজ পড়ার সময় ইসলাম ধর্মের লোকেরা এটা ব্যবহার করে থাকে। মুসলমান কাঁথা শিল্পীরাই এই কাঁথা বেশি সেলাই করে। মসজিদ, মিনার ও গম্বুজের মোটিফ দেখা যায় এই কাঁথায়। মক্কা ও মদিনা শরীফের ছবিও দেখা যায় এখানে। এই কাঁথা পবিত্র বিধায় এর ধর্মীয় মূল্য খুব বেশি।

www.pathagar.com

ছ. গাদলা কাঁথা : লোক শিল্পীরা এই গাদলা খুব মোটা করে তৈরি করে। বড়দের জন্য সাধারণত ১২ থেকে ১৫ পুর কাপড় দিয়ে এবং শিশুদের জন্য ৮ থেকে ১০ পুর কাপড় দিয়ে এই গাদলা তৈরি করা হয়। এটা তৈরি করতে বেশি কাপড় লাগে বিধায় ভিতরে সব পুরান কাপড় দিয়ে পুর দেয়া হয়। এই গাদলা বা গোদলা শহরের থেকে গ্রামের লোকেরা দড়ি দিয়ে তৈরি খাটলা ও চোকিতে পেতে ঘুমায়।

জ. আরশিলতা: আরশি শব্দের অর্থ আয়না। লোক শিল্পীরা প্রসাধনের নানা সামগ্রি যেমন: আয়না, চিরুনি, বিভিন্ন ধরনের কাজল এইসব জড়িয়ে রাখতে এই আরশিলতা কাঁথা সেলাই করে থাকে। এ ধরনের কাঁথার ব্যবহার নিয়ে এই জেলাতে কিছু লোক বিশ্বাস চালু আছে। যেমন গ্রামের মহিলারা/ যুবতী মেয়েরা রাতে আয়না দেখে না, দেখলে পরে নাকি মুখে কালো দাগ পড়তে পারে। আবার এমন বিশ্বাস চালু আছে যে, রাতে আয়নায় মুখ দেখলে অপদেবতা শরীরে ভর করতে পারে। তাই রাতের বেলায় আরশিলতা দিয়ে আয়না ঢেকে রাখা হয়।

ঝ. পর্দা কাঁথা : চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় গরুর গাড়ির টাপর/ ছই (বাঁশ দিয়ে তৈরি এক ধরনের ঢাকনা) এর পর্দা হিসেবে এই কাঁথার ব্যবহার দেখা যায়। এক সময় এই জেলায় গরুর গাড়ির খুব প্রচলন ছিল। এখন যোগাযোগের জন্য রাস্তা ঘাট হওয়ায় এই গাড়ির প্রচলন খুবই কম দেখা যায়। তবুও প্রত্যন্ত গ্রামের কোন কোন জায়গায় মেয়েদের চলাচলের জন্য গরুর গাড়ি ব্যবহার করার সময় এই পর্দা কাঁথা পর্দা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

জেলার কাঁথা শিল্পীরা বিশেষ করে গ্রামের শিল্পীরা নিজের ইচ্ছে মত কাঁথা তৈরি করে না। যারা নকশি কাঁথার ব্যবসা করে, তাদের চাহিদা ও ইচ্ছে অনুযায়ী গ্রামের শিল্পীরা বিভিন্ন মাপ ও ডিজাইনের কাঁথা তৈরি করে দেয়। গ্রামের এইসব কাঁথা শিল্পীরা নিজের সখে নিজেদের ব্যবহারের জন্য খুব কম কাঁথা সেলাই করে থাকে। গ্রামের কোন কোন কাঁথা শিল্পী এটিকেই একমাত্র জীবিকার উপায় মনে করে। তারা একটা কাঁথা সেলাইকরে যে মজুরি পায়, তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। কেননা একটা ভাল নকশি কাঁথা তৈরি বা সেলাই করতে ৩ থেকে ৪ মাস লেগে যায়। যার মজুরি ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা মাত্র। অথচ এই কাঁথা বিক্রি হয় ২৫০০ থেকে ৩০০০ টাকায়। শহরের উচ্চবিত্তের লোকেরা নানা ধরনের অনুষ্ঠানে এমন দামী নকশি কাঁথা উপহার সামগ্রী হিসেবে দিয়ে থাকে।

এমন উপহার দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশেও পাড়ি জমায়। অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার বিদায় অনুষ্ঠান, মাননীয় মন্ত্রী কিংবা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শুভাগমন উপলক্ষে তাঁদের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নকশি কাঁথা উপহার হিসেবে দেয়ার নজির আছে। এখানকার নকশি কাঁথা লোকশিল্পের ক্ষেত্রে এক গৌরবময় ভূমিকা পালন করে আসছে।[৩০] কে কত বেশি সুন্দর করে নকশি কাঁথা তৈরি করতে পারে তার প্রতিযোগিতাও চলে জেলার শিল্পীদের মধ্যে। জেলার নকশি কাঁথা সত্যি এক অসাধারণ লোক শিল্প। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শহরের ইসলামপুরে নকশি কাঁথা শিল্পের দুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে।

www.pathagar.com

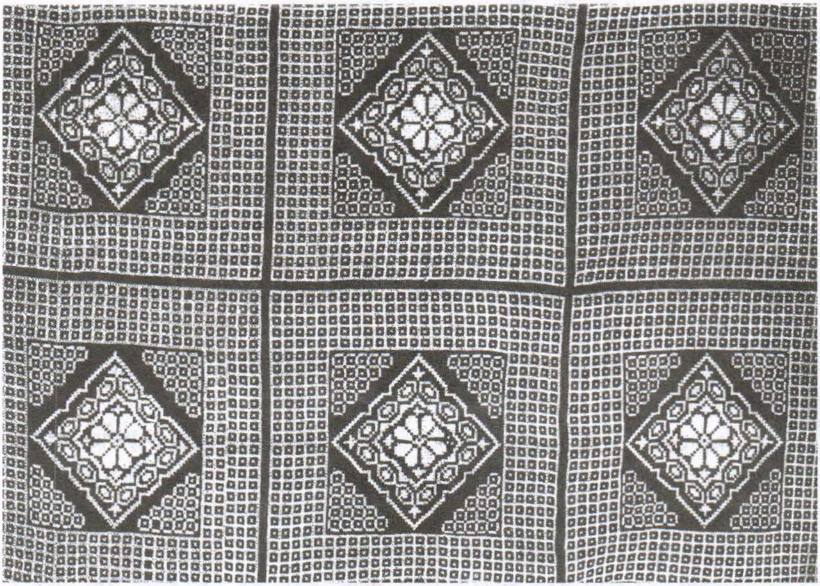

নকশি কাঁথা

কাঁসার দোকান

www.pathagar.com

৪. রেশমশিল্প

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে জড়িয়ে আছে শিবগঞ্জ উপজেলার লোকশিল্প-তাঁত শিল্পের সুখ-দুঃখের ইতিহাস। আমরা যাকে রাজশাহী সিল্ক বলে থাকি এবং সারা দেশের মানুষ যাকে রাজশাহী সিল্ক বলে থাকে মূলত তা শিবগঞ্জে এবং নবাবগঞ্জ সদর উপজেলাতে তৈরি হয়। এখানকার এই তাঁতশিল্পীরা সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায়, যুগ-যুগ ধরে তাদের এই পেশাকে টিকিয়ে রেখেছে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই তাঁতশিল্পীরা অভাব অনটনকে উপেক্ষা করে টিকিয়ে রেখেছে হাজার বছরের বাংলার লোকশিল্পের ঐতিহ্যকে।

রেশম শিল্পের ইতিহাস বাংলাদেশে অনেক প্রাচীন। আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দী থেকে এ ইতিহাসের যাত্রা শুরু। ঔপনিবেশিক আমলে এ শিল্পের তেমন উন্নয়ন ও প্রসার ঘটেনি। দেশ ভাগের পর রাজশাহী জেলা শহরে রেশম ও লাক্ষা শিল্প প্রযুক্তি ইন্সটিটিউট এবং রেশম কারখানা স্থাপন করা হলেও আন্তরিকতার অভাবে এ শিল্পের কোন উন্নতি হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর তাঁতশিল্পীরা আশায় বুক বেঁধেছিল; কিন্তু সেখানেও হতাশার চিত্র। দেশ স্বাধীন হবার পরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের একটি উপখাত হিসেবে রেশম শিল্পকে বিবেচনা করা হলেও এর ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য ও কারিগরী পৃষ্টপোষকতা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। এসব নিয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হয়েছে, যাতে করে রেশম তাঁত শিল্পীদের জীবন ও জীবিকা টিকে থাকে। তবে বর্তমান সরকার ভেঙ্গে দেয়া রেশম বোর্ডকে পুনর্গঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এটি একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ।

রেশমশিল্প হচ্ছে একটি কৃষি নির্ভর কুটিরশিল্প এবং লোকশিল্প। এক ধরনের গুটি পোকার গুটি থেকে খুব সূক্ষ্ম ও হলুদ রঙের তন্তু পাওয়া যায়। যা দিয়ে প্রথমত সুতা এবং পরে বিভিন্ন ধরনের কাপড় তৈরি হয়। এ গুটি পোকাকেই বলা হয় রেশমের গুটি বা রেশমের কীট (Silkworm)। রেশমকীটের চাষাবাসের মাধ্যমে রেশম উৎপাদন করা হয়। বম্বিক্স মরি (Bombyx mori) প্রজাতির রেশমকীটই উৎকৃষ্ট রেশম উৎপাদন করে বলে এরই চাষ বেশি করা হয়। এরা ওক (Oak), চেরি ও তুঁত গাছের পাতায় বাসা বাঁধে।[৩১]

স্ত্রী রেশমকীটগুলো চাষ করা পাতার উপরে একসাথে প্রায় পাঁচশত ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার দিন থেকে প্রায় দশ দিন পরে সেই ডিম ফুটে পলু (কীট) বের হয়। পলু বের হলে পরে এদের তুঁত গাছের পাতা খেতে দেয়া হয় এবং খেতে দেওয়ার দিন থেকে ৩২ থেকে ৩৮ দিন হয়ে গেলে এরা পরিণত রূপ পায়। তখন এদের দৈর্ঘ্য হয় প্রায় ৩ থেকে ৪ ইঞ্চি। সঞ্চালনশীল নরম ত্বকে আংটির মতো ১২টি এককেন্দ্রী বস্তু নিয়ে এদের দেহ গঠিত। এদের মাথার দিকে চোয়াল ও দাঁতের মতো শক্ত দুটি নিম্নহনু থাকে। পরিণত কীট পাতার উপর শুয়ে মাথার অদ্ভুত কাঁপন আর দেহের ধীর চক্রাকার গতিতে গুটি বুনতে শুরু করে। কীটের দেহের ভিতর থেকে ফাইব্রয়েন (Fibroin) নামের একটি সিক্ত বস্তু সামান্য মোমজাত এক বস্তুর সঙ্গে মিশে এর ঠোঁটের সূক্ষ্ম ফাঁক দিয়ে নিঃসৃত হতে থাকে। ফাইব্রয়েন বাতাসে খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় এবং শক্ত

www.pathagar.com

হয়ে তন্তুতে পরিণত হয়। ক্রমে এর উপরে আঠালো স্বরযুক্ত একটি খোলাস তৈরি হয়ে গুটিটি পূর্ণতা লাভ করে।[৩২] গুটি পূর্ণ হয়ে গেলে এখান থেকে তন্তু তৈরি করা হয়। প্রথমে গরম জলে গুটিগুলোকে সিদ্ধ করে নিয়ে একটি একটি করে খুলে কয়েকটি তন্তুকে একসাথে পাকিয়ে রেশম সুতা তৈরি করা হয়। ভাল জাতের একটি গুটি থেকে প্রায় ২০০০ থেকে ২৫০০ ফুট পর্যন্ত তন্তু হতে পারে বলে মনে করেন ভোলাহাটের তুঁত চাষী ও পলু পালনকারীরা।

বাংলাদেশের আবহাওয়া, ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশ তুঁত চাষ এবং পলু উৎপাদন ও পালনের জন্য খুবই উপযোগী। তুঁত চাষ, পলু উৎপাদন ও পালন এ কাজগুলি কৃষির পর্যায়ভুক্ত। আবার রিলিং (পাকানো), টুইস্টিং (দুইটিকে একসাথে পাকানো), নলি পাকানো টানা করা (১৫০ থেকে প্রায় ১৭০ গজকে এক সাথে লম্বা করে তৈরি করা), জড়ুন করা (টানা করার দ্বিতীয় পর্যায়: অর্থাৎ কোন উন্মুক্ত স্থানে/ আম বাগানে/ খেলার মাঠে ১৫০ থেকে ১৭০ গজ রেশম সুতাকে একটি কাঠের তৈরি লড়দে (কাঠের তৈরি ১৪/১৫ ইঞ্চি গোলাকার এবং ৬৫/৭০ ইঞ্চি লম্বা এক ধরনের রোলার বা ব্যালন) শানার মধ্য দিয়ে জড়ানো/ পাকানো। এই কাজটি করতে সময় লাগে প্রায় ৪/৫ ঘন্টা। এটি শেষ হলে একে খটখটি/ তাঁতে জুড়ে দেয়া হয় এবং বোয়া তোলা (প্রত্যেকটি রেশম সুতাকে বোয়ার ছিদ্রের মধ্য দিয়ে এপার ওপার করা এবং প্রায় ২৫০ রেশম সুতাকে এক একটি বোয়ার মধ্যে দিয়ে বুনন করা) হলে সবশেষে তাঁত শিল্পীরা বিভিন্ন জাতের কাপড় বোনা শুরু করে। নলিতে রেশম সুতা জুড়ে এটিকে মাকুতে জুড়ে বোনার কাজ শুরু হয় বিশ্বকর্মাকে পূজা করে। এই কাজগুলি লোকশিল্প জাত।

কবে থেকে এখানে তাঁত শিল্পের কাজ শুরু হয়েছিল তার সঠিক হিসেব পাওয়া আজ খুবই কঠিন। এ এলাকার তাঁত শিল্পীরা বলেন যে, পুরুষানুক্রমে তারা এ পেশায় নিযুক্ত। যারা বিত্তহীন, অভাবী আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল তারা শৈশবকাল থেকেই এ পেশায় জড়িয়ে পড়ে। প্রাথমিক অবস্থায় শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায় এবং পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়া লেখা করেই শেষ করে এ পাঠ। অতঃপর কিছুটা আর্থিক সুবিধার কারণে তারা প্রাথমিকভাবে তাঁতে কাপড় বা বস্ত্র তৈরির আগের পর্যায়ের কাজগুলোতে শারীরিক শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করে। যেমন প্রথমত: বাগানে বা কোন লম্বালম্বিভাবে খোলা জায়গায় ১৫০ গজের টানা করতে সহযোগিতা করা, দ্বিতীয়ত: জড়ুন (রেশম সুতাগুলোকে কাঠের লড়দে জড়ানো) করতে সহযোগিতা করা, তৃতয়ীত: নলি পাকাতে সহযোগিতা করা, চতুর্থত: সুতা রঙ করতে রং জলে মিশান বা গোলা, চুলা জ্বালান, জল গরম হলে সেখানে পরিমাণমত সাবান-সোডা দেয়া (সাবান-সোডার গরম জলে রেশমের আসল রঙ ধুয়ে ফেলা হয় এবং পরে সাদা রেশম সুতাকে পছন্দমত বিভিন্ন রঙে রাঙানো হয়) কাজে সহযোগিতা করে থাকে। এ বিষয়গুলি করা শেষ হলে পরে খটখটি তাঁতে শুরু হয় কাপড় বোনার কাজ। এ কাজ প্রধানত পুরুষ তাঁতিরাই করে থাকে। খুব কম ক্ষেত্রেই শিশু বা নারীরা এ কাপড় বোনার কাজ করে। নারীরা অন্যান্য কাজে সহযোগিতা করে থাকে।

www.pathagar.com

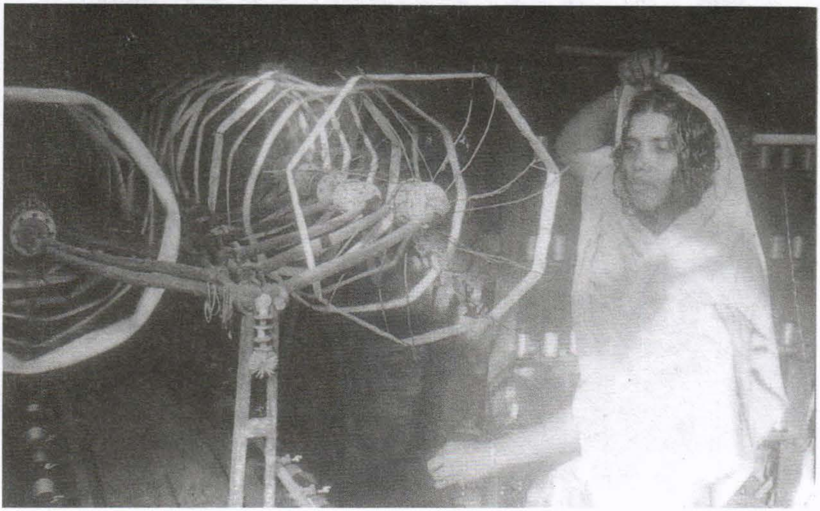

রেশম সুতা রিলিং করা অবস্থায় ঊর্মি খাতুন, বয়স-২০ বৎসর।

নলি পাকানো অবস্থায় পলি খাতুন, বয়স-২০ বৎসর।

www.pathagar.com

তাঁত বোনা অবস্থায় ভাগ্য দাস, বয়স-৩২ বৎসর।

শিবগঞ্জ সদরের এক সময়ের সফল রেশম কাপড়ের ব্যবসায়ী ৭০ বছরের সাধন চন্দ্র মনিগ্রাম। তার কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। তিনি আমাকে বলেন যে, তাঁর পূর্ব পুরুষেরা ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ থেকে যখন এ অঞ্চলে চলে আসেন, তখন এ রেশম ব্যবসা সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। তবে তখন উন্নত মানের বিদ্যুৎচালিত পাওয়ার লুম বিদ্যুৎ চালিত চরকা, ববিন-রেলিং মেশিন, টুইস্টিং মেশিন এসব কিছুই ছিল না। তখন সব কিছুই তাঁত শিল্পীরা তাদের হাত দিয়ে করত। শিবগঞ্জ উপজেলার আলিডাঙ্গা, তক্তিপুর, দেওয়ান জায়গীর এসব এলাকায় তখন থেকেই খটখটি বা গর্ত তাঁত চালু ছিল। স্বাধীনতা উত্তর কালে হরিনগর, লাহারপুর, লক্ষ্মীপুর, নয়ালাভাঙ্গা, ঘোড়াপাখিয়া এসব অঞ্চলে রেশমের খটখটি বা গর্ত তাঁত চালু হয়।

স্বাধীনতার পূর্ব কালে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে এসব এলাকার তাঁতে মোটা সুতার (৪০×৬০) শাড়ি-কাপড় তৈরি হতো চিত্তরঞ্জন তাঁতে। এ কাপড়গুলো সাধারণত মধ্যবিত্ত কিংবা বিত্তহীন পরিবারের মেয়েরা ব্যবহার করত। পাকিস্তান আমলে এসব এলাকায় চিত্তরঞ্জন তাঁতের সংখ্যা বেশি ছিল। এ তাঁতগুলোকে আবার সেমি অটোমেটিক তাঁত বলা হয়। এক এক জন তাঁত শিল্পী দিনে (সকাল ৭/৮টা থেকে বিকেল ৪/৫ টা পর্যন্ত) ৩টা পর্যন্ত শাড়ি (অর্থাৎ ১০ হাত × ৩ =৩০ হাত) বুনতে পারত। তবে যারা দক্ষ এবং শারীরিক দিক থেকে বেশি শক্তিশালী তারা দিনে ৪ টা শাড়ি বুনতে পারত। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে বিশেষত ১৯৭৪ সালের প্রথম দিক থেকেই সুতার কাপড়ের বাজার খারাপ বা মন্দা হতে থাকে এবং ক্রমশ তাঁত শিল্পীরা রেশম ব্যবসার দিকে ঝুঁকে পড়ে। হরিনগর গ্রামের অচিন্ত্য কুমার দাস (৬৭) প্রথম সাহস করে রেশম সুতার কাপড়/ শাড়ি তৈরির কাজে হাত দেন। তিনি তখন রানীহাটি উচ্চ বিদ্যালয়ের বি.এস-সি শিক্ষক। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি এ কাজে মনোযোগ দেন। তাঁর সাথে সার্বক্ষণিক ছিল তাঁর ব্যবসায়িক সাথী এ গ্রামেরই প্রেম চাঁদ দাস

www.pathagar.com

(৬৬)। প্রেম চাঁদ দাস একজন ভাল কণ্ঠশিল্পীও বটে। তাঁরা প্রথম খটখটি তাঁতে লাল পেড়ে গরদ শাড়ি তৈরি করে এবং সফলও হয়। তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলেন যে, আলিডাঙ্গা গ্রামের দুই ভাই রতিকান্ত ব্যান্ধ্যা (স্বর্গত) এবং ছোট ভাই নবকান্ত ব্যান্ধ্যা (শিবগঞ্জ সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের অব: শিক্ষক) (৭৪) এ কাজে তাঁদের সহযোগিতা করেছিলেন। এদের সাথে তাঁরা সাধন চন্দ্র মনিগ্রামের কথাও কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করেন। এরপর ক্রমশ সমস্ত চিত্তরঞ্জন তাঁতের স্থান দখল করে নেয় খটখটি তাঁত। অর্থাৎ এ গ্রামের সব তাঁত শিল্পীরাই সুতার কাপড়ের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে রেশম কাপড় তৈরির কাজ শুরু করে। এ ব্যবসা করে তাঁত শিল্পীরা ১৯৭৪/১৯৭৫ সালের পর থেকে আর্থিকভাবে বেশ সফলও হয়। অনেকে বিত্তহীন থেকে গাড়ি বাড়ির মালিক পর্যন্ত হয়েছে। তবে বর্তমানে রেশম কাপড়ের ব্যবসা শুধু অলাভজনকই নয়, ঐতিহ্যময় রেশম শিল্পের ব্যবসা এখন প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি। প্রতিদিনই রেশম সুতার মূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং সে তুলনায় বাজারে কাপড়ের মূল্য না পাওয়ায় এ শিল্প এখন হুমকির সামনে। তাঁত শিল্পীরা হতাশায় দিন গুনছে। একবার লন্ডন শহরের টেক্সটাইল প্রকৌশলী হাস্যময়ী ল্যারী গ্যাব এসেছিলেন রেশম শিল্পের নানা দিক দেখতে। তাঁর সাথে আমার কথা হয়েছিল হরিনগর গ্রামে। তখন রেশম তাঁত শিল্পের ব্যবসা জমজমাট। প্রাণচঞ্চল সেই বিদেশিনী সমস্ত গ্রাম ঘুরে ঘুরে দেখলেন, তাঁত শিল্পীদের বুনন নৈপুণ্য আর বিভিন্ন রঙ ও ডিজাইনের সুদৃশ্য সব শাড়ি। যেমন: পটলা কাতান, তাঞ্চি কাতান, ওয়ার প্রিন্ট, কনট্রাস্ট, লাল পাড়ের ঐতিহ্যবাহী গরদ শাড়ি (এই গরদ শাড়ি হিন্দু মেয়েরা বিভিন্ন পূজার সময়ে মন্দিরে আলপনা দিতে এবং পূজার নৈবেদ্য সাজাতে স্নান সেরে পড়ে), বেনারশি, যাউথ কাতান, সিল্ক-মটকা, কটন মটকা, বলাকা থান প্রভৃতি। লাস্যময়ী এই ল্যারী গ্যাব যতটা আনন্দিত হয়েছিলেন, তার থেকে অনেক বেশি বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর বিস্ময়ের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি অকপটে স্বীকার করেন যে, আধুনিক প্রযুক্তিগত শিক্ষা-দীক্ষা ছাড়া এসব শিল্পীদের কারিগরি নৈপুণ্য সত্যি প্রশংসার দাবিদার।

যাঁরা কোনদিনও এসব শিল্প এলাকায় (হরিনগর, আলিডাঙ্গা, তত্তিপুর, লাহারপুর, দেওয়ানজাইগীর, লক্ষ্মীপুর) যাননি, সেখানে গেলে প্রথমে ভাল না লাগতেও পারে। তাঁত শিল্পীদের তাঁত বোনার শব্দে হঠাৎ হয়ত বিরক্ত লাগতেও পারে; কিন্তু সেই বিরক্তি অল্প সময়ের মধ্যেই ঘুচে যাবে নিশ্চিত। তাঁত বোনার সময় মাঁকু-সানা (এক ধরনের পাতলা লোহার লম্বালম্বি নেটের মতো চওড়া চার ইঞ্চি এবং লম্বা ৬০ ইঞ্চি) বোয়ার সাথে সাথে শিল্পীর নিপুণ হাত পায়ের ছন্দে ছন্দে যে শব্দের তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তা আপনাকে সেই তাঁতের কাছে আপনার অজান্তেই কিছুক্ষণ দাঁড় করিয়ে দেবে। আপনি বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে ছন্দে ছন্দে তালে তালে শিল্পীর নিপুণ হাতে নক্সা তৈরির নান্দনিক খেলায় বিমোহিত হয়ে উঠবেন। অতঃপর আপনাকে তাড়া করে ফিরবে কিছু প্রশ্ন: কত দাম? একটা শাড়ি বুনতে কয়দিন লাগে? কেমন করে হাজার হাজার রেশম সুতার সাথে তালে তাল মিলিয়ে ছন্দে ছন্দে হাত ও পায়ের সাথে নলি ও মাঁকু খেলা করে চলেছে? সব মিলিয়ে তাঁত শিল্পীর বুনন-নৈপুণ্য আপনাকে নিশ্চয় মুগ্ধ করবে। আপনি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখবেন আপনার ভাল লেগে যাবে জীবন সংগ্রামী এসব তাঁত শিল্পীদের বুনন নৈপুণ্য।[৩৩]

www.pathagar.com

এসব এলাকায় বিভিন্ন রকমে রেশম কাপড় তৈরি হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সদরে অবস্থিত ব্রাকের আড়ং সেন্টারের সিনিয়র সেন্টার ম্যানেজার এনামুল হক সাহেবের অফিস থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী নিম্নলিখিত বিভিন্ন ডিজাইনের কাপড় তৈরি হয়। এসব কাপড় তৈরি হয় লাহারপুর, বহরম, হরিনগর, দেওয়ানজাইগীর, শিবগঞ্জ, নয়ালাভাঙ্গা গ্রামে। কাপড়গুলি হচ্ছে (১) বলাকা সিল্ক থান, (২) বগলার থান, (৩) জয়শ্রী সিল্ক থান, (৪) জয়শ্রী সিল্ক কালার থান, (৫) সিল্ক এন্ডি থান, (৬) জয়শ্রী সিল্ক ডবল ভন্না থান, (৭) সিল্ক এন্ডি কালার থান, (৮) বলাকা সিল্ক শাড়ি (৭০ গজ), (৯) বলাকা সিল্ক কালার শাড়ি (৭.২৫ গজ) (১০) সিল্ক জয়শ্রী শাড়ি (৭ গজ), (১১) সিল্ক জয়শ্রী শাড়ি (৭.২৫ গজ), (১২), সিল্ক এন্ডি শাড়ি, (১৩) সিল্ক চেক শাড়ি, (১৪) সফ্‌ট সিল্ক শাড়ি, (১৫) সিল্ক মটকা থান, (১৬) সিল্ক ডুপিয়ান থান, (১৭) সিল্ক দোপাটি, (১৮) এন্ডি কটন থান, (১৯) স্মান সিল্ক থান প্রভৃতি।

এসব রেশম কাপড়ের বিক্রির বাজার মূলত ঢাকা। এছাড়া চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, রাজশাহীতেও বিক্রি হয়। এখন তাঁতশিল্পীদের কাছ থেকে কাপড় কিনে প্রধান আড়ং সেন্টার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। কিন্তু ১৯৮২ সালের পূর্বে এলাকার স্থানীয় ব্যবসায়ীরা তাঁত শিল্পীদের কাছ থেকে কাপড় কিনে নিয়ে বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করতো। তখন তাঁত শিল্পীদের আর্থিক অবস্থাও ভাল ছিল; কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের রুচির পরিবর্তন হয়েছে। নতুন নতুন রঙ ও দৃষ্টিনন্দন সব ডিজাইনের শাড়ির সাথে পাল্লা দিয়ে টিকে থাকতে পারছে না রেশম কাপড়। এছাড়াও প্রতিদিনই রেশম সুতার মূল্যের ঊর্ধ্বগতির ফলে তৈরি কাপড়ের দাম হয়ে যাচ্ছে বেশি। ফলে তৈরি কাপড় ক্রেতার ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। ভোলাহাটে যে রেশম উৎপন্ন হয় তা চাহিদার তুলনায় খুবই কম। এখন রেশম আমদানী করা হয় চীন ও ভিয়েতনাম থেকে। বেশিরভাগ রেশম আসে ভিয়েতনাম থেকে। আমদানীকৃত রেশমের চড়া মূল্য এবং চড়া মূল্যে কেনা রেশম সুতা দিয়ে তাঁত শিল্পীরা কাপড় বুনে ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করতে পারছে না। অনেক সময় কম পুঁজির তাঁতীরা জীবনের দৈনন্দিন চাহিদা মিটাতে টাকা ছাড়ের জন্য অল্প দামে তাদের কাপড় বিক্রি করে দেয়। যার ফলে কোন লাভ হয় না। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁত শিল্প হুমকির সম্মুখীন। লাভ হয় না বলে অনেক রেশমের তাঁত এখন বন্ধ হয়ে গেছে।

১৯৮২ সালের পূর্বে শিবগঞ্জে বেশ কিছু সিল্ক ফ্যাক্টরী গড়ে উঠেছিল। যেখানে রেশম সুতা রিলিং ও টুইস্টিং করা হতো যন্ত্রচালিত চরকা ও রেলিং মেশিনে। ছিল পাওয়ার লুম (বিদ্যুৎ চালিত এক ধরনের তাঁত)। ১৯৮৪ সাল শিবগঞ্জ সদরে শিবগঞ্জ সিল্ক মিল লিঃ নামে একটি রেশম ফ্যাক্টরী হয় এবং সেই ফ্যাক্টরী বেশ ভাল ভাবেই প্রায় ৪/৫ বছর চলেছিল। অচিন্তকুমার দাস (৬৫), প্রেম চাঁদ দাস (৬৪), মরহুম ইদ্রশ আহমেদ, সাধন চন্দ্র মনিগ্রাম (৬৭), সাদ মনির আহমদ (৬৭) এই পাঁচ জন মিলে এই ফ্যাক্টরী করেছিলেন; কিন্তু সেই ফ্যাক্টরী এখন কালের গর্ভে বিলীন। এছাড়াও শিবগঞ্জে ছিল (ক) আদর্শ সিল্ক ফ্যাক্টরী, (খ) শুভেচ্ছা সিল্ক ফ্যাক্টরী, (গ) সাধন সিল্ক ফ্যাক্টরী, (ঘ) ইসলাম সিল্ক ফ্যাক্টরী (ঙ) নূরুল ইসলাম সিল্ক ফ্যাক্টরী এবং (চ) সততা সিল্ক ফ্যাক্টরী। এখন কোন ফ্যাক্টরী চালু নাই। সবগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। কেননা বাজারে

www.pathagar.com

দামের জন্য পাল্লা দিয়ে টিকে থাকতে পারছে না রেশম বস্ত্র। প্রতিদিনই রেশমের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে রেশম আমদানীকারকেরা। কেননা আমদানী কারকেরা একচেটিয়াভাবে এ ব্যবস্থা করছে। সাধারণ কিম্বা অল্প পুঁজির তাঁত শিল্পীরা সরাসরি চীন বা ভিয়েতনাম থেকে রেশম সুতা আমদানী করতে পারে না। ফলে চড়া মূল্য দিয়েই তাদের কাছ থেকে টানা (১৬০-১৭০ গজের রেশম সুতা) ভরনার (যে রেশম সুতা তাঁতে কাপড় তৈরির সময় বোনা হয়) রেশম তাঁতীদের কিনে নিতে হয়। চড়া দামে রেশম কিনে এবং কাপড় বুনে অনেক সময় জীবন ও জীবিকার বাস্তব তাগিদে মুনাফা ছাড়াই তৈরি শাড়ি কাপড় বা থান কাপড় বিক্রি করে দিতে হয়।

তাঁত শিল্পীদের বিশেষত সনাতন ধর্মাবলম্বী হিন্দুদের একটি মজার আচার অনুষ্ঠান বহুদিন থেকে চালু আছে। দূর্গা পূজার দশমী তিথিতে তাঁত শিল্পীরা এবং মহাজনেরা (যারা এক সাথে ১০ থেকে ১৫টি তাঁত তাঁতীদের দিয়ে চালায়) যাদের কাছে কাপড় বিক্রি করে সারা বছর, তাদের প্রত্যেকের জন্য একটি করে নতুন গামছা কিনে রাখে। নির্দিষ্ট দশমী তিথিতে যেসব ব্যবসায়ীরা তাঁতী বা মহাজনদের বাড়িতে সাইথ বা বৌনি করতে আসে। ব্যবসায়ীরা তাঁতি বা মহাজনদের ঘরে এলে প্রথমে তাদের থালায় বা পেস্নটে করে দুর্গা পূজা উপলক্ষ্যে বাড়িতে তৈরি করা লোকখাদ্য যেমন: নারিকেলের নাড়, ঝুড়ির নাড়ু, তিলের নাড়ু, মুড়ির নাড়ু (মোয়া), বুটের ডালের নাড়ু, চিড়ার নাড়ু, চালের নাড়ু, রসকড়া প্রভৃতি সাজিয়ে দেয়া হয়। এর সাথে বাড়িতে তৈরি বিভিন্ন রকম ও স্বাদের মিষ্টিও থাকে। এভাবে তাদের প্রথমে আপ্যায়ন করা হলে, কাপড় ব্যবসায়ীরা তাঁতি ও মহাজনদের পাওনা টাকা পরিশোধ করে কিম্বা অগ্রিম টাকাও দেয়। অতঃপর ক্রেতাদের হাতে নতুন গামছায় বেঁধে দেয়া হয় নানা রকম ও স্বাদের মনভরা সব নাড়ু ও মিষ্টি। মজার বিষয় যে, এ অনুষ্ঠান উপভোগ করতে ক্রেতারা একা একা আসে না। সাথে করে নিয়ে আসে তাদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের। এদের সকলের হাতেই একটি করে নতুন গামছায় বেঁধে দেয়া হয় নানা রকমের নাড়ু আর মিষ্টি। কেউ কেউ আবার মজা করে একটা সত্য কথা বলে বসে যে, 'আমাকে মিষ্টি দিবেন না গো, তার চেয়ে বরং দু'চারটা নাড়ু বেশি দেন।'

এ অনুষ্ঠানকে ঘিরে লাহারপুর, লক্ষ্মীপুর, হরিনগর, আলিডাঙ্গা, শিবগঞ্জ, দেওয়ানজাইগীর প্রভৃতি গ্রামে লোকখাদ্য নানা জাতের নাড়ু তৈরির এক ধুম বা সাড়া পড়ে যায়। এসব নাড়ু তৈরিতে গ্রামের মায়েরা, পিসিরা, দিদিরা, টাম্‌মারা, মাসিরাই মূল ভূমিকা পালন করে। নাড়ু তৈরির কাজটি একজনে হয় না বিধায় এক এক দিন এক এক বাড়িতে বেশ আসর করে আনন্দের সাথে নাড়ু তৈরি করতে বসেন গ্রামের মেয়েরা।

প্রথমে গুড় বা চিনি চুলাতে তাপ দিয়ে পাক তৈরি করা হয়। পাক আঠাল হলে অর্থাৎ একটু ঘন হয়ে আসলে ২/৪ জন মিলে তাড়াতাড়ি করে হাতে সরিষার তেল মাখিয়ে বিভিন্ন রকমের নাড়ু তৈরি করতে লেগে যান। নাড়ু তৈরির মিষ্টি গন্ধে দুরন্ত কিশোরেরা নাড়ু পাবার আশায় আশে পাশে ঘোরাঘুরি শুরু করে। কিন্তু ঘোরাঘুরি করলে কী হবে, তাদের ভাগ্যে নাড়ু আর জোটে না। কেননা নাড়ু তৈরি করে সন্ধ্যার সময় পূজাতে আগে উদ্দিষ্ট দেবতাকে সেই সব নাড়ু উৎসর্গ করতে হবে। তারপরে সেই

www.pathagar.com

প্রসাদ জুটবে। তাই পূজা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া দুরন্ত কিশোরদের আর কোন গতি থাকে না। তাঁত শিল্পীদের ব্যবসা মন্দা হয়েছে ঠিক, তবে দশমীর দিন ক্রেতাদের গামছা করে বিভিন্ন রকমের নাড়ু আর মিষ্টি দেয়াতে এখনো টান পড়েনি। এ এক মজার আচার অনুষ্ঠান।

শুধু নাড়ু বানানোতেই মেয়েরা পারদর্শী নয়। তাঁত শিল্পের সাথেও মেয়েরা জড়িত। রেশমের কাপড় বোনার আগে বিভিন্ন প্রস্তুতির জন্য মেয়েদের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন: নলি পাকানো, রেশম সুতা রেলিং (সুতাকে পাকানো) করা, টুইস্টিং (দুটো সুতাকে একসাথে করে পাকানো) করা প্রভৃতি কাজগুলো ঘরে একটি পিড়িতে বসে বসে মেয়েরাই করে থাকে প্রথমে। বস্ত্র তৈরির প্রাথমিক কাজগুলোতে প্রধানত মেয়েদের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা তারা তাঁত না বোনালেও তাঁতে বস্ত্র তৈরিতে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে থাকে।

জেলার তাঁত শিল্পীরা তাঁতে বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র বা কাপড় বুনতে বিভিন্ন রকমের যন্ত্র ব্যবহার করে থাকে। এই সব যন্ত্রের ব্যবহার প্রাচীনকাল থেকেই হয়ে আসছে। তবে প্রাচীনকালে শুধু হাতেই এই সব যন্ত্র ব্যবহার করা হতো। বিজ্ঞানের উন্নতির পথ ধরে এমন কোন কোন যন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্র বিদ্যুতের সহযোগিতা নেয়া হয়। তেমনি এক যন্ত্র হচ্ছে চরকা। আগে হাতের চরকার সাহায্যেই তাঁতের নলি বা ললি পাকানো হতো; কিন্তু এখন সেটা অনেক জায়গাতেই বৈদ্যুতিক চরকায় নলি/ ললি পাকানো হয়। এতে করে তাঁতে বিভিন্ন ধরনের কাপড় তৈরি করা হয়। সেগুলোর নাম ও বিবরণ নিচে দেয়া হল:

চরকা, লাটা-হলকি, নলি বা ললি, মাঁকু, সানা, বোয়া, নাচনি, পাদানি ইত্যাদি।

চরকা: এটি একটি সরু প্রায় ১ ইঞ্চি কাঠের বা বাঁশের শলাকা দিয়ে তৈরি। ৭ থেকে ৮ টা শলাকা লাগে এবং একটি শলাকাকে অন্য শলাকার সাথে মোটা সুতা দিয়ে পরস্পর বেঁধে গোলাকৃতি করা হয়। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৩ ফুট এবং প্রস্থ ১ ফুট। এই চরকাকে দুটি কাঠের বা বাঁশের শলকার মাথায় খাঁজ কেটে বসান হয়। এই চরকার মধ্যে সুতা কিংবা রেশম চাপিয়ে নলি/ ললি পাকান হয়।

লাটা-হুলকি: চরকার থেকে সুতা প্রথমে পাকিয়ে লাটা-হুলকিতে জুড়া বা পাকান হয়। লাটা-হুলকি বাঁশের এক ইঞ্চ চওড়া ৫/৬টি শলাকা দিয়ে তৈরি করা হয়।

নলি/ ললি বা ববিন: প্রায় ৪ ইঞ্চি লম্বা এবং ১ ইঞ্চি চওড়া এবং এর মধ্যে ছিদ্র করা থাকে। এই ছিদ্র দিয়ে ববিন বা নলিকে চরকায় আটকিয়ে তার গায়ে সুতা বা রেশম পাকান হয়।

মাকু: এটি কাঠের তৈরি। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১২ ইঞ্চি এবং প্রস্থ প্রায় ৩ ইঞ্চি। এর মধ্যে খাঁজ কাটা ফাঁকা অংশে নলি জুড়ে দেয়া হয়।

সানা: এটি খুবই সূক্ষ্ম লোহার তার দিয়ে তৈরি। এটি লম্বা হয় প্রায় ৬০ ইঞ্চি। এটি প্রত্যেক সুতা বা তারকে অন্য সুতা বা তার থেকে লম্বালম্বিভাবে আলাদা করে রাখে। এটি চওড়া হয় ৪ ইঞ্চি।

www.pathagar.com

বোয়া: এটি নাইলনের এক ধরনের সুতা। এটি লম্বা হয় প্রায় ৭০ ইঞ্চি এবং চওড়া হয় প্রায় ৮ ইঞ্চি। প্রতিটি নাইলনের মধ্যে একটি করে ছিদ্র থাকে যার মধ্যে সুতা তাঁত বোনার সময় ওঠা নামা করে।

নাচনি: ২ পাটি বোয়াকে ২টি কিংবা ৩টি নাচনির সাহায্যে তাঁত বোনার সময় উঠা নামা করানো অর্থাৎ নাচানো হয়। এর মধ্য দিয়ে মাকুর সাহায্যে নলি তাঁতের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত চলাচল করে কাপড় তৈরি হয়। নাচনি দেখতে অনেকটা দাঁড়ি পাল্লার মত।

পাদানি: ঠকঠকি বা গর্ত তাঁত একজন তাঁত শিল্পী পাদানির সাহায্যে দুটি পা দিয়ে ২ পাটি বোয়াকে উঠা নামা করায় এবং এর মধ্য দিয়েই নলি সানার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাতায়াত করে।

আগের চিত্তরঞ্জন তাঁত বোনা অবস্থায় তপন দাস, বয়স-৪০ বৎসর

৫. নকশি পাখা

উষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত অধিকাংশ দেশের গ্রামাঞ্চলে যেখানে বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা নেই সেখানে নক্‌শি পাখার কদর রয়েছে। নক্‌শি কাঁথার পরেই বাংলাদেশে নক্‌শি পাখার জনপ্রিয়তা সর্বাধিক। চাঁপাইনবাবগঞ্জ বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটি চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া বিশিষ্ট অঞ্চল। এখানে শীতের সময় যেমন প্রচণ্ড শীত, গরমের সময় তেমনি প্রচণ্ড গরম। সাম্প্রতিককালে অবাধে বৃক্ষসম্পদ কর্তনের ফলে এখানকার আবহাওয়া রীতিমত ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে। এখানকার গ্রামাঞ্চলে এখনো বিদ্যুৎ গিয়ে পৌঁছেনি, তাই প্রায় সমগ্র জেলাতেই হাতে তৈরি পাখার যথেষ্ট ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই পাখাগুলো হয় বিভিন্ন আকারের এবং নক্‌শা খচিত রঙ-বেরঙের সুতা দিয়ে তৈরি। ঘন ঘন পাখাগুলো হয় বিভিন্ন আকারের এবং নক্‌শা খচিত রঙ-বেরঙের সুতা দিয়ে তৈরি। ঘন ঘন বিদ্যুতের লোড সেডিং এর কারণে শহরের বাড়িগুলোতেও নক্‌শি পাখা রাখা হয়ে থাকে।[৩৪]

www.pathagar.com

চাঁপাইনবাবগঞ্জের গ্রামাঞ্চলের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই বিভিন্ন আকার ও রঙের নক্‌শি পাখা দেখা যায়। প্রকরণ-উপকরণ বৈশিষ্ট্যে পাখা দ্বিবিধ-সুতার পাখা আর বাঁশ-বেতের পাখা। চাকের প্রেক্ষাপটে সূঁচের সাহায্যে পুরোনো বস্ত্রজাত সুতার বুনন কৌশলে সুতার পাখার শিল্পরূপ বিন্যস্ত। তবে নতুন কাপড় চাকে মুড়ে তার ওপর রুমালের সঙ্গে নতুন সুতার নক্‌শা তুলেও অনেক সময় পাখা তৈরি হয়। বুনন বৈশিষ্ট্যে সুতার পাখার সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও বাঁশ-বেত তালপাতার পাখার শিল্পায়ন বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র। বাঁশের ফালি থেকে অভ্যস্থ হাতের কৌশলে তৈরি হয় সূক্ষ্ম বাতি। সেই বাতি মসৃণ করে চোঁচ অথবা তালপাতা ফালি ফালি করে কেটে বুননের কৌশলে তৈরি করা হয় পাখা। তালপাতার বোনা পাখায় রঙের ব্যবহার সীমিত। বিশিষ্ট বুনন-কৌশলের মধ্যেই এর শিল্পরূপ বিন্যস্ত। বাঁশ-বেতের পাখায় বাতিগুলি বিচিত্র রঙে রাঙিয়ে বুননের কৌশলে এবং বর্ণ-সম্ভারের বৈচিত্র্যে তৈরি হয় নক্‌শা।

পাখার চিত্র বা নক্‌শা আলপনা চিত্র প্রভাবিত। তবে পাখার সীমিত পরিসরে চিত্র বা নক্‌শা বৈচিত্র্যের অবকাশ কম। পাখা নানা আকারের এবং বিভিন্ন নক্‌শার সমাবেশ প্রস্তুত করা হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জের নক্‌শি পাখার জ্যামিতিক লতাপাতা ও জীবন্ত প্রাণীর মটিফের বৈচিত্র্যেপূর্ণ সমন্বয়ে পাখার নক্‌শা বোনা হয়। বিভিন্ন নাম রয়েছে এখানকার পাখার। তৈরি পাখার নাম শঙ্খলতা, তারাফুল, বলদের চোখ, সাগরদীঘি ইত্যাদি। বাঁশের তৈরি গুলপাতা, তারাফুল, ছিটাফুল, ভালবাসা, নলখাগড়া ইত্যাদি নামে পরিচিত। হাতি, মানুষ ও ফল বেতের তৈরি পাখার মধ্যে পালংপোষ এবং পাশার দান উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আর যে সমস্ত নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মটিফ হচ্ছে–বাবন, কোটা, মাকড়ের জাল, পদ্মজো, সুজনী জো, পাটাসন, কবুতর, খোপ, ময়ূর মনসুন্দরী, মানবিলাসী, মনবাহার, বাঘাবন্দি, কাঞ্চনমালা ইত্যাদি। নক্‌শি পাখা শুধু বাঁশ-বেত, তালপাতা আর সুতা দিয়েই তৈরি হয় একথা ঠিক নয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জের গ্রামীণ মানুষেরা অনেক সময় কলার শুকনো খোল, খেজুর পাতা, পাখির পালক, গমের ডাটা, মোটা কাপড়, চন্দন কাঠ, শোলা ইত্যাদি দিয়েই পাখা তৈরি করে থাকে।[৩৫]

যে কোনো ধরনের পাখার মূল আকর্ষণ এর নক্‌শা। যদিও জ্যামিতিক লতাপাতা ও জীব-জন্তুর প্রতিকৃতি নক্‌শার মূল বিষয়বস্তু। তবুও কখনো কখনো প্রবাদ নীতিকথা ছড়া নক্‌শি পাঁখায় দেখা যায়। চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর থানার সাগরইল গ্রামের জনৈক হুমায়ূন কবিরের বাড়িতে একটি নক্‌শি পাখায় একটি ছড়া বিধৃত হয়েছে। ছড়াটি নিম্নরূপ–

তাল গাছে জন্ম তোমার
নামটি তোমার পাখা
শীতকালের শত্রম্ন তুমি
গ্রীষ্মকালের সখা।[৩৬]

কেউ বলতে পারে না এ ছড়ার রচয়িতা কে? এ ধরনের আরো একটি ছড়া দেখেছি বারোঘরিয়া গ্রামের মরহুম মোজাফফর হোসেন আমিনের বাড়িতে। এতে লেখা রয়েছে–

www.pathagar.com

শীতে তুমি লুকিয়ে থাকো
গরমে দাও দ্যাখা,
আদর করে নাম রেখেছি
তাই তো তোমায় পাখা।[৩৭]

গ্রামীণ অখ্যাত কোনো কবির রচিত এ ধরনের সহজ সরল ছড়া বুকে ধারণ করে রয়েছে শুধু চাঁপাইনবাবগঞ্জের নয় সমগ্র বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নক্‌শি পাখা।

৬. নকশি শিকা

গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে ব্যবহৃত শিকা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে সংস্কৃত 'শিক্য' শব্দ থেকে। শিকার সঙ্গে পাটের সম্পর্ক খুবই নিবিড় কারণ পাট দিয়েই অধিকাংশ শিকা তৈরি হয়ে থাকে। অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে প্রবর্তিত খনার বচনে পাট বা সোনালি আঁশের উল্লেখ পাওয়া যায়। চাঁপাইনবাবগঞ্জের গ্রামাঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই নক্‌শি শিকার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এখানে পাটের তৈরি শিকা ছাড়াও সুতার তৈরি শিকা দেখতে পাওয়া যায়। এসব শিকায় পুতির মালা, ঝিনুকের বোতাম, কড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

শিকা সূঁচি শিল্প বা বয়ন শিল্প কোনোটারই মধ্যে পড়ে না। শিকা প্রস্তুতের প্রথম পর্যায়ে পাটের গোছা দ্বিধাবিভক্ত করে রঙিন সুতার সঙ্গে দড়ির মতো পাকিয়ে দ্বিধাবিভক্ত করে বিনুনি পাকিয়ে নহর তৈরি করা হয়। এই সমস্ত নহর পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করে বিভিন্ন ধরনের শিকা বানানো হয়। একান্তভাবে মহিলাদের নিজস্ব শিল্প হিসেবে নক্‌শি শিকা চাঁপাইনবাবগঞ্জের গ্রামীণ এলাকায় বিভিন্ন নামে পরিচিত, যেমন–কউতর খোপী, উল্টো কেশী, আওলা কেশী, জিলাপী, মাছকাটা ইত্যাদি।[৩৮]

নক্‌শি শিকা প্রসঙ্গে ড. ওয়াকিল আহমদ বলেছেন, শিকার নক্‌শা বিন্যাস ফাঁস তোলা ও বিনুনি গাঁথার কৌশলের ওপর নির্ভর করে। শিকার গায়ে ছবি ফুটিয়ে তোলা শক্ত। ফুল ছাড়া অন্য চিত্র খুব কম দেখা যায়। ফুলের নামানুসারে কয়েক প্রকার শিকার নাম পাওয়া যায়। যেমন– তারাফুল, পুঁতিফুল, চড়াফুল, টাকাফুল ইত্যাদি। ফাঁসের কৌশলে টাকার মতো চাকতি, পুঁতির মতো দানা অথবা তারার মতো বটি দিয়ে যথাক্রমে টাকাফুল, পুঁতিফুল ও তারাফুলের শিকা তৈরি হয়।[৩৯] ড. আহমদ এর বক্তব্যে নক্‌শি শিকার যে শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য ও প্রকার ভেদের কথা উপস্থাপিত হয়েছে বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলের শিকাই কমবেশি এই বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। চাঁপাইনবাবগঞ্জের গ্রামীণ অঞ্চলে প্রচলিত শিকার ক্ষেত্রেও উপরিউক্ত বিবরণ অনুসৃত হয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

ব্যবহারের দিক থেকে শিকা অপরিহার্য। ঝুলন্ত ও তলদেশে গেড়ো দেয়া শিকা সাধারণত হাঁড়ি-পাতিল, বাসন-কোসন, রাখার জন্য গ্রামের মহিলারা তৈরি করে থাকে। শিকার বিভিন্ন আকার ও ব্যবহারিক দিক প্রসঙ্গে তোফায়েল আহমদ বলেন, গোলাকার বা চতুষ্কোণ বাঁশের ফ্রেমে জালী বুনা ফুলটংগী, টুপি, বইপুস্তক রাখার শিকা, সোজা জালের মতো বুনা কাপড় রাখার শিকা, কাঁথা-বালিশ রাখার জন্য ওপরে ঝুলান গাইঞ্জা,

www.pathagar.com

লেপ-কাঁথা ঝুলানোর জন্য দুটি ব্যালট বা ফিতার মতো ঝুলান শিকা, জোত বা দোলাই এবং আয়না চিরুনী ঝুলানোর শিকা প্রভৃতি ব্যবহারিক দিক থেকে শিকার শ্রেণি বিন্যাস। চাঁপাইনবাবগঞ্জের গ্রামে-গঞ্জে শিকা ব্যবহৃত হয়ে থাকে উপরিউক্ত পদ্ধতিতেই।

৭. দারুশিল্প

দারুশিল্প সূত্রধর বা ছুতার সম্প্রদায়ের বৃত্তি। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায়, অধম সংকর বা অসংসূত্রের তালিকায় এদের নাম।[৪০] পলিমাটির বাংলাদেশে, যেখানে পাথর একান্তই দুষ্প্রাপ্য সেখানে কাঠে যে প্রচুর তক্ষণ ও মন্দনকার্য হত, অন্তত পাথরের চেয়ে বেশিই হত সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম।

কিন্তু বাংলার উষ্ণ-জলীয় আবহাওয়ায় কালের করাল গ্রাস এড়িয়ে সেগুলো আমাদের এসে পৌঁছতে পারেনি। যে অত্যল্প নিদর্শন টিকে আছে; যেমন– গৃহের স্তম্ভ, চালের বাতা, কপাট, চৌকাঠ, ইত্যাদির কারুকার্য ও নৈপুণ্য রীতিমতোই বিস্ময়োদ্রেককারী। ঢাকা জাদুঘরে এমন কিছু নিদর্শন রক্ষিত আছে। এছাড়া সংসারের বিভিন্ন আসবাবপত্র, ঘরবাড়ি, মন্দির, পালকি, গরুগাড়ি, রথ বিশেষ করে নদীগামী নানা প্রকার নৌকা, সমুদ্রগামী বৃহদাকৃতি নৌকা বা জাহাজ ইত্যাদি সমস্তই ছিল কাঠের। সেই দিক দিয়ে দেখলে কাষ্ঠশিল্পের সমৃদ্ধি সহজেই অনুমেয় এবং সমাজের মধ্যে এই শিল্পীদের একটি স্থানও ছিল।

কাষ্ঠশিল্পে চাঁপাইনবাবগঞ্জ একসময় অত্যন্ত অগ্রগামী ছিল। কিছুদিন আগেই শুধুমাত্র অভিজাত উচ্চ শ্রেণি নয়, সাধারণ সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহ, চণ্ডীমণ্ডপে, সৌখিন শিল্পায়িত গৃহে, অনেক মন্দির-মসজিদ কাঠের খুঁটি, চালের বাতা, চৌকাঠ, কড়িকাঠ, খিলান ইত্যাদিতে আশ্চর্যরকম কারুকার্যের ওপর এখানকার ছুতারদের কারুকার্য নিঃসন্দেহে শিল্প নৈপুণ্যের পরিচায়ক।

কাঠের আসবাবপত্রে ছুতারদের কারুকার্য বহু বিচিত্র ধরনের। তবে গৃহের খুঁটি, চৌকাঠ, খিলান, চালের বাতা, দরজা, ইত্যাদির কারুকার্যই ছিল সর্বাপ্রেক্ষা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। খুঁটি, দরজায় পাল্লায় খোদিত হয় লতাপাতা, ফুল-পদ্ম ইত্যাদি আলপনা চিত্র ও নানা জ্যামিতিক ছক। চৌকাঠ কড়িকাঠের সরু লম্বাটে আয়তনে খোদিত হয়। নানা লতাপাতা, বিশেষত তরঙ্গিত ও পুষ্পিত লতাপাতা। সর্বাপেক্ষা চমৎকারিত্ব প্রকাশ পায় চালের বাতা এবং ডাফ-এর মধ্যে। ডাফগুলো কখনো মনুষ্যকৃতি, কখনও হাতির শুঁড়ের আকৃতি।

কখনো পরি বা অর্ধ-পশু, অর্ধমানব অথবা নানা পশুর চিত্রে শোভিত। চাকের সাহায্যে খোদাইকৃত খাট পালঙ্কের পায়া, পিলসুজ, বিভিন্ন যন্ত্রের বাট বা আছারি, কৌটা পুতুল ইত্যাদিতে সাধারণত কোনো চিত্র থাকে না, ক্ষেত্র বিশেষ নানা জ্যামিতিক ছক থাকে মাত্র। বিকল্প পণ্যের প্রতিযোগিতায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের কাষ্ঠশিল্পই বোধকরি সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্থ। আর তার প্রেক্ষিতেই এখানকার সূত্রধর সম্প্রদায়ই সর্বাপেক্ষাই বেশি বৃত্তত্যাগী।

www.pathagar.com

৮. চিত্রকলা

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন বাংলার কুলবধূদের বলেছেন, "বাঙলার চিত্রশিল্পের রাণী"। কেননা বাংলার চিত্রকলার উৎস সন্ধানে নিরত হলে অনিবার্যভাবে আমাদের পৌঁছাতে হবে বাংলার মেয়েলী ব্রতের অঙ্গনে। চাঁপাইনবাগঞ্জের নারী সমাজ বাঙালি নারীদের সমস্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তারা বাঙালি ঐতিহ্যসমৃদ্ধ বিভিন্ন শিল্পকর্মে নিয়োজিত রাখে সারাটা জীবন। আলপনা, নক্‌শি কাঁথা, নক্‌শি-শিকা, নক্‌শি পাখা ইত্যাদির মাধ্যমে চিত্রকলার লালন করে থাকে।

আলপনা : 'আলপনা' শব্দটি আসলে কৃষিকেন্দ্রিক জাদু বিশ্বাসজাত, আইল প্রস্তুত করা বা আইলপনা চিত্রদ্বারা সীমারেখা অঙ্কনের প্রথা থেকে আলপনা চিত্রের বিকাশ এবং দেশজ আলপনা শব্দের উৎপত্তি। আইলের সীমারেখা দেয়া বা বিশিষ্ট রেখাচিত্র দ্বারা শস্যক্ষেত, জনবসিত, গ্রহ প্রভৃতি কুপ্রভাবমুক্ত করার আদিম যাদু বিশ্বাসগত প্রক্রিয়ার অঙ্গরূপেই আলপনা শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ অনুমতি হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, লোকসমাজে ও লোকপ্রচলনে আলপনা আঁকা কথাটি সচরাচর ব্যবহৃত হয় না, আলপনা দেয় কথাটাই ব্যবহৃত হয়।[৪১]

আলপনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে রফিকুল আলম বলেছেন, আলপনা আসলে একপ্রকার ধর্মীয় নক্‌শা (বা Ritual Decoration) যা মেঝেতে করা হয়। গ্রামের মহিলারাই এ নক্‌শা আঁকেন। গ্রাম বাংলার বিভিন্ন পূজা এবং ব্রত অনুষ্ঠানে, বিয়ে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ইত্যাদিতে আলপনা আঁকার রেওয়াজ ছিল।[৪২] জাদু বিশ্বাস সম্ভূত হলেও আলপনা একান্তভাবে ব্রত শিল্প নয়, তবে মেয়েলি শিল্প অতি অবশ্যই। ব্রতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেও আলপনা একটি ঐতিহ্যবাহী ও প্রথাগত আদিম শিল্প প্রকরণ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বাঙালির বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে আলপনা দেয়ার রীতি প্রচলিত।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের আলপনা সম্পর্কে বলতে গেলে নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, এখানকার আলপনা-চিত্রের পরিধি বহুদূর বিস্তৃত; এর বৈচিত্র্যও অফুরন্ত। বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান বিশেষত মেয়েলিব্রত সংশ্লিষ্ট বলে আলপনার চিত্র-বৈচিত্র্যের প্রধান উৎস অনুষ্ঠান বা ব্রতের বৈশিষ্ট্য। যেমন লক্ষ্মীব্রতের পারা, লক্ষ্মী পেঁচা, ধান ছড়া, পদ্ম, কলমিলতা, দোপাটিলতা ইত্যাদি। মঘলমণ্ডল ব্রতের চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র,ভিটা, পুতুল, পৃথিবী, আকাশ, পুকুর, পালকি, দোলা, ঘোড়া, সিংহাসন, শঙ্খ-সিঁদুর, আয়না-চিরুনী, পান-সুপারি ইত্যাদি আর সেঁজুতিব্রেতে দোলা, বেগুনপাতা, সুপারিগাছ, ফলগাছ, আসন পিড়ি, শঙ্খ, চন্দ্র, সূর্য, তারা হাট-বাজার, গোয়ালঘর, রান্নাঘর ইত্যাদি অঙ্কিত হয়।[৪৩]

মানব জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান বিবাহ। চাঁপাইনবাবগঞ্জে বিবাহের আলপনা বহু বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। বরের বাড়ির উঠানে ১২/১৩ রকমের আলপনা দেয়া হয়ে থাকে। এছাড়া বিবাহের কুলা, পিঁড়ি, হাঁড়ি, সরা ইত্যাদিতেও আলপনা দেয়া হয়। আলপনার চিত্রে বৈচিত্র্য আসে, অনুষ্ঠান বা সেই কামনারই প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত হয়। কেননা যে কামনায় যে অনুষ্ঠান আলপনায় সে অনুষ্ঠান বা সেই কামনারই প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত হয়। এছাড়া কুলা, সিঁড়ি ইত্যাদি সীমিত পরিসরে এই চিত্র-বৈচিত্র্যের আঁকা

www.pathagar.com

সম্ভব। চাঁপাইনবাবগঞ্জে যে আলপনা আঁকা হয়ে থাকে প্রকৃতিগতভাবে তা দুই প্রকারের। যথা– ১. শুষ্ক চূর্ণ দ্বারা রচিত ধূলিচিত্র ২. চালের গুড়া বা টিঠালীগুলে রচিত আর্দ্র চিত্র। রঙের প্রধান উৎস যদিও পিঠালি তবুও রঙের বৈচিত্র্যের জন্য এখন সিঁদুর, আবির, লালমাটি, পোড়ামাটির গুড়া, হলুদ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

আলপনার প্রধান উপকরণ তিনটি: পিঠালি বা রঙ, রমণীর আঙ্গুল আর এক টুকরো ন্যাকড়া। হাতের বৃদ্ধা তর্জনী ও মধ্যমার সহায়তার পিঠালিতে ন্যাকড়া ভিজিয়ে আঁকা হয় আলপনা। রৈখিক সাবলীলতা ও পেলবতা বাঁধাধরা ও রীতিসিদ্ধ আলপনা চিত্রকে ছন্দময় ও জীবন্ত করে তোলে।[৪৪]

জাতি-ধর্ম-বর্ণ শ্রেণিভেদে আলপনা উদ্দেশ্য ও পদ্ধতিগত ভিন্নতা সত্ত্বেও চাঁপাইনবাবগঞ্জের সর্বত্র অল্পাধিক আলপনা দেয়ার রীতি প্রচলিত রয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের আলপনা ব্রত সংশ্লিষ্ট আর মুসলমান সম্প্রদায়ের আলপনা ব্রত সংশ্লিষ্ট না হলেও কোনো না কোনো উৎসব অনুষ্ঠানে সম্পর্কিত অতি-অবশ্যই। তবে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল আলপনার মটিফ, চিত্রকল্প এবং চিত্র বৈশিষ্ট্যের ঘনিষ্ঠ সাজুয্য থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তা একই লোকায়াত সমাজের সাধারণ উত্তরাধিকার। আলপনায় সাধারণত যে সমস্ত মটিফ ব্যবহৃত হয় সেগুলো হচ্ছে– সূর্য, ধানের শিষ, পেঁচা, লাঙ্গল, মই, পা, মাছ, সিঁদুরের কৌটা, পান ইত্যাদি।

আলপনার বৈশিষ্ট্য হলো ছন্দময় বক্ররেখা। বৃত্তাকাররেখা চাঁপাইনবাবগঞ্জের আলপনায় খুব বেশি ব্যবহৃত হয়। এছাড়া রয়েছে নক্‌শার পুনরাবৃত্তি (Repeatation) ফলে আলপনায় রয়েছে এক ধরনের যান্ত্রিক একঘেঁয়েমিতা (Mechanical Monotony)। তবুও একঘেঁয়েমি নক্‌শার মধ্যে থাকে এক ধরনের স্বচ্ছন্দ গতিময়তা। আলপনার চতুষ্কোণ বা অষ্টকোণ খুব কমই দেখা যায়। গোলাকৃতিই আলপনার প্রাণ। গোলাকৃতির কেন্দ্র থেকে অঙ্কন শুরু হয় এবং তা বৃহত্তর আবর্তে বর্ধিত হতে থাকে। অবশেষে শিল্পীর ইচ্ছায় তা শেষ হয়।[৪৫] আলপনা বৃত্তের কেন্দ্রে থাকে শতদল পদ্ম, নীলপদ্ম পূর্ণকুণ্ড, অষ্টকলসি, মঙ্গলকলসি, শাখা বিস্ফারিত কদম অথবা অন্যতম বৃক্ষ। কেন্দ্রস্থ বৃক্ষের চারপাশে শঙ্খলতা, কলমীলতা কলালতা, কুন্তিলতা, দোপাটিলতা, চাঁপালতা, মোচালতা, শীষলতা ইত্যাদি বৃত্তাকারে সজ্জিত হলে লতামঙ্গল হয়। এইরূপে পদ্মের চতুর্দিকে বৃত্তাকারে সজ্জিত হলে পদ্মমণ্ডল বা পদ্মচক্র। এই কেন্দ্রস্থ চিত্র অথবা মণ্ডলকে ঘিরে থাকে বিভিন্ন পর্যায়ক্রমিক চিত্রলতা, পাতা, ফল-ফুল, মাছ ধানছড়া, জীবজন্তু ও নানাবিধ গৃহস্থালী সরঞ্জাম। চৌকা আলপনায় কেন্দ্রস্থ চিত্রের চারপাশে লতামণ্ডলে অনেকটা চিত্রের ফ্রেমের কাজ করে।

ঐতিহ্য পরম্পরাগত এবং প্রথাগতভাবে আলপনা যদিও ব্রতীর মনস্কামনারই প্রতিচ্ছবি, তথাপি এতে শিল্পীর ব্যক্তিগত কামনা বাসনা প্রকাশের অবকাশ নেই, শুধুমাত্র ব্যক্তিগত শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশের স্বাধীনতা বর্তমান। অর্থাৎ যে কোনো ব্রতে যে কোনো আলপনা আঁকার স্বাধীনতা যেমন নেই ব্রতীর, তেমনি ব্রতীর যে কোনো ব্রতে যে কোনো আলপনাকে আলপনায় রূপায়িত করার স্বাধীনতাও নেই। কিন্তু লোক সমাজের ভাঙন যেখানে যত বেশি বিলম্বিত, জীবন ও মূল্যবোধ যত বেশি সচল ও অকৃত্রিম। তবে এ যুগে চাঁপাইনবাবগঞ্জসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত যে

www.pathagar.com

আলপনার সঙ্গে আমরা পরিচিত তা মূলত শান্তিনিকেতনী আলপনার দ্বারা প্রভাবিত। শান্তিনিকেতনী আলপনা একটি উন্নত ধরনের নক্শি ধর্মী শিল্প (Decorative Art) যদিও আলপনাতে আধুনিকতার প্রভাব স্পষ্ট। এতে সনাতনী ও আধুনিকতার এক সচেতন সম্মিলন লক্ষ্য করা যায়। কোন ধর্মীয় বা ব্রত উদ্দেশ্য এখানে কাজ করে না। তাই বিশেষ কোনো মটিফ বা জীব-জন্তুর চিত্রের প্রয়োজন এখানে হয় না। ফলে আলপনা অনেক বেশি বিমূর্তন। যে কোনো সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একে অনায়াসে ব্যবহার করা চলে। আর এই বিমূর্তনকার ফলেই বর্তমান বাংলাদেশের মুসলমান সমাজের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে আলপনা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিতে সক্ষম হয়েছে। বস্তুত বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে আলপনা সম্পূর্ণরূপে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রূপ লাভ করেছে।

আধুনিক শিক্ষিত সমাজে আনুষ্ঠানিক ও ঐতিহ্যানুসারী লৌকিক আলপনার পাশাপাশি কেবলমাত্র সৌন্দর্য চর্চার জন্য ড্রয়িং রুমের মেঝে অথবা কোণে কোণে, ফুলদানি-ছাইদানিতে আলপনার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আধুনিক শিল্পীরাও আলপনার রূপ চেতনা ও আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যকে জাতীয় চেতনা ও ঐতিহ্যের বাহক হিসেবে রূপায়িত করেন তাঁদের শিল্পে। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মীরা বাংলা নববর্ষে, ২১শে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসে জাতীয় ঐতিহ্য ও চেতনার প্রতীক হিসেবে রাস্তার মোড়ে মোড়ে রূপায়িত করেন আলপনা ঐতিহ্যবাহী চিত্র। সারা দেশের মতো চাঁপাইনবাবগঞ্জেও আলপনার ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৪৬]

কারুকৃতি: বাংলার বাস্তশিল্পে কারুবৃত্তির প্রথম উৎস ঝাপ ও বেড়ার কারুকার্য বা নকশা। সাধারণভাবে ঝাপ মানে বাঁশের চেচারি, বাখারি ইত্যাদি দরজা-জানালা আগর টাটি। কিন্তু 'ঝাপ' কথাটির একটি অন্যতর ও বিশিষ্ট মানে বর্তমান। সাধারণত গ্রামীণ বেড়া দু'ভাগে বিভক্ত, ভিটা থেকে কপালি পর্যন্ত বেড়া এবং কপালি থেকে পাড় পর্যন্ত ঝাপ বা ভেলকি। চাঁপাইনবাবগঞ্জের লৌকিক গৃহে ঝাপের কারুকৃতি অতি সাধারণ ব্যাপার, নল-খাগড়া, পাটকাঠি বা চাটাইয়ের বেড়াই হোক আর মাটির দেয়ালই হোক, লৌকিক গৃহের ঝাপ স্বল্প বিস্তর কারুকার্য খচিত। তবে সৌখিন এবং কাষ্ঠ নির্মিত খুঁটি বা থাম, দরজা চৌকাঠ, খিলান ইত্যাদিতেও লতাপাতা, পশু-পাখি, ফুলের-ফলের চিত্র খোদাই শুধু চাঁপাইনবাবগঞ্জের নয়, সমগ্র বাংলার সর্বপ্রকার গৃহে লক্ষ্য করা যায়। ঝাপ বা বেড়ার কারুকার্যের প্রধান উপকরণ বিচিত্র আকৃতি-প্রকৃতির বাঁশের ফালি এবং বেত। দক্ষ হাতের অভ্যস্থ কৌশলে বাঁশের ফালি মসৃণ ও সূক্ষ্মভাবে তৈরি করে, পাতলা-সরু, চ্যাপ্টা-পুরু বিভিন্ন কায়দায় বিন্যাস করে তাতে মসৃণ বেতের গেরো পরপর সাজিয়ে পদ্ম, পান, কলসি ইত্যাদিসহ বিচিত্র লতাপাতা, পুষ্প-পল্লবের নকশা তোলা হয়। আবার কেবলমাত্র গেরোগুলোর মধ্যেও আলাদাভাবে অভিব্যক্ত হয় ফুল পাতা পল্লবের আভাস।

পরিশেষে বলা যায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের লোকশিল্পকলা শুধুমাত্র প্রাচীন নয়, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ও আঙ্গিক রীতির বৈচিত্র্য এবং অলংকরণে সমুজ্জ্বল। এতে লোকসমাজ ও সংস্কৃতির অপূর্ব আলেখ্য ফুটে রয়েছে। এখানকার লোকশিল্প যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতিচ্ছবি নয় বরং একাডেমিক রীতিবহির্ভূত স্বতঃস্ফূর্ত তথাকথিত অশিক্ষিত অথচ দক্ষ গ্রামীণ

www.pathagar.com

শিল্পীর ব্যক্তিপ্রতিভার মূর্ত প্রকাশ। কখনো প্রতীকী অলংকরণ শৈলী এবং রঙের বিন্যাস রসোত্তীর্ণই নয়, বংশানুক্রমে সম্প্রসারিত। লোকাচার, লৌকিক বিশ্বাস, পারিপার্শ্বিক প্রভাব, উপাদান ও উপকরণের সমন্বয়ে প্রাচীন প্রথা ও সংস্কার এখানকার লোকশিল্পকে করেছে সমৃদ্ধ।

তথ্যনির্দেশ

১. মযহারুল ইসলাম, ফোকলোর: পরিচিতি ও পঠন-পাঠন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২২

২. বারীন্দ্র মজুমদার, বাংলার লোকশিল্প, রত্নসাগর গ্রন্থমালা, কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃ. ২

৩. ড. প্রদ্যোত ঘোষ-বাংলার লোকশিল্প পুস্তক বিপনি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন; কলকাতা-২৩, ২০০৪ লোকসংস্কৃতি লোকায়ত মানুষের সামগ্রিক মননের ফল

৪. প্রাগুক্ত-পৃ-৩

৫. গোপাল চন্দ্র পাল, গ্রাম-বারঘরিয়া, ডাকঘর-বারঘরিয়া, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-মৃৎশিল্পী, বয়স-৬৮ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-অষ্টম শ্রেণি। সংগ্রহের তারিখ-১৮.০৭.২০১১, সোমবার

৬. নাডু গোপাল পাল, গ্রাম-চুনারীপাড়া বারঘরিয়া, ডাকঘর-বারঘরিয়া, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-গৃহিণী, বয়স-৬০ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-সপ্তম শ্রেণি। সংগ্রহের তারিখ-২৩.০৭.২০১১, শনিবার

৭. ডলি রানী পাল, গ্রাম-চুনারীপাড়া বারঘরিয়া, ডাকঘর-বারঘরিয়া, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-গৃহিণী, বয়স-১৮ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-পঞ্চম শ্রেণি। সংগ্রহের তারিখ-২৩.০৭.২০১১, শনিবার

৮. নাথুরাম পাল, গ্রাম-চুনারীপাড়া বারঘরিয়া, ডাকঘর-বারঘরিয়া, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-মৃৎশিল্পী, বয়স-২৫ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-ষষ্ঠ শ্রেণি। সংগ্রহের তারিখ-২৩.০৭.২০১১, শনিবার

৯. সনাতন পাল, গ্রাম-চুনারীপাড়া বারঘরিয়া, ডাকঘর-বারঘরিয়া, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-মৃৎশিল্পী, বয়স-৩৫ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-দশম শ্রেণি। সংগ্রহের তারিখ-২৩.০৭.২০১১, শনিবার

১০. সরোজিনী পাল, গ্রাম-চুনারীপাড়া বারঘরিয়া, ডাকঘর-বারঘরিয়া, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-গৃহিণী, বয়স-৬৫ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-নিরক্ষর। সংগ্রহের তারিখ-২৩.০৭.২০১১, শনিবার

১১. রুবিনা বেগম, গ্রাম-গোহিলবাড়ি মঙ্গলামোড়, ডাকঘর-বারঘরিয়া, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-মৃৎশিল্পী, বয়স-২৫ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-নিরক্ষর। সংগ্রহের তারিখ-২৩.০৭.২০১১, শনিবার

১২. বলরাম পাল, গ্রাম-রানীবাড়ি চাঁদপুর, ডাকঘর-রানীবাড়ি চাঁদপুর, উপজেলা-শিবগঞ্জ, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-মৃৎশিল্পী, বয়স-৪৫ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-পঞ্চম শ্রেণি। সংগ্রহের তারিখ-০২.১২.২০১১, শুক্রবার

১২. বিশ্বনাথ পাল, গ্রাম-বারঘরিয়া, ডাকঘর-বারঘরিয়া, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-মৃৎশিল্পী, বয়স-৫৫ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-পঞ্চম শ্রেণি। সংগ্রহের তারিখ-১৮.০৭.২০১১, সোমবার

www.pathagar.com

১৩. হরেন চন্দ্র পাল, গ্রাম-রানীবাড়ি চাঁদপুর, ডাকঘর-রানীবাড়ি চাঁদপুর, উপজেলা-শিবগঞ্জ, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-মৃৎশিল্পী, বয়স-৬৫ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-পঞ্চম শ্রেণি। সংগ্রহের তারিখ-০২.১২.২০১১, শুক্রবার
১৪. মানিক চন্দ্র পাল, গ্রাম-রানীবাড়ি চাঁদপুর, ডাকঘর-রানীবাড়ি চাঁদপুর, উপজেলা-শিবগঞ্জ, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-মৃৎশিল্পী, বয়স-৫২ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-ষষ্ঠ শ্রেণি। সংগ্রহের তারিখ-০২.১২.২০১১, শুক্রবার
১৫. ভূপেন চন্দ্র পাল, গ্রাম-রানীবাড়ি চাঁদপুর, ডাকঘর-রানীবাড়ি চাঁদপুর, উপজেলা-শিবগঞ্জ, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-মৃৎশিল্পী, বয়স-৭৫ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-পঞ্চম শ্রেণি। সংগ্রহের তারিখ-০২.১২.২০১১, শুক্রবার
১৬. লক্ষ্মীরানী পাল, গ্রাম-রানীবাড়ি চাঁদপুর, ডাকঘর-রানীবাড়ি চাঁদপুর, উপজেলা-শিবগঞ্জ, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-ছাত্রী, বয়স-২০ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-এইচ.এস.সি। সংগ্রহের তারিখ-০২.১২.২০১১, শুক্রবার।
১৭. উদয় চন্দ্র পাল, গ্রাম-শুক্রবাড়ি, ডাকঘর-চৌডালা, উপজেলা-গোমস্তাপুর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-মৃৎশিল্পী, বয়স-৪৫ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-অষ্টম শ্রেণি। সংগ্রহের তারিখ-০২.১২.২০১১, শুক্রবার
১৮. উন্নয়ন চন্দ্র পাল, গ্রামা-শুক্রবাড়ি, ডাকঘর-চৌডালা, উপজেলা-গোমস্তাপুর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-মৃৎশিল্পী, বয়স-৩০ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-অষ্টম শ্রেণি। সংগ্রহের তারিখ-০২.১২.২০১১, শুক্রবার
১৯. তরিকুল ইসলাম, গ্রাম-রামকৃষ্ণপুর, ডাকঘর-বটতলাহাট, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-পৈত্রিকসূত্রে কাঁসারি, বয়স-৫০ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-পঞ্চম শ্রেণি। সংগ্রহের তারিখ-১৪.১২.২০১১
২০. জামিল হোসেন, গ্রাম-রামকৃষ্ণপুর, ডাকঘর-বটতলাহাট, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-কাঁসারি (অবসর সময়ে আমের ব্যবসা করেন), বয়স-৪০ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-নবম শ্রেণি। সংগ্রহের তারিখ-১৪.১২.২০১১
২১. মোঃ মিজানুর রহমান, গ্রাম-মাঝপাড়া, ডাকঘর-বটতলাহাট, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-কাঁসারি, বয়স-৩২ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-ষষ্ঠ শ্রেণি। সংগ্রহের তারিখ-২৬.১২.২০১১
২২. নাজমুল হোদা, গ্রাম-আজাইপুর, ডাকঘর-বটতলাহাট, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-কাঁসারি, বয়স-৩৩ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-এইচ.এস.সি। সংগ্রহের তারিখ-২৫.১২.২০১১; শামসুল হক, গ্রাম-আজাইপুর, ডাকঘর-বটতলাহাট, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-কাঁসারি, বয়স-৫২ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন। সংগ্রহের তারিখ-২৫.১২.২০১১; ওবাইদুল হক, গ্রাম-আজাইপুর, ডাকঘর-বটতলাহাট, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-কাঁসারি, বয়স-৩২ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-এইচ.এস.সি। সংগ্রহের তারিখ-৩১.১২.২০১১; তরিকুল আলম, গ্রাম-আজাইপুর, ডাকঘর-বটতলাহাট, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-কাঁসারি, বয়স-৩৫ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন। সংগ্রহের তারিখ-৩১.১২.২০১১; কাওসার আলী, গ্রাম-আজাইপুর, ডাকঘর-বটতলাহাট, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-কাঁসারি, বয়স-৩৪ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-এস.এস.সি। সংগ্রহের তারিখ-৩১.১২.২০১১; নুরুল ইসলাম, গ্রাম-আজাইপুর,

www.pathagar.com

ডাকঘর-বটতলাহাট, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-কাঁসারি, বয়স-৩২ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-পঞ্চম শ্রেণি। সংগ্রহের তারিখ-৩১.১২.২০১১; মিনারুল ইসলাম, গ্রাম-আজাইপুর, ডাকঘর-বটতলাহাট, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-কাঁসারি, বয়স-১৪ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-চতুর্থ শ্রেণি। সংগ্রহের তারিখ-৩১.১২.২০১১

২৩. চাঁপাইনবাবগঞ্জের সূচিশিল্প, বিলকিস বেগম, পৃষ্ঠা ২১, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-২০০৬।

২৪. সাক্ষাৎকারঃ রেবিনা খাতুন, গ্রাম-মহারাজপুর, ডাকঘর-মহারাজপুর, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৪৫ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-পঞ্চম শ্রেণি

২৫. সাক্ষাৎকার অঞ্জনা দাস, পোড়াবাগ, হুজরাপুর, উপজেলা ও জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৫৪ বৎসর, আই, মিউজ

২৬. জসীম উদ্দীন, পূর্ববঙ্গের নকশী কাঁথা ও শাড়ি, শামসুজ্জামান খান সম্পাদি, বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্য, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১৯৮৫, পৃষ্ঠা ২৭০

২৭. ওয়াকিল আহমদ, বাংলার লোক-সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১৯৭৪, পৃষ্ঠা ৪৬

২৮. বিলকিস বেগম, চাঁপাইনবাবগঞ্জের সূচিশিল্প, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-২০০৬, পৃষ্ঠা-২৯

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ-২৯

৩০. 'নূর নকশি মহিলা জাগরণ'। এর প্রথম নাম ছিল নূর নকশি ঘর। এর মালিক বলেন যে, সরকারি রেজিস্ট্রেশন পাবার সাথে সাথে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের নাম বদলিলে রাখেন 'নূর নকশি মহিলা জাগরণ', ২৬.১২.২০১১। এর মালিক হচ্ছেনঃ তাহারিমা বেগম, ইসলামপুর, ডাকঘর-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-গৃহিণী ও কাঁথা ব্যবসায়ী, বয়স-৪৮ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-বি.এ। ২৬.১২.২০১১; মোসা. মমতাজ মহল, ইসলামপুর, ডাকঘর-চঁঅপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-গৃহিণী ও কাঁথা ব্যবসায়ী, বয়স-৩৮ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-বি.এ। ২৬.১১.২০১১; মোহালি বেগম, গ্রাম-নামোশংকরবাটী বড়িপাড়া, ডাকঘর-নতুনহাট, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-কাঁথা শিল্পী, বয়স-৩৫ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-এস.এস.সি। ২৬.১২.২০১১; মোনয়ারা বেগম, গ্রাম-চকআলমপুর, ডাকঘর-রামচন্দ্রপুরহাট, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-কাঁথা শিল্পী ও গৃহিণী, বয়স-৬০ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-নিরক্ষর। ২৬.১২.২০১১; মোহারমি বেগম, গ্রাম-আজাইপুর, ডাকঘর-বটতলাহাট, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-কাঁথা শিল্পী ও গৃহিণী, বয়স-৪০ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-পঞ্চম শ্রেণি। ২৬.১২.২০১১; রেবিনা খাতুন, গ্রাম-মহারাজপুর ঘোড়াস্ট্যান্ড, ডাকঘর-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-কাঁথা শিল্পী ও গৃহিণী, বয়স-৪৫ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-পঞ্চম শ্রেণি। ২৬.১২.২০১১; সুফিয়া খাতুন, গ্রাম-আকুন্দবাড়িয়া মহারাজপুর, ডাকঘর-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-কাঁথা শিল্পী ও গৃহিণী, বয়স-৪২ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-পঞ্চম শ্রেণি। ২৭.১২.২০১১; সালেহা বেগম, গ্রাম-টিকরামপুর, ডাকঘর-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-কাঁথা শিল্পী ও গৃহিণী, বয়স-৪৫ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-চতুর্থ শ্রেণি। ২৭.১২.২০১১; রুনা লাইলা, গ্রাম-শান্তিরমোড়, ডাকঘর-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-

www.pathagar.com

চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-কাঁথা শিল্পী ও গৃহিণী, বয়স-৪২ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-চতুর্থ শ্রেণি। ২৭.১২.২০১১; সালমা খাতুন, গ্রাম-ইসলামপুর, ডাকঘর-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-কাঁথা শিল্পী ও গৃহিণী, বয়স-৩৫ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-এইচ.এস.সি। ২৭.১২.২০১১; অঞ্জনা দাস, গ্রাম-পোড়াবাগ হুজরাপুর, ডাকঘর-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-কাঁথা শিল্পী ও গৃহিণী, বয়স-৫২ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-আই.মিউজ (সখে কাঁথা সেলাই করে থাকে)। ২৭.১২.২০১১

৩১. শিশু বিশ্বকোষ, ৫ম খ-, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, পৃষ্ঠা ৭৮, ডিসেম্বর, ১৯৯৭

৩২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৮

৩৩. ভঞ্জন দাস, গ্রাম-হরিনগর, ডাকঘর-রানীহাটি, উপজেলা-শিবগঞ্জ, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-তাঁত শিল্পী, বয়স-৩২ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-সপ্তম শ্রেণি (ছবি আছে)। সংগ্রহের তারিখ-১৫.০৭.২০১১, শুক্রবার; শুভ দাস, গ্রাম-হরিনগর, ডাকঘর-রানীহাটি, উপজেলা-শিবগঞ্জ, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-তাঁত শিল্পী, বয়স-২৫ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-অষ্টম শ্রেণি। সংগ্রহের তারিখ-১৫.০৭.২০১১, শুক্রবার; উর্মি খাতুন, গ্রাম-নয়ালাভাঙ্গা, ডাকঘর-রানীহাটি, উপজেলা-শিবগঞ্জ, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-গৃহিণী, বয়স-২০ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-অষ্টম শ্রেণি (ছবি আছে)। সংগ্রহের তারিখ-১৪.০৭.২০১১, বৃহস্পতিবার; পলি খাতুন, গ্রাম-হরিনগর, ডাকঘর-রানীহাটি, উপজেলা-শিবগঞ্জ, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-গৃহিণী, বয়স-২১ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-সপ্তম শ্রেণি (ছবি আছে)। সংগ্রহের তারিখ-১৪.০৭.২০১১, বৃহস্পতিবার; গজেন চন্দ্র পাল, গ্রাম-লাহারপুর, ডাকঘর-বারঘরিয়া, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-তাঁতী, বয়স-৩৫ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-পঞ্চম শ্রেণি। সংগ্রহের তারিখ-২০.০৭.২০১১, বুধবার; শচীনন্দন দাস, গ্রাম-লাহারপুর, ডাকঘর-বারঘরিয়া, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা- তাঁতী, বয়স-৫০ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-পঞ্চম শ্রেণি। সংগ্রহের তারিখ-২০.০৭.২০১১, বুধবার; নন্দলাল দাস, গ্রাম-লাহারপুর, ডাকঘর-বারঘরিয়া, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-তাঁতী, বয়স-৫০ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-পঞ্চম শ্রেণি। সংগ্রহের তারিখ-২০.০৭.২০১১, বুধবার; টুকটুকি দাস, গ্রাম-লাহারপুর, ডাকঘর-বারঘরিয়া, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-তাঁতী, বয়স-১৮ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-সপ্তম শ্রেণি। সংগ্রহের তারিখ-২০.০৭.২০১১, বুধবার; প্রকাশ চন্দ্র দাস, গ্রাম-লাহারপুর, ডাকঘর-বারঘরিয়া, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-তাঁতী, বয়স-৩৫ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-পঞ্চম শ্রেণি। সংগ্রহের তারিখ-২০.০৭.২০১১, বুধবার' শ্রীদাম চন্দ্র দাস, গ্রাম-লাহারপুর, ডাকঘর-বারঘরিয়া, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পেশা-তাঁতী, বয়স-৫২ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-চতুর্থ শ্রেণি। সংগ্রহের তারিখ-২০.০৭.২০১১, বুধবার; এনামুল হক, সিনিয়র সেন্টার ম্যানেজার, ব্রাক আড়ং সেন্টার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর; তপন দাস, বয়স-৪০ বৎসর,

৩৪. তরিকুল ইসলাম, পিতা-হুমায়ুন কবির, মাতা-রাজিয়া বেগম, গ্রাম-সাগরইল, পোস্ট-আক্কেলপুর, উপজেলা-গোমস্তাপুর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৪৬ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতকোত্তর, সংগ্রহের তারিখ-২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় সকাল ১০:০০ টা

www.pathagar.com

৩৫. নাজমা বেগম, পিতা-মহবুব ইলিয়াস, মাতা-সুরাইয়া বেগম, গ্রাম-নতুন ইসলামপুর, পোস্ট-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৪৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ-২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৩৬. ফাইজুর রহমান মানি, পিতা-মরহুম ইউনুসুর রহমান, মাতা-উমরাতুন নেসা, হাসপাতাল রোড, পোস্ট-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৪৯ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ-২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৩৭. সিরাজুল ইসলাম, পিতা-মরহুম মোজাফ্‌ফর হোসেন মিয়া, মাতা-মরহুম মালেকা বেগম, গ্রাম-বারোঘরিয়া, পোস্ট-বারোঘরিয়া, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৭২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতকোত্তর, সংগ্রহের তারিখ-২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৩৮. সুলতানা ফেরদৌসী স্বাতী, স্বামী-ওয়াইল হক চৌধুরী, মাতা-তাহেরা বেগম, গ্রাম-বেলেপুকুর, পোস্ট-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৪৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতকোত্তর, সংগ্রহের তারিখ-২৫/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৩৯. ড. ওয়াকিল আহমদ, বাংলার লোকসংস্কৃতি, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১৯৭৪, পৃ. ২৭
৪০. খগেশ কিরণ তালুকদার, বাংলার লোকায়ত শিল্পকলা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৫৬
৪১. বিশ্বকোষ, সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ১২
৪২. রফিকুল আলম, 'বাংলাদেশের লোকশিল্পঃ আলপনা', বৈশাখী লোকউৎসব প্রবন্ধ, স্বরোচিষ সরকার সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৪০০, পৃ. ৯০
৪৩. অরবিন্দ ঘোষ, পিতা-সুরেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ, মাতা-অপর্না বালা ঘোষ, গ্রাম-কালিগঞ্জ বাবুপাড়া, পোস্ট-বটতলাহাট, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৭৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতকোত্তর, সংগ্রহের তারিখ-০৫/০৩/২০০৮ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৪৪. লিপি সাহা, পিতা-ধনঞ্জয় সাহা, মাতা-হিমলতা সাহা, গ্রাম-রাজারামপুর মাস্টারপাড়া, পোস্ট-রাজারামপুর, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-২৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ-২১/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা
৪৫. রফিকুল আলম, 'বাংলাদেশের লোকশিল্পঃ আলপনা', বৈশাখী লোকউৎসব প্রবন্ধ, স্বরোচিষ সরকার সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৪০০, পৃ. ৯৩
৪৬. সুলতানা ফেরদৌসী স্বাতী, স্বামী-ওয়াইল হক চৌধুরী, মাতা-তাহেরা বেগম, গ্রাম-বেলেপুকুর, পোস্ট-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৪৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতকোত্তর, সংগ্রহের তারিখ-২৫/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

www.pathagar.com

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ

দেশ বিভাগ পূর্ব পর্যন্ত চাঁপাইনবাবগঞ্জ ছিল হিন্দু প্রধান এলাকা। হিন্দু পুরুষেরা সাধারণত ধুতি-পাঞ্জাবি পরিধান করেন। পুরুষদের মতো মুসলমান সম্প্রদায়ের পুরুষরাও সে সময় ধুতি পরিধান করতেন। হিন্দু তখন ধুতি পরাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখা হতো।

বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে কেউ আর ধুতি পরে না। হিন্দু সম্প্রদায়ের পুরুষরাই ধুতি পরেন, তবে নিয়মিত নয়। বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান, পূজা পাঠণে সাধারণত তারা ধুতি পরিধান করে থাকেন। উৎসব বা পূজা পাঠনে তারা ধুতি ছাড়াও পাজামাও পরেন সেই সাথে পরেন রঙ বেরঙের পাঞ্জাবি।

এখানকার মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের পুরুষেরা লুঙ্গি ব্যবহারে অভ্যস্ত। সাধারণত বাড়িতে তারা লুঙ্গি ব্যবহার করেন। বাইরে খুব সাধারণ ও নিম্নপেশাজীবী মানুষ লুঙ্গি ব্যবহার করেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্ন পেশাজীবী যেমন–মুচি, সুইপার, জেলেরা এখনও খুব স্বল্প মূল্যের ধুতি ব্যবহার করে থাকেন। বয়স্ক এবং বিধবা হিন্দু মহিলারা ধুতি শাড়ি হিসেবে ব্যবহার করেন।

আধুনিককালে এ অঞ্চলের পোষাক-পরিচ্ছদের অনেক পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে চাঁপাইনবাবগঞ্জের শহর ও গ্রামাঞ্চলের স্মার্ট পুরুষেরা ধুতি, লুঙ্গি ছাড়াও প্যান্ট, শার্ট, গেঞ্জি, কোর্ট, স্যুট, ফতুয়া, সোয়েটার, জাম্পার, জ্যাকেট, মাফলার, থ্রিকোয়াটার প্যান্ট, আন্ডারওয়ার, টুপি, চাদর, মোজা ইত্যাদি ব্যবহার করেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের গ্রাম ও শহরের মেয়েদের পোশাক হচ্ছে শাড়ি, ব্লাউজ, সায়া বা পেটিকোট, সালোয়ার, কামিজ, ওড়না, চাদর, বোরকা, ম্যাক্সি ইত্যাদি। সাম্প্রতিককালে অল্পবয়সি মেয়েদের মধ্যে প্রিন্টের কাপড়ের বোরকা ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মহিলারা রেশম শাড়ি ব্যবহারেও অত্যন্ত আগ্রহী। কারণ চাঁপাইনবাবগঞ্জ রেশমের জন্য বিখ্যাত জনপদ এবং এখানে রেশমের কাপড় ব্যবহার করা পারিবারিক ঐতিহ্যের পরিচায়ক। পুরুষরা সাধারণত রেশম সিল্কের এবং মটকা কাপড়ের পাঞ্জাবি এবং নারীরা সিল্কের ঘিয়া রঙের লাল পাড় বিশিষ্ট শাড়ি পড়তে পছন্দ করেন। তবে সম্প্রতিককালে সিল্কের প্রিন্টের শাড়ির ব্যাপক প্রচলন লক্ষ করা যাচ্ছে। সিল্কের শাড়ি ছাড়াও স্থানীয় দোকানগুলোতে জামদানি, কাতান, বেনারসি জর্জেট, টিস্যু ইত্যাদি শাড়ি বিক্রি হয়।

পোশাক-পরিচ্ছেদের ব্যাপারে চাঁপাইনবাবগঞ্জবাসী অত্যন্ত সচেতন। এখানে গ্রাম কিংবা শহর কোথাও কোন উলঙ্গ শিশু চোখে পড়ে না। বিভিন্ন অনুষ্ঠান, পালা-পাঠনে আত্মীয়-স্বজনকে বস্ত্র উপহার দেয়ার রীতি অত্যন্ত উৎসাহের সাথে পালন করা হয়।

www.pathagar.com

* ঈদ উৎসবে আত্মীয়-স্বজনদের বস্ত্র উপহার দেয়ার রীতি অত্যন্ত প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত রয়েছে।

* পূজা পার্বণ বিশেষ করে দুর্গা পূজার সময় স্বজনদের পোশাক উপহার দেয়া হয়।

* বিবাহ অনুষ্ঠানের পূর্বে থুবড়া খাওয়ানো অনুষ্ঠানে কনেকে শাড়ি উপহার দেয়া হয়।

* কোন পুরুষ মারা গেলে চল্লিশার দিন বিধবা মহিলাকে শাড়ি, সায়া ইত্যাদি উপহার দেয়া হয়।

* সন্তান প্রসবের জন্য মায়ের বাড়ি গমনের সময় বধূকে শাড়ি, সায়া ইত্যাদি উপহার দেয়া হয়।

* সদ্যজাত শিশুকে প্রথম দেখার সময় পরিধেয় বস্ত্র উপহার দেয়ার রীতি রয়েছে।[১]

চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাঁওতাল ও ওরাওঁ সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে। এই জাতি সত্তাগুলোর নিজস্ব পোশাক সংস্কৃতি রয়েছে।

সাঁওতাল পুরুষরা আগে সাদা থানকাপড়ের ধুতি পরিধান করতেন। বর্তমানে অধিকাংশ পুরুষ লুঙ্গি ব্যবহার করেন। শিক্ষিত সাঁওতাল ছেলেরা প্যান্ট, শার্ট ব্যবহার করেন। নারীরা 'ফতা' নামে দুসাধ্য ক্ষুদ্র মোটা কাপড় একখণ্ড বস্ত্র উর্ধাঙ্গে ও অপরখণ্ড নিম্নাঙ্গে ব্যবহার করে থাকেন। নিম্নাঙ্গের বস্ত্রটি কোমড় থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত ঢেকে থাকে আর উর্ধাঙ্গের বস্ত্রটি বক্ষদেশ আবৃত করে স্কন্দ পেরিয়ে পিঠ বরাবর ঝুলে থাকে। তবে বর্তমানে বয়স্ক দু'চার জন নারী ছাড়া এমন পোশাক পরতে তেমন আর দেখা যায় না। বর্তমানে মেয়েরা সালোয়ার কামিজ ও শাড়ি পরিধান করেন।[২]

ওরাওঁ সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী পোশাক হচ্ছে পুরুষদের নেংটি আর নারীদের ফতা নামে দুখণ্ড বস্ত্র। অতীতে পুরুষরা শুধু নিম্নাঙ্গে নেংটি এবং নারীরা উর্ধাঙ্গে একটি এবং নিম্নাঙ্গে একখণ্ড বস্ত্র পরিধান করতো। বর্তমানে অতি দরিদ্র এবং বয়োবৃদ্ধ দু একজন পুরুষকে কদাচিত নেংটি পড়তে দেখা যায়। কিন্তু ফতা নামে ক্ষুদ্র দুখণ্ড বস্ত্র আবৃত্ত কোন নারীকে আর দেখা যায় না। বর্তমানে ওরাওঁ পুরুষেরা অধিকাংশ লুঙ্গি পরেন। আবার কেউ কেউ ধুতি পরেন। ওরাওঁ নারীদের প্রধান পরিধেয় বস্ত্র এখন শাড়ি। এর সঙ্গে ব্লাউজ ও সায়া পরিধান করেন।[৩]

চাঁপাইনবাবগঞ্জের নারীরা অলংকার ব্যবহারে অত্যন্ত আগ্রহী। অতীতে তারা মাথায় টিকলি বা সিঁথপাট, নাকে নোলক, নাকছাবি, নাকমাছি, বেসর, ঝোলক, কানে ঝুমকা, কুন্তল, কানফুল, বালি, কণ্ঠে মালা, হাসুলি, হার, হারের এক, দুই, তিন, বা সাত লহার, তাবিজ, বাহুতে বাজুবন্ধ, কেয়ুর, তাড়, হাতে চুড়ি, নারা, পৈঁচি, বালা, কঙ্কন, হাতের আঙ্গুলে আংটি, অঙ্গুরী, কোমরে চন্দ্রহার, নীবিবন্ধ এবং পায়ে নূপুর, ঘুঙুর, মল, বাঁক, খাড়ু ইত্যাদি পরিধান করতেন। বর্তমানে তেমন অলংকার সজ্জা লক্ষ্য করা যায় না। তবে বিয়ে, ঈদ, পূজা ইত্যাদি উৎসব, আচার-অনুষ্ঠানে নারীরা বিভিন্ন ধরনের অলংকার পরিধান করেন। স্বর্ণ ছাড়াও রূপার অলংকর তারা ব্যবহার করেন।[৪]

www.pathagar.com

লোকনৃত্যে লোকপোশাক

সাঁওতাল রমণীরা সৌন্দর্য প্রিয়। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে তারা নিজেদের সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে নানান অলংকার পরিধান করেন। তারা রূপার অলংকারই বেশি ব্যবহার করেন। তাদের ব্যবহার্য অলংকারের মধ্যে রয়েছে গলায় হাঁসুলি মালা ও তাবিজ যাকে সাঁওতালি ভাষায় বলে 'মান্দালি' কানে দুল, নাকে নথ ও মাকড়ি, সিঁথিপাটি, হাতে বালা, চুড়ি ও বটফল, বাহুতে বাজু, কোমরে বিছা বা হাড়াহাড়ি, পায়ে বাকী তাদের ভাষায় বাস্কী, হস্তাঙ্গুলে অঙ্গুরি ও পদাংগুলে বটরি ইত্যাদি। এছাড়াও বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে সাঁওতাল রমণীরা পুষ্পভরনে সজ্জিত হয়। তাঁরা শিমুল ফুল, চম্পাফুল, ও কবরী ফুল খোঁপায় গুঁজে রূপসজ্জা করেন। পুষ্প ছাড়াও অনেক মেয়ে খোঁপায় কাঁটা পরেন। কেউ কেউ রঙিন ফিতা দিয়ে খোঁপা সজ্জিত করেন। ওষ্ঠ, কপাল ও সিঁথা এবং হাত-পা রঞ্জিত করার জন্য তারা আলতা ও সিঁদুর ব্যবহার করেন।[৫] ওরাওঁ রমণীরা বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে সাজতে ভালোবাসে। এজন্য তারা ব্যবহার করেন বিভিন্ন অলংকার। তারা সাধারণত রৌপ্য সিঁথা অলংকার পরিধান করেন। তারা নাকে পরে নাকফুল (কারমা শিকড়ি)। পায়ে পয়েরে, পদ নখে মুদাদি, চুলের খোঁপায় রূপার কাঁটা (যংশ) প্রভৃতি অলংকর। ওরাওঁ রমণীরা তাদের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে পুষ্পভরনে সূচিত হয়। তারা চুলে খোঁপা বাধার জন্য রঙিন ফিতা ব্যবহার করে।

www.pathagar.com

লোকউৎসবে লোকপোশাক

তথ্যনির্দেশ

১. নইমুল বারী, পিতা-মরহুম আলহাজ আজিজুর রহমান, মাতা-মরহুম জরিনা বেগম, গ্রাম-চাতরা, পোস্ট-কানসাট, উপজেলা-শিবগঞ্জ, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৬৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ-১৫/১১/২০১৩ খ্রি., সময় সকাল ১০:০০ টা

২. গোপিন মূর্মু, পিতা-ছোটে মূর্মু, মাতা-সন্ধ্যা টুডু, গ্রাম-চাপড়া, পোস্ট-বিনোদপুর, উপজেলা-শিবগঞ্জ, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-২২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ-২৮/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা

৩. সুবর্ণা কুজুর, পিতা-জীবন কুজুর, মাতা-রজনী কুজুর, গ্রাম-কোচাইবাড়ী, পোস্ট-কসবা, উপজেলা-নাচোল, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-২৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ-২৮/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৩:৩০ টা

৪. তাহেরা ইসলাম, স্বামী-সিরাজুল ইসলাম, মাতা-মরহুম জায়েদা বেগম, গ্রাম-বারোঘরিয়া, পোস্ট-বারোঘরিয়া, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৬২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-উচ্চ মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ-২৭/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

৫. বাসন্তি তিগ্‌গা, পিতা-রামলাল তিগ্‌গা, মাতা-কামিনী তিগ্‌গা, গ্রাম-খান্দুরা, পোস্ট-নাচোল, উপজেলা-নাচোল, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৪০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ-২৮/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৩:৩০ টা

www.pathagar.com

লোকস্থাপত্য

বাংলাদেশের একটি প্রত্যন্ত জেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জ। এখানকার অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা স্বচ্ছল নয়। এ কারণে তারা সহজলভ্য সাধারণ নির্মাণ উপকরণ– যেমন মাটি, বাঁশ, খড় ইত্যাদি দিয়ে বাড়িঘর তৈরি করে। এখানে ঘর-বাড়ি তৈরি করতে যে সমস্ত দক্ষ কারুশিল্পী নিয়োজিত রয়েছেন তাদের আঞ্চলিক ভাষায় 'ঘরামি' বলা হয়ে থাকে। এই ঘরামি সম্প্রদায় বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় গৃহনির্মাণ করে যা আধুনিক স্থপতিদের বিস্ময়ের কারণ হতে পারে।

ভিন্নতর আকৃতি-প্রকৃতির এসব গৃহ ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত। যেমন– আয়তকার ভিটের ওপর সমতল ছাদযুক্ত, আয়তকার ভিটেতে ঢালু চালযুক্ত, গোলাকার ভিটে ও শঙ্কুরৎ চালযুক্ত এবং মাটির ভিটিয় মাটির দেয়ালযুক্ত (কোঠাঘর)। আবার দোচালা, চারচালা, আটচালা ইত্যাদি চালের বৈশিষ্ট্য অনুসারে চাঁপাইনবাবগঞ্জের লোকায়ত গৃহগুলো বিশিষ্ট ও বিচিত্র। তাই আকৃতি প্রকৃতি গঠন বিন্যাস ও সজ্জিতকরণের বৈশিষ্ট্যানুসারে এখানকার লোকায়ত বাস্তুকলাকে দু'ভাগে বিন্যাস করা যায়–

১. নির্মাণ কলা এবং
২. শিল্পায়ন বা অলংকরণ।

১. নির্মাণ কলা : নির্মাণ বৈশিষ্ট্যে বাস্তশিল্পে বাঙালির সর্বজন স্বীকৃত অবদান মূলত চালের বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্রের মধ্যেই নিহিত। আর চালের গঠন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাংলার লোকায়ত গৃহগুলো দোচলা ও চৌচালা-প্রধানত এ দুই ভাবে বিভক্ত। চাঁপাইনবাবগঞ্জের গ্রামগুলোতেও সাধারণত এ দু'ধরনের গৃহই দেখতে পাওয়া যায়।

দোচালা : বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর বলেন, "গ্রাম বাংলার প্রধান বৈশিষ্ট্য দোচালা। দুটি চালা কৌণিকভাবে ছাদে এসে মিশেছে। বাড়িটি দাঁড়িয়ে আছে বাঁশের খুঁটির ওপর। চালার উপাদান ছন, খড়, বেত; বেড়ার উপকরণ পাটখড়ি, কঞ্চি, জাফরি কাটা, নক্সা সরল; মনে হয় কুঁজো হয়ে আছে নিসর্গে অনেকটা গ্রামীণ মেয়েদের বসে কাজ করার মতোন। সেই ফর্ম কি প্রবল বিজয়ীর মত নিসর্গে ফুটে আছে।"[১]

বাস্তবিক তাই বাঁশ-বেত-খড়ে নির্মিত চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিশিষ্ট দোচালা ঘর ঘরামিদের শিল্পবৃত্তির অতি উজ্জ্বল নিদর্শন। সাধারণ দোচালা-চৌচালা ঘরের সঙ্গে এর দৃশ্যত প্রধান পার্থক্য ছাদ বা চালের বিন্যাসে। এর ছাদ নৌকার উল্টো পিঠের মতো দু'পাশে ক্রমশ ঢালু। এই রীতির দোচালা ঘর ভারতীয় স্থাপত্যে 'বাঙালি ছত্রী' বা 'গৌড়ীয় রীতি' নামে খ্যাত। মধ্যযুগীয় স্থাপত্যে বাংলার অবদান বলে স্বীকৃত এই বাংলার রীতি মোগল আমলে দিল্লী, আগ্রা, রাজস্থানেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

www.pathagar.com

মাটির ঘর

মাটির দেয়ালে চিত্রসহ ঘর

www.pathagar.com

খরের ছাউনি ঘর

রীতির ঘর সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, "এই গঠন ও আকৃতিই অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'বাংলোবাড়ি' নামে ঈঙ্গ ভারতীয় সমাজে পরিচিতি লাভ করে। এই ধরনের গোড়ীয় রীতির আবাস গৃহই গরীবের কুটির হইতে আরম্ভ করিয়া ধনীর প্রাসাদ পর্যন্ত সমাজের সকল স্তরে বিস্তৃত ছিল। পার্থক্য যাহা কিছু সমৃদ্ধি ও অলংকরণের। দ্বিতল ত্রিতল গৃহও এই রীতিতেই নির্মিত হইত। উপরের চাল বিন্যস্ত হইত ক্রমহ্রাসমান ধনুকাকৃতি রেখায়। কোন কোন মন্দিরও ঠিক এই গোড়ীয় রীতিতে নির্মিত হইত; বস্তুত একাধিক প্রস্তর ফলকে এই ধরনের মন্দির উৎকীর্ণ দেখা যায়।"[২]

চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাট, নাচোল, গোমস্তাপুর এবং শিবগঞ্জ থানার সর্বত্রই মাটির তৈরি কোঠাঘরের ওপর দোচালার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এসব ঘর সাধারণত একতলা বিশিষ্ট হয়ে থাকে। তবে নবাবগঞ্জ সদর, নাচোল ও ভোলাহাটের কোন কোন স্থানে দোচালা বিশিষ্ট মাটির দ্বিতলা ভবনও দেখা যায়। স্থানীয় মাটির ঘর রঙিন মাটি দিয়ে লেপে দেয়ার রীতি রয়েছে যা বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে থাকে।

চারচালা : আয়তকার ভিতে সংস্থাপিত গৃহের চতুষ্পার্শের চারটি ওপরের দিকে ক্রমহ্রাসমান রেখায় মিলিত অনেকটা পিরামিড আকৃতির গৃহকে চৌচালা বলে। এ ধরনের গৃহ চাঁপাইনবাবগঞ্জে বেশ দেখা যায়। এখানকার টিন, টালি অথবা এজবেস্টোস নির্মিত গৃহ প্রধানত এই পদ্ধতিতে নির্মিত। চৌচালা গৃহের সামনে বারান্দায় একটি আলগা অতিরিক্ত চাল সংযোজিত হলে হয় পাঁচচালা ঘর।

www.pathagar.com

চাঁপাইনবাবগঞ্জের সর্বত্রই এই চৌচালা কোঠাঘর দৃষ্টিগোচর হয় তারই আদর্শে এখানকার মসজিদ ও মন্দির নির্মিত হয়ে থাকে। জেলার প্রতিটি থানা এলাকায় প্রচুর পরিমাণে চৌচালার মতো পাকা মসজিদ ও মন্দির দেখা যায়।[৩]

২. শিল্পায়ন বা অলংকরণ : চাঁপাইনবাবগঞ্জের লোকায়ত সমাজ বাড়ি-ঘরকে বিভিন্ন চিত্রের মাধ্যমে অলংকৃত করে থাকে।

দেয়াল আলপনা : প্রকৃতিগতভাবে দেয়াল আলপনা মেয়েলি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত এবং উৎস ব্রতের আলপনা। ব্রতে কামনার প্রতিচ্ছবি আলপনার সাহায্যে রূপায়িত হয় প্রধানত ঘরের মেঝে এবং বিভিন্ন সরঞ্জামাদিতে। ব্রতের আলপনা 'আনুষ্ঠানিক বলে অনুষ্ঠান শেষে এগুলো প্রায়শ অর্থহীন, কিন্তু দেয়াল আলপানর সাথে আনুষ্ঠানিকতার সম্পর্ক থাকলেও সজ্জিতকরণ বা সৌন্দর্য বৃদ্ধি এর অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই অনুষ্ঠান শেষেও দেয়াল আলপনার একটা স্থায়ী তাৎপর্য থেকে যায়। তবে কৃষি ভিত্তিক সমাজে মেয়েলি আলপনার নারী মনের কৃষিকেন্দ্রিক ধ্যান-ধারণাই প্রতিফলিত। এই জন্য ধন ধান্যের দেবী ষষ্ঠী ইত্যাদির ব্রতেই চাঁপাইনবাবগঞ্জের গ্রামীণ গৃহ দেয়ালে অঙ্কিত হয় আনুষ্ঠানিক আলপনা।[৪]

তথ্যনির্দেশ

১. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, বাংলাদেশের লোকশিল্প, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ২২
২. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালির ইতিহাস (আদিপর্ব), কলকাতা, ১৩৫৮, পৃ.
৩. মো. গোলাম জাকারিয়া, পিতা- আলহাজ আবুল কাসেম বিশ্বাস, মাতা- জমিলা বেগম, গ্রাম ও ডাক- চৈতন্যপুর, উপজেলা- শিবগঞ্জ, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২৩/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৩:০০ টা
৪. লিপি সাহা, পিতা-ধনঞ্জয় সাহা, মাতা- হিমলতা সাহা, গ্রাম- রাজারামপুর মাস্টারপাড়া, পোস্ট- রাজারামপুর, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ২৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২১/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা

www.pathagar.com

লোকসংগীত ও গাথা

ক. লোকসংগীত

লোকসাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বহুল প্রচারিত জীবন্ত শাখা হলো লোকসংগীত। লোকসংগীত চিরায়ত সংগীত। এ সংগীতে আছে মাটির মানুষের প্রাণের ছোঁয়া। উচ্চতর সংগীতের মতো লোকসংগীতের পূর্ব প্রস্তুতি থাকে না। মনের মধ্যে যখন গানের আবেগ ভর করে, কিংবা বাইরে যখন এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তখন তা সমাজ মনের স্বাভাবিক উৎস খুলে দেয়। আপন হতে তখন অন্তরের অনুভূতি আপনার সুধারাগে উৎসারিত হতে থাকে।[১] চাঁপাইনবাবগঞ্জ লোকসংগীতে সমৃদ্ধ। লোকসংগীতের মধ্যে গম্ভীরা, মেয়েলিগীতই এখানকার প্রধান ও স্ববৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল লোকসংগীত। এগুলোকে চাঁপাইনবাবগঞ্জের নিজস্ব সম্পদ বলা যেতে পারে। এ ছাড়াও আরও বেশকিছু লোকসংগীত এ জেলায় প্রচলিত রয়েছে। এখানকার মানুষের চর্চা ও পৃষ্ঠপোষকতায় এ লোকসংগীতগুলো শত শত বছর ধরে টিকে আছে। এগুলো গীত হয় চাঁপাইনবাবগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষায়।

১. গম্ভীরা

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা আম, কাঁসা, রেশমের ঐতিহ্য ধারণ করার সাথে সাথে লোকসংস্কৃতির এক ঐতিহ্যময় ধারা গম্ভীরাকে স্নেহময়ী জননীর মতো বহুদিন থেকেই লালন করে আসছে। নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির ধারা সামনের দিকে ধাবমান। আগে গম্ভীরা ছিল এক রকম, এখন গম্ভীরা অন্যরকম।

প্রাচীনকালে 'গম্ভীরা' পূজা উৎসব হিসেবেই প্রচলিত ছিল এবং এর উদ্ভব প্রায় দেড় হাজার পূর্বে বলে অনুমান করা হয়।[১] এ পূজা মহাদেব বা শিবকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত হতো, যা শিবের গাজন নামে পরিচিত।[২] ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার মণ্ডলপুর গ্রামের শিবপূজা গম্ভীরা পূজা নামে পরিচিত। খ্যাতিমান গবেষক ড. প্রদ্যোত ঘোষ তাঁর একাধিক গবেষণামূলক গ্রন্থে মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাগুলোতে গম্ভীরা শিবপূজা নামে অনুষ্ঠিত হতো বলে উল্লেখ করেছেন। বাংলার অন্যতম বড় উৎসব দুর্গোৎসবের ন্যায় মালদায় গম্ভীরা পূজায় নতুন জামা কাপড় কেনার ধূম পড়ে যেত।[৩] বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে গম্ভীরা মণ্ডপ সুন্দরভাবে সাজান হতো।[৪] ড. প্রদ্যোত ঘোষের মতে, তখনকার মণ্ডপশ্রী বড়ই মনোরম। সতেজ পদ্মফুলে গম্ভীরা মণ্ডপ সাজান হতো। ঘৃতের প্রদীপ জলতো এবং সর্বদা ধূপ-ধুনার গন্ধে সমস্ত গম্ভীরা মণ্ডপ পূর্ণ থাকতো। কোন কোন স্থানে সরায় সরষে

www.pathagar.com

তেল দিয়ে সলতে বা পুঁটুলি জ্বলতো। এছাড়া নানান জিনিস দিয়ে তৈরি হতো মশাল। উজ্জ্বল আলো থাকতো সমগ্র স্থানটিতে। গায়ক ও নৃত্যবিদেরা মশাল হাতে করেই এক 'গম্ভীরা' থেকে অন্য 'গম্ভীরায়' যাতায়াত করতো।[৪]

মধ্যযুগের নানা গ্রন্থে গম্ভীরা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ অন্ধকার প্রকোষ্ঠ বা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। কোন কোন গবেষক আবার সংস্কৃত শব্দ গম্ভীর থেকে গম্ভীরা কথাটি এসেছে বলে মনে করেন।[৫] গম্ভীরা শব্দটির অর্থ খুব সুস্পষ্ট না হলেও গম্ভীরা এখন এক ধরনের লোকসংগীত হিসাবে পরিচিত। তাছাড়া বর্তমান গম্ভীরার মধ্যে ধর্মগন্ধি ভাব নেই, আছে সাধারণ মানুষের ও রাষ্ট্রযন্ত্রের যাবতীয় সামাজিক অসঙ্গতির কথা। তাই গম্ভীরা এখন শুধুই জীবনপ্রদ এক লোকসংগীত।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কথা অনুমান করা যেতে পারে যে, গম্ভীরা অর্থে বাড়ির অন্তঃপ্রকোষ্ঠকে বোঝান হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে গম্ভীরা বলতে কোন শিব পূজা বা মন্দিরকে বোঝায় না।

ড. প্রদ্যোত ঘোষ তাঁর গবেষণা গ্রন্থে স্বীকার করেছেন যে, গম্ভীরা গানে শিবকে উপস্থিত করে অর্থাৎ শিব সাজিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে গানের প্রচলন; কিন্তু খুব বেশি দিনের নয়। ইংরেজ বাজারের বিখ্যাত গম্ভীরা গায়ক বিশ্বনাথ পণ্ডিতের মতে প্রায় আট নয় দশক আগেই এর প্রচলন। প্রচলনের কারণও খুব চিত্তাকর্ষক।[৬] ড. ঘোষ তাঁর গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে একটা সত্য ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি এই রকম, "কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বাংলার গৌরব স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের একবার মালদহ আসবার কথা ছিল। স্থানীয় বিখ্যাত গম্ভীরা লেখক ও গায়ক মোহাম্মদ সুফী আশুতোষ অর্থাৎ শিবের (শিব বা মহাদেবের অপর নাম) সম্মুখে গম্ভীরা গাইবেন ঠিক করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একজন পাত্রকে শিব সাজিয়ে আসরে হাজির করেন। কিন্তু অনিবার্য কারণ বশত স্যার আশুতোষ মালদহে না এসে তাঁর এক প্রতিনিধি আসেন। মোহাম্মদ সুফী তবুও শিবকে উপস্থিত করে যে গান গেয়েছিলেন, তার কিয়দংশ স্মৃতি থেকে উদ্বৃত করেছিলেন শ্রীপণ্ডিত:

হে দ্যাখ, হো দ্যাখ, কারে ডাকতে
কেডা এল ভাইরে
ইনি কি স্যার আশুতোষ? হাইকোর্টের জজ
গায়ে মাখা কেন ছাইরে?[৭]

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গম্ভীরা গান চিত্তাকর্ষক হওয়ায় সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছিল। তাই একথা বলাই বাহুল্য যে, শিবের চরিত্রকে গম্ভীরা গানে উপস্থিত করা ও তাকে জনপ্রিয় করে তোলার পিছনে সুফী মাস্টারের অবদান অনস্বীকার্য।

এক সময় মানুষ তাদের সুখ-দুঃখের সমস্ত ঘটনা অর্থাৎ বর্ষ পর্যালোচনার বিবরণী শিবের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে গম্ভীরা গানে বলত। তাদের বিশ্বাস শিবের শরণাপন্ন হলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব। তাই যখনই সাধারণ মানুষ কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তখনই তারা গানের মাধ্যমে শিবের সামনে তাদের কথা তুলে ধরেছে। যেমন ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর বাংলার লোক সাহিত্য গ্রন্থে এমন গানের

www.pathagar.com

কথা লিখেছেন। এখানে প্রকাশ পেয়েছে অনাবৃষ্টিতে সৃষ্ট অভাব আর ম্যালেরিয়ার ভয়াবহতা :

শিব তোমার লীলা কর অবসান
বুঝি বাঁচে না আর জান।
অনাবৃষ্টি কর‍্যা সৃষ্টি
মাটি করল্যা নষ্ট হে
দৃষ্টি থাকতে কইষ্ট কর‍্যা
দেখছ নাকি কষ্ট হে
মিষ্ট কথায় তুষ্ট কর‍্যা
শিষ্ট লোকে ইষ্ট মার‍্যা
করল্যা মোদের গুষ্টি ছাড়া।
শুন বলি পষ্ট কর‍্যা
তারপরে ম্যালেরিয়ায়
হলাম হালাকান
বুঝি বাঁচে না আর জান।[৮]

বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিশ শতকের শুরুতে গম্ভীরা গানে শিবের মূর্তি বদলিয়ে তা হয়েছে মানবরূপী শিব। একজন মানুষকে শিবের প্রতীকে দাঁড় করিয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে সমস্যা সমাধানের জন্য। তাঁর কাছে হাজির করা হয়েছে বর্ষ বিবরণী। এমনি একটি চিত্র নিচের গানে:

(তুমি) কেন উদাসী, কাশিবাসী, ওহে কাশীশ্বর।
দুনিয়াটা যায় রসাতল, রক্ষা কর হর ॥
কামার কুমার ছুতার চাষা
ছাড়ল তার জাত ব্যবসা
চাকরি লয়ে বাবু ভাবছে কত বড়।
গাঁয়ের মাটি শিল্প হলো মাটি
বাংলার মাটি হলো খাঁটি
কৃষি শিল্পে শিখাও মোদের
(তুমি) দেশকে তুলে ধর।
চাষ উন্নতি করতে হলে
চলবে না আর পুরান চালে
দেশ বিদেশের নতুন নিয়ম
আমদানি সব কর।[৯]

গম্ভীরা গানের বিষয়বস্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তৈরি। এখানে সব দল ও মতের ক্রটিগুলো খোলামেলাভাবে কথায় ও সুরে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে বলা হয়। কেননা লোকশিক্ষা ও সমাজ চেতনাকে জাগিয়ে তোলাই এই গানের লক্ষ্য। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ধর্মের গণ্ডি থেকে গম্ভীরা গানকে ধর্মনিরপেক্ষভাবে জন সাধারণের মধ্যে তুলে ধরতে যে দুজন শিল্পী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাঁরা হলেন মোহাম্মদ সফিউর

www.pathagar.com

রহমান (সুফী মাস্টার) ও মোহাম্মদ সোলেমান।[১০] নেচে গেয়ে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে এ গান পরিবেশন করা হয় লঘুচালের কথাবার্তা ও রসের মাধ্যমে। তাই এ গম্ভীরা গান লোকসঙ্গীতের গুণসম্পন্ন।

অশিক্ষিত নিরক্ষর জনসাধারণ এই গানের মাধ্যমে অনেক শিক্ষা লাভ করে থাকে। অঙ্গভঙ্গি করে হাস্য কৌতুকের মাধ্যমে এই গান পরিবেশন করা হয়। এই গানের ভাষা লোকায়ত সমাজের ভাষা। তাই এ গান খুব সহজেই সাধারণ মানুষকে তথ্য ও শিক্ষা দিয়ে সচেতন করে তুলতে পারে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র তাই সুরসাধক দিলীপ কুমার রায়কে মালদহে গিয়ে গম্ভীরার নাচ ও গান দেখতে চিঠি দিয়েছিলেন।[১১]

বৈষ্ণব পদাবলী যেমন যতোটা না পাঠে আনন্দ, তার চেয়েও বেশি আনন্দ হচ্ছে যখন সেটা গীত হয়। সুর তাল লয়ে বৈষ্ণব পদাবলী গীত হলে শ্রোতাদের হৃদয় মনে অনাবিল আনন্দের স্রোত বয়ে যায়। তেমনি গম্ভীরা তখনই আনন্দময় ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে যখন তা গীত বাদ্য সংলাপের মিশ্রণে রস রসিকতায় প্রকাশ করা হয় লোকনাট্যের ভঙ্গিতে। গম্ভীরা গান যদি শুধু পাঠ করা হয়, তবে আনন্দের ভগ্নাংশও পাওয়া সম্ভব নয়। যেমন : বাংলাদেশ বেতারের গম্ভীরা "গানে শুধু একটা ইঙ্গিত থাকে যা Sketch ধর্মী"।[১২]

ভারতের পশ্চিম বাংলার সাথে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জের গম্ভীরার পার্থক্য আছে। দেশ স্বাধীন হবার পরে চাঁপাইনবাবগঞ্জে গম্ভীরা গান নানা নাতির পরিবেশনায় খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৭২/৭৩ সালের পরের থেকে গম্ভীরা গানকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে কুতুবুল আলম, রাকিব উদ্দীন, বীরেন ঘোষের অবদান সর্বজন স্বীকৃত। এ জেলায় বীরেন ঘোষই প্রথম ব্যক্তি যিনি গম্ভীরা গানের দলে হারমনিয়ামের ব্যবহার শুরু করেন। ফাইজুর রহমান মানি[১৩] বলেন, বীরেন ঘোষের আর একটা কৃতিত্ব ছিল যে, তিনি বামা কণ্ঠের মত করে উপরের স্কেলে অর্থাৎ তারাতে সুন্দর গাইতে পারতেন। শ্রোতারা তখন অবাক হয়ে শুনতেন সেই গম্ভীরা গান।

সাধারণত ৯/১০ জন নিয়ে একটি গম্ভীরা গানের দল গঠন করা হয়। এই দলের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন নানা ও নাতি। তারা কখনো সংলাপে কখনো গানে অঙ্গভঙ্গি করে লোকনাট্যের ভঙ্গিতে গান করে। হাস্য কৌতুকের মাধ্যমে সমসাময়িক নানা সমস্যা ও সমাধানের কথা এই গানে পরিবেশিত হয়। দলে যন্ত্রানুষঙ্গের মধ্যে থাকে হারমনিয়ম, তবলা-ডুগি, বাঁশি, করতাল, জিপসি, দোতারা ইত্যাদি। এসব যন্ত্র বাদক ছাড়াও দলে থাকে ২/৩ জন দোহার। দলের সবাই লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরে মঞ্চে ওঠেন। নানা পরে থাকেন লুঙ্গি, ছেড়া গেঞ্জি, মুখে দাড়ি, মাথায় মাথাল এবং হাতে লাঠি। যুবক নাতির বেয়াড়াপনাকে অনেক সময় ধমকানোর জন্য নানা লাঠি সঞ্চালন করে থাকেন। নাতির পরনে লুঙ্গি বা হাফপ্যান্ট এবং গায়ে থাকে গেঞ্জি। দলের এসব পোশাক লোকায়ত জীবনের নিত্য দিনের পোশাক। নানা ছিন্ন বস্ত্রে এলোমেলো চুলে যখন মঞ্চে আসেন, তখন তিনি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বই করেন। সচরাচর তিনি মাথাল মাথায় দিয়ে হাতে পাঁচন নিয়ে কৃষকের বেশে মঞ্চে উপস্থিত হন। নানা-নাতির কৌতুকপূর্ণ রঙ্গব্যঙ্গের মাধ্যমে সমাজের কঠিন সত্য ও বাস্তব চিত্রগুলি খুব সহজেই উপস্থাপিত হয়। ফলে দর্শক-শ্রোতাদের মন ছুঁয়ে যায় এবং তাদের ভাবায়।

www.pathagar.com

স্বাধীনতার পরে অর্থাৎ ১৯৭২ সালের শেষ এবং ১৯৭৩ সালের প্রথম দিকে গম্ভীরা গানের পরিবেশনার সময় গানের সূচনাতে প্রথমে বন্দনা গেয়ে শুরু হতো আসর। যেমন :

কাঁদবো কতকাল, মা তোর একি জঞ্জাল ॥
মা তোর অর্ডারে যুদ্ধ হলো
কত রক্ত দিয়ে স্বাধীন হলো
কত সেনা আইলো গ্যালো
মোরা শুধু হইনু নাজেহাল ॥
মা গো, মনে করি হলাম স্বাধীন
কিন্তু দেখি আমরা এখনো অধীন
আবার মরবো, সত্যি যেদিন হবো স্বাধীন
মা তোর এই স্বাধীনের কিবা ফল।।[১৪]

কুতুবুল আলম ও রকিবুদ্দিন

কুতুবুল আলম ও রকিবুদ্দিন

এই জেলার গম্ভীরা সমসাময়িক সমস্যাগুলোকে গম্ভীরা শিল্পীরা গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ফলে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। যেমন : শিক্ষাঙ্গনে নানা অনিয়ম বর্তমানের যুব সমাজসহ সকলকেই হতাশ করেছে। এই হতাশার বিষয়টি ব্যক্ত হয়েছে গম্ভীরাতে। নাতি নানাকে বলছে–

www.pathagar.com

মাহবুব আলম ও ফাইজুর রহমান মানি

খায়রুল আলম ও তার সঙ্গী

www.pathagar.com

হে নানা, শুনব্যা তো আইসো জি
দ্যাশের ক্যামুন লেখাপড়া।
পড়া পইড়্যা মানুষ হ্যোতে
পারে না হারঘের ছোঁড়া ॥
এর উত্তরে নানা বলে–
ক্যামনে পহ্‌ড়বে হাঁরঘের ছোড়া
তোমরা সভাই কহো
বন্‌ধো থাকে এগারো মাস
খুলা থাকে এক মাস
এখ্যানে ওখ্যানে শুধু চলো।
কার কথা কে শুনে
খামখা খামখা দেয় তাড়া ॥
প্যোহড়তে গিয়া পালিয়া আসে
লয়খো ছাত্রের দোষ
আজকের পরীক্ষা পরশু হবে
ক্যামুন কর‍্যা ছাত্র রবে
পড়হার থাকে না পরিবেশ
দেখ্যা শুন্যা ছোঁড়া কহে
খাবো না আর হুড়া ॥
নানা হে - - - - - - [১৫]

সমাজের আর এক সমস্যা মাদকাসক্তি। এই মরণ নেশার কবলে পড়ে ঝড়ে যাচ্ছে হাজার হাজার সম্ভাবনাময় প্রতিভাবান যুবক যুবতী। গম্ভীরায় নানা নাতির গানে সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে এর ভয়াবহ চিত্র।

হে নানা শুনছিস ভাইরে
সর্বনাশ হয়্যাছে ষোল আনা।
কাণ্ডকীর্তি দেখ্যা শুন্যা
বিগড়্যা গেছে মেজাজ খানা ॥
বাংলাদেশের যত আছে যুবক নানা
বেশিরভাগই গিলছে মদ ধরছে তাড়ি টানা
লিচ্ছে ড্রাগ নানা দ্যাখ তো কাণ্ড খানা।
প্রায় চল্লিশ লাখ হয়্যাছে আসক্ত
ফেনসিডিল আর প্যাথেড্রিনের কত শত ভক্ত
নানা আরো আছে কত নাম শক্ত
ভবিষ্যতে মরণ ছাড়া এদের গতি নাই জানা।
চেষ্টা তদবির চলছে নানা সরকারি মহলে
ক্যামন কর‍্যা ছাড়ান যায় এসব কি ছলে
নানা এভাবে কি দেশ চলে?

www.pathagar.com

ভাইসব তোমরা দ্যাশের মা-বাপ
তোমরাই ভবিষ্যত কি না ॥[১৬]

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাতে ১১টি দল আছে–যারা সারা বছর ধরেই কোন কোন সময়ে গম্ভীরা গান করে থাকে। এই জেলা সদর ছাড়াও ৩/৪টি দল দেশের বিভিন্ন জায়গায় সরকারি কিংবা বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার ডাকে সেখানে গিয়ে গম্ভীরা করে আসে। তেমনি দলের মধ্যে একটি দল চাঁপাই গম্ভীরা। এই দলের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন মাহবুবুল আলম নানার ভূমিকায় এবং ফাইজুর রহমান মানি নাতির ভূমিকায়। সারা বছর জুড়েই তারা দেশের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও উৎসবে গম্ভীরা গান পরিবশন করে থাকে। যেমন : বাংলা একাডেমি, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ছায়ানট, প্রভৃতি জায়গায় এই দল গম্ভীরা করে থাকে। মাহবুব-মানির চাঁপাই গম্ভীরা দল বাংলা একাডেমির বইমেলায় অংশ নিয়ে বই মেলার চিত্র, বাংলা একাডেমির স্থাপনা প্রভৃতি বিষয় সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তেমিন একটি গম্ভীরা গান নিচে দেয়া হল।

বাংলা একাডেমির বইমেলায় আস্যাহে নানা
কি কহি কিছুতো ভাব্যা পাছি না
মাসব্যাপী এই মিলন মেলায়
মনের আশা পুরছে না।
ভাষার জন্য রক্ত দিল
দেশের তাজা তরুণ প্রাণ
এমনি কথা যায়নি শোনা
ইতিহাসে নাই সন্ধান।
আটচল্লিশ বছর পরে
সেই ঘটনার সূত্র ধরে
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা
দিবস পাইল ঠিকানা।
ভাষা আন্দোলন শহিদ ভাইদের
চিরদিন রাখতে স্মরণ
উনিশশো পঞ্চান্ন সালে
বাংলা একাডেমি হয় গঠন
স্বাধীনতার ফেব্রুয়ারি মাসে
ক'জন জ্ঞানীর চিন্তায় আসে
বাঙালিদের তীর্থস্থান
বই মেলার হয় সূচনা।
সমাজ সংস্কারের ঝামেলাতে
অস্থির হলে চিত্ত
সমাধান দেয় আনন্দ দেয়
লেখক আর সাহিত্য
আসবে যত চড়াই উৎরাই

www.pathagar.com

লেখকের হাত তত এগিয়ে যায়
চিন্তা করে দেখো না।[১৭]

বিদেশি সংস্কৃতির আগ্রাসনে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতিকে হতাশ করার বিষয়টি তাদের গানে চিত্রিত হয়েছে। যেমন–

'নদী নালা গাছ পালা
ছয় ঋতুর এই দেশে
ঘুমায় জাগি গানের সুরে
দিন কাটাই আবেশে
কুন্‌ঠে (কোথায়) বিজয়-হাসন-লালন
কুন্‌ঠে কানাই রাধা রমণ
হৈ হুল্লোড় আর বাজনার ঠেলায়
গানের কিছু শুনি না।
মানুষের নিজ পরিচয় তার
আপন কৃষ্টি কালচার
যাত্রা খেমটা ঝুমুর নাট্য
হোয়্যা য্যাচ্ছে ছারখার।
পোশাক আশাক চলন ফিরন
সব বিদেশী অনুকরণ
মাহবুব মানি করায় স্মরণ
এদিকে দাও মনখানা।[১৮]

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গম্ভীরার অন্য একটি দলের নাম 'রসকস চাঁপাই' গম্ভীরা দল। এই দলের নেতৃত্ব দেন সৈয়দ শাহ্‌জামাল। তিনি নানার ভূমিকায় অভিনয় করেন আর নাতির ভূমিকায় থাকে সোহেল রানা। এই দলটিও দেশের বিভিন্ন জায়গায় গম্ভীরা গান করে থাকে। স্বাধীনতা দিবস (২৬ মার্চ) উপলক্ষে এই দলের করা গম্ভীরা গান নিম্নরূপঃ

নয় মাস যুদ্ধ কইর‍্যা হামরা বিজয় অর্জন কইর‍্যাছি।
১৯৪৭ সালে পাকিস্তান কায়েম হয়
পশিমাদের কাছে বাঙালির নির্যাতনের সীমা নাই–নানা হে
বাংলা ভাষা রাখবে না, উর্দু ভাষা রাখবে তারা
৫২ তে ভাষা আন্দোলন তাইতো কর‍্যাছি হামরা।
৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হয়
পাকিস্তানি শাসকচক্র রাজ্য ছ্যাড়া নাহি দ্যেয় নানা হে
৭১ এর ২৫ শে মার্চ যখন নানা গভীর র‍্যাত
বাংলার উপর গুলি চালিয়া বাঙালিকে করতে চাহ্যাছিল কা'ত।
এখন স্বাধীন সার্বভৌম আমাদের এই বাংলাদেশ
আমাদের সোনার বাংলাকে আমরা ভালবাসি বেশ নানা-হে
পরাধীনের কী যন্ত্রণা সব লোকেরি আছে জানা

www.pathagar.com

শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণেতে শুইনাছি ॥

কথায় কথায় নানা-নাতি-অনেক গেলাম বলে
ভুল হইলে করবেন ক্ষমা আজকে সকলে–নানা হে
নানা-নাতির প্রার্থনা চরণ-হারা করবেন না
আমরা মূর্খ করি তর্ক-নানা-নাতি দুইজনে।[১৯]

ঢাকাতে এই দলের পরিবেশনায় বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নববর্ষের চিত্র ধরা পড়েছে সুন্দরভাবে :

হে নানা বাধ মানে না মনটা খুবই হাসছে
আবার নতুন বছর ঘুইরা আইয়্যাছে
ফুলে-ফলে নতুন কইর‍্যা সবি যেন সাইজাছে।
সুলতান হোসেন শাহের কালে বৈশাখ তার গননা
মোঘল সম্রাট আকবরের কথা কি হে জান না– নানা হে
কৃষকের জন্য নানা অগ্রহায়ণ হয় গণনা
পরে বৈশাখ হয় গণনা, এই কথা কি বুঝ না।
নববর্ষের প্রথম মাস তুমি গো বৈশাখ হও
তুমি এলে বাঙালি মোরা এই কথাটি বলে দাও।
হালখাতায় হিড়িক লাগে বৈশাখের লগনে
খেয়াল কইর‍্যা দেখ তোমরা বাংলার কারণে–নানা হে
ঘরে ঘরে এত সুখ হাসি হাসি সবার মুখ
বৈশাখ লাগিয়ে তাক বাঙালির মন কাইর‍্যাছে।
বৈশাখ মাসের কাল বৈশাখি উলঠ পালট কইর‍্যা দাও
পরক্ষণেই বৈশাখ তুমি আদর করে বুকে লও, নানা হে
বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হলে, পানি জমে খালে বিলে
পুকুরে মাছ গোলাতে ধান কৃষক লোকের ঘরেতে ॥[২০]

এই গম্ভীরা গানে বন্দনা ও অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক গানগুলি লেখা থাকলেও সংলাপ বা কথোপকথনের ক্ষেত্রে উপস্থিত বুদ্ধি ভীষণ জরুরি। রঙ্গরসের মাধ্যমে এই গানকে সর্বজন গ্রাহ্য করে তোলার ক্ষেত্রে এই গানের পাত্র পাত্রীরা বিশেষ করে নানা নাতি উপস্থিত বুদ্ধির উপর নির্ভর করেই সংলাপ ও গান রচনা করে থাকেন। ব্যঙ্গ কৌতুকের মাধ্যমে অঙ্গভঙ্গি করে দর্শকদের আনন্দে মাতিয়ে রেখে তাদের কাছে গানের মাধ্যমে উদ্দিষ্ট বিষয়বস্তু তুলে ধরে গম্ভীরা শিল্পীরা।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় আর একটি গম্ভীরা দল আছে– যার নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন সাবিনা ইয়াসমিন। তিনি নানার ভূমিকায় এবং নাতির ভূমিকায় অভিনয় করেন ইসমাত আরা। দলের নাম হচ্ছে 'প্রভাতী মহিলা' গম্ভীরা দল। এই দল এই জেলা এবং দেশের বিভিন্ন জায়গায় গম্ভীরা গান পরিবেশন করেছেন। বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশের উপরে তাদের একটি গান নিচে দেয়া হল :

হে নানা শুন কথা, শুন বাঁচাও বাংলাদেশ

www.pathagar.com

আগে রক্ষা করতে হবে হারঘের পরিবেশ।
গণ্যমান্য নানার সব দিছে এই উপদেশ ॥
পতিত জায়গা জমির আইলে বৃক্ষ রোপণ কর ভাই
বসত বাড়ির ফাঁকা জায়গা পতিত যেন নাহি রয়–নানা হে।
আম-কাঁঠাল আর মেহগুনি লাগাইলে টাকার খনি
নিজের ভুলে চোখের জলে জীবনটা করিনু শেষ।
কার্বন ডাই অক্সাইড আর অক্সিজেন এই দুটি গ্যাস।
ভারসাম্য বজায় রাখে খোঁজ খবর লিয়া দ্যাখ- নানাহে
বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি করে মরুভূমি হয় না ওরে
পুষ্টি জোগায় পুঁজি বাড়ায় গাছ কাইটা করিস না শেষ।
দেশের সরকার বলছে বার বার বৃক্ষ রোপণ কর সবাই
দিন বদলের পালা মোদের ডিজিট্যাল বাংলা গড়তে চাই,
সরকার বলে আরো আরো গাছ লাগাইতে যত পারো
পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গাছ লাগাইয়া ভরবো দেশ॥ [২১]

ইসমাত আরা ও সাবিনা ইয়াসমিন

ক্ষেত্র সমীক্ষায় জেলায় যে সব গম্ভীরা দলের সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলির তালিকা নিচে দেয়া হল:

	দলের নাম	অধিকারীর নাম	ঠিকানা
০১.	চাঁপাই গম্ভীরা	মাহবুবুল আলম	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, পৌরাঞ্চল
০২.	রসকস চাঁপাই গম্ভীরা	সৈয়দ শাহামাল	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, পৌরাঞ্চল
০৩.	জেলা গম্ভীরা	খাইরুল আলম	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, পৌরাঞ্চল
০৪.	লোক গম্ভীরা	সাইদুর রহমান	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, পৌরাঞ্চল

www.pathagar.com

০৫.	প্রভাতী মহিলা গম্ভীরা	সাবিনা ইয়াসমিন	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, পৌরাঞ্চল
০৬.	চাঁপা নকসী গম্ভীরা	শিশ মোহাম্মদ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, পৌরাঞ্চল
০৭.	কালজয়ী চাঁপাই গম্ভীরা	সঞ্জয় কুমার ঘোষ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর(নসিপুর)

উপর্যুক্ত দলগুলো সারা বছর ধরেই কোন না কোন অনুষ্ঠানে গম্ভীরা গান পরিবেশন করে থাকে। এই দলগুলো ছাড়াও কিছু দল আছে যারা কোন উৎসব অনুষ্ঠান কিংবা দেশের জাতীয় দিবসগুলোতে (স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, পহেলা বৈশাখ ইত্যাদি) স্থানীয়ভাবে গম্ভীরা গান পরিবেশন করে থাকে। তেমনি কয়েকটি দল:

১. বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরাঞ্চল, দলনেতা-গোলাম ফারুক মিথুন।

২. সূর্য দিগন্ত শিল্পী গোষ্ঠী, রহনপুর পৌরাঞ্চল, গোমস্তাপুর, দলনেতা-রিপন ইসলাম।

৩. গীতাঞ্জলি সংস্কৃতি একাডেমি, নাচোল, দলনেতা-খাদেমুল ইসলাম।

৪. সুরাঞ্জলি ক্লাব, নাচোল বাসস্ট্যান্ড, দলনেতা-মো. সাইফুদ্দীন।

এছাড়াও কোন কোন স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা প্রতিষ্ঠানের উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গম্ভীরা গান পরিবেশন করে থাকে। নিম্নে চাঁপাইনবাবগঞ্জ উপজেলার চামাগ্রামের গম্ভীরা রচয়িতা এটিএম শহীদুল আলম এর একটি গম্ভীরা পালা তুলে ধরা হলো।

জনসচেতনতা, শিক্ষা অর্জন ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক গম্ভীরা

নানা : (প্রথমেই দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ নানা স্টেজে উঠে চিৎকার করে তার নাতিকে ডাকতে থাকবে–) শনুরে, এ শনু ! শনু ...। এত লোকজন দেখছি কিন্তু হারঘে শনু গেল কুনঠে। (মঞ্চ থেকে চারদিকে তাকিয়ে এদিক ওদিক কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করে পাত্তা করতে পারে না।) হাঁজি ভাই, তোমরা হারঘে শনুকে দেখ্যাছ। ই শালা বোকাকাঠি গ্যাল কুণ্ঠেজি? (শেষ পর্যন্ত রেগে গিয়ে নাম বিগড়ে ডাকবে–) শৈন্যাবে, এ শৈন্যা ...। (তারপর লাঠি উপরে তুলে বলবে) শালাকে পা'লে আ'জ মজা দ্যাখাব। আবে শৈন্যাবে...

শনু : (দৌড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে মঞ্চের দিকে আসবে শনু। মঞ্চের সম্মুখে জনতার মধ্যে সে বসে ছিল। এসেই বলবে–) কি হয়েছে জি নানা, এত চিল্যাইছো ক্যানে? তোমার গ্যাঙড়োনের ঠ্যালাই গোটা পাড়া-ই অস্থির। সভাই কহিছে তুমি হামাকে শৈন্যা শৈন্যা কৈহ্যা ডা'ক্যা বেড়াইছ। হার নাম কি শৈন্যা জি নানা, হাঁর নাম যে শনু– মো. শনু মিয়া। শনিব্যারে হয়েছিনু বৈল্যা তুমিই তো নাম রা'খ্যাছিলা শনু। তুমি দিনকে দিন বুঢ়া হৈছ, না ভ্যাড়া হৈছ বুঝতে পারিন্যা।

নানা : কী ...শালা বেহুদ্যা কুণ্ঠেকার। শালাকে গোবান দিলে বুঝতে পারবে। শালাকে ডা'ক্যা ডা'ক্যা হামার দম বারহিয়্যা যা'ছে আর শালা হাঁর

www.pathagar.com

ডাকাকে গ্যাঙড়ান্ কহিছে। কিন্তু এখ্যানে এত লোক কেনে বে। কী হৈছে এখ্যানে?

নাতি : খুব ভালো কাম হৈছে জি নানা এখানে। জনসভা জি জনসভা। যাতে ক'র্যা সভাই (সবাই) তারঘে ব্যাটা-বেটিকে স্কুলে প্যাঠায়, ল্যাখাপড়া শিখায়, ছাল্যাপিল্যা কম কৈর্যা ল্যায়, জন্ম নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে, পরীক্ষাসহ যাবতীয় নকল ও দুর্নীতি বন্ধ করে, তার উপর আলোচনা হৈছে।

নানা : হাঁবে, তাহিলে তো খুব ভালো কথাই আলোচনা হৈছে।

নাতি : তুমি ফের এগ্ল্যার কী বু'ঝব্যা। এগ্ল্যাকে সেমিনার কহে, সেমিনার। সব পণ্ডিতঝোনারা বৈস্যা পাবলিককে বক্তিতা খাওয়াইছে। তুমি এগ্ল্যার কিছু বু'ঝব্যা না।

নানা : কী ...? ফের মুখে মুখে কথা কহছিস। শালাকে এ্যামন গরমান গরমাবো, শালার পাছা লাল ক'র্যা দিব। (তারপর সত্যি সত্যি লাঠি দিয়ে এক ঘা বসিয়ে দিবে) তোমরাও যারা অফিস্যার-পঁপিস্যার সেমিনার করতে আ'স্ছো, তোমরাকে কহ্ছি, হামি বুঢ়া মানুষ হাঁর একটা অভিজ্ঞতা আছে। হামার কথাও কিন্তু তোমরা শুইনব্যা। তাতে লাভই হৈবে।

নাতি : ঠিক আছে, ঠিক আছে জি নানা তুমি এ্যাগল্যা বুঝ। বয়স্ক মানুষ সারা জীবনের জ্ঞান তোমার। আ'সো হামরাও অরঘে সোঁতে এগ্ল্যা আলোচনায় যোগ দি।

নানা : তাহিলে ধর গান–

গান : নানা বিদ্যার কদর কত
বু'ঝ্যাছি নানা
অবহেলায় সুযোগ হারা'সন্যা
ল্যাখাপঢ়ার এমন সুযোগ হারঘে সময় ছিল না। (২) হে নানা ...

দোহারি : নানা বিদ্যার কদর কত
বু'ঝ্যাছি নানা
অবহেলায় সুযোগ হারা'সন্যা
ল্যাখাপঢ়ার এমন সুযোগ হারঘে সময় ছিল না। (২)

নানা : বুঝলি বে?

নাতি : খৈল্যামু কৈর্যা ল্যাখাপঢ়া করোনি। বড়ো নানির মুখে হামি সব শুন্যাছি, তুমি খালি স্কুল থ্যা'ক্যা পালিয়্যা আ'সত্যাক।

নানা : কি কহব রে ভাই, তখন স্কুল ছিল দূরে। বড়ো হৈয়্যা মানে বার-তের বছরে 'অনে' (Class One) ভর্তি হ'য়্যাছিনু। আর ফাইবে উঠ্যা বিহ্যা দিয়্যা দিলে। তারপর থা'ক্যা স্কুল গেলে বুকের ভিতিরট্যা তোর নানির লা'গ্যা ক্যামন ক্যামন করতোক বে? তাই আর–

নাতি : ল্যাখাপঢ়া হৈলো না। চৌদ্দটা ব্যাটা-বেটি হৈলো?

নানা : ঐ আর কি– দশটা ছা'ল্যা এমনি হয়েছিল। আর তোর এগার নম্বর মামুর সময় থাইক্যা দ্যাশে মায়া বড়ি আ'লো– গাঁয়ে গাঁয়ে দিয়্যা বেড়াইতোক। তোর নানি মাঝে মধ্যে খা'তোক, মাঝে মধ্যে খা'তোক না। এগ্লা খা'য়্যা

www.pathagar.com

তোর নানির নাকি মাথা ঘুরতোক। বড়ি খাওয়া ফাঁক পৈড়্যা যাওয়ার কারণেই জন্ম নিমন্ত্রণ আর হয়নি–

নাতি : জন্ম নিমন্ত্রণ লয় জি নানা, ঐট্যা হৈলো জন্ম নিয়ন্ত্রণ।

নানা : ঐ হৈলো বে, একই কথা। তোর চৌদ্দ নম্বর মামু হওয়ার আগে বড়িগ্যালা তোর নানি আর খা'লে না। তখন দু'মাস হামিও খা'য়াছিনু। কিন্তু পরে জান্‌নু এগ্‌ল্যা ব্যাটা ছা'ল্যা খা'লে কোন কাম হয় না। আর ছা'ল্যা বন্দ করব, এই শরমের কথা কাহুকি কিছু কহিতে পারি ন্যা। ফলে চৌদ্দটা– বুঝ্! তখন কুকুর-কাহাটালি ল্যা'গ্যা গ্যাল। তোরা কিন্তু এ্যাগল্যা ভুল করিসন্যা। ল্যাখাপড়া শিখিস আর ছাইল্যাপিলা কম লিস। হামার সংসার ভারীর কারণেই তো তোর মামু-খালারাকে ঠিক মতো মানুষ করতে পারনু না।

নাতি : কি রকম?

নানা : শুন্ তাহিলে–

গান : ল্যাখাপড়া জানলে হামার এ্যামন হাল আ'জ হৈতোক না। (২)
ভাতকাপড়ের এত অভাব সংসারে হার আসতোক না। নানা হে
আগে যদি জানতুন হামি এমন ভুল হাঁর হৈতক না। (২)
এত বেশি সন্তান লিয়্যা সন্ত্রাসীর বাপ হৈতুং না।

দোহারি : নানা বিদ্যার কদর ...
... ছিল না।
হে নানা বিদ্যার কদর কত ...
... হারা'সন্যা।

নাতি : তুমি কুন্ কথা কহিছ?

নানা : আবে এত ভা'ঙ্যা লিসন্যা। কিবোল তো হাইস্কুলে পড়ছিস। বড়ো হবি তখন বুঝতে পারবি। এখন ভালো কৈর‍্যা মন দিয়্যা ল্যাখাপড়া কর তাহিলে মানুষের মতো মানুষ হ'তে পারবি। আর বুড়া মানুষ, যা কহছি তা শুন্যা লে, ম'র‍্যা গেলে আর শুনতে পাবিন্যা।

গান : ভালো কৈর‍্যা ল্যাখাপড়া যারাই নানা কৈরাছে (২)
কম ছা'ল্যাপিল্যা লিয়্যা সুখী সংসার গৈড়্যাছে। নানা হে
ইঞ্জিনিয়ার করল কাউকে, কাউকে ডাক্তার নানা
শ্যাষ বয়সে তাই তো অরঘে কুনু চিন্তা থাকে না। (২)

দোহারি : নানা বিদ্যার কদর ...
... ছিল না।
হে নানা বিদ্যার কদর কত ...
... হারা'সন্যা।

নানা : বুঝলি বে চৈত্‌ন্যা?

নাতি : কৈ, কী বুঝাইল্যা?

নানা : মানুষের ২/৩ ট্যা ক'র‍্যা ছা'ল্যাপিল্যা। আর হামার চৌদ্দটা। অরঘে ব্যাটাবেটির‍্যা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অফিস্যার পপিস্যার হৈলো আর হার

ব্যাটারা কে চোর হৈলো, কে চিট্‌বাটপার হৈলো, আর তোর ছোট মামু তো গোটাই সন্ত্রাসী হ'য়্যা গ্যাল। অরঘে ল্যাগা মানসম্মান তো থাকলোইন্যা, মানুষে হামার দিকে লোগ (আঙুল) তু'ল্যা দ্যাখিয়্যা কহে, ঐট্যা হৈলো অমুকের বাপ। লাতিবে, তুই ভালো ক'র্যা ল্যাখাপড়া করগা। ল্যাখাপড়া না করলে উন্নতি করা যা'বে না। মানুষের মতো মানুষ হওয়া যা'বে না।

নাতি : হামি তো ঠিক মতোই পড়িছি জি নানা।

নানা : (নাতির পেছনে লাঠির গুতো দিয়ে) তুই পড়ছিস রে শালা? সারাদিন তো আড্ডা ঠুঁক্যা ব্যাড়াছিস। পোত্তেক বছর পরীক্ষার আগে নোট বইয়ের পাতা কাটছিস। নকল হয় না বৈল্যা বছর বছর ফেল করছিস। এই ম্যাট্রিক ফেল তোর কইব্যার হৈলো, এবার দিয়্যা চারব্যার হৈলো। তাও শালার স্বভাব খারাপ! বেটি ছ্যা'ল্যার পিছে পিছে ঘুর ঘুর ক'র্যা ব্যাড়াইছে। বিহ্যার বয়স হয়নি, এগ্‌ল্যা কি ক'র্যা বেড়াছিস বে। এরকুম যুতি দেখি, আর এবার যদি ম্যাট্রিক ফেল করিস তাহিলে কিন্তু ঘাড় ধ'র্যা বাড়ি থা'ক্যা বাহির ক'র্যা দিব।

নাতি : অত রাগ করছ ক্যানে? তুমি নিজেই তো এগার-বারো বার পরীক্ষা দিয়্যা ফাইভ টপ্‌কিতে পা'রল্যা না।

নানা : ফের শালা এ কথা তুলছে। হারঘে সময় ছিল অন্য। আর হামি যে ভুল ক'র্যাছি বে, তোকেও সে ভুল করতে হৈবে? এ ভুলের লা'গ্যা তো সমাজের অধঃপতন, অফিস আদালতের অধঃপতন, দ্যাশের অধঃপতন। ভালো মতোন পরিকল্পনা করতে না পারলে দ্যাশের উন্নতি করতে পারা যা'বে না। তাহিলে শুন্–

গান : নকল করা পরীক্ষাতে পাশ করে যে নানা (২)
চাকরির পরীক্ষাতে যা'য়্যা পাত্তা করতে পারে না। নানা হে
মামু-খালুর বদৌলতে চাকুরি পেলেও নানা (২)
জাতীয় উন্নতি তারা কিছুই করতে পারে না। হে নানা...

দোহারি : নানা বিদ্যার কদর ...
... ছিল না।
হে নানা বিদ্যার কদর কত ...
... হারা'সন্যা।

নাতি : ঐগ্‌ল্যা ছাড়ো তুমি।

নানা : কি কহলি?

নাতি : ভালো ফল যদি করতে না পারি, চাকরিও যদি না পায়, ক্ষতি নাই।

নানা : ঐ শালা। কি করবি রে? ভিখ্‌ ক'র্যা খাবি?

নাতি : তোবা তোবা! তোমার মাথায় ঘিলুই নাই।

নানা : আচ্ছা তোর ঘিলুর কথাই শুনি–

নাতি : পাটিতে নাম ল্যাখাব। রাজনীতি করব। তারপর ক্যাডার হৈয়্যা না–

নানা : ক্যাডার হৈয়্যা কি করবি?

নাতি : আরে মালদারেরঘে কাছ থা'ক্যা চাঁন্দা তুলব– টাকা পয়সার অভাব হৈবে না। তুমিও ভালো থা'কব্যা হামিও ভালো থাকব। শালাকে ড্যাম কিয়ার–

নানা : (নাতির পাছায় একটা লাঠির ঘা দিয়ে) হারামজাদা, তোর ছোট মামুর মতো সন্ত্রাসী হবি। ঐ হারাম টাকাতে হামি পেচ্ছাব কৈর‍্যা দি।

নাতি : আরে হারাম লয়, হারাম লয়। টাকা যেম্‌নি হ'ক জায়েজ জিনিস। যার হাতে যায় তখন তার। আর সরকার বদল হৈলে হামিও বদল। সব সময় সরকারি পাট্টি করব। আর সরকারি পাট্টি করতে না পারলেও অসুবিধা নাই। বিরোধী দলে থা'ক্যা মাঝে মধ্যে হরতাল ডাকব। যারা চাঁন্দা দিবে না, হরতালের দিন ওরঘে দোকান-পাট বাড়িঘর ভাঙচুর করব।

নানা : ঐগ্‌ল্যা করিসন্যা বে। ভালো কিছু কর। যাতে মানুষে নাম করে। গডফাদারের পিছে পিছে ঘুরলে একদিন ঠিকই গুলি খা'তে হৈবে তোকে। কখন দেখব বোমা খা'য়্যা ম'র‍্যা প'ড়্যা আছিস। তাহিলে শু'ন্যালে, ভালো ক'র‍্যা হার সোঁতে তুইও গান ধর।

গান : হৈ হুলোড়ে যোগ দিস ন্যা আর হরতাল করিস ন্যা
শেসন-জটে পৈড়্যা যা'য়্যা চাকরির বয়স হারা'স ন্যা। নানা হে
অস্ত্র-বাজ আর চাঁদা-বাজের জীবনে সুখ আ'সে না। (২)
গড ফাদারের পয়রাবিতেই জীবনটা হয় ফানা। হে নানা ...

দোহারি : নানা বিদ্যার কদর ...
... ছিল না।
হে নানা বিদ্যার কদর কত ...
... হারা'সন্যা।

নাতি : নানা তোমার কথাই বুঝনু– ঠিক। হামার একটা কথা শুনো।

নানা : কি কহ্য। ভালো কথা হ'লে শুনব– কহ্য।

নাতি : শুনব্যা তো?

নানা : ঐ যে কহিনু ভালো কথা হ'লে শুনব।

নাতি : ম্যালাদিন থা'ক্যা সিনেমা দেখিনি জি নানা– বিশটা টাকা দিব্যা? আইজ সিনেমা দেখতে যাব।

নানা : আচ্ছা কথা মনে ক'রাছিস। শালার বেকুব কুণ্ঠেকার। ঐগ্‌ল্যা দেখতে হ'বে না। আগে হারা দে'খ্যাছি কত রকম ভালো বই। দেখ্যা জান জুড়িয়্যা যা'তোক। আর এখনকার সিনেমায় শুধু মারপিট হৈ হুলোড় আর খাচ্চোড় পোষাকের বেটিছা'ল্যার ড্যানেস। চাঁন্দাবাজি মাস্তানি ছাড়া কুনু সিনেমা নাই। দিনকে দিন আরও খারাপ হ'য়্যা যা'ছে। তার লা'গ্যা কহছি, শুনেক–

গান : সুশিক্ষার বিকল্প নাই যে, যদি উন্নতি চাই (২)
অপসংস্কৃতি ধরলে দেশ ও জাতি ধ্বংস হয়। নানা হে
উচ্চ শিক্ষা অর্জন করে রাজনীতিতে নামলে পারে
দ্যাশকে আগিয়্যা লিতে পারে উন্নতিরই শিখরে। হে নানা ...

দোহারি : নানা বিদ্যার কদর ...

www.pathagar.com

... ছিল না।
হে নানা বিদ্যার কদর কত ...
... হারা'সন্যা।

নাতি : হাঁ জি নানা, তুমি যেগ্ল্যা কথা কহিল্যা সবই তো ভালো কথা। বারটা ব্যাটার বাড়ি করতে আর দু'বেটির বিহ্যা দিতে তুমি ফতুর। তোমার যা অবস্থা, তোমার ব্যাটা-বেটির‌্যা যা কৈর‌্যাছে তাতে দু'দিন পর ভিখ করতে বারহায়তে না হয়? যে চার বিঘা জমি আছে হাঁকে লেখ্যা দিবা তো হামি হালচাষ করব, ঠিক মতো ল্যাখাপড়া করব। কথা দিছি, আর নকল করব না, ঘুরাফিরা করব না। জমিট্যা লেখ্যা দিব্যা তো?

নানা : দিব বে দিব। ঠিক মতো চললে, ল্যাখাপড়া করলে তোকে সব দিব। তোর কর্মই তোকে আ'ন্যা দিবে। লে এবার শেষ কর।

নাতি : ঐ যে তুমি যে কহিল্যা ফেল করলে হাকিয়্যা দিব্যা–

নানা : হামি বুঝতে পারছি তুই আর ফেল করবিন্যা। তুই তো হাকে কথাই দিলি যে ঠিক মতো ল্যাখাপড়া করবি। ঠিক মতো ল্যাখাপড়া করলে কেহু ফেল করে না। আর একটা কথা হার মতো জীবনটাকে লষ্ট করিসন্যা। ভবিষ্যতে ছা'ল্যাপিল্যা কম লিবি। আর এই যে মানুষগ্যালা আছে, এরাকে কহি হাঁরা, তোমরা ছা'ল্যাপিলা কম ল্যাও। আর ঠিক মতো ল্যাখাপড়া করাও, না হ'লে হার মতোন আবস্থা হ'বে। লে শেষখানটা ধর্–

গান : জনসংখ্যা বাড়ছে দ্যাশে হুহু কৈর‌্যা নানা। (২)
বসতবাড়ির ল্যা'গ্যা বুঝিন চাষের জমি থাকবে না। নানা হে ...
নিয়মিত মনের মতো করগা ল্যাখাপড়া (২)
দশের-নিজের চিন্তা করগা খা'সন্যা গিন্নির হুড়া। হে নানা ...

দোহারি : নানা বিদ্যার কদর ...
... ছিল না।
হে নানা বিদ্যার কদর কত ...
... হারা'সন্যা।

নানা : ম্যালা কথা কহিনু। শুন জনগণ, তোমরাও কিছু মনে করিওনা। বুঢ়া মানুষ তো! বকর বকর করতে ভালাগে। হার কথা যদি ভালো হয় তাহিলে তোমরা কথাগ্যালা মা'ন্যা লিও। গানের মধ্যে কুনু ভুল ক'র‌্যা থাকলে মাফ ক'র‌্যা দিও। (নাতির দিকে ইঙ্গিত করে) ধর্ বে–
ভুলের উর্ধ্বে নইগো মোরা বলছি করজোড়ে (২)
এতক্ষণ যা বলনু মোরা সমাজচিত্র ধরে। নানা হে
নানা লাতি হামরা দুঝ্না গাহিনু যা আসরে
ভুলত্রুটি পা'লে কিছু দিবেন ক্ষমা করে। হে নানা ...

দোহারি : নানা বিদ্যার কদর ...
... ছিল না।
হে নানা বিদ্যার কদর কত ...

www.pathagar.com

...হারা'সন্যা।[২২]

চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত গম্ভীরা গান–

১.

হে নানা দেখবিতো দোড়া হে
কত কাণ্ড-কারখানা
পালন করতে শিক্ষা পক্ষ
আইস্যাছে কত গুণিজনা ॥

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড
জানে সর্বজনে
সবাই নিব শিক্ষা মোরা
কুশিক্ষা বর্জনে
সবে প্রতিজ্ঞা কর মনে প্রাণে।
পড়াশুনা করব সবাই
নকলবাজি করব না ॥

লেখাপড়া মানে কেবল
বই পড়া নয়–
খেলাধুলা শিল্পচর্চা
বিদ্যার পরিচয়
আছে সংগীত, আবৃত্তি অভিনয়।
এসব নিয়েই, আসল শিক্ষা
নইলে উন্নতি হবে না ॥
ভাটিয়ালী, গম্ভীরা, আলকাপ,
জারী আর সারী–
আরো আছে শিল্প সম্পদ
কত গাড়ি গাড়ি
মনে কষ্ট কহিতে না পারি।
হায়রে এসব ছাড়া পপ ব্রেকড্যান্স
সহ্য করতে যে পারি না ॥

বাংলাদেশের সবখানে
শিক্ষা পক্ষেতে
শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রী সবাই
উইঠ্যাছে মেতে
ইউনিভার্সিটি স্কুল কলেজেতে
এসব কাজের সুফল আছে
চর্চা কর সর্বজনা ॥

www.pathagar.com

২.
হে নানা কথা শুনজি
পরিবার পরিকল্পনার
লোকে লোকারণ্য হয়ে
দেশ হল যে ছারখার ॥

দশ কোটি লোকের জন্য
জমিয়ে সামান্য
এক জমিনে তিন ফসল
কাটেনাকো তবু ধকল
মোদের জোটেনাতো অন্ন।
লোক সংখ্যা বেশী বাড়লে
সুখ হবে নাতো আর ॥

সবার যদি থাকে শুধু
একটি মাত্র সন্তান
যত্ন নেওয়া সহজ হবে
শিক্ষা দিক্ষাও ভাল হবে
খাদ্যের হবে সংস্থান ॥
সেই মতে চললে পারে
উপাই হবে বাঁচার ॥

দেশের সরকার করছে খরচ
কোটি কোটি টাকা
পরিবার পরিকল্পনা
গ্রহণ কর এই মন্ত্রণা
দূর হবে সব ধাক্কা।
ছোট পরিবার গড়লে পারে
সুখ শান্তি হবে সবার ॥
৩.
হে নানা পারি না সামলাইতে হে
এতটি ছাল্যা পিল্যার জ্বালা
ওদের মুখে অন্ন দিতে
জীবন হইছে যে ঝালাফালা ॥

আগে যদি থাকত পরিবার-পরিকল্পনা
পালন কইরা মনে মনে
সুখী হইতাম সর্বক্ষণে

www.pathagar.com

অশান্তি কখনও আসত না।
এখনও সময় আছে
সাবধান হও তোমরা সবাই মিল্যা ॥

বাংলাদেশের জনসংখ্যা
মোট সতেরো কোটি
নিয়ন্ত্রণ না করিলে
ঠিকমত হাল না ধরিলে
জুটবেনা কপালে ভাত-রুটি ॥
জনসংখ্যা ডবল হইবে
দুহাজার সালে বুঝবি ঠ্যালা ॥
৪.
হে নানা শুনব্যাতো আইসজি
ধূমপান করার কথা
ধূমপান কইর‍্যা কইর‍্যা
শেষ হলোযে মাথা ॥

ধূমপান করলে পারে
কলজ্যা যায় পচে–
শেষ হবে তার জান
গলায় ধরবে তার মরচে।
আয়ু তার স্বল্প হবে
বুকে থাকবে ব্যথা ॥

ধূমপান শুধু স্বাস্থ্য নয়
টাকা পয়সা ক্ষয়–
ধূমপান না করিলে
অনেক অর্থ বেঁচে যাবে
উন্নতি হবে যে নিশ্চয়।
স্বাস্থ্যের সঙ্গে অর্থ পাবে
এই হলো মোদের কথা ॥

এতো সবাই ধূমপানের
করি প্রতিরোধ
ধূমপায়ীদের মানা করি
ব্যবসায়ীদের চাপ্যা ধরি
ধূমপান হবে তবে রোধ
আইন করে মানা করলে
রাখবে সবাই কথা ॥

www.pathagar.com

৫.
হে নানা দৌড়িয়া আইসজি
শুনতে পাইছনা আহাজারি
সর্বনাশা বান আইস্যাছে
ডুব্যা গেলযে ঘরবাড়ি ॥

সারা দেশ ডুইবা গেল
মরল কত জনা–
গরু বাছুর ডুবল কত
যাইবে নাকো গনা
হায়রে মুছ্যা গেল ফসল সোনা।
এখন মনের মধ্যে একটাই চিন্তা
ক্যামন কইর‌্যা বাঁচতে পারি ॥

সারা দুনিয়া এ খবরে
আমাদেরও কাছে–
খাদ্য ওষুধ কাপড় চোপড়
সাহায্য দিয়াছে।
তাইতো দ্যাশের মানুষ বাঁইচাছে
এবার বন্যা নিয়ন্ত্রণের কথা
ভাবো দেশের নর-নারী ॥

এবার রাস্তাঘাট ডুব্যা গেছে
বানেরও পানিতে
বুড়িগঙ্গার নদীর পানি–
ঢুকলো রাজধানীতে
নানা কষ্ট পাই এসব শুনিতে
যদি বানের চইল্যা আসে
কলেরা মহামারি ॥

দেশে যদি আসে নানা
কলেরা ডাইরিয়া
ওর স্যালাইন তৈরি কর
ঘরেতে বসিয়া
নানা রোগীদের কাছে যাও নিয়া।
এসব কাজ করতে হবে
নিজেদের তাড়াতাড়ি ॥

www.pathagar.com

৬.
হে নানা শুনজি
শুনলে উঠবে মাথা ঘুর‍্যা
দ্যাশের যুবক সারা হইল
মাদকদ্রব্য সেবন কর‍্যা ॥

বাংলাদেশের কিশোর যুবক
মত আছে নানা–
দেশের ভবিষ্যৎ তাহারা
এটাই সবার জানা
দ্যাখনা তাদের কাণ্ড কারখানা।
হেরোইন মারিজুয়ানার ছোবল
হানছে সারা দ্যাশ জুড়্যা ॥

লাখ লাখ লোক আজ মাদকে আসক্ত
দিন দিন বাড়ছে আরো
কতশত ভক্ত
তাদের হিসাব নেওয়া শক্ত।
মাদকদ্রব্য সেবন কইর‍্যা
চুরি ডাকাতি যাইছে বাইড়্যা ॥

এসো সবাই মাদক দ্রব্যের
করি প্রতিরোধ–
সেবনকারিদের মানা করি
ব্যবসায়ীদের চাপ্যা ধরি
তবে হবে এটার রোধ।
মাদকদ্রব্য রোধ হইলে
দ্যাশের মান যাবে বাইড়্যা ॥
৭.
হে নানা দেখবাতো আইসজি
কত লোকের সমাগম
লাঙ্গল হাতে, কাস্তে হাতে
কৃষক যে কতজন।

কৃষক হইল দেশের প্রাণ
এটা সবাই জানে–
কত নেতা আইল গেল
কৃষিকৃষি রব তুলিল

www.pathagar.com

মারলো তাদের প্রাণে।
কালকের কথা আজকে বাণী
কথায় ভরায় মন ॥

ফসল শুধু ফলে না সারে
লাগে আরো কিছু
আসল চাষার জমি রবে
হালের বলদ দিতে হবে
হটবেনা চাষা পিছু।
নিজের দাবি আদায় করে
আনবে শুভক্ষণ ॥

কৃষিঋণ চাষীর ভরসা
এটা সবাই জানে
সবখানে কারসাজি
মারছে শুধু প্রাণে।
একের ঋণ অন্যে নিচ্ছে
বিফল হয় শ্রম ॥

এখন মোদের সময় হচ্ছে
কর সঞ্চয় বল
একে অন্যের হাত ধর
নিজের দাবি আদায় কর
জ্বলবে যে মশাল।
বিফল হলে উঠে না পানি
করবে কে বল পূরণ ॥

তোমরা সবাই সুধীজন
আমরা কৃষক চাষা
যতসব মনের ব্যথা
গানের মধ্যে দুটি কথা
কৃষক সবার ভরসা।
ভুল হইলে ক্ষমা কর
নানা নাতির চলন ॥[২৩]

৮.
হে নানা শুনব্যাতো আইসজি
নিরক্ষরতার কথা
শুনলে মনে দারুণ ব্যথা ॥

www.pathagar.com

নিরক্ষর লোক নানা
চোখ থাকিতে অন্ধ
ভাল সমাজ হয় না গড়া
সব রাস্তা বন্ধ
নানা সবার সাথে সবার দ্বন্দ্ব।
শিক্ষা দ্বারা পাওয়া যাবে
মানুষ হবার নিশ্চয়তা ॥

লেখাপড়া জানলে কৃষক
আধুনিক কায়দাতে–
অধিক খাদ্য উৎপাদনে
সক্ষম হবে যাতে
ফসল নষ্ট হবে না কোন মতে
সব কিছুর আসল গোড়া
হটাও নিরক্ষরতা ॥
শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড
এটা সবার জানা
আসল শিক্ষা শিখতে হবে
নকল করতে মানা
তবে শিক্ষা হবে ষোল আনা।
জ্ঞানার্জন করো সবে
ছেড়ে দাও অলসতা ॥
৯.
হে নানা কি আজব কাণ্ড দেখি
নকলের খেলা সারা দেশে
তেলে নকল ঘিয়ে নকল
মানুষ নকল হইল শেষে ॥

হাটবাজারে চলতে ফিরতে
দেখিশ চারিপাশে
আসল খুঁজে যায় না পাওয়া
খাঁটি জিনিস যায় না চাওয়া
দোকানীরা মুখ ফিরিয়ে হাসে।
নকল ভেজাল জিনিস পত্রই
খাঁটি হইল অবশেষে ॥

নকল জিনিস খেলে নানা
কত অসুখ হবে

www.pathagar.com

পরীক্ষাতে করলে নকল
দেশের ছাত্র-ছাত্রী সকল
পাশ করেও গোল্লায় যাবে।
নকল থেকে দূরে থাক
উন্নতি আসবে পরিশেষে ॥

অন্তর বড় হলে পরে
ভালবাসা যায়
মন ছোট হইলে নানা
খাঁটি ভালবাসা হয় না
মেকী একদিন ধরা যে পড়েই
(তাই) নকল ছেড়ে আসল ধরলে
জীবনে পরিপূর্ণতা আসে ॥
১০.
হে নানা কুনঠে পালাবজি
দ্যাশে ডাইরিয়া যে মাইত্যাছে।
এদিক ওদিক তাকিয়া দ্যাখো
কত মানুষ মইর‍্যা যাইছে ॥

সবাই করছে আলোচনা
কত মটর দুর্ঘটনা
অগ্নিকাণ্ড সন্ত্রাস ছিনতাই
ঘটছে কত দ্যাশেতে হায়
তার উপরে রোগের আনাগোনা।
শিশু কিশোর যুবক বৃদ্ধ
বাই চিন্তায় পইড়্যা গেছে ॥

উচিত উপায় বাহির করা
জেনে মানুষ না যায় মারা
না খেলে বিশুদ্ধ পানি
রোগে ধরবে সবাই জানি
সুস্থ সমাজ হইবে নাকো গড়া
পানি ফুটিয়ে পান কর
ডাক্তারেরা কহিছে ॥

দুটা থাকলে ছেলেমেয়ে
সুখের কাঠি যাবে পেয়ে
লেখা পড়ায় বড় হবে

www.pathagar.com

সুনাম অর্জন করবে ভবে
সুখি সংসার গড়বে সবার চেয়ে।
যুগের সঙ্গে তাল মিলালে
সুখ শান্তি আসবে ঘরের কোণে ॥

১১.
হে নানা কি জ্বালায় পোড়্যাছি হে
ভাবতে পারছি না কিছু মনে
ক্যামন কোর‍্যা বাঁচব ভাইরে
এ ভাবনায় ভাবছি ক্ষণে ক্ষণে ॥

যখন বাজার যাছি ভোরে
খালি ব্যাগটা হাতে করে
টাকা পাইস্যা খরচ কোর‍্যা
উঠছে নাকো ব্যাগ ভইর‍্যা
ফির‍্যা আসছি বাড়ি জোরে সোরে।
টাকা বিশেক খরচ কইর‍্যা
আড়াইশ গ্রাম মাছ পাই ওজনে ॥

মাছের কথা না হয় যাক
বিক্রি হইছে কচুর শাক
একশের কচুর পাতা মিলে
পাঁচ টাকা দাম দিয়া দিলে
ভাবতে গেলে হইতে হয় অবাক।
কি করবো হায় কোথায় যাবো
বাঁচবে কি খাইয়া লোকজনে ॥

যদি এইভাবে যায় দিন
সবাই হবে পুষ্টিহীন
সুষমখাদ্য না পাইলে
আয়ু কমবে তিলে তিলে
দিনে দিনে বাড়ছে দ্বিগুণ ঋণ।
দ্রব্যমূল্য না কমালে
সমাধান আসবে কেমনে ॥

১২.
হে নানা ভাবনাতে পইড়াছি হে
হইয়া গেছি তালকানা
পরিবেশ নষ্ট হইছে
জন প্রাণী বুঝি বাঁচে না ॥

www.pathagar.com

বাড়ির বাহির হলে পরে
গাড়ির দোঁয়ায় দুচোখ ধরে
করকারখানার ধোঁয়ার চোটে
প্রাণ অতিষ্ট হয়ে ওঠে
কহ তোমরা বাঁচি কেমনে করে।
ড্রেনে রাস্তায় ঘরের পাশে
আবর্জনা কেহ ফেলিও না ॥

গাছ লাগালে পাবে ফল
তাতে বাড়বে মনোবল
বৃষ্টি হবে যাবে খরা
মাটির ক্ষয়রোধ হবে ত্বরা
কৃষিক্ষেত্রে পাইবে সফল।
প্রতিবছর গাছ লাগালে
অর্থের অভাব ঘটিবে না ॥

স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল
এটা মিথ্যা নয় এক চুল
পরিবেশ বজায় না রাখিলে
স্বাস্থ্য বিধি না মানিলে
সুস্থ জাতির চিন্তা করা ভুল।
সুস্থ জাতি গড়তে হলে
এখনই কর চিন্তা ভাবনা ॥[২৪]

১৩.
পাকা ধান কেমন কইর‌্যা তুলবো ঘরে
চিন্তায় চিন্তায় যাইছে মাথা ধরে
যখন তখন বৃষ্টি নাইম্যা
ভিজলে এমন করে ॥

বৃষ্টি যখন চাহছি নানান
তখন বৃষ্টি হয় না,
পাকা ধানে এমন বৃষ্টি
জানেতে আর সয়না।
অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি,
দুটাই হলো অনাসৃষ্টি।
বাঁচি হাঁমরা কেমন করে
এইরকম হইলে পারে ॥

ছয়টি ঋতুর বাংলাদেশে

www.pathagar.com

বাস করি হাঁমরা,
হিসেব কষে ফলাই ফসল
আর চাষ-বাস করা।
দিনে দিনে কিযে হইলো,
আবহাওয়া কি পালেট গেলো
আশে-পাশের কাণ্ড দেইখ্যা
পরান কাঁপে ডরে ॥

দশের লাঠি একের বোঝা
প্রবাদেতে শুনি,
সবাই মিলে কাজ করার
সময় যে এখুনি।
তাইতো হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে,
কাজ করি আজ সবাই মিলে।
সোনার বাংলা, সোনার ফসলে
উঠুক এবার ভরে ॥

১৪.

ভাষা আন্দোলনের মাস ওহে নানা,
স্মরণ করতে তোমরা কেহ ভুইলোনা।
বাংলা ভাষার মান রাখিতে
দিয়াছে যারা জীবন খানা ॥

বাংলা মোদের জন্মভূমি,
বাংলা মাতৃভাষা,
এই ভাষাতেই কথাবলি আর
চলে কাঁদা-হাঁসা।
বাংলা ভাষার বাঁচাতে মান,
প্রয়োজনে দেয় সে এ প্রাণ।
ইতিহাসে আছে প্রমাণ
একথা সবার জানা ॥

শহিদানের ত্যাগের কথা
যখন করি স্মরণ,
ঠিক থাকিতে পারি নাকো
বেদনাতে ভরে মন।
সর্বস্তরে বাংলাভাষা,
চালু হবে মোদের আশা।
গাফলতি কইর‍্যা কেহ

www.pathagar.com

অমর্যাদা কইরো না।

নানা ঐতিহ্য ভরা
বাংলাদেশের সংস্কৃতি,
রক্ষা করবো আমরা সবাই
করবো নাকো ক্ষতি।
এই কহছি হও সচেতন
নিজ ঐতিহ্য কর সংরক্ষণ।
বাংলা ভাষার সম্মান দেইখ্যা
ভরবে হারগে বুকখানা ॥

১৫.
নানা কেমন কইরা হাঁসি বুঝায় তোরে,
হাঁমার মনের ভিতর যে তোলপাড়া করে।
তাইতো হাঁমার লাগে না ডর
কালবৈশাখীর ঝড়ে ॥

ষড় ঋতুর দেশ হাঁমারঘে
সবাই হাঁমরা জানি,
গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত
শীত, বসন্ত জানি।
রোদ-বৃষ্টি আর বন্যা-খরা,
এক এক সময় এক এক চেহারা।
দিন বদলের ঋতুর খেলায়
আসে যে ভাই ফিরে ॥

নানা ধরনের ফসল আর ফল
ফলে হাঁরঘে দেশে,
বাংলা মাসের দিনক্ষণ বুঝে
রাখি হিসাব কষে।
কৃষির উপর নির্ভর করে,
জীবন মোরা তুলছি গড়ে।
বাংলা নামে না ডাকিলে
পরান কি আর ভরে ॥

বারো মাসে তেরো পাবন
আরো কত অনুষ্ঠান,
কতো রকম সুরে-তালে
গাহি হাঁমরা বাংলা গান।

www.pathagar.com

দিনে দিনে সে সব নানা,
হারিয়ে যাচ্ছে চাইয়া দেখনা।
এখন থেকে নজর না দিলে
কেমনে রাখবো ধরে ॥
১৬.
রাগ করিসনা গুধা তুই কাছে আয় না
মেলা লিয়া যাবো তোকে শুনেক না।
বুদ্ধি ক্যানে খোলে না ॥

মেলা যাইয়া দিবো কিন্যা
হরেক রকম খেলনা,
তোর নানীরঘে ধামা-আড়ি
আরো কিনবো আলনা।
সার্কাস দেইখ্যা দুপুর বেলা,
খাবো কিনা রসগোল্লা।
বাড়ির লাইগ্যা হাঁড়ি ভইর‍্যা
মিষ্টি কিনতে ভুলবো না ॥

ক্ষ্যাতে যে পাইকাছে ধান
গেছিস কি তুই ভুইল্যা,
কাইটা সে ধান মনের সুখে
তোর নানিরঘে সাধ-আবদার,
বাকি এবার রাখবোনা আর।
তাই কহছি মন দিয়া
কাজ-কাম কেইন্যা করিস না ॥

চাষা-ভুষা মানুষ হাঁমরা
কৃষি হাঁরঘে অহংকার,
এই কৃষি কাজ কইর‍্যা
চলাই হাঁরঘে সংসার।
কৃষির উন্নতি না হইলে,
দেশ যে যাইবে রশাতলে।
যার যেখনে সুযোগ আছে
কাজে তোমরা লাগাওনা ॥
১৭.
শুন গুধা আইজ কহছি তোকে রাগ করিস না,
সংসারের কথা তুইতো বুঝিসনা।
আগে হাঁমি ছিলাম না এমন

www.pathagar.com

বুঝ্যাও ক্যান বুঝিসনা ॥

হাঁমার দাদার অনেক ছিল
সম্পত্তি ছিল বেসুমার,
কয়েকটা বিহা কইর‍্যা দাদায়
হইয়া গেছে ছারখার।
অল্প বয়সে বিহ্যা কইর‍্যা,
লোকসংখ্যা তো গেছে বাইড়্যা।
কি ভুগান্তি আইজ ভুগছি সবাই
নিজের চোখে দ্যাখনা ॥

এত বড় সংসার হাঁমার
খাটার বেলায় হাঁমি,
সহেনা আর জানেবে গুধা
নানীরঘে পাগলামি।
পুরাইতে তোর নানিরঘে আবদার,
ধকল যাচ্ছে জানে হাঁমার।
এত কিছু করার পরেও
মন উঠাইতে পারছি না ॥

এতো খাটন খাটি হাঁমি
সাথে তোকে লিয়া,
সময় হইলে দিবো তোর
সুন্দর দেইখ্যা বিহ্যা।
তাই কহছি আর জ্বালাইসন্যা
কাম-কাজ থুইয়া পালিয়া যাইসন্যা
নিজের বিপদ নিজে ডাইক্যা
হাঁমাকে দোষ দিসনা ॥

১৮.

এমন দিনে গুধাবে তুই
বাহিরে যাইস না,
বানের পানি ভাসিয়া লিছে
ঘরখানা।
কি খাবো আর কোনঠে যাবো
ভাইব্যা কিছু পাই না ॥

গরু, ছাগল, মানুষজন
আরও সব পশুপাখি,

www.pathagar.com

শুকনা জাগার অভাব নানা
বলনা কোথায় রাখি।
দিনে দিনে বাড়ছে পানি,
বাড়ছে হাঁরঘে পেরেসানি।
এ অবস্থা চললে পারে
জানতে আর বাঁচবো না ॥

চারিদিকে অসুখ-বিসুখ
ঠাণ্ডা-জ্বর আর ডায়রিয়া,
টাকা-পয়সার অভাবে নানা
সুচিকিৎসা হয় না।
সবাই মিল্যা চেষ্টা করলে,
সব সমস্যা যাইবে চলে।
তাই কহছি সম্ভব হইলে
সহযোগিতা করো না ॥

দুর্যোগ থেইক্যা রেহাই পাইতে
করো চিন্তা-ভাবনা,
স্থায়ী সমাধান না করিলে
মুক্তি হাঁরঘে মিলবে না।

প্রত্যেক বছর বন্যা-খরা,
করছে ক্ষতি যাচ্ছি সারা।
এই অবস্থা চলতে থাকলে
দেশের উন্নয়ন হবে না ॥

১৯.
রাগ কইর‍্যা তোর ছোট নানি ঘর ছাড়ি
চইল্যা গেছে আইজ ওর বাপের বাড়ি।
খাচ্ছি এখন মুড়ি ॥

অভাবেরই সংসার হাঁমার
বুঝতে ওরা চাহেনা
এটা লিব সেইটা লিব
ধরে খালি বায়না।
এদিক টানতে ওদিক উদাম
দিনে দিনে জিনিসের দাম,
সাধ্যে বাহিরে যাচ্ছে চইলা
বলনা কিযে করি ॥

www.pathagar.com

বড় নানিন ভুগছে জ্বরে
মাইজকল নানির ফোড়া,
ছোট নানি লিবে গড়িয়া
মাকড়ি একজোড়া।
হাঁমি মরছি হাঁমার বিষে,
শালিরা সব বুঝবে কিসে।
আলাপা চাইলের ভাত খাইয়া
বাড়াইছে খালি ভুঁড়ি ॥

আগে যদি বুঝতামবে গুধা
এমন সংসার করতাম না,
তোর নানিরঘে জাতাকলে
নাজেহাল আর হইতামনা।
তাই কহছি চিন্তা করে,
সংসার তোমরা তোল গড়ে।
নইলে পস্তাইবা শেষে
হইলে বুড়া-বুড়ি ॥
২০.
নানা দেখ্না তুই ভালো কইরা চোখ মেলে,
ছেলে-মেয়েরা যায় কেজি স্কুলে।
দিনযে এমন যাচ্ছে পাইল্টা
যাচ্ছিস ক্যানে ভুলে ॥

আগের দিনে হাঁমরাবে গুধা
চইড়া গরুর গাড়ি,
বিহা-সাধী, মেলা, পোশালু
যাইতাম কুটুম বাড়ি।
এক্সিডেন্টের ছিল না ভয়,
এত জীবন হতো ক্ষয়।
মানুষ মারার কল বানাইয়া
প্রতিযোগিতা চলে ॥

দিন বদলের চলছে চেষ্টা
সারাটা দেশ জুড়ে
জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিবিড় ছোঁয়া
প্রতি ঘরে ঘরে।
আইজক্যা যেটা কহছি লতুন,
আগামীকাল হয় পুরাতন।

www.pathagar.com

ভুল পথে চললে পারে,
পড়বি চাকার তলে ॥

লতুন ফ্যাশনের পোশাক পড়ে
আজকের ছেলে-মেয়েরা,
চলাফেরার ঢং দেইখা
হয়ে যায় দিশাহারা।
ছেলে-মেয়ে যায় না চেনা,
কহবো কি আর ওহে নানা।
আরও কত কি দেখবো হাঁমরা
সামনে কলিকালে ॥[২৫]

২১.
জানার কথা কহি হামরা ও ভাই দশজনা
তোমরা মন দিয়া সবাই শুনোনা
বুঝে শুনে না চলিলে জানে কেহু বাঁচবেনা।

পানি হলো প্রকৃতির দান
পানির অপর নাম জীবন
সেই পানি দুষিত হলে
হবে যে মরার কারণ–
পানিতে আর্সেনিক থাকিলে
মাহবুব আলম তাইতো বলে
জেনে শুনে এই পানি
ভুলে কেহ পান করোনা।

সুস্থ থাকার কথা কহি ওহে নানা
তোমরা মনো দিয়া সবাই শুনোনা
স্বাস্থ্য বিধি চললে মেনে রোগে ধরতে পারবেনা।

স্বাস্থ হলো অমূল্য ধন
এটা কথার কথা নয়
স্বাস্থ্য সুন্দর না থাকিলে
সদায় যে মরনের ভয়–
মাহবুব আলম বলে গম্ভীরায়
সুন্দর স্যানিটেশন হওয়া চায়
যত্র তত্র মল মুত্র
ত্যাগ কেও কখনো করোনা।

সবজীর বিকল্প চাষ করো ওহে নানা

www.pathagar.com

তাহলে সব্জীর অভাব থাকবেনা
দেশে মাসরুম চাষ করিলে
দুঃখ কষ্ট পাবেনা।

আলু বেগুন পটলের মত
সবাই করো মাসরুম চাষ
অর্থ পাবে পুষ্টি পাবে
সুখে থাকবে বার মাস–
মাহবুব তাইতো বলে সহি
মাসরুম চাষে হও আগ্রহী
মাসরুম চাষে ভাল জমির
কোন দরকার হবেনা।

২২.

হে নানা কথা শুনোজি পরিবার পরিকল্পনার
লোকে লোকারণ্য হয়ে দেশ হলোযে ছারখার।

হাঁরঘে দেশের লোকের জন্য
জমি আছে যে সামান্য–
এক জমিনে তিন ফসল
কাটেনাকো তবু ধকল
মোদের জুটেনাতো অন্ন।
লোক সংখ্যা আর বাড়িলে
কপালে জুটবেনাতো আহার।

যদি থাকে একটি সন্তান
শান্তি রবে অফুরান–
যত্ন নেওয়া সহজ হবে
শিক্ষা দিক্ষাও ভাল হবে
খাদ্যের হবে সংস্থান।
পরিকল্পনা করে চললে
উপায় হবে বাঁচার ॥

২৩.

শিক্ষা মেলায় আস্যা ওহে নানা
মনে আনন্দ যে আর ধরেনা
জানার কথা কহছি হামরা
চাঁপাই গম্ভীরার দলখানা ॥

জান্যা রাখো তোমরা সবাই

www.pathagar.com

বাধ্যতা জন্ম নিবন্ধন
দেশের জন্য সুশাসন আর
পরিকল্পনা প্রয়োজন–
নাগরিকের পরিচিতি প্রমাণ
মিলবে সঠিক বয়সের মান
সচেতন হও সব জনগণ
পিছে পোড়্যা থাকিওনা ॥

শিক্ষা হলো অমুল্য ধন
উন্নয়নের চাবিকাঠি
শিক্ষা ছাড়া দিশাহারা
জাতির সব কিছু মাটি–
নারী শিক্ষায় গুরুত্ব দাও
বাল্য বিবাহ যৌতুক থামাও
সকল কাজে নারী অংশীদার
এ কথাটা ভুলোনা ॥

বাঁচ্যা থাকার জন্য দরকার
সুস্থ নির্মল পরিবেশ
সেই পরিবেশ দূষণ হলে
জীবনের সব কিছু শেষ–
গাছ মোদের পরম বন্ধু
পার করিবে দুঃখের সিন্ধু
বেশি করে গাছ লাগাতে
ভুলেও ভুল করিওনা ॥[২৬]

নানা আজকের সভায় বহু গুণী
আমরা জানি সবাই জ্ঞানী
তাইতো মোরা সবাই চলি
তাদের কথা বার্তাতে না-না-হে

সভার মাঝে বড় নানা
মুখ খানা তার চাঁদ পানা
আলো করে বসে আছে
সাথে আছে আরো নানা না-না-হে

দেখে ভাবি ইন্দ্রপুর
সাথে আছে অনেক সুর

www.pathagar.com

দেখে যেন মনে হয়
আছি ইন্দ্রপুরীতে হে-না-না

আজকের সভায় বলবো কথা
মনের যত আছে ব্যথা
উজার করে বলবো আজা
এটাই মোদের আজকের কাজ না-না-হে
দেশ মোদের কৃষি প্রধান
করতে হবে প্রথম সাধন
তার পরেতে কল-কারখানা
হবে যত্ন নিতে হে-না-না

পোশাক শিল্প অতি দরকার
যত্ন নেন মোদের সরকার
মালিক পক্ষ উদাসীন ভাই
শ্রমিকের প্রতি যত্ন নাই না-না-হে
যোগাযোগের উন্নয়ন
ত্বরা করে করতে হবে
তবেই মোরা দেখতে পাব
উন্নয়ন অর্থনীতিতে হে-না-না

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড
না হলে সব লণ্ডভণ্ড
শিক্ষার বিস্তার শতভাগ
করতে হবে সবার আগ না-না-হে
চিকিৎসা সেবা দিতে হবে
গরীব দুখী বাঁচবে তবে
খাদ্য দ্রব্যের অগ্নিমূল্য
হবে নিয়ন্ত্রণ করতে হে-না-না

মানুষের কথা বললাম মোরা
বিষয়গুলো ভাবিস তোরা
দেশের সার্বিক উন্নতিতে
আছে এতে গাঁথা না-না-রে
দক্ষ শ্রমিক গড়তে হবে
বিদেশেতে যাবে তবে
বিদেশী মুদ্রা আসবে প্রচুর
কাজে লাগবে উন্নতিতে হে-না-না-না

www.pathagar.com

ছোট মুখে বড় কথা
নিও নাকো মনে ব্যথা
গরীবের কথা বাসি হলে
পরিণামে সেটাই ফলে না-না-হে
এবার মোদের বিদায় দাও
যার যার বাড়ি চলে যাও
কথাগুলো মাথায় নিয়ে
ভাবিও নিরিবিলিতে হে-না-না

২৪.

নানা জলদি করে আয় সভাতে
দেখবি কত নানা হারঘের মাঝেতে
গুণী জ্ঞানী সবাই তারা
সভায় হাজির আছেন যারা হে-না-না

আজকের সভার বড় নানা
বসে আছেন আলো করে
আর নানারা পাশে বসে
আলোর জ্যোতি বাড়িয়ে তোলে না-না-হে
মাঝ আকাশে চাঁদ যেমন
বড় নানা ঠিক তেমন
আর নানারা পাশে আছে
ঠিক যেন উজ্জ্বল তারা হে-না-না

হাজির হেথা হয়েছি আজ
বহু ব্যথা নিয়ে
বাবা আমার মন বুঝে না
দেয় নাকো বিয়ে না-না-হে
বাবা বলে অগ্নিমূল্য
খরচ হবে ম্যালা
আমি বলি সেই মোতাবেক
পণ দিবে তারা হে-না-না

দেশেতো আর শান্তি নাই
আগুন জ্বলে দেশে
কি হবে আর কি হবে না
তাই ভাবি বসে না-না-হে
দেশ গেল, দেশ গেল বলে
চেঁচায় নেতা যারা

www.pathagar.com

প্রেম মহব্বত কী জিনিস
জানেনা তো তারা হে-না-না

কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ
পেয়ে বসেছে মোদের
এখান হতে দূরে থেকে
শাসতে হবে তোদের না-না-হে
লম্ফ ঝম্প করছে মানুষ
হারিয়ে সঠিক দিশা
দশ-দেশের খেয়াল নাই
দেশটা হল সারা হে-না-না

ভাবনু হামি নানার বাড়ি
যাব মাকে আনতে
পথে বেরিয়ে দেখি আল্লাহ
পাঁচ ছেলেকে কাঁদতে না-না-হে
মা-বাবা তাদের পুড়ে মরেছে
আসতে মটরগাড়িতে
এসব করছে যারা
দেশের শত্রু তারা হে-না-না

আমরা গায়ক বাদক দল
চাই মোরা শান্তি
মোটা খাব, মোটা পড়ব
থাকবে না অশান্তি না-না-হে
আয় সবাই এক সাথে
পণ করি দেশ গড়তে
ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে
সন্ত্রাসীদের তাড়া হে-না-না

অনেক কথা হলো বলা
এবার মোদের যাবার পালা
দুঃখ-কষ্ট নিও নাকো
কর নাকো পথে তারা না-না-হে
সালাম, সালাম, সালাম সবে
এবার মোরা আসি তবে
বাসায় আছে খুবই তাড়া
এখানেই গান হলো সাড়া হে-না-না।[২৭]

www.pathagar.com

২৫.
বাংলাদেশ মোদের মাতৃভূমি
হাজার ত্যাগের ফল,
কত লোকের রক্ত গেল
তার পরে স্বাধীন হলো
হইলাম মোরা সফল।
এসব কথা বলতে গিয়ে প্রাণে লাগে ব্যথা ॥

বাংলাদেশকে করবে শাসন পশ্চিমা দালাল
নেতা মোদের বলে দিল
মুক্তি যুদ্ধে অংশ নিল
স্বাধীনতা যুদ্ধের ফল।
এতই কষ্টে পেয়েছি মোরা মোদের স্বাধীনতা ॥

যার হাতে যা ছিল তাই নিয়ে যুদ্ধে গেল
কত শীতে সাঁতার দিল
না খেয়ে পড়ে রইল

এত কষ্টে সৃষ্টি হল লাল সবুজ পতাকা ॥

নবাবগঞ্জের বাসিন্দা মোরা
কেন অবহেলা;
শহিদ স্মরণ কেমনে করি
শহিদ মিনার নাই যে তৈরি
বল কত মোদের জ্বালা।
এখন হামরা কি করিব
সবাই যে লটপটে ॥

একুশ দিচ্ছে শিক্ষা মোদের
ভাল করে বাঁচার,
বুদ্ধি নিয়ে আর নয় একুশ
ভাত নিয়ে এসে বসুক
দাও বাঁচার অধিকার।
নইলে মোদের ভয় নাই তাতে ॥
২৬.
বাংলাদেশ মোদের মাতৃভূমি হাজার ত্যাগের ফল
কত লোকের রক্ত গেল
তারপরে স্বাধীন হলো

হইলাম মোরা সফল।
এসব কথা বলতে গিয়ে প্রাণে লাগে ব্যথা ॥

স্বাধীন হয়ে এখন হামরা পেলাম কি বল তোমরা
চলা ফিরার নাইকো সুখ
পেটে থাকছে শুধুই ভোক
এখন মোরা দিশাহারা
আর কতকাল থাকবে বল নাঙ্গা ভুখা থাকা।

কৃষক শ্রমিক মানুষ হামরা
এই না বাংলাদেশে
হামরা জাতির মেরুদণ্ড
খাই যে লাঙল চষে
হামরা মরছি অবশেষে।
সার বিছন আর পানির লাইগা
সব জাগাই খাছি গুতা ॥

স্বাধীন হয়ে এখন হামরা পেলাম কি বল তোমরা
চলা ফিরার নাইকো সুখ
এখন মোরা দিশাহারা।
আর কতকাল চলবে বল নাঙ্গা ভুখা থাকা ॥

নেতার যেন অভাব নাই সবাই নেতা হতে চায়
রহিম বলে আমার দেশ
করিম বলে আমার দেশ
নাগাল নাহি কেহু পায়
সবাই শুধু লাইন খোঁজে করে না দেশের চিন্তা ॥

একে অন্যের দোষ দিয়ে হবে কি আর বল
সবাই মিলে লেগে পড়ি
নিজে নিজের কাজ করি
শান্তির রব সব তুলো।
দেশ বিদেশে ভাল বলতে উঁচু হবে মাথা ॥

তোমরা সবাই সুধীজন আমরা তুচ্ছ অতি
মনের মধ্যে যত ব্যথা
গান দিয়ে দুটি কথা
বলে গেলাম নানা ল!তি।
সবাই মিলে ক্ষমা কর আমাদের বাতুলতা ॥

www.pathagar.com

২৭.

বাংলাদেশ মোদের মাতৃভূমি হাজার ত্যাগের ফল
কত লোকের রক্ত গেল
তারপরে স্বাধীন হলো
হইলাম মোরা সফল।
আজকে সবই মনে পড়ছে
কথা মুক্তিযুদ্ধের ॥

কৃষি হইল দ্যাশের প্রাণ
বাহক যে তার কৃষক
বীজ আছেতো সার নাই
কৃষক করে হাঁইফাঁই
সরকার সামলাচ্ছে ঝোঁক
ঠিকমত বন্টন হলে অভাব মিটবে তাদের ॥

দশ কোটি লোকের জন্য
জমিয়ে সামান্য
এক জমিনে তিন ফসল
কাটে নাকো তবু ধকল
জুটে নাতো মোদের অন্ন।
লোকজন আর বাড়িলে
দেশ হবে হাহাকার ॥

সবার যদি থাকে শুধু একটিমাত্র সন্তান
যত্ন নেওয়া সহজ হবে
শিক্ষা দিক্ষাও ভাল হবে
খাদ্যের হবে সংস্থান।
সেই মতে চললে পারে
ভাল হবে মোদের

যোগাযোগ দরকার মোদের করতে চলাচল
রাস্তাঘাট যা আছে
বাস ট্রেনের অভাব হচ্ছে
কেমনে চলি মোরা বল।
সব নদীতে ব্রিজ হলে
সুখ হবে চলাচলের ॥

শিক্ষা দিক্ষা হলোরে জাতীয় মেরুদণ্ড
স্কুল কলেজ বন্ধ থাকছে

www.pathagar.com

লেখাপড়া গোল্লায় যাচ্ছে
সব হচ্ছে লণ্ডভণ্ড।
আজকের পরীক্ষা কালকে হচ্ছে
গচ্ছা যাচ্ছে বাপের ॥

বাংলাদেশের মধ্যে আছে জেলা নবাবগঞ্জ
আম কাঁঠাল লাক্ষা আছে
কাঁসা পিতল চলে যাচ্ছে
বসেনা আমের চাষে মন।
এইসব দিকে না দেখিলে
চরম ক্ষতি হবে দেশের ॥

২. মেয়েলি গীত

মেয়েলি গীত লোকসংগীতের একটি উলেখযোগ্য ধারা। নারী সমাজের আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না, কামনা-বাসনার বিচিত্র উপাদানের আকর মেয়েলি গীতের ভাব সম্পদ। প্রকৃতপক্ষে মেয়েলি গীত মেয়েদের জীবনবেদ স্বরূপ। চাঁপাইনবাবগঞ্জ মেয়েলি গীতে সমৃদ্ধ। এখানকার পালা পার্বণে অনুষ্ঠানে যেমন– আকিকা, মুসলমানী ও বৈবাহিক উৎসবে মেয়েলি গীতের ভূমিকা মুখ্য। বাঙালি সমাজ নিরীক্ষণে চাঁপাইনবাবগঞ্জের মেয়েলি গীতের গুরুত্ব অপরিসীম।

এবারে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় প্রচলিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কিছু গীত উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

১.

তোরা আয়গে আয়
পুঠির বিহ্যার কথা শুনা যায়
আইব্যারী মস্ত ব্যাপারী
পান চাবায় আর ছুপ ছিটায়
পুঠির ... যায়
তোরা ... আয়।
পাঁচ কাপড়ে লেনা-দেনা
পুঠির ভাগে রূপা গহনা
সিরো গাঁয়ের ঢ্যাংগা ছোঁড়া
নন্দ হবে তাই
পুঠির ... যায়
তোরা ... আয়।
বাখুদা বল্‌দের সোয়ারী গাড়ি
মা শাশুড়ি বহু ঝিয়ারি
আর গালাই শ্বশুর জাঁওই

ব্যাটা ভাইর‍্যা ভাই
পুঠির... যায়
তোরা... আয়।[২৮]
২.
আইব্যারী হে আইব্যারী
ম্যালাই তোমার কানভারী
পুঠির গায়ের গহনা কি কহো
বহু বায়না হয়্যা গ্যালো
তাও ক্যানে মুখ না খুলো
গাড়ুয়া মুখে ট্যারা চোখে চাহো
পুঠির... কহো।
পাঁয়ে লিবো মল কোমরে বিছ্যা
কহো ছ্যাঁচ্চা না কহো মিছ্যা
আর লিবো কামিনী সেন্দুর তাও
পুঠির... কহো।
মাইনের কাপড় পুরা পাঁচ খান
নানী-দাদীর ধলো দু'খান
শ্বশুর শাশুড়ির রঙ্গিল গালা দিও]
পুঠির... কহো।
৩.
বিহ্যার দিন তো আইলো গো দাদী
বহ্যার দিন তো আইলো
ধলো ছুঁড়ির কাইল্যা দামানদ
এই ভিট্যাতে আইলো
মুরগা ডাকে মুরগি ডাকে
আগন্যাতে গলিতে
কাইল্যা কুলি কুহু কুহু
আম গাছের ডালেতে
বাইরষ্যাতে ঝম ঝইম্যা বৃষ্টি
দানা পানির খ্যাতে
গা ধুইয়া লিস ওরে পুঠি
ছাইনচ্যার পানিতে
গইঢ়্যা গাবাড়ে ভাদইর‍্যা পানি
সান্ধ পঁহাতে
লক কইর‍্যা গা ধুবি কুনু ছুতনাতে
জাড়ের পানি কুসুম কুসুম পদদা লোদ্দীতে
কলসী কাঁকইলে যাইও
পুষের শ্যাষ রাতে।[২৯]

৪.
তোরা আয় সভাই
পুঠির বিহ্যার হল্যোইদ মাখাই।
কাঁচা হল্যোইদ সেন সেন করে
হল্যোইদ গতর উনহাইছেরে
বাটা হল্যোইদ গইল্যা পড়ে সোনার গায়
পুঠির বিহ্যার হল্যোইদ মাখাই।
তোরা আয় সভাই
পুঠির বিহ্যার হল্যোইদ মাখাই।
ডালিম গাছে আগুন লাইগ্যাছে
কাইল্যা ভুমরা ভোঁ ভোঁ করছে
টুকটুইক্যা লাল ঝইর‍্যা পড়ে পুঠির গায়।
পুঠির বিহার হল্যোইদ মাখাই
শিরো হোইন্যা আইলো বান
ভাঠির গাঙ্গে এক সমান।
লোতুন পানতে হামার পুঠি সাতরাইয়্যা যায়
পুঠির বিহ্যার হল্যোইদ মাখাই।
তোরা আয় সভাই
পুঠির বিহ্যার হল্যেইদ আলো সোনা
বাস রে চ্যারাগ লাগে না
সোনার ঝলক গায়ে জ্বলে দেখতে পাই।
পুঠির বিহ্যার হল্যোইদ মাখাই
তোরা আয় সবাই।
৫.
খাও থুবড়া খাও ওরে সোনা
জান ভইর‍্যা খাও হে আরোশ
পরাণ ভইর‍্যা খাও।
থুবড়া খাইতে হইল দিরোং
বাপের হাতে খাওরে সোনা
ভাইয়ের হাতে খাও।
জান ভইর‍্যা খাওরে থুবড়া
পরান ভইর‍্যা খাও।
থুবড়া খাইতে কাকার বাড়ি
মামার বাড়ি যাওরে সোনা
বুবুর বাড়ি যাও।
থুবড়া খাইতে পাড়া পড়শি
কোলে কইর‍্যা যাওরে সোনা
তুইল্যা লিয়্যা যাও

www.pathagar.com

জান ভইর‍্যা খাও
পরান ভইর‍্যা খাও।
থুবড়া লিয়্যা আইলোরে সোনা
ব্যাইড়া মলের গাঁওরে সোনা
আপনি মলের গাঁও
জান ভইর‍্যা খাওরে থুবড়া
পরান ভইর‍্যা খাও।
থুবড়া খাইতে যাওরে সোনা
মোলের বাড়ি যাওরে যাদু
মোলার হাতে খাও
জান ভইর‍্যা খাওরে থুবড়া
পরান ভইর‍্যা খাও।[৩০]

৬.
দ্যাও বিদায় দ্যাও ও বাপুজি
জরমের মতোন দ্যাও বিদায়
খাইদ পিন্ধনে বড় করল্যা
জরম ভিঠ্যার আগন্যায়।
শ্বশুর বাড়ি যাও রে সোনা
জাঁওয়ের বাড়ি যাওরে যাও
জরমের সাঁথী হইল বাপে
কর্মের গইনে স্বামী পাও।
দ্যাও বিদ্যায় দ্যাও ওমা ওজি
জরমের মতো বিদায় দ্যাও
দশ মাস দশ দিন প্যাটে থুইল্যা
দুধের ধার কি শুধা যায়।
বিদায় দিতে জান ফাইট্যা যায়
তাও বিদায় দিতে হয়
সুখের সংসার গড়িও সোনারে
তাতি দুধের ধার শোধ হয়।
দ্যাও বিদায় দ্যাও দাদোজি
জরমের মতো দ্যাও বিদায়
কোলে পিঠে মানুষ হৈনু
মাফ কইর‍্যা দ্যাও ঘাইট অন্যায়।
যাওরে সোনা যাওরে পুঠি
আপন সোনা যাওরে যাও
চোখের পানতে বিদায় দিতে
দেল কলজায় মস্ত ঘাও।
দ্যাও বিদ্যায় দ্যাও দাদীজি

www.pathagar.com

জরমের মতো দ্যাও বিদায়
হাইগ্যা মুইত্যা মানুষ হৈনু
তোমার কাপড়ের আঁচলাই।
যারে পুঠি যারে জুটি
সোয়ামীর ঘর কর আলো
শ্যাষের দিনট্যাই আসিও সোনারে
হামার যেদিন সব কালো।
দ্যাও বিদায় দ্যাও নানা- নানি
জরমের মতোন দ্যাও বিদায়
নানির বাড়ি মধুর হাঁড়ি
জান ভোর ভোরতোক মিঠ্যা কথায়।
ওরে হামার সোনার চানরে
বুক ফাটেরে জানের জান
ক্যামুন কইর‍্যা দিব বিদায়
ঘরে থুইব্যার লওরে ধন।
দ্যাও বিদায় দ্যাও পাড়া পড়শি
দ্যাও বিদায় ও মোড়লজী
মাফ করিও সভাই তোমরা
ঘাইট যুতি কইর‍্যা থাকি।
পোঁথল্যা খেলত্যা হাঁরঘে সোঁতে
জিন্দ্যা পোঁথলা খেলতে যাও
মোড়ল তোমার উকিল বাপু
মোলের হইনে দুয়া ল্যাও।
জমিন কান্দে আসমান কান্দে
কান্দে বাপে মায়ে
বাড়ি ভরা কুটুম কান্দে পুঠির এই বিদ্যায়ে।
৭.
কুলক্ষণা কহুরে
সাত সকাল ব্যালারে
ক্যামুন কর‍্যা কলস ভাঙ্গিলিরে।
শাহান বান্ধা ঘাটেরে
মাটির না কলসরে
আছাড় খাইয়া কলস ভাঙ্গিলেরে।
নন্দে না কলসরে
নন্দে না পুছেরে
হাড় পাখ্খি ভারীরে
ক্যামুন কর‍্যা কসল ভাঙ্গিলিরে।
কাজ কামের হাতরে

মাটিরই না কলসরে
তাড়াহুড়ায় কলস ভাঙ্গিলিরে।[৩১]
৮.
হাটে যাইছি বাজারে যাইছি রাণী
তোমার লেগ্যা কি আনবো ঘরে
হাটে যাইছো বাজার যাইছো সদাগর
হামার লাইগ্যা পাটের শাড়ি।
শাড়ি যদি আইনব্যা সদাগর
শাশুড়ি ননদী হইবে জ্বালা
হামার মা বহিনে পুছিলে রাণী
কহিব্যা তোমার ভাইয়ের দ্যাওয়া।
৯.
কার ঘরে ক্যানে আইল্যা ভাবের মইল্যান
কার লাগ্যা রাখা তই পাগলি দেবে মইল্যান
বিহ্যার সাজন সাজি;

যেখানে ছাইল্যা আরশা গোসল করে,
সেখানে ভাবের মইল্যান পানি কাইড়া রাখে,
আরও পানি দেরে মইল্যান–
বিহ্যার সাজন সাজে ॥

সেখানে ছাইল্যা গোসল করে
সেখানে মইল্যান সাবান কাড়ে
আরো সাবান দেরে মইল্যান
গোসল করার লাইগ্যা

যেখানে ছাইল্যা গোসল করে
সেখানে গামছা কাইড়া রাখে
আরও গামছা দেরে মইল্যান
বিহার সাজনা সাজে–
আরো পানি দেরে মইল্যান
গোসল করার লাগ্যা,
আরো সাবান দেওরে মইল্যান
বিহ্যার সাজনের লাইগ্যা।
১০.
মেয়ের নালিশ
বালু নাচরে বাপজান কারো কবিতর
পড়ে না, উড়িয়া বলে বাপজান ॥ আমারও

www.pathagar.com

পিনজিরার মাঝে– নাইরে আমার ই
পিনজিরার মাঝে।
প্রশ্ন:
কিসের ও লাইগ্যা বাপজান ॥
আমাকে পরের ঘরেতে দিল্যা
বাপজান, আমাকে পরের ঘরে?
পাঠাইছো ক্যানে বাপজান পরের ঘরেতে।
উত্তর:
(বাপ): কাপড়ের লাইগ্যা বেটি ॥
তোমাকে পরের ঘরেতে পাঠাইনু
বেটি, তোমাকে পরের ঘরে
সাবানের লাইগ্যা বেটি ॥ তোমাকে
পরের ঘরে পাঠাইনু বেটি, পরের ঘরে,
উড়িয়া চলে ভাইজান ॥ কবিতর
আমারও পিনজিরাতে নাইরে,
প্রশ্ন:
কিসেরও নাইগ্যা ভাইজান ॥
আমার পরের ঘরেতে দিল্যা
ভাইজান, আমাকে পরের ঘরেতে
উত্তর:
(ভাই): সুখেরই লাইগ্যা বোহিন ॥
তোমাকে দিনু পরের ঘরে
ও বহিন দিনু পরের ঘরেতে।

১১.

ছেলের বিয়ে
সাজেনা সাজে নওশা সাজেরে
দূরেরও বিহ্যাতে
কানছে না কানছে মাজান কানদিছে
দুলার আগা ঘেরারে ॥
দিয়া যারে ব্যাটা দিয়্যা যা
দুধেরই ঐ হিসাব রে–
আইন্যা দিচ্ছি মাজান আইন্যা দিছি
হাঁইস্যালের রাঁধুনীকে
সাজে না সাজে নওশা সাজেরে
দূরেরও বিহ্যাতে রে
কানছে না কানছে বহিন কানদিছে
দোলার আগা ঘেরারে,

www.pathagar.com

দিয়্যা যারে ভাইজান দিয়্যা যা
কোলের ঐ হিসাব ওরে–
আইন্যা দিছি বহিন আইন্যা দিছি
সাথের ও সংগ্যানী রে,
সাজে না সাজে নওশা সাজিছে
বিহ্যা করব্যার লাগ্যারে।
১২.
মেয়ের বিদায়
ত্যালেপানিতে কইরল্যাম মানুষ
আমারে না লিল্যারে–আরেলো
মোর লিল্যা বত্তিরে
কাইনদা গেলো লিলার বাবা
লিল্যা জবাব দেওরে
লালো মোর লিলাবতিরে।
কুনঠে গ্যালো লিলার চাচা
লিলাকে সঁইপ্যা দেওরে
ও লো মোর লিলা বতিরে
কিবা কইহ্যা সপিবো আমি
বুকটা ফাইটা যাইছে রে
ও লো মোর লিলা বতিরে।
কুনঠে গেলো লিলার মাজান
লিলাকে তুইল্যা দেওরে
আলো মোর লিলা বালিরে।
কুনঠে গেলো লিলার ভাইজান
লিলাকে বিদায় দাওরে
লালো মোর লিলা বতিরে।[৩২]
১৩.
হলোদ বাটিয়া বাটিতে রাখিয়া ॥
ডাক দিলোরে হামার
মিঞা পাড়া পড়শিকে ॥
কাঁচা হলোদ যেন যেন করে
আখিয়া দাও কন্যার
যোনার গতরে রে ॥
জড়িনার বিহ্যার হলোদ মাখাই
টুকটইকা লাল ঝইড়া
পড়ে জড়িনার গায়েরে ॥
চল সখিচল মেহেন্দী পাড়তে

www.pathagar.com

জড়িনা যাইবে শশুরের
কড়ি মেহেন্দী হাতে দিয়ারে ॥
মিহি কইরা বাটো মেহেন্দী ॥
লয়া পাটা খান্টাতে
গোলাপ জল মিশিয়ারে ॥
মেহেন্দী বাটিয়া পাতাতে রাখিয়া ॥
হাতে দিয়া দাও
জড়িন্যার বড় ভানীতেরে ॥
১৪.
খাও খুবরা ওরে সোনা
পড়ান ভইরা খাও
পারার হাতে খাওরে সোনা
মায়ের হাতে খাও
জান ভইরা খাওরে খুবরা
পরান ভইরা খাও
খুবরা খাইতে কাকার বাড়ী
মামার বাড়ি যাও
বুবুর বাড়ি যাওরে সোনা
পড়শির বাড়ি যাও
খুবরা খাইতে যাও তুমি
পড়ান ভইরা খাওরে
মড়লের বাড়ির আইলোর খুবরা
খুবরা তুমি খাও
মড়ল তোমার কাপের মতন
তাহার হাতে খাও
জান ভইরা খাওরে খুবরা
পড়ান ভইরা খাও।
১৫.
আহারে বাবার বাগানের পাখিরে ॥
হলোদ মেহেন্দী মাখিয়া পাখিরে
যাইবে শশুরের বাড়িরে
বাপো মায়ো ছাইড়া পাখিরে
যাইবে স্বোমীর ঘরেরে
দাদী কান্দে নানী কান্দে
কান্দে পাড়া পড়শিরে
জমিন কান্দে আসমান কান্দে
কান্দে বাপে মায়েরে
দাও বিদায় দাও কুটুমেরা

www.pathagar.com

জন্মের মত বিদায়রে
মাফো করিও তোমরা সবাই
ভুলযদি কইরা থাকিরে
দোয়া কইরো সোয়ামীর ঘর
আলো কইরা থাকেরে।[৩৩]

মাতাল স্বামীর হাতে স্ত্রী প্রহৃত হওয়ার ঘটনা আমাদের সমাজে অতি পরিচিত ঘটনা। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে চাঁপাইনবাবগঞ্জে বহু গীত রচিত হয়েছে। নিম্নে এ ধরনের একটি গীত উদ্বৃত করা হলো :

উপরে কদমের গাছ ঝিক ঝিক করে
তারি তলে বাপ মায়ের বাড়ি নারে
মা বাপ এ বিহ্যা দিলে কি কারণ
বিহ্যা দিলে গাঞ্জাখোরের সাথেনারে।
সারারাত গাঞ্জা খায় আগুন টুকতে পরান যায়
সোনার দেহ কালা হয়্যা গ্যালো নারে।

স্বামীর নির্যাতন সহ্য করতে পারলেও সতীনের জ্বালা যে কোনো নারীর পক্ষে অসহনীয়। সুখী দাম্পত্য জীবনে সতীনের আগমনে নারীর জীবনে যে কি মর্মান্তিক বেদনার উদ্রেক করে তা নিম্নের গীতে সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে।

সতীন সতীন সতীন বিছাতুর কাটা সওদাগররে
সদাগর সতীন বসাইল্যা সওদাগররে
একো পিন্ধনের কাপড় সওদাগর দুই পিন্ধনে করাইল্যা
সওদাগর সতীন বসাইলা সওদাগররে।
সতীন বসাইল্যা ভালো কইরল্যা দিল্যা জায়ের মুখে হাসিরে
সওদাগর সতীন বসাইল্যা সওদাগররে
সতীন জায়ের হাসিতে সওদাগর অঙ্গার হইল দেহরে
সওদাগর সতীন বসাইল্যা সওদাগররে।[৩৪]

যৌতুক বাঙালি রমণীদের ভাগ্যবিড়ম্বনার অন্যতম কারণ। যৌতুকের কারণে শুধু বধূকে নির্যাতনই সহ্য করতে হয় না, জীবনও দিতে হয়। সামাজিক এই কুপ্রথা নিয়ে বহু মেয়েলি গীত চাঁপাইনবাবগঞ্জের প্রচলিত রয়েছে। দৃষ্টান্ত :

ছয় মাস হৈলে বেটি হামি
জাঁওই এর মুখ দেখলাম না
তোমার জাঁওই রাগ কর্য়াছে বাপু
তোমার বাড়িতে আসবে না।
তোমার জাঁওই রাগ কইর্য়াছে বাপু
ঘড়ি বিহনে আসবে না।
তোমার জাঁওই রাগ কইর্য়াছে বাপু
সাইকেল ব্যাগর আসবে না।
কাইল বিহানে দিল্যাম চিঠিরে বেটি

www.pathagar.com

জাঁওই ক্যানে তাও আইলো না
হাতে ধরি পাঁয়ে পড়ি বেটি
এব্যার ঘড়ি দিতে পারুম না।
হাতে ধরি পাঁয়ে পড়ি বেটি
এব্যার ঘড়ি দিতে পারুম না।
আসমানে নাইখো পানিরে বেটি
জমিতে ফসল বুঝিল ফলবে না।[৩৫]

দাম্পত্য গীত

১.
কাইয়্যা কালো কালি কালো কালো জি স্বামী তোমার মাথার বাবারি আরে কে
পাহাড় উঁচা পর্বত উঁচা উঁচাজি স্বামী তোমার মাথার ছাতি আরে কে
দুধ ধলো দই ধলো ধলোজি স্বামী তোমার সর্বশরীল আরে কে
গুড় মিঠ্যা চিনি মিঠ্যা মিঠ্যাজি স্বামী তোমার মুখের জবান আরে কে
নিম তিত্যা লিসিন্দ্যা তিত্যা তিত্যাজি স্বামী তোমার বহিনের জবান আরে কে
নেমু খাটা ত্যাঁতৈল খাটা খাটাজি স্বামী তোমার ভানির জবান আরে কে
কাইয়া কালো কালি কালো কালোজি স্বামী তোমার বুকের সিন্যা আরে কে।[৩৬]

২.
হামার আব্বার গলিতে এ্যাকি না'রকেল গাছি
ধর না'রকেল ডালা কমলা নাচ করো রে
হামার আব্বা গিয়্যাছে দূরেরই বণিজে
সেখানে যা'য়্যা আব্বা বন্দি হয়েছে কমলা নাচ করো রে
হামার সিথ্যাতে লক্ষ টাকার সেঁন্দুর আম্মার সিঁথ্যাতে সে'ন্যা সিন্দুর দিলাম
আব্বার নামে লেন সেঁন্দুর দেন আব্বাকে ছা'ড়্যা কমলা নাচ করো রে[৩৭]

৩.
ওপারে আছে কদমের গাছ চিলিমিলি করে পাতা
তাহার তলে বাপো-মারো বাড়ি আরে কে
বাপো হামার লিদারুন মাও হামার কি কারণ
বিহ্যা দিলে গাঞ্জাখোরের সাথে আরে কে
গাঞ্জাখোরে গাঞ্জা খায় আগুন ঢু'তে পরান যাই
সোনার গতর কয়লা হ'য়্যা গ্যাল আরে কে।[৩৮]

৪.
কান্টায় আছে উগ্‌নি বাগুন, স্বামী হামার জীয়ের আগুন
ওহে ননদি রে তোমার ভাই ক্যানে বিদ্যাশ করিছে
স্বামী যা'বে রাজশাহী হামার লা'গ্যা আনবেন শাড়ি
ওহে ননদি রে তোমার ভাই ক্যানে বিদ্যাশ করিছে
হামার স্বামী যা'বে ঢাকা হামার লা'গ্যা আনবেন টাকা
ওহে ননদি রে তোমার ভাই ক্যানে বিদ্যাশ করিছে

www.pathagar.com

হামার স্বামী যা'বে উড়ি হামার লা'গ্যা আনবেন চুরি
ওহে ননদি রে তোমার ভাই ক্যানে বিদ্যাশ করিছে।[৩৯]

ময়েলি গীতে বিধৃত নারী জীবনের আনন্দ-বেদনার চিত্র শুধু চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নয়। এ গীত মূলত বাঙালি সমাজেরই শ্বাশত পরিচয়।[৪০]

৩. জারিগান

চাঁপাইনবাবগঞ্জের লোকনাট্যের এক সম্পদ জারিগান। জারি ফারসি শব্দ। অর্থ কান্না বা শোক। প্রধানত কারবালার যুদ্ধের বিষাদময় ঘটনা জারিগানের বর্ণনা করা হয়। তবে কারবালার প্রসঙ্গ ছাড়াও সামাজিক নানা বিষয়ে জারিগান রচিত হয়ে থাকে। সাধারণত লোককবিরা এ জাতীয় গান রচনা করে থাকেন। ইসলাম ধর্মের কিছু বীরত্বগাথা, করুণগাথা ও প্রেমগাথার কাহিনি নিয়ে লোককবিরা তাদের মনের মাধুরী মিশিয়ে জারিগান রচনা করেন। সাধারণত জাতি, ব্যক্তি বা গোষ্ঠির শোকাচ্ছন্ন বা বীরত্বপূর্ণ ঘটনাকে বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচন করা হয়। যেমন– আইয়ুব নবী, বিবি রহিমা মক্কার জঙ্গনামা, শহিদ কারবালা, হাজেরার বনবাস সখিনার বিয়ে, জহরনামা, কুলসুমের মেজবানী হানিফার লড়াই ইত্যাদি। চাঁপাইনবাবগঞ্জের জারিগানের বিশেষ প্রচলন রয়েছে। জানা যায়, এই অঞ্চলে হোসেন সরকার, আবুল কাশেম অনু, খাইরুল আলম, মোসফিকুর রহমান, শাহজাহান প্রামাণিক প্রমুখ জারিগানের আসর বসিয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। কারবালার যুদ্ধ, আরবি-ফারসি সাহিত্যের বীরত্বগাথা এবং মধ্যযুগে ইসলামের উদার মানবতাবাদ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের সমন্বয়ী মনোভাব এ অঞ্চলে জারিগানকে জনপ্রিয় করেছে।

পরিবেশনা : সাধারণত নাচসহযোগে জারিগান পরিবেশিত হয়। জারিগানের সুর নির্দিষ্ট। কিন্তু বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট নয়। জারিগানের মঞ্চ থাকে। আর স্টেজের চারপাশে থাকে দর্শক-শ্রোতা। মঞ্চ কখনো উঁচু কখনো সমতল জায়গায়। নির্দিষ্ট এরিয়া করে মঞ্চ তৈরি করা হয়। জারিগানে একজন মূল গায়ক বা বয়াতি থাকে। শুরুতে বন্দনাগীত পরিবেশিত হয়। তারপর কাহিনি পরিবেশন করেন। সঙ্গে থাকে সহযোগী গায়ক ও যন্ত্রশিল্পীরা নূপুর পরে হাতে গামছা বা রুমাল নিয়ে বৃত্তাকার পা ফেলেন আর দোহারিরা ধুয়া তোলে। জারিগানে পোশাকের প্রয়োজন হয়। আর বাদ্যযন্ত্র হিসেবে থাকে হারমোনিয়াম, ঢোল, তবলা, চাক্কি, বাঁশি ইত্যাদি। সাধারণত গ্রামে-গঞ্জে রাতের বেলাতেই জারিগান হয়। নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সবাই জারিগানের আসরে উপস্থিত থাকে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের লোকনাট্যের এ ধারা এখন বিলুপ্তির পথে। জারিগানের নমুনা :

১.

হায় হোসেন,
পুরেতে বন্দনা করি পুবের ভানুশ্বর,
একদিকে উদয়গো ভানু চৌদিকে পশার।
দক্ষিণে বন্দনা করি বঙ্গোপসাগর,

www.pathagar.com

যেখানে বাইত ডিঙ্গা চান্দ সদাগর।
উত্তরে বন্দনা করি হিমালয় পর্বত,
যেখানে রাইখ্যাছে আলী সালামের পাথর।
পশ্চিমে বন্দনা করি মক্কা হেন স্থান,
উদ্দেশ্যে জানায় গো ছেলাম মমিন মুসলমান।
ইহার পশ্চিমের কথা কহনও না যায়,
বাড়াইয়া রান্ধিল ভাত বরাহ্মণে যায়।
হায় হোসেন,
চাইর কোনা পৃথিবী বানালাম মন করিয়া স্থির,
সুন্দরবন মোকামে বানলাম গাজি জিন্দা পির।
গাজি সাবের বাপের নাম গো শাহা সেকান্দর,
পাথর দিয়া বান্ধাইছেন তিনি বিরাট নগর।
হাত পাতিয়া মারলে পাথর বুক পাতিয়া লয়,
ছাটনি ভরে পড়লে পাথর জুদা জুদা হয়।
আল্লা আল্লা বল ভাইরে নবী কর সার,
নবীর কলেমা পড়ি হইয়া যাইবা পার।[৪১]

২.

প্রথমে বন্দনা করি আল্লাহ, রসুল নাম
তার পরেতে একে একে জানাই গো সালাম
সালাম জানাই পিতা-মাতা আরো শিক্ষাগুরু
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের কথা নিয়া করলাম জারি শুরুরে
শোনেন শোনেন ভাই বন্ধুরে আরো শোনেন দিয়া মন
বঙ্গবন্ধুর কথা আমি করিব বর্ণনারে।
গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় উনিশো বিশ সালে
সতেরই মার্চ এই জাতির পিতা জন্মগ্রহণ করে
পিতা ছিল লুৎফর রহমান মাতা সায়রা খাতুন
চার কোন বোন আর দুই ভাইয়ের মধ্যে তিনি তৃতীয় সন্তানরে।
ভাষার জন্য আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর আগে
স্বাধিকার আদায়ে মানুষ তারি কথায় জাগে
একাত্তরের সাতই মার্চে এই নেতার ঘোষণা
বাংলার মানুষ পাইলো তাদের স্বাধীন ঠিকানারে।
ফাঁসির দড়ি দেখায় যখন মুজিব কারাগারে
বঙ্গবন্ধুর কথায় সবাই মুক্তিযুদ্ধ করে
অন্তরে মুজিবের ছবি মুক্তিযোদ্ধা সব লড়ে
ত্রিশ লক্ষ শহিদ হয়ে বাংলা স্বাধীন কররেরে।
বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলা হাজার ত্যাগের ফল
রক্ত দিয়া জীবন দিয়া হইয়াছি সফল

www.pathagar.com

কারো দানে পাওয়া নয় দেশের স্বাধীনতা
জীবন দিয়া করবো রক্ষা এই মোদের বারতা রে।
হাজার শিশুর মাঝে মুজিব যেত যখন দেখা
কোথায় মোদের জাতির পিতা দেখি মুজিব খোকা
মুজিব শিশু শিশুই মুজিব আলাদা আর নয়
বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবস শিশু দিবস তাইরে।
পঁচাত্তরের পনেরই আগস্ট কালো সে রাতে ভাই
মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শহিদ হয়ে যায়
মৃত্যুর চেয়ে জীবন অনেক বড় সবাই জানি
কখনো মৃত্যু বড় হয় জীবনের শেষ দানে রে।
গানে গানে মনের টানে হইলো মেলা কথা
ভুল ভ্রান্তি হলে কেহ নিবেন না কেউ ব্যথা
দোয়া করি গড়ে উঠুক সুখি বাংলাদেশ
সবাইকে সালাম দিয়া জারি করলাম শেষ রে।

৩.

আরে প্রথমে বন্দনা করি আল্লাহ নবির নাম
একে একে মুসলমানদের জানায়গো সালাম আর হিন্দুদের প্রণাম
মহানন্দার শিল্পী মোরা বলবো কিছু কথা
এসব কথায় রয়েছে যে শিশুদেরই সব কথা রে
দ্যাখো দ্যাখো মেলা দ্যাখোরে ও ভাইরে আনন্দ মেলা দেখরে।
তিন দিনের আনন্দ মেলার এই আয়োজন
শিশুদের জন্য বিনোদনের ছিল প্রয়োজন
শিক্ষা জ্ঞানের অনেক কিছু আছে এখানে
কত খুশি দেখ চেয়ে শিশুদেরই পানে রে।
আনন্দ মেলাতে দেখ কত ফুলের হাসি
প্রতি বছর সুবাস বিলায় জানে জেলাবাসি
শিশুদের এই হাসি যেন থাকে চিরকাল
এরাই মোদের গৌরবের ধন এরাই তরীর পাল রে।
আনন্দ মেলাতে শিশু সবাই সরল অতি
ফুল বাগানে উড়ছে যেন রঙ্গিন প্রজাপতি
শিশুর দিকে নজর দিও করিও না হেলা
দেশ গড়তে যেয়ে সবাই পার করিও বেলা রে।
শিশুদেরই মতামতের পূর্ণ কদর দাও
আনন্দময় করতে তাদের খেলা করতে দাও
বুদ্ধির বিকাশ হতে মনের কথা জেনে নিও
ভালো থাকার জন্য তাদের আঘাত না দিও রে।
শিক্ষিত শিশু শিক্ষিত জাতি কথা মিথ্যা নয়

www.pathagar.com

অধিকার সচেতন হইতে শিক্ষা সবার চাই
জনগণ সচেতন হলে হবে উন্নয়ন
ভবিষ্যতে জাতি গড়তে এগিয়ে সবাই আসল রে।
গানে গানে মনের টানে হইলো মেলা কথা
ভুলভ্রান্তি হলে কেহ নিও নাকো ব্যথা
দোয়া করি গড়ে উঠুক সুখি বাংলাদেশ
সবাইকে সালাম দিয়া জারি করলাম শেষ রে।

৪.

প্রথমে বন্দনা করি আল্লাহ রসুল নাম
একে একে সুধীনদের জানাইগো সালাম
সালাম জানাই পিতা-মাতা আরো শিক্ষা
সবাইকে শ্রদ্ধা জানিয়ে জারি করলাম শুরুরে
শোনেন শোনেন ভাই-বন্ধুরে আরো শোনের দিয়া মন
স্বাস্থ্য নিয়া কিছু কথা করবো পরিবেশন রে।
চৌদ্দ কোটি জনতার এই বাংলাদেশ
ঘরে ঘরে সীমাহীন দুঃখের নাইতো শেষ
সুখী জীবন গড়তে সবাই লেখাপড়া করো
ঘরে ঘরে জ্বালিয়ে দাও শিক্ষা জ্ঞানের আলো রে।
দিনে দিনে বাড়ছে মানুষ বাড়ছে নাতো জমি
বিশ বছর পর কোথায় থাকবে ভেবে বলো তুমি
আয়ের সাথে সংগতিটা রাখতে যদি চাও
পরিবার পরিকল্পনার পথটি তোমরা বেছে নাও রে।
বাংলাদেশের মা-বোনেরা বড়ই ভাগ্যহীনা
রুগ্ন শিশুর জন্ম দেয় বাঁচবে বল কি না
দারিদ্রতার শিকল পরে হয় যে দুর্গতি
এই শিকল ছেঁড়ার সময় হলো হলো সুমতি রে।
সুস্থ সবল থাকতে হলে স্বাস্থ রাখো ভালো
স্বাস্থ্য নীতির কথাগুলো মেনে তোমরা চলো
অন্ধত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে হলে
খাও শাক-শবজি আর পাকা হলুদ ফলে রে।
ডাইরিয়া হলে দেহে পানিশূন্য হয়
তরল খাবার আর স্যালাইন তখন খেতে হয়
পোলিও, হাম, যক্ষ্মা রোগ দেখা দেওয়ার আগে
প্রতিরোধ টিকা দিও সবাই দেরি নাহি করো রে।
আয়োডিনের অভাব হলে থাকে সদায় ভয়
মৃত কিংবা বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়
হাবাগোবা বুদ্ধি কম শিশু দেখ যদি

www.pathagar.com

আয়োডিনযুক্ত লবণ খাইনি জানিও আজ অবধিরে।
এইডস এমন মরণ ব্যাধি চিকিৎসা যার নাই
শরীরে ঢোকার আগে প্রতিরোধটা চাই
সহজ সরল সঠিক সৎপথ রাখবো ধরে মোরা
ঘাতক ব্যাধি এইডস এর কাছে দেব নাকো ধরা রে।
সিভিল সার্জন অফিস থেকে এসেছিলাম হেথায়
স্বাস্থ্য শিক্ষার করলাম বর্ণনা সুরে সুরে কথা
ভুলভ্রান্তি হলে জানি করে দিবেন ক্ষমা
মোদের কথা মনের মধ্যে রাখবেন কিন্তু জমা রে।

৫.
প্রথমে বন্দনা করি আল্লাহ্ নবীর নাম
একে একে সুধীজনদের জানাই গো সালাম আর হিন্দুদের প্রণাম
মহানন্দার শিল্পী মোরা বলবো কিছু কথা
এসব কথায় রয়েছে যে এই জেলারই কথা রে
এই তো আমার সোনার বাংলাদেশ ও ভাইরে
সেই আমার জন্মভূমির দেশ আরে বাংলা আমার মা
আরে বাংলা আমার মায়ের মত নাই তুলনা তার রে
এইতো আমার চাঁপাই জেলারে সেইতো আমার সোনার জেলা রে।
সারি সারি আমাদের বাগান আর গম্ভীরা গান
আলকাপ-লাক্ষা-রেশম শিল্প এই জেলারই প্রাণ
মহানন্দা নদীর তীরে ছোট এই শহর
অতীত ইতিহাসের কত কেটেছে প্রহর রে।
চাঁপাইয়েরই আমের কথা জানে সর্বজনে
হরেক রকম আমের চাষে অর্থ নিয়ে আসে
আম হল... শিল্প রক্ষা প্রয়োজন
বিদেশি টাকা আসবে দেশে করলে উৎপাদন রে।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা মোদের প্রিয় জন্মভূমি
এ মাটিতে জন্ম নিয়ে ধন্য হলাম আমি
আম মেলা প্রতি বছর করা দরকার
এমন আমের সমারোহ নেইতো কোথাও আররে।
আলকাপ গানের মরণ দশায় ভীষণ কষ্ট পাই
এসব গানের মত মধু আর কিছুতেই নাই
হারিয়ে গেল পুঁথি পাট যাত্রা ঘাটু গান
লোক নাট্য লোক নৃত্য এখন সবাই বাঁচান রে।
গানে গানে মনের টানে হইলো মেলা কথা
ভুলভ্রান্তি হলে কেহ নিও নাকো ব্যথা
দোয়া করি গড়ে উঠুক সুখি বাংলাদেশ

www.pathagar.com

সবাইকে সালাম দিয়া জারি করলাম শেষ রে।[৪২]

৬.

প্রথমে বন্দনা করি আল্লাহ রসুল নাম
একে একে সুধীজনদের জানাই গো সালাম
সালাম জানাই পিতা-মাতা আরো শিক্ষাগুরু
মহানন্দার শিল্পী মোরা জারি করলাম শুরুরে
শোনের শোনের ভাই বন্ধুরে আরো শোনের দিয়া মন
শিশু অধিকারের কিছু কথা হবে পরিবেশন রে ॥

শিশুরাই তো জাতির সম্পদ আমরা সবাই জানি
তাদের অধিকারের কথা তবু কি কেউ মানি
জাতিসংঘ শিশু সনদে বাস্তবায়ন চাই
দেশের জন্য শিশু উন্নয়নের বিকল্পতো নাই রে ॥

স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার ভাই
শিশুদের প্রথম দাবি অজানা তো নয়
বিকাশিত হওয়ার কথাও এই দাবিতে আছে
শত কাজের ব্যস্ততাতেও ভুলবেন না কেউ তাদেরে ॥

নির্যাতন-নিপীড়ন বিপদ থেকে ভাই
রক্ষা পাবার অধিকার শিশুদেরও চাই
সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তাই
সব শিশুকে সুযোগ দেবার আহ্বান জানাই রে ॥

চুয়ান্ন ধারার সনদপত্রের শিশু অধিকার
বাংলাদেশে বাস্তবায়ন করা যে দরকার
একশো বিরানব্বই দেশের সম্মতিতে ভাই
বাংলাদেশও আছে বলে আনন্দিত সবাই রে ॥

শিশু অধিকারের অনেক কথা হলো ভাই
সুধীজনদের নিকট থেকে এবার বিদায় চাই
হেথায় আছেন মোদের চেয়ে বহু জ্ঞানীগুণী
ভুলত্রুটি হলে পরে মাফ করবেন তা জানি রে ॥

৭.

আরে প্রথমে বন্দনা করি আল্লা নবীর নাম
একে একে সুধীজনদের জানাই গো সালাম আর হিন্দুদের প্রণাম
মহানন্দার শিল্পী মোরা বলবো কিছু কথা
সে সব কথায় রয়েছে যে মোদের দেশের কথারে

www.pathagar.com

এই তো আমার সোনার বাংলাদেশ ও ভাইরে
এই তো আমার জন্মভূমির দেশ আরে বাংলা আমার মা
আরে বাংলা আমার মায়ের মত নাই তুলনা শেষ রে
এই তো আমার সোনার বাংলাদেশ ও ভাইরে
এই তো আমার প্রাণের বাংলাদেশ।

মুক্তিযুদ্ধের কথা মোরা আমরা সবাই জানি
নয়মাস যুদ্ধ করে বিজয় নিয়ে আনি
কত ভাই কত বোন জীবন দিল বলি
তাদের কথা স্মরণ করি আমরা যে আজ বলি রে ॥

মাতৃভূমি বাংলাদেশ হাজার ত্যাগের ফল
রক্ত দিয়া জীবন দিয়া হইয়াছি সফল
কারো দানে পাওয়া নয় দেশের স্বাধীনতা
জীবন দিয়া করবো রক্ষা এই মোদের বারতা রে ॥

সবুজ-শ্যামল দৃশ্যে ভরা মোদের বাংলাদেশ
কত কবি গান লিখেছে নাইকো তাহার শেষ
মাঠে মাঠে সোনার ফসল ঢেউয়েরই মূর্ছনা
রাখালীয়া বাঁশির সুরে মন হয় যে আনমান রে ॥

পনের কোটি জনগণ সবাই তোমার ছেলে
অন্ন-বস্ত্র আদেরা দিয়ে নিজ টেনে কোলে
তোমারই ভাণ্ডারে মাগো কত কিছু সঞ্চিত
কৃপা করে এসব থেকে করো না বঞ্চিত রে ॥

সুধীজনদের কাছে মোরা একটা কথা বলি
হিংসা-বিদ্বেষ বিবাদ-বিভেদ এসো সবাই ভুলি
সবাই মিলে কাজ করিব মোদের দেশের তরে
সুখ আর শান্তি করবে বিরাজ মোদের ঘরে গরে রে ॥
গানে গানে মনের টানে হইল মেলা কথা
ভুল-ভ্রান্তি হলে কেহ নিও নাকো ব্যথা
দোয়া করি গড়ে উঠুক সুখি বাংলাদেশ
সবকে আবার সালাম দিয়া জারি করলাম শেষ রে ॥

৮.

আরে প্রথমে বন্দনা করি আল্লাহ নবীর নাম
তার পরেতে সুধীজনদের জানাই গো সালাম
সালাম জানাই পিতা-মাত আরো শিক্ষাগুরু

www.pathagar.com

নবাবগঞ্জের শিল্পী মোরা জারি করলাম শুরুরে
শোনের শোনের ভাই বন্ধুরে আরে শোনের দিয়া মন
লোক ঐতিহ্যের কিছু করবো পরিবেশন রে ॥

বাংলাদেশের সংস্কৃতি মোদের গর্বের ধন
দেশের মানুষ রচিয়াছে দিয়া মন প্রাণ
শিল্পকলা একাডেমি সেসব রক্ষার জন্য
জেলায় জেলায় অনুষ্ঠান করে করেছে যে ধন্য রে ॥

পল্লীগীতি ভাটিয়ালি জারি বাউল গান
ভাওয়াইয়া আর লালনগীতি রাখছে দেশের মান
এই জেলার গম্ভীরা গান দেশ-বিদেশে ভাই
নাম করেছে এ আনন্দ সবার মনে তাই রে ॥

আলকাপ গানের মরণ দশায় ভীষণ কষ্ট পাই
এসব গানের মতো মধু আরে কিছুতেই নাই
হারিয়ে গেল পুথিপাঠ যাত্রা ঘাটু গান
লোকনাট্য লোক ঐতিহ্য এখন সবাই বাঁচান রে ॥

কাহানির আসর কোথায় গেল ছিল গ্রামের প্রাণ
সারা নিশী থাকতাম জেগে উঠলে নতুন ধান
মহরমের ঝাণ্ডি গানটা হারিয়ে গেল শেষে
ভিন দেশেরই কৃষ্টি এসে বাংলার সাথে মিশেরে ॥
গানে গানে মনের টানে হইল মেলা কথা
ভুল-ভ্রান্তি হলে কেহ নিও নাকো ব্যথা
দোয়া করি গড়ে উঠুক সুখি বাংলাদেশ
সবাইকে সালাম দিয়া জারি করলাম শেষ রে ॥

৯.

আরে প্রথমে বন্দনা করি আল্লাহ রাসুল নাম
এই আসরে আছেন যত তাদের জানাই গো সালাম
মহানন্দার শিল্পী মোরা বলছি কিছু কথা
এসব কথায় রয়েছে যে দেশের হারিয়ে যাওয়া কিছু কথা ॥
মরি হায় রে–

কোথায় রাখালীয়া বাঁশি কোথায় গো দোতারা
গ্রামেগঞ্জে দেখতে পাইনা বাউলের একতারা
কোথায় গেল জারি সারি কোথায় কবিগান
এসব কথা মনে পড়লে প্রাণ করে আনচান ॥

www.pathagar.com

মরি হায় রে–

কোথায় গেল ধানের গোলা গাঁয়ের গরুর গাড়ি
কোথায় গেল ঢেঁকি যাঁতা কইতে নাহি পারি
শাক-শবজিতে নাই স্বাদ আছে নাইরে মজা
কোথায় গেল মুড়ি মুড়কি মোয়া খাজা গজা ॥
মরি হায়রে–

মায়ের কণ্ঠে শুনিনা আর ঘুম পাড়ানি গান
ব্যাকুল হয়ে খুঁজে বেড়াই সেই সুরেরই তান
পাখির ডাকে ঘুমাইতে চাই জাগবো পাখির গানে
সেইতো মোদের পরম শান্তি চাই যে মনে প্রাণে ॥
মরি হায় রে–

দেশের মানুষ এসো সবাই করি গো যতন
হারিয়ে যাওয়া আগের দিনের অমূল্য রতন
বাংলাদেশের সন্তান মোরা দেশকে ভালবেসে
শিল্প সংস্কৃতির সেবা করবো সবাই হেসে হেসে ॥
মরি হায় রে–

গানে গানে মনের টানে বললাম অনেক কথা
ভুল-ভ্রান্তি হলে কেহ নিবেন নাকো ব্যথা
দোয়া করি গড়ে উঠুক সুখি বাংলাদেশ
সবাইকে সালাম দিয়া জারি করলাম শেষ
মরি হায় রে।[৪৩]

১০.
লাইলাহা পড়বে মিঞা কলেমা রব্বানী,
আর না লবে মানুষ জনম বল আল্লাহর ধ্বনি।
আল্লা ভাবো তর্ক রাখ সারগো দেলে নাই,
খাছবান্দা বেহস্তে যাইবে তার দোজখে জাগা নাই।
দোজখ হাছা, দোজখ মিছা দোজখ নৈরাকার,
এই দোজখে পুইড়্যা মরব বান্দা গোনাগার।
দোজখের কীড়া ভাইরে আঙুল পরিমাণ
সেই কীড়ায় কুরিয়া খাইবে পাপীর পরান।
ভাই বল বান্ধব গো বল পন্থের পরিচয়,
মইরেনে কেউ সঙ্গে যাবে, কেহ কারো নয়।
হায় হোছেন,
আইস, মা ফাতেমা মাগো তোর গুণ গাই

www.pathagar.com

অধম দেইখ্যা ছাড় যদি ঐ আল্লার দোহাই।
তুমি অইও কল্পতরু আমি অমু লতা,
যুগল চরণ বেইড়্যা রাখমু ছাইড়্যা যাবে কথা।
সভ কইর্‌্যা রইছেন মিঞারা মমিন মুসলমান,
সবারো জনাবো আমি অধমের ছেলাম।[৪৪]

৪. নৌকার গান

চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চলে এক সময় বাঁশ, দড়ি, কাগজ, কাপড় ইত্যাদি নানা উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হত একটি বিশাল বজরা বা নৌকা। দলবদ্ধভাবে তখন প্রচলিত ছিল নৌকা বা শাড়ির নৌকার গানের। নৌকার ভেতর পাঁচ-ছয় জন শিল্পীরা অবস্থান করত। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে থাকত ঢোল, করতাল ও হারমোনিয়াম। নৌকাকে সাজানো হত নানা রঙের রঙিন কাপড় ও রঙবেরঙের নানান কাগজ দিয়ে। আলোর রোশনায় নৌকা ঝলমলিয়ে উঠত অপূর্ব সৌন্দর্যে। শিল্পীরা সেই নৌকার মাঝখানে অবস্থান করে সকলে একত্রে নৌকায় গানের সুরে সুর মিলিয়ে নৌকার শাড়ির নৌকার গান গাইতে গাইতে সারা শহর জুড়ে পরিক্রমা করত এবং প্রতিটি পরিচ্ছদের গানের শেষে গায়কী শিল্পীরা নৌকা বা শাড়ির নৌকার গানের এক নতুন আঙ্গিক যোগ করে সমবেত কণ্ঠে বলতে হোঃ– হোঃ–হোঃ। সারি বা নৌকার গানের খরচ ব্যয়বহুল হবার জন্য একেবারে সেই গান এখন উঠে যাবার পথে। সর্বশেষ দলটি ছিল বারোঘরিয়া শতীশ পালের। তাঁর মৃত্যুর পর আর কোনো দল গড়ে ওঠেনি।

শাড়ির নৌকা গানে সংগৃহীত নমুনা

চল্ সেই দেশে হোঃ– হোঃ– হোঃ যায় যায় দেরি করিস না
মানুষ যেথায় মানুষ থাকে পশু বনে না
নাই সেখানে জাতের লড়াই, ধর্মের নামে মানুষ জবাই
মানুষ মাত্রেই মানুষের ভাই, অন্য কিছু না
হোঃ– হোঃ– হোঃ হল্ সেই দেশে যায়।
ঢাকা আর চট্টগ্রামে মানুষ মরে বোমার ঘায়ে
কি দোষ এদের কাদের পায়ে ছিল বল না
লহে এমন যাতনা
যে সব শয়তান করে এমন কাম্ নাইকো মার্জনা
চ্যার থেকে চ্যাংড়া উঠলে প্যাঁচে, গার্জেনরাও পরেছে প্যাঁচে
অ্যাডমিশন্ টেস্টের আঁচে হচ্ছে আধখানা
কেমন দ্যাখো জমানা।
করে এমন প্রশ্ন মেজাজ উষ্ণ প্রতিকার আজানা
হোঃ– হোঃ– হোঃ
শুনতে পাচ্ছি পরস্পরে পৌরসভা যাবে বেড়ে
থাকবে কি তখন পুরানা ঘরে ভ্যাবা পাচ্ছি না

শুনি আরও ঘটনা।
ওয়ার্ড নটা হবে তিনটা কর‍্যা গগনা
হোঃ– হোঃ– হোঃ
আসে তেড়ে যখনই বান বাড়ে তখন রাস্তার মান
তারপরে সবাই অজ্ঞান হুঁশ কি হবে না
ঠিক্ ঠিক্ বাস যে চলে না
দিয়্যা টাকা উঠায় চাকা কেউ উপায় করে না
হোঃ– হোঃ– হোঃ
স্বাক্ষর অভিযানে সরকার, টাকা খরচ করছে দেদার
নিন্দুকরা বলে বারবার কিছুই হচ্ছে না
শুনি আরও ঘটনা।
ছাত্র সাজিয়ে আনে ইনসপেকশনে এমনি শেয়ানা
হোঃ– হোঃ– হোঃ
পণ প্রথা আর ভুরিভোজন, বর্জন কর‍্যা করো শোধন
তবেই থাকে শুভ মিলন কেন বুঝ না
সবাই শপথ করে না।
পণ দেওয়া নেওয়ার মতো পাপ আর করব না
হোঃ– হোঃ– হোঃ
অঙ্গীকার হোক চৌদ্দশ শকে
বিভেদ ভুলে সবাই থাকব সুখে
অশান্তির আগুন এই দুনিয়ার বুকে
জ্বলতে দিব না।
অরুণ বসাকের প্রার্থনা
বিদায় বেলায় প্রণাম জানাই দোষ ধরো না
হোঃ– হোঃ– হোঃ।[৪৫]

৫. ব্যাঙ বিয়ের গীত

উত্তরাঞ্চলের বৃহত্তর রাজশাহী জেলার চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় বৃষ্টি আহ্বানের জন্য 'ব্যাঙ বিয়ে' নামক এক ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠানে পরিবেশিত গানগুলো 'ব্যাঙ বিয়ের গীত' নামে পরিচিত।

দেশে অনাবৃষ্টি দেখা মিলে গ্রাম্য ললনারা বৃষ্টি আনয়নের জন্য ব্যাঙের বিয়ে দিয়ে থাকে। অনুষ্ঠানের পূর্বে মেয়েরা বিল-ঝিল অথবা পুকুর থেকে একটি পুরুষ ব্যাঙ ও একটি স্ত্রী ব্যাঙ ধরে আনে। তারপর সেই ব্যাঙ দুটোকে তেল-হলুদ মেখে দেহে কুড় দেয়। কুড় দেয়ার পর স্ত্রী ব্যাঙটিকে শাড়ি পরায় এবং পুরুষ ব্যাঙটিকে পুরুষের পোশাক পরায় ও মাথায় টুপি দিয়ে বর সাজায়। স্ত্রী ব্যাঙটিকে কনে সাজায়। এরপর মেয়েদের মধ্যে কেউ বরপক্ষ আবার কেউ কনেপক্ষ অবলম্বন করে নানা প্রকার গীত গেয়ে থাকে। এই গীতগুলোই ব্যাঙ বিয়ের গীত নামে পরিচিত। মেয়েরা ব্যাঙের বিয়ে

www.pathagar.com

দেয়ার পর কলার খোলের পাল্কি তৈরি করে কে নাইওর করায়। এরূপ বিভিন্ন নিয়মের মধ্য দিয়ে ব্যাঙ বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হয় এবং ব্যাঙ দুটোকে পুকুরের গভীর পানিতে ছেড়ে দেয়ার সাথে সাথে অনেক ক্ষেত্রে রৌদ্রদগ্ধ পৃথিবী অকস্মাৎ মেঘে ঘিরে ফেলে এবং মুষলধারে বৃষ্টি হতে শুরু করে।

ব্যাঙ বিয়ের গীত নমুনা

১.

মাটির তলে থাইক্যা ব্যাঙ, বিহ্যার দিনে ম্যালে ঠ্যাং
ব্যাঙ ব্যাঙ বেহুলা সুন্দরী হে
ব্যাঙ ব্যাঙ কোলহা ব্যাঙ মাটির নীচে ম্যালে ঠ্যাং
ব্যাঙ ব্যাং বেহুলা সুন্দরী হে
ঐ ব্যাঙের ডাকে পানিতে হামার শাড়ি ভিজ্যা গ্যালোরে
ব্যাঙ ব্যাঙ বেহুলা সুন্দরী হে
ব্যাঙ ব্যাঙ কুন ব্যাঙ ব্যাঙ মাইটা ব্যাঙ
ঐ ব্যাঙের ডাকে পানিতে হামার পিরহ্যান ভিজ্যা গ্যালোরে
ব্যাঙ ব্যাঙ কুন ব্যাঙ ব্যাঙ মাইটা ব্যাঙ
ঐ ব্যাঙের ডাকে পানিতে হামার সিথ্যাপাটি ভাঁসেরে
ব্যাঙ ব্যাঙ বেহুলা সুন্দরী হে
ঐ আষাঢ় মাসের পানিতে হামার কলসী ভাঁইস্যা গ্যালোরে
ব্যাঙ ব্যাঙ বেহুলা সুন্দরী রে।[৪৬]

২.

মাচার তলে হোলা ব্যাঙ
দক্কিনে ম্যালিচে ঠ্যাং
বড় যত্তনের ব্যাঙ রে।
কইন্যার বাবা হুক্কা খায়
তাতে ব্যাঙ মুতিয়া দ্যায়
বড় যত্তনের ব্যাঙ রে।
কইন্যার বাবার পিটির কুজ
ব্যাঙের কুলায় গুজাগুজ
বড় যত্তনের ব্যাঙ রে।
কইন্যার বাবার খোলামুখ
কালাই কাইটার বড় সুখ
বড় যত্তনের ব্যাঙ রে।
কইন্যার ভাইয়ের শোলা মুখ
চাউল কাইড়বার বড় সুখ
বড় যত্তনের ব্যাঙ রে।
মাচার তলে হোলা ব্যাঙ

www.pathagar.com

দক্কিনে ম্যালিচে ঠ্যাং
বড় যত্তনের ব্যাঙ রে।[৪৭]

৬. কারাম উৎসবের লোকসংগীত

কারাম ওরাওঁদের সবচেয়ে বড় উৎসব। ভাদ্রমাসে সাধারণত এ উৎসব পালন করা হয়। কারাম উৎসব পালনের সঙ্গে ওরাওঁদের একটি কাহিনি জড়িত আছে। তাদের মতে, কারাম বৃক্ষ রক্ষাকর্তা। ইতিহাসের কোন এক সময় ওরাওঁ জাতি অন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সময় গভীর জঙ্গলে পালিয়ে কারাম বৃক্ষের নীচে আশ্রয় নিয়েছিল। কারাম বৃক্ষ যেন তাদের শক্রর হাত থেকে রক্ষা করেছিল। এ ঘটনাকে স্মরণ করার জন্য কারাম উৎসবের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ উৎসবে বিভিন্ন লোকসংগীত পরিবেশিত হয়ে থাকে। এ সব সংগীতকে কারাম উৎসবের লোকসংগীত বলা হয়। দৃষ্টান্ত–

কারামের বন্দনা
আখেড়া বন্দনা কবি সরস্বতী মহালী
তবে রে বন্দনা মেঝুনারে
মদনে ঝুমুর লাগাল বারে।

আখেড়া হে গুছে লাল মগাহরি
মন্দনে পু-জ্বালায় মৌ গায়
মদনে ঝুমের লাগাল বারে।

আখেড়া ছাড়িয়া গীত গাওয়ালা পর দেশী ভাই
গুরুবান্ধি সরস্বতী বিনিয়া ঢুলাইরে।
আগে আগে রাম চন্দ্র সেকের পিছে
লোঝুমের সীতা সুন্দর সীতা কারাবই সাঁয়রে
ভাদর কের একাদশে কারাম গাড়ায়রে
সুন্দর ধুঁতি আঁহি রামকে চালায়রে।[৪৮]

ভাবার্থ : প্রথমে জানাই সরস্বতী, মদন, রামচন্দ্র, দেব-দেবীদের প্রণাম। তারপর গুরুকে প্রণাম, সীতাকে প্রণাম। কারাম পুজা হয় ভাদ্র মাসের একাদশীর দিনে। সেদিন রাম চলে আগে, আমরা চলি তাঁর পিছে পিছে।

কারামের গান
বারো মাসে হিংসে নালেরে কারাম (২)
হায় কারাম বের দাগা দলরে
ও ভাই হায় কারাম বের দেগা দেখরে।
কেমরা আফসালায় কেমরা পিয়াসালায় (২)
কেমরা কারমা গাড়ায়রে (২)
ও ভাই কেমরা কারাম গাড়ায় রে

www.pathagar.com

ভাই মর আফসালায় বোহিন মরা পিয়াসালা (২)
কেমরা কারমা গাড়ায় রে
ও ভাই কেমরা মরা কারমা গাড়ায়রে
কামরা গাইড়তে ভেল সামরে তুলরে (২)
চেল যাহো আখরা ছলাইতে (২)
ও ভাই চেল যাহো আযরা ছলাইতে।

ভাবার্থ : বার মাস পর একবার মাসে তাই আনন্দে নাচ-গান করি। ভাই-বোনের মধ্যে কথোপথন হয়, কে কারাম গাড়ায়। ভাই বলে আমি কারাম পূজা করব। তার কথায় প্রত্যেক কাজ করতে বার মাস সময় লাগবে।

৭. সোহরাই উৎসবের লোকসংগীত

কারাম উৎসবের আমেজ শেষ হতে না হতেই সোহরাইয়ের আগমনী বার্তা ধ্বনিত হতে শুরু করে। কার্তিক মাসের অমাবশ্যার সময় ওরাওঁরা সোহরাই উৎসব পালন করে থাকে। এই উৎসব চলে তিনদিন। এই উৎসবে পরিবেশিত লোকসঙ্গীতের দৃষ্টান্ত নিম্নে দেয়া হলো :

আরে ও ওরে
রেহি রে রে রে রে রে রে রে রে রে
দিয়া যে রায়ঝা দিয়ারা রে দিয়ারা
কা করে উরোজনা বাড়ীরে
আরে-আগে যে জাগাওয়ে গজোমতি গাহা হো
তোকোর পিছে জাগারো কৃষানোরে।[৪৯]

ভাবার্থ : বাড়িওয়ালা তুমি বাতি জ্বালিয়ে কি করো, কিসের জন্য বাতি জ্বালাও, বাতি জ্বালিয়ে গোয়ালে গরুগুলোকে জাগিয়ে তুলছি এবং পরে কৃষককে জাগিয়ে তুলবো পূজার জন্য।

বড়কি চুমায়ো ভালা, ঝিলিমিলি খেচুয়া হো
মঝলি চুমায়ো দুর্বা ঘাসোরে
সাঝলি চুমায়ো দুয়ো কানের সোনা হো
টোছকি চুমায়ে বাথানো রে।

ভাবার্থ : বড় বউ গরুকে ধান দুর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করে। পরে মেজো বউ ধান দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করে। একই রূপে সেজো বউ ও ছোট বউ সব গরুকে আশীর্বাদ করে।

৮. ফাগুয়া উৎসবের লোকসংগীত

ওরাওঁ সমাজের নববর্ষের নাম 'ফাগুয়া'। ফাগের অর্থ আবীর। এই উৎসবে ব্যবহৃত হয় প্রচুর 'ফাগ' বা আবীর। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় এ উৎসব উদযাপিত হয়।

ফাগুয়া উৎসবের লোকসংগীতের দৃষ্টান্ত

www.pathagar.com

লালে ঠট সুগা হারিয়ারা প্যাঁখরে
এ ... সুগা রঞ্জনি ... রঞ্জনি দুই আখরে
মারবোউ রে সুগা ধনুকা চাড়ায় যে এরে সুগা।
গিরি যাবে ... যমুনা ... কিনারা যে
হায় ... সুগা সুন্দর ভায় (২) ঐ
মাস তোরা গলি গলি ভূয়া পরি যাতও
... রে ... এর সুগা ... হাড় তোরা
দিয়া চরি যাতোও (২) সুগা সুন্দর ভায় ॥[৫০]

এগানে একটি পাখির মাধ্যমে মানুষের জীবন ও মরণের কথা বলা হয়েছে। সুগা একটি পাখির নাম। বায়লার সুগা পাখির লাল ও ঠোঁট ও সবুজ পাখা রঙিন চোখে। মারবো আমি সুগা ধনুক নিয়ে যে পড়ে যাবে। যমুনার ধারে। মাংস তোমার গলে গলে যাবে। হাড় তোমার উই পোকা খাবে, সুন্দর সুগা।

৯. সারহুল উৎসবের গান

ওরাওঁ সম্প্রদায়ের সারহুল উৎসবে বিশেষ ধরনের লোকসংগীত পরিবেশিত হয়ে থাকে দৃষ্টান্ত :

কেতেয়নু তিখিল টাড়িঃনু বিল্লি
একা দেওড়াস্ গুড়ঁমা লাগদাস
জোঁখ্ দেওরাস্ তেলা বিসাহী
বলবারী জিয়া কালঃই
বলবারী জিয়া কালঃই
কিচরিন চাঁড়ঃ অনঃ ভাগান সাজঃ অন্ঃ
ভোঙ্গায় পেল্লো পারেতা মাঁইয়া
আনারি রাঃ আতনার তেঙ্গা চিরঃ অবঃ।[৫১]

ভাবার্থ : কুলোতে চাল বেড়াতে এলো, কোন পুরাহিতে সোচ্চার আর্তি, যুবক পুরোহিতের হৃদয় কায় অকল্যাণে মুক্তি চায়। বলতে চলতে বলে যায় বলতে বলতে বিদায় নেয়। যুবতি তুমি পালিয়ে যাও অন্য পারে চলে যাও। তোমরা যা গোপন করছো অন্যরা তা প্রকাশ করছে।

১০. ওরাওঁ প্রেমসংগীত

প্রেম মানব হৃদয়ের শাশ্বত চেতনার অন্যতম দিক প্রেম নিয়ে ওঁরাও সমাজে অসংখ্য লোকসংগীত প্রচলিত রয়েছে। প্রেমের আকুলতা কখনও প্রেমিকার কথা আবার কখনও প্রেমিকের কথা এসব গানে প্রকাশিত হয়ে থাকে। নিম্নে প্রেম বিরহ সংগীত উদ্ধৃত করা হলো :

না ছোড় যাবে পিয়া
না ছোড় যাবে

www.pathagar.com

তো সঙ্গে যাবে বেরী
ইয়া তোরে পিয়া
ঝিরগা ডাম ডোলে বাধে
ঝিরগা ডাম ডোলে পানি
ভিতরে ব্যাঙ হারমোনি বাজায়ে
ঝিরগা ডাম ডোলে ॥

ভাবার্থ : প্রিয়তম তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না। আমি তোমার সঙ্গে চলে যাবো। তুমি আমার ছেড়ে যেও না। বর্ষার বারিধারায় প্রকৃতি যেভাবে প্লাবিত হয়। ব্যাঙ আনন্দে গান গায়। আমি তেমনি তোমার সঙ্গে চলে যাবো। আনন্দে জীবন অতিবাহিত করবো।

বিরহ সংগীত
ক্ষুদিয়া চুরিয়া পোষালা
ভেইয়ারে ভেইয়া
ভেইয়া মোর গেলই
পরদেশ যাহা হো
ভেইয়া মোর গেলই
পরদেশ।

ভাবার্থ : ক্ষুদের দানা দিয়ে যে ভাইকে লালন করেছিলাম। সে ভাই আজ মারা গেল। সে পরপারে চলে গেল।

১১. ওরাওঁ বিয়ের গীত

ওরাওঁ লোকসংগীতের ব্যাপক অংশ জুড়ে রয়েছে বিবাহাচারকে ঘিরে রচিত লোকসংগীত। বিয়ের কথাবার্তা থেকে শুরু করে কনে বিদায় পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে এসব গীত পরিবেশিত হয়ে থাকে।

একে গোটা বেটি
কা করে দিয়ালো
মায়ো বেটি সুকৈ কান্দয়
দো আড়েনি লুগা
পনেকে টাকা
কেইসে ঘুরায়ো দেবোও।

ভাবার্থ : একমাত্র কন্যাকে বিয়ে দিতে হচ্ছে। স্নেহের কন্যার কান্নায় হৃদয় ভেঙ্গে যাচ্ছে। কিন্তু (বর পক্ষের নিকট থেকে) দুখানি কাপড় পণ দেয়া হয়েছে; কেমন করে এগুলো ফিরিয়ে দেবো?

ঋতুর গান : ওরাওঁ সম্প্রদায়ে ঋতুর গান প্রচলিত রয়েছে। দৃষ্টান্ত–
হায়রে হায়ারে হায়
সারি সারি ছুড়ি তোমার পরাব লাল শাড়ি
ফুলফুটে শারি শারি।

www.pathagar.com

ফলে গেল শ্রাবণ মাস পড়লো ভাদ্র মাস
ফুল ফোটে শারি শারি।
ছুড়ি (জ্ঞানী) তোমার পরাব লাল শাড়ি।[৫২]

১২. সাঁওতালি প্রেমসংগীত

প্রেম মানব হৃদয়ের শাশ্বত চেতনার অন্যতম দিক প্রেম নিয়ে সাঁওতাল সমাজে অসংখ্য লোকসংগীত প্রচলিত রয়েছে। প্রেমের আকুলতা কখনও প্রেমিকার কথা আবার কখনও প্রেমিকের কথা এসব গানে প্রকাশিত হয়ে থাকে। নিম্নে প্রেম বিরহ সংগীত উদ্ধৃত করা হলো।

দায়া দুলোড় ঞেঁলতে
কুলি মেঘে সানাঞাঁ
মনেরঃ ভাবনা বাচোম লৌহওঞঁ
মন তিংমা চুটচ্‌ট কোড়াম তিংমা ধাক্‌ধাক
আম তুলুচ বড় গেচো বাচঞ দিলা।

ভাবার্থ : আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে আমার মনের কথা বলতে পারছিনে আমার বুক কাঁপছে। আমি সাহস হারিয়ে ফেলছি।

বিরহসংগীত

চেতইং মেতাঃ মেয়াম হিড়িং কেদা
এম কাতিংমে তি-রেয়াঃ বাজুমুদোম
রূতনড় বাড়িংমে মারুখা রুমোল।

ভাবার্থ : নদীর তীরে ভেন্ডা গাছ। সেগাছের নিচে তারা বসেছিল। প্রেমিক-প্রেমিকাকে বলছে, তুমি কথা রাখলেনা, কাজেই আমার রুমাল ফিরিয়ে দাও।

১৩. বাহা উৎসবের লোকসংগীত

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের আরেকটি অন্যতম প্রধান উৎসব হলো বাহা উৎসব। সাঁওতালী ভাষায় 'বাহা' শব্দের অর্থ ফুল। ফাল্গুন মাসে এ উৎসব পালিত হয় তাই কেউ কেউ একে বসন্ত উৎসবে বলেও অভিহিত করে থাকেন। আবার কেউ বলেন, 'পুষ্প উৎসব'। এই উৎসবে সাঁওতাল সমাজে বিভিন্ন অনুষ্ঠানিকতার আয়োজন করা হয়। পরিবেশিত হয় বিভিন্ন ধারার লোকসংগীত। এখানে একটি বাহা উৎসবের দুটি লোকসঙ্গীতের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো–

তোয়ক কোকো চিয়ে লেদা বীর দিসমাদঃ
তোয়ক কোকো টাণ্ডি লেদা বীর দিসামদঃ
মোড়ে কোকো চিয়ে লেদা বীর দিসাম দঃ
তরুই কোকো কুটাম লেদা নাতো মা ময়ুর দঃ।[৫৩]

ভাবার্থ : কে কে ঐ জংগলে গিয়েছিল, কে কে ঐ জংগলটা পরিস্কার করেছিল? ঐ জংগলে গিয়েছিল পাঁচজন লোক, ঐ জংগল পরিস্কার করেছিল ছয়জন লোক।

সেঁন্দ্রা কোকো ওডোং এনা
ছাতু সাম্বার তায়য়োম মেনা
এহো হাপে হো তাঙ্গি লেপে
ইদি আপে-লে বাড়ি বুটো।

ভাবার্থ : শিকারের জন্য যুবকেরা চলে যাচ্ছিল, পশ্চাৎ থেকে মেয়েরা তাদের ডেকে বলছিল, তোমরা বট গাছের তলায় অপেক্ষা কর, আমরা তোমাদের জন্য চিড়া-মুড়ি নিয়ে আসছি।

১৪. সাঁওতালি বিয়ের গীত

সাঁওতাল লোকসংগীতের ব্যাপক অংশ জুড়ে রয়েছে বিবাহাচারকে ঘিরে রচিত লোকসংগীত। বিয়ের কথাবার্তা থেকে শুরু করে কনে বিদায় পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে এসব গীত পরিবেশিত হয়ে থাকে।

হেন্দা বাবা রায় বারিচ
তিমিন মারাং তালে জাঁওয়াই কোড়া
নাডি হঁ বায় মারাং নাডি হঁ বায় হুডিঞ
সিয়োঃ পাঁয়ড়াঁরে ঝুন্‌কো
কাডায় লাগা কিনোঃ ঝুমুর ঝুমুর ॥

ভাবার্থ : এ বাবা ঘটকদার, আমাদের জামাইটা কতবড়ো। (উত্তরে ঘটক বলছে), বেশি বড়োও নয়, বেশি ছোটও নয়। তার লাঠির পেছনে ঝুমকো লাগানো আছে, মহিষ পেটার সময় ঝুমুর ঝুমুর শব্দ হয়।

হেন্দা বাবা রায়বারিচ
তিমিন মারাং তালে
বাহু কুড়ি?
অডি হঁ বায় মারাং
আডি হঁ বায় হুডিং
জনঃ মুটিরে ঝুনকো
রাচায় জঃ জঃ কানা
ঝুমার ঝুমুর ॥

ভাবার্থ : এ বাবা ঘটকদার, আমাদের বউটা কত বড়ো? (ঘটক উত্তর দিচ্ছে), বেশি বড়োও নয়, বেশি ছোটও নয়; মেয়েটি বাড়ুন দিয়ে ঝাঁড়ু দিচ্ছে, তার পেছনে ঝুমকোগুলো ঝনঝন করছে।

১৫. দাঁসাই গান

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের এক শ্রেণির লোকসংগীতের দাঁসাই গান। দাঁসায় গানের নমুনা–

www.pathagar.com

তকয় গুরুয়া বাচারে তুমদাঃ টামাক সাডিকানা
যহায় তকয় চেলায়া রাচারে তুমদাঃ টাকাক সাডিকানা
কামর গুরুয়া রাচারে তুমদাঃ টামাক সাডিকানা
সহরায় কামরু চেলায়া বাচারে তুমদাঃ টামাক সাডিকানা

তকারেদ হো গুরুহো বোঙ্গায় জানাম লেন
যহায় তকরেদ হো চেলাহো গৌই জানাম লেন
বিরি ড়াড়ুরে গুরুহো বোদ্ধায় গৌই জানাম লেন
কাশি বেড়ারে বেলা হো গৌইকু জানাম লেন।[৫৪]

১৬. দং গান

সাঁওতালদের জনপ্রিয় সংগীত দং গান। দং গানের লাইন বা স্তবক ছোট হয়। এ গানের কথাগুলোয় টানাভাব কম থাকে এবং একটু তাড়াতাড়ি বলতে হয়। দং গানের নমুনা–

ছাম লাতার ছামডা লাতার, কুড়ুকুড়ু, মান্দাডিয়েই
বলয়েনা, আলে দলে মেন ইদা লহক তিগিয়
কুতু আকাশ, জনম কুড়ু ভালায় কুড়ু গেয়া ॥

১৭. লাগড়েঁ গান

লাগড়েঁ গান সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জনপ্রিয় লোকসংগীত। এ গানের প্রথম কথাগুলো স্বাভাবিক গতিতেই বলতে হয়। কোন কোন লাগড়েঁ গানে দু-একটি করে বাংলা শব্দ থাকে। এখানে একট লাগড়েঁ গানের উদাহরণ দেয়া হলো–

লেরে বাবু ধুতি, লেরে বাবু দাহিড়ি, লেরে বাবু মান্দাল বাজায়
আমি দিদি লেখাপড়া লোক গো, মান্দাল বাজায় জানিনা
আমি দিদি লিখনে গড় হল দিদি... লিখনে গড় হগ।

১৮. ডান্টা গান

ডান্টা গানের প্রথম কথাগুলো কথা বলার মতো, তবে তাড়াতাড়ি বলতে হয়। এ গানে লম্বা সুর থাকে না। উদাহরণ–

মর ডান্টা, মর ডান্টা লায় গেল হে
হে, হে, হা, হা মর ডান্টা মর ডান্টা
লায় গেল হে।

১৯. গাম গান

গাম গানের কথাগুলো টানাভাবে হয় এবং গলাটা হয় করুণ। যেমন–

www.pathagar.com

সাতশ হনুমান একটি বুড়া হনুমান
খেলেক ও খেলেক
দিদি মুখে দিদি জল দিলি না।

২০. জান গান

জান গানের কথাগুলো স্বাভাবিক কথার মত কিন্তু শেষে লাইনের কথাটা টানাভাবে হয়। এই গানের উদাহরণ–

লৌড়ি কিদেঞ্চ ঘৌড়ি কিদোঞ্চ
খান্দ খুন্দইঞ্চ পাঞ্জা কেৎ
জ-বাহা-সময় নাইগ পারম এনাবে।[৫৫]

২১. মহররমের ঝাণ্ডিগান

মুসলিম সম্প্রদায়ের শোকাবহ ঐতিহাসিক ঘটনা কারবালা প্রান্তরের করুণ কাহিনি নিয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জের লোক কবিরা এক ধরনের শোকসংগীত রচনা করে আশুরার সময় দলবদ্ধ হয়ে পরিবেশন করেন এই গান স্থানীয় ভাষায় ঝাণ্ডিগান বা ঝান্‌নি গান নামে পরিচিত। শিল্পীরা বাঁশের গিরার নিচের অংশ ফাটিয়ে এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র তৈরি করেন যাকে 'ঝান্ডি' বা 'ঝান্‌নি' বলা হয়ে থাকে। দুই হাতে দুটি ঝান্ডি নিয়ে গোলাকার হয়ে ৮/১০ জন শিল্পী দাঁড়িয়ে একে অপরের ঝান্ডিতে আঘাত করে এক সুরের আবহ সৃষ্টি করেন। ঝান্ডির তালে তালে তারা শোকগীতি পরিবেশন করেন। এ গানের সূচনাকাল সম্পর্কে সঠিক কিছু না জানা গেলেও প্রায় শতবর্ষ পূর্বে এ গানের প্রচলন ছিল বলে প্রবীণ ব্যক্তিরা জানান। চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের ফকির পাড়ার আবুল কাশেম বর্তমানে এ গানের ধারাকে লালন করে বলেছেন। ঝান্ডিগানের ধারায় যে শিল্পীরা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ফকির পাড়ার জামাল উদ্দিন, মসজিদ পাড়ার ফুরকান আলী মাস্টার, মোঃ ইসহাক আলী, মোঃ কুদ্দুস আলী, মহাডাঙ্গার সদু সরকার, শংকরবাটী-ফুলবাগানের হাবিবুর রহমান উল্লেখযোগ্য।

দলপতি : (স্থায়ী) কেঁদে বলে সকিনা
আর প্রাণে সহেনা।
সহ-দলপতি : কেঁদে বলে সকিনা
আর প্রাণে সহেনা।
দলপতি : কেন রাত্রি পহাল এখন।
দোহারীগণ : কেঁদে বলে সকিনা
আর প্রাণে সহেনা ॥
কেন রাত্রি পহাল এখন।
দলপতি : (অন্তরা) আমার বিয়ের কলেমা
পড়াল কোন মওলানা।
সহ-দলপতি : হাতে রইল বিয়ের কঙ্কনা।

www.pathagar.com

দোহারীগণ : গায়ে রইল হলদি
হাতে রইল মেহেদি।
দলপতি : বিয়েত নয় পুতুল খেলা হায়।
দোহারীগণ : কেঁদে ... এখন।
দলপতি : মহড়ানা বাঁধার কালে
কেউনা নিষেধ করিলে।
দলপতি : এই অভাগীর হোলনা মরণ।
দোহারীগণ : কেঁদে ... এখন।
দলপতি : সেরে রইল সেহেরা
ছেড়ে গেল পিয়ারা।
সহ-দলপতি : সেরে রইল সেহেরা
ছেড়ে গেল পিয়ারা।
দলপতি : কেন খোদা করিলে এমন।
দোহারীগণ : কেঁদে ... এখন।
দলপতি : বাসি বিয়ে হলোনা
এ দুঃখ মোর গেলনা
সহ-দলপতি : বাসি বিয়ে হোলনা
এ দুঃখ মোর গেলনা।
দলপতি : বৃথা ভবে আমার এ জীবন।
দোহারীগণ : কেঁদে ... এখন।
দলপতি : মাফ কর খোদা আমায়
এ দুঃখ জানাই তোমায়।
সহ-দলপতি : মাফ কর খোদা আমায়
এ দুঃখ জানাই তোমায়।
দলপতি : আর কারো করোনাকো এমন।
দোহারীগণ : কেঁদে ...এখন।[৫৬]

২২. চাঁপাইনবাবগঞ্জের আঞ্চলিক গান

১.
কি সুখে যে আছি হামিগে নানি
এ্যাকবার আস্যা যা দেখ্যা
হাঁর কপালে কুন কালিতে বিধি
থুয়্যাছিলো লেখ্যা নানিগে।

ও নানিগে–
বাড়ির গিথাইন ছিন্হ্যার খাস্যালগে
ওগে ও নানি এ্যামুন হাঁড়ি টুংরা

কথা কহে চপোর চপোর
ভিতরটা খিঁচ নোংরা নানিগে।

ও নানিগে–
রাইতে খায়্যা বেশি ভাতেগে
ওগে ও নানি দিয়্যা থুই ভাতে পানি
সভাই খায় লাহারী পান্তা
হামার ভাগে আমানি নানিগে।

ও নানিগে–
জালান কতো সোহবো নানিগে
ওগে ও নানি কোলজ্যা ডোহ্যা যায়
দিনে রাইতে উঠতে বোসতে
খালি খোঁটা দ্যায় নানিগে

ও নানিগে–
বুক উমড়্যা কান্দন আসেগে
ওগে ও নানি আছি সোহ্যা বোহ্যা
জান দিতে পারিন্যা হামি
সংসার হাঁর কোহ্যা নানিগে।

২.
জাফোত দিনু বন্ধু তোমাকে
যাইও হাঁরঘে বাড়ি
ইস্ট্যাশনে আনতে যাবো
জুড়্যা গোরুর গাড়ি।

পঁহাত বেলায় লাহারি দিবো
চাইল কালাইয়ের রুটি
ধন্যাপাতা নুন মরিচ ত্যাল
পেজ কাটি কুটি,
গরম গরম খাইও বন্ধু
বোস্যা আখার গুড়ি।

ষাঠ্যা চাইলের ভাত দিবো
রোজ দুপ্পহর কোর‍্যা
বাগুন বড়ি মাছ চচ্চড়ি
খাইও প্যাট ভোর‍্যা,
আরাম করিও বন্ধু
দড়ির খাট পাড়ি।

www.pathagar.com

ভাঠি ব্যালায় আগান বাগান
ঘুরবো সোঁতে লিয়্যা
ঘুর্যা আস্যা খাইও তুমি
দুধ চিঁড়্যা ভিজিয়্যা,
রাইতে সুত্যা উঠিও বন্ধু
পঁহাতে তাড়াতাড়ি।

৩.
পুড়া কপাল লিয়্যা হামি
আইনু দুনিয়ায়
এ্যামুন বিহ্যা হোলো হামার
দুক্ষে দিন কাটায়।

ভাত দিব্যার লয়খো ভাতার
কিল মারার ঠাকুর
ল্যাড় ফ্যাধা গিল্যা আস্যা
বাড়তে তুলে ঢেকুর,
কার কোনাতে থাকে মিনস্যা
ঘরের চিন্ত্যা নাই।

কলসী ঠিলি থালি বাসুন
গিল্যাস ঘটি বাটি
সব কিছু খাইলে বেচ্যা
এ্যামুনি উড়াটি,
বাড়িতে হাঁড়ি চড়েনা
ফুটানি দ্যাখায়।[৫৭]

২৩. গায়েনের গীত

মানুষ যখন হাতে কলমে লিখতে শেখেনি সে যুগের অশিক্ষিত প্রতিভাধর ব্যক্তিরা মুখে মুখে রচনা করেছেন এবং সুযোগ সুবিধা মতো বিভিন্ন স্থানে পরিবেশন করে দর্শক শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন। আর তাদের সংগীতগুলো শ্রোতাদের মুখে মুখে এ স্থান থেকে অন্যস্থানে পরিভ্রমণ করতো। এর ফলে সংগীতগুলোর কদর বা আবেদন ছিল প্রচুর। কিন্তু বেশ কিছু গান ছিল যেগুলো আসরে, অনুষ্ঠানে ও অবসর মুহূর্তে কদাচিত গাওয়া হতো, এখনো বা একেবারই গাওয়া হতো না, সে সংগীতগুলো স্মৃতির পাতা থেকে খসে পড়তো। এ গানগুলো গায়েনের গীত নামে পরিচিত। এই গায়েনের পথ ধরে এখনও রচিত হচ্ছে এ জাতীয় সংগীত। গানগুলো এখন বেশ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। গ্রামীণ গায়েনদের রচিত গানগুলোর কয়েকটি এখানে উপস্থান করা হলো।

www.pathagar.com

১.
তুষেরই আগুন যেমন ধিকিধিকি জ্বলে,
তুই বিহনে যৌবন আমার যায় যে বিফলে।
বয়সকালে বন্ধু তুমি আইলানা,
আমার প্রেমের কদর তুমি করলানা ॥

দারুন গরমে ঝুলে গাছে পাকা আম,
তুমি ছাড়া সে ফল বন্ধু কেমনে খাইতাম।
ঝড় বাতাসে পাকাফল ঝইরা ঝইরা পড়ে,
তোর লাগিয়া অন্তর আমার সদয় পুড়ে মরে।
বন্ধু তুমি আইল্যা না
রসের মজা পাইলা না,
পাইলা না ॥

বর্ষা নেমে নদী ভরে ডাকলো যখন বান,
কদম ফুলের পাশে বসে কোকিল করে গান।
এমন সময় প্রাণবন্ধু রইলা কোনবা দেশে,
মিষ্টি হেসে বন্ধু একবার দাঁড়াও পাশে এসে।
তরী তুমি বাইলা না,
মানের গাঙ্গে ভাসলানা,
ভাসলানা ॥

পৌষ মাসে বন্ধু আমি মরি দারুন শীতে,
হৃদয় ভরা আগুন নিয়ে যায় যে বিছানাতে।
বসে বসে বানাই কত সুন্দর রসের পিঠে,
রাখছি তুলে যতন করে সখের হাঁড়িতে
বন্ধু তুমি খাইলানা,
পিঠার স্বাদ নিলানা,
নিলানা।
২.
ও নিষ্ঠুর কন্যা গো
রাগ করিয়া বাপের বাড়ী
কেন যাও চলিয়া ॥

তোর কারণে কন্যা আমি
দিতে পারি জ্ঞান
তুই যে আমার আঁধার ঘরে
পূর্ণিমারই চাঁন।

www.pathagar.com

কোন দোষে যাইছো কন্যা
যাওনা বলিয়া ॥

তুই যে কন্যা চ্যাংড়া ছুঁড়ি
কিছুই বুঝিস না,
তোর লাগিয়া আমি
যে হইছ দিওয়ানা
তুই যে আমার পরানের পরান
হিয়ার হিয়া ॥

বাজার থেকে আনছি কিনা
পুঁতির একখানা মালা,
এমন করে রাগ করিয়া
বাড়াস নাকো জ্বালা।
কাছে এসে ভালোবেসে
মনটা দে জুড়াইয়া ॥
৩.
মনের মানুষ চাইরে আমি
মনের মানুছ চাই,
তার সন্ধানে সবখানে তাই
ঘুরিয়া বেড়াই ॥

যদি তাহার দেখা পাইরে
বন্দি করে হৃদ পিঞ্জরে,
শিখাইতাম পিরিতের গান
(আর) রাখতাম পাহারায় ॥

অন্তরেতে জ্বলে আগুন
চোখে জলের ধারা,
তোর লাগিয়া আমি অধম
প্রেমে পাগলপারা।

ঘর ছাড়িয়া হইনু বাহির
প্রাণবন্ধুর তালাশে,
কেউ যদি তার জানিস খবর
বলিস কাছে এসে।
(আমি) জীবন যৌবন সব সপেছি
সেই বন্ধুয়ার পায় ॥

www.pathagar.com

বন্ধু আমার রসিক কালা
খেলছে বসে একোন খেলা ॥
পারঘাটাতে আমি একেলা
কাঁদছি নিরালায় ॥

৪.

কি কারণে কন্যা আমার
কইরাছে মুখভার,
মেঘে ঢাকা পড়লে চন্দ্র
হয় যে আন্ধার ॥

কিবা দুঃখ আছে মনে
কওনা আমায় খুলে,
কেবা দিলো আঘাত এমন
সদ্য ফোটা ফুলে।
দোহায় তোমার একটু হাঁসো
মুখ করনা ভার ॥

তোমার রূপের যাদু আমায়
শুধুই কাছে টানে,
নদী যেমন ছুটে চলে
সাগরেরই পানে
পূর্ণিমার চাঁদ সেতো হয় না
তুলনা তোমার ॥

স্বপনেতে গড়ি বাসর
স্বর্গেরই বাগানে,
অলি খোঁজে ফুলের মধু
ঘুরে বনে বনে।
মরণে ডর করি নাকো
থাকলে পাশে আমার ॥

৫.

হায়রে আমার সাধের একতারাতে,
হায়রে আমার সাধের দোতারাতে
এখনতো আর কয়না কথা মন
ভরে বেদনাতে ॥

বাউল রে তোর গানের দেশে
বড়ই যে আকাল,

www.pathagar.com

বাঁচবিরে তুই কেমন করে
পাবি না সুরতাল।
তাইতো বলি ওরে বাউল
যাসনা ও পথে ॥

বাঁশের বাঁশি, একতারা কই
বাজেনাতো খোল,
ঢাক ঢোলে ওঠে না আর
ধাম কুড়া কুড় বোল।

রক, ডিসকো আর ব্যান্ড সংগীতে
চারিদিক উত্তাল,
হাসনের সুর, লালনের সুর
হইলো যে বেহাল।
তাইতো বলি ওরে লালন
তাইতো বলি ওরে হাসন
যাবি কোন দেশেতে ॥
৬.
(রসিক) কালা আমার
প্রেম করতে জানে না,
এপথে যে জ্বালা আছে
সে কথা কি বুঝেনা ॥

প্রেমেরে হাটে বেচাকেনা
করিতে আসিয়া,
খুঁজে বেড়ায় মনপাখি
হৃদ পিঞ্জিরা নিয়া।
কোনখানে তার মিলেনা দেখা
হইলো একি যন্ত্রণা ॥

(এখন) কান্দি বসে নদীর কুলে
ঘাটে নাই তরী,
যাবো আমি ঐকুলেতে
উপায় কি যে করি।
দারুন এই বিপদের কালে
কোথায় পাবো ঠিকানা ॥

না জেনে প্রেম করতে আইসা
করলাম একি ভুল,

www.pathagar.com

জীবন দিয়া শোধ করিব
ভুলেরই মাশুল।
মনের ওজন না করিলে
দেখা যে তার মিলে না ॥

৭.
ও প্রাণ বন্ধুরে আমার,
কেন এত নিঠুর হইলা বন্ধু
প্রাণে সহেনা যে আর ॥

দিবানিশি কান্দি আমি
নিরালায় বসিয়া,
ছেড়ে গেলা কোন দোষেতে
একেলা ফেলিয়া।
অন্তরেতে জ্বলছে আগুন (আমার)
পুইড়া হই অঙ্গার ॥

আমায় পিরীতের বাণ
মাইরা বুকে,
তুমি দিন কাটাইছো
মহা সুখে।
কেমন পাষান হৃদয় (তোমার)
নিলানা খবর ॥

কত স্বপন দেখেছিলাম
তোমারে লইয়া,
তোমারই বিরহে আজ
যায় যে মরিয়া।
দুঃখ সাগরে চলছি ভেসে (আমার)
মিলেনা কিনার ॥

৮.
রসিক ছাড়া রসিকার মন
কেউতো বুঝেনা,
মিঠা কথায় তেমন বন্ধু
চিড়া ভিজেনা ॥

ফুলে মধু না থাকিলে
অলি কি আর বসে,
যে ফল কভু যায় না খাওয়া

www.pathagar.com

ঝরে পড়ে শেষে।
গরম ছাড়া তেমনি যে হায়
শীত কাটে না ॥

বিনা মেঘে হয়না বৃষ্টি
চাতক কেঁদে মরিলে,
জালে মাছ যায়না ধরা
জলে মাছ না থাকিলে।
বসন্তকাল ছাড়া বনে
কোকিল ডাকে না।

আকাশেতে পূর্ণিমার চাঁদ
রাতেই শোভা পায়,
মনের মানুষ থাকলে পাশে
পরান ভরে যায়।
দুই-এ মিলে পূর্ণ জীবন
পুরে মনের বাসনা ॥

৯.
ধুক্কুর ধুক্কুর চলছে আমার
শ্যামলা বলদের গাড়ি,
মেলাদিন পর যাচ্ছি সবাই
মোদের নানীর বাড়ি ॥

নানীর বাড়ির আশে-পাশে
হরেক-রকম গাছ,
পুকুরেতে আছে ছাড়া
কতরকম মাছ।
ছিপ ফেইলা ধরবো সে মাছ
কতই মজা করি ॥

কালো গাইয়ের গাঢ় দুধে
রাঁধবে নানী ক্ষীর,
সাথে কাইটা দিবে আরো
মিঠা আমের চির ॥
নানারকম লাড়ু-চিড়া
আরো পিঠা-পুরি ॥

নানার মেজাজ চিচ্চিড়া

www.pathagar.com

বকবে মজা কইরা,
মাঠে মাঠে দেখবো ফসল
রোদ-বাতাসে ঘুইরা।
রাইতে নানীর কাহিনী শুনবো
উঠানে খাট পাড়ি ॥[৫৮]

২৪. নাতির গান

গম্ভীরা গান শুরুর পূর্বে একক কণ্ঠে নাতির গান পরিবেশিত হয়। নানা মঞ্চে প্রবেশের পূর্বের সবার অনুরোধে নাতি–এই গান গেয়ে থাকে। সম্পূর্ণ গ্রামীণ পোশাকে নাতি নেচে নেচে এ গান গেয়ে থাকে। গানের বিষয়বস্তু বিচিত্র। দেশের বিভিন্ন সমস্যা, সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহ, প্রেম-ভালোবাসা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নাতির গান রচিত। গানের ভাষা ও নৃত্যের ভঙ্গি নিতান্তই চাঁপাইনবাবগঞ্জের নিজস্ব। রাকিব উদ্দিন, বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ফাইজুর রহমান মানি, খাবির উদ্দিন প্রমুখ এধারার কবি হিসেবে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

১.
কাঁদবি কত কাল
মাতোর কি জঞ্জাল
বাংরা মা তই

মাগো তোরই ডাকে যুদ্ধ হলো
কত লোকের রক্ত গেল
মা বহিনের ইজ্জত গেল
হলো মোদের সংগ্রাম সফল।

মাগো এ দ্যাশতো স্বাধীন হলো
দ্যাশের মানুষ কিবা পেল
কত সরকার বদল হলো
মোরা হলাম শুধু নাজেহাল।

মাগো মনে করি পেলাম স্বাধীন
কিন্তু মোরা এমন অধিন
মরব যেদিন হবো স্বাধীন
তোর স্বাধীনের কি বা ফল।

মাগো রাজনীতির কোপানলে
দ্যাশ গেল রসাতলে
এমন সংকটকালে
বঙ্গবন্ধু ধরল হাল ॥

২.
হে নানা আইস্যাছি হামরাজি
আজকের এই অনুষ্ঠানে।
হাঁরঘে যত মনের কথা
খুল্যা কহিব গানে গানে ॥

৩.
আসব ঢাকা লিনু টাকা
আইনু আমরা কাটা বাসে
কি কহিব দুঃখের কথা
শুনলে ঘুর‍্যা যাইবে মাথা
লোকের ভিড়ে চ্যাপ্টা হইনু শেষে।
জনসংখ্যা রোধ না হইলে
মারা পড়ব জানেপ্রাণে ॥

৪.
স্বৈরতন্ত্র খতম হইল
দেশে গণতন্ত্র এলো
সবাই মিলে দেশ গড়
বিশ্বের বুকে তুলে ধরো
জনতা শুভেচ্ছার পাখা মেলো।
সবাই জানুক বাঙালিরা
স্বাধীনতা শব্দের মানে ॥

৫.
দেশে আইল ভাইরে ভোট
সবাই বাঁধো এবার জোট
কারো কথায় না কান দিয়া
যোগ্য ব্যক্তি নাও খুঁজিয়া
নিওনা পকেটে কেহু নোট।
ভাল লোককে ভোট না দিলে
পস্তাবে সবাই মনে মনে ॥

৬.
নারী জাতি ভক্তিমতি
তারা কত অসহায়
প্রতিদিনই খবর আসে
অবলাদের সর্বনাশে
নির্যাতন চল্যাছে হায়রে হায়।
যৌতুক ধর্ষণ এসিড নিক্ষেপ
নারী পাচার হইথে সবাই জানে ॥

www.pathagar.com

৭.
লিয়া দিক্ষা বিদ্যা শিক্ষা
ভাইরে না করিলে পরে
হইবে না উন্নতি দেশে
পড়্যা থাকবো দেখিও অবসরে।
গণশিক্ষা চালু হইলে
বড় হবো সবাই জানে ॥

৮.
বাংলা গানে আমেজ আনে
নানা সকলেরই মনে
পশ্চিমা সুর বাদ্যযন্ত্রে
পপ জাজেরই তন্ত্রেমন্ত্রে
খাঁটি সংগীত পালাইল কোনখানে।
অপসংস্কৃতি ঘুঁচাও
ঐতিহ্য ঘুচাও প্রাণপনে ॥

৯.
ধূমপান মানে বিষপান
দেখছি যে ভাই বিজ্ঞাপনে
হেরোইন গাঁজা যেই হারে
করছে যেসব চারিধারে
ধ্বংস হবে মানব জাতি প্রাণে।
চিন্তা শক্তি জাগাও তোমরা
দূর করো এসব অভিযানে ॥[৫৯]

২৫. দেহতত্ত্বের গান

চাঁপাইনবাবগঞ্জের লোককবিরা দেহতত্ত্বে গান রচনা করে এই ধারাটিকে লালন করে আসছেন। মানুষের দেহের মধ্যেই আরশ-কুরশি, আল্লাহ এই দেহের মধ্যেই বসবাস করেন। অথচ আল্লাহকে আমরা খুঁজে বেড়াই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে, আকাশ পাতালে। আমাদের এই যে ভ্রণ তা দূরীভূত করে দেহতত্ত্ব গানে। মানবদেহে সপ্ত আকাশ, দশদ্বার এবং সূক্ষ্ম বস্তুসমূহ বিরাজমান। সপ্ত আকাশ বলতে পায়ের তালু, তালুর ওপরে গিরা হাঁটুর গিরা, কোমর, বুক, গলা ও মাথার তালুকে বোঝায়। দশ দ্বার বলতে–দুই চক্ষু, দুই কর্ন, দুই নাসিকারন্ধ্র, একটি মুখগহ্বর, একটি গুহ্যদ্বার, একটি লিঙ্গদ্বার ও ব্রহ্মতালু, বোঝায়। এছাড়া দেহের ভেতরেও পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে। সেগুলো হচ্ছে–মন, বিবেক, ইচ্ছা, ক্রিয়া, ও অহং।

দেহের মধ্যে এত কিছু যে রয়েছে, সাধারণ লোকেরা এসবের কোনই খবর জানেনা। তাই দেহতত্ত্ব গানে জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের আলহাজ

www.pathagar.com

বদিউজ্জামান, আমানুল হক, মহবুব ইলিয়াস প্রমুখ লোককবি দেহতত্ত্ব গান রচনা করে খ্যাতি লাভ করেছেন।

১.

সৃজন করিয়া বিধি মনুষ্য সুন্দর
লীলাভরা অপূর্ব এক মহল অন্দর।

নিজঘরে বালাখানা সাজানো সপ্তমে
একথরে সর্বভোগী রাখিলে গন্দমে

অস্তিমচুড়া পরিপাটি জগত মাঝার
রসভূমে কপাট আঁটা ঘুমান করতার।

কপাটের কড়া যেই নাড়ে ঋষিজন
নির্বিকারে ঘটে জাগে ভাবের গুঞ্জন।

পূর্ণিমার কামভাবে প্রেমের বিকার
মহাযোগে প্রেমযোগ ঘটান অবতার।

প্রেমপথে আসা যাওয়া উজানের চর
অবতর-কবতরে মাখামাখি ঘর।

আসমান-যমীন ফাঁক সর্বলোকে বলে
বিধাতার কাম-প্রেম একপথে চলে।

মহাভাব মহাপ্রেম ভরা সে শহর
প্রেমের দুয়ারে সাধুর উৎফুল্ল অন্তর।

হৃদমাঝে সাঁইগুরুর প্রেমের আসন
অমৃত সুধায় অমর মানব জনম।

২.

শোনরে ও ভাই ভাবুকজনা
ভাবের তরী ভাটায় চলে না।

শুদ্ধ প্রেমিক ভাবুক যে জন
ভাব-দরিয়ায় চলে উজান
রসে ভরা প্রেমের উঠান
জোয়ার-ভাটায় ঠলে না
ভাবের তরী ভাটায় চলে না।

ভাবের রসে শুক্লা-তিথি

www.pathagar.com

সাধক জাগে অহর্নিশি
যোগ মিলনে রবিশশী
ঝড় তুফানে নড়ে না
ভাবের তরী ভাটায় চলে না।

গুহ্য প্রেমিক বারেক তা' য়ালা
সপ্ততালার রংমহলা
ভেদ খুলিলে দরজা খোলা
বেরসিকে জানে না
ভাবের তরী ভাটায় চলে না।

জীবন-যৌবন ভুলেরসাধন
ডুবান তরীর হাজার বাঁধন
শমনকালে ভূতের কাঁদন
তরী পারে ভিড়ে না
ভাবের তরী ভাটায় চলে না।

উজান তরী বাইতে গেলে
জীবন-মরণ সঙ্গে চলে
পারের গুরু শুদ্ধ হলে
মাস্তুলে টান পড়ে না
ভাবের তরী ভাটায় চলে না।

৩.
মন কতকাল বাইবি রে তুই ভাঙা তরীর বৈঠা
পারঘাটার ঐ পারের গুরুর নিরিখ বান্ধরে কইষা
হাওয়ার কলে বৈঠা চলে
জীবন নদীর বুকে
সারাজনম বাইলাম তরী
থুইলাম তোরে সুখে
এখন জীবন যৌবন ভাটার টানে আছি পারঘাটাতে বইসা
এবার গুরুর নিরিখ বান্ধরে মন- বান্ধরে বাঁধন কইষা।

পারাপারের কানাকড়ি হারায়েছি জলে।
জানি-খেয়া পারের মনমাঝি তুই পালাবি কোন ছলে।
আমার-ভাঙা বৈঠা ফুটা তরীর তলা গেছে খইসা
কখন-মনের পাখি উড়াল দিবে দেহখানি চইষা।

বাউল মনা কেঁদে বলে সুরুজ গেলো ডুইবা
জীবন তরীর কুপিখানি গেল বুঝি নিইভা

www.pathagar.com

দেহের বাঁধন আলগা হইল
গেল চোখের আলো হইটা
এন কতকাল বাইবি রে তুই ভাঙা তরীর বৈঠা।
৪.
মরণে মানবের কি হয়?
দিবস-রাতি কোন মহাজন জন্ম-মৃত্যু তত্ত্ব লয়।

বাহানা করিয়া রুহু গুপ্ত-কপাট যেই খোলে
উড়ানকালে জীবাত্মা তার অতীত কর্ম সব ভোলে
বিশ্বরূপীর প্রেম দিওয়ানা জীবাত্মা ফের জনম চাই
মরণে মানবের কি হয়?

কান্ত-চিত তৃপ্ত আত্মা ঘট ফেলিয়া বাইরে যায়
আলোকিত দেহের গঠন পবিত্র নফস তখন পায়
আত্মভোলা দুর্ভাগা প্রাণ অজান্তে নিজ রূপ হারায়
মরণে মানবের কি হয়?

দুনিয়াদারীর গুণটি ছাড়ো
মরার আগে একবার মরো
আত্মতত্ত্ব জানতে পারো
নইলে জনম বিফল হয়
মরণে মানবের কি হয়?[৬০]

দয়াল-গুরুর দয়া বিনে ত্রিনয়ন কি যায় খুলে
কালিমাখা অন্তরে কার বিশ্বমাতার রূপ দোলে
প্রেম-কামনায় টানাটানি মরণে তার মুক্তি নাই
মরণে মানবের কি হয়?

২৬. মুর্শিদি গান

আরবি 'ইরশাদ' শব্দটির অর্থ আদেশ। যিনি ইরশাদ বা নির্দেশ দেন তাকে মুর্শিদ বলে। সে অর্থে মুর্শিদকে গুরু বলা যেতে পারে। এই মুর্শিদ বা গুরুকে প্রতি ভক্তি বিষয়ক সংগীতকে মুর্শিদি গান বলে। আল্লাহকে পেতে হলে মুর্শিদের প্রয়োজন, কেননা মুর্শিদ পথের দিশারি। অথচ পৃথিবীর প্রেম, প্রীতি ভালোবাসার অঙ্গ হয়ে আমরা মুর্শিদ ধরার চিন্তা ভাবনা করিনা।

এক সময় মুর্শিদ গান পিরের দরবার ও মাজারে ফকিররা এই গান গাইতেন। এখন এই গান দরবার, মাজার বা আখড়ায় সীমাবদ্ধ নেই। যারা মাঠের কাজ করে, নৌকা বায়, ছায় পিটায় তাদের কণ্ঠেও শোনা যায় মুর্শিদি গান।

www.pathagar.com

চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত মুর্শিদি গান।

১.

দয়াল কুতুব খাজা মখদুম শাহে কাদরী বোগদাদী
মহাকালগড় তোমার ছোঁয়ায় পায় গো যে প্রাণ পায় আযাদী।
তুরকান বাব মাহে সুলতান
শহিদ গাজী সাবীহ লিল্লাহ
ধন্য তাদের জীবন মরণ
ধন্য তাদের নামের হিল্লা।

নরবলি বিদায় নিল
মহাকালগড় শান্তি পেল
পেল বাদশাহী
ওলীর দোয়ায় বাদশাহী নাম পেল রাজশাহী
আলীকুলী বুলন্দশাহী
পিয়ারে রাব্বানী
গৌড়শাহী নিয়ামতুল্লার
কাসিদা হাক্কানী।

সাধক ওলির প্রেমের সুবাস
বয়ে বেড়ায় আকাশ বাতাস
বহে জান্নাতের নদী
রহম করো হক মুর্শিদী
দয়াল কুতুব খাজা মখদুম শাহে কাদরী বোগদাদী
পদ্মা পাড়ে আছেন মুয়ে মুর্শিদে শাহী
ওলীর দোয়ায় বাদশাহী নাম পেল রাজশাহী।

২.

গৌরবময় প্রভু তুমি পাক-পরোয়ার
আলো হয়ে আছো মিশে বিশ্বের মাঝার।

অপার করুণা তোমার অফুরন্ত মান
রাজিখুশি হয়ে কারো কর রাজ্য দান।

পরাক্রমশালী তুমি গুণমণি সাঁই
কাল দিলে রাজ্য যাবে আজ দেখি নাই।

তুমি ভাঙো তুমি গড়ো উচ্চ তব শির
ফকিরকে করো রাজা রাজাকে ফকির।

অসীম মহিমা তোমার যত গুণগান

www.pathagar.com

তব ইচ্ছায় লভে বান্দা মান-অপমান।

দয়াবান আল্লা তুমি অতি মহীয়ান
তোমা হতে আসে যত মঙ্গল ও কল্যাণ।

রাত দিয়ে ঢেকে দাও দিবসের আলো
আলো দিয়ে করো দূর অন্ধকার কালো।

মৃতকে করো জিন্দা জীবিতরে মৃত
রিজিক পায় কেহ তব ইচ্ছায় অবারিত।[৬১]

মেহেরবান খোদা তুমি অন্তরে সবার
ভরে দাও ভক্তি প্রেম শুধুই তোমার।

খ. গাথা

ইংরেজি Ballad এর প্রতিশব্দ গীতিকা বা গাথা। ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলা গীতিকা বা গাথার উদ্ভব হয়েছে। সুর সহযোগে গাইবার জন্য রচিত হতো বলে গাথার মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলে সুর প্রধান কাহিনি বর্ণনা। এক কথায় বলতে গেলে, গাথা হচেছ এক প্রকার ঐতিহ্যমণ্ডিত ব্যক্তি নিরপেক্ষ গীতিময় কাহিনি।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গীতিকা বা গাথার প্রচলন রয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এখন পর্যন্ত যে সকল গাথা সংগৃহীত হয়েছে তা প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে–

১. নাথ গীতিকা

২. মৈমনসিংহ গীতিকা

৩. পূর্ববঙ্গ গীতিকা।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের গ্রামে-গঞ্জে অসংখ্য গাথা ছড়িয়ে পড়েছে। প্রেম অধিকাংশ গাথার প্রধান উপজীব্য হলেও এখানকার গাথাগুলো রচিত হয়েছে মূলত ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহ নিয়ে। প্রেম নিয়ে রচিত গাথা পাওয়া গেলেও ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে রচিত গাথার প্রতি দর্শক শ্রোতাদের অধিক আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়।

১.

উত্তরবঙ্গের ফকির বিদ্রোহ

দশের সাম্‌নে হাজির হৈনু অসমাতে
ফকির বিদ্রোহের কথা কিছু কহিতে
সত্‌রোশো বাহাত্তর সনে
উত্তরবঙ্গের সবখ্যানে
প্রজাপীড়ন করে বৃটিশ কোম্পানিতে

www.pathagar.com

ফকির ... কহিতে
দশের ... কহিতে।
কোম্পানির দোসর ছিলো দেবী সিংহের মতো জমিদার
কোম্পানির অত্যাচারে প্রজা-বিদ্রোহ শুরু হয় সেবার
ফকির মজনু শাহ্ মূল নেতা
এই সংগ্রামের ছিলেন হোতা
সাথে দেবী চৌধুরাণী
ভবানী পাঠকের নাম শুনি।
প্রজা যতো একমনা
কর দিতে রাজি হয় না
অতিতে বাদশাহি আমলে
ফকিরের কদর প্রচুর মিলে
মাজার মন্দির ধর্মের জাগা
শ্মশান গোরস্থান দরগা
অবাধে করতো যাতায়াত
ফকির সন্ন্যাসী সব জাত।
ব্রিটিশ মনে বাঁধে দানা
এইট্যা তার ভালো লাগে না
তারা টুঁড়ে খালি রোজগার
বসায় তীর্থ যাত্রীদের কর
ফকির সন্ন্যাসী সম্প্রদায়
কর দিতে নারাজ হয়।
ফকির সন্ন্যাসী প্রজাগণে
সভাই গ্যালো আন্দোলনে
সংঘর্ষ বাঁধে সবখানে
সমর্থন দ্যায় কিছু রাজাগণে।
নাটোরের রাণী ভবানীর
এতো বড় জমিদারির
ত্যারো হাজার মাইল জমিদারি
ফকির পায় তাও খাতিরদারি।
সন্ন্যাসী আর দরবেশ
তারা সম্মান পায় অশেষ
সংঘর্ষ বাঁধিলো যখন
ফকির সন্ন্যাসী মৈলো ড্যাডুশোজন
প্রজাকুল ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস
নিহত ক্যাপ্টেন্ টমাস্
ড্যাডুশোজন ফকির মাইর্যা

www.pathagar.com

খাইদ্-পানি লিলে কাইড়াহ্।
বৃটিশের এতো কুশাসন
অস্থির হৈলো জনগণ
মজনু শাহের মৃত্যুর পরে
নেতৃত্ব পায় মুসা ফকিরে
উত্তর বাংলার বহুখানে
সংগ্রাম চলে কোম্পানির সনে।
সত্রোশো সাতাশি সালে
যতো ফকির প্রজা মিলে
রাজশাহীতে ঢ্যুইক্যা গ্যালো
দু-পক্ষে সংঘর্ষ বাঁধিলো
বরকন্দাজ-রা পরাজিত হয়
পরে বেশি বরকন্দাজ যায়।
গাঁ-র লোক ফকির সাহায্যকারী
প্রধান-রা সব বিরূদ্ধচারি
এই থাইক্যা প্রমাণ হয়
গাঁ-র লোক ফকিরের সভায়
নবাবগন্জ অধিবাসী যতো
ফকির বিদ্রোহে সাহায্য দিতো
কেহ্ কয় সন্ন্যাসী বিদ্রোহ
এট্যা শুনি অহরহ
ফকির সন্ন্যাসী ধর্মপ্রাণ
স্বাধীনতায় ম্যালায় দান।

একটা কথা আইলো পশ্চাতে
শ্রোতাগণের জ্ঞাতার্থে
ফকির বিদ্রোহ কালে
সাহায্য করতো সকলে
টিং-খরচা নামে খ্যাত
এ-নাম সাধারণ্যে পরিচিত।
২.

নবাবগন্জে নীল বিদ্রোহ

ইংর্যাজের জুলুমের কাহিনী
শুনেন্ শ্রোতা শিরোমণি
ইংর্যাজ জাতি নিষ্ঠুর অতি
করে তারা বেন্যাবৃত্তি
সারাদ্যাশে বৃটিশ বেন্যা

www.pathagar.com

নব্‌গন্‌জও বাদ পড়েনি
শুনেন... শিরোমণি
ইংর‍্যাজের... কাহিনি।
নীলকরের নীলা বিষে জর্জরিত চাষী
রামচন্দ্রপুরের কথা কিছু কহিতে প্রত্যাশী–
নব্‌গন্‌জ জেলার অন্তরগতি
মহানন্দার তীরবর্তী
উনবিংশ শতাব্দীতে
ব্রিটিশ এই এলাকাতে
নীলকুঠি গড়িয়্যা তোলে।
রেশম চাষকে সোঁতে লিলে
বারঘোরিয়্যা নূরপুরে
ইংর‍্যাজ বাজার রামচন্দ্রপুরে।
সতেরোশো পছাত্তর সালে
দ্যাশে নীলচাষ গড়ে তোলে
আঠারোশো তিরিশ সালে
বারোঘোর‍্যা মহানন্দার কূলে।
রামচাঁদপুর হাটখলা
এসব জাগায় বৃটিশ নীল
চাষীদের করে অত্যাচার
আদায় করে যতো নীলকর।
নীলচাষ যে করতো না
বেত্রাঘাত তার পাওনা
মাথায় দিতোক্‌ কাদা তুল্যা
কাদায় বীজ দিতোক্‌ ফেল্যা
চারা না বারাহ্‌ তক্‌
মাথায় থাক্‌তো কাদার চাপ
এ্যাতে কাজ না হৈলে
ভিঠায় আগুন দিতো জ্বেলে
হাত-পা বাইন্ধ্যা পিঠ্‌ মোড়াতো
ঘোড়ার পায়ে টানা হৈতো
এইভাবে কতো চাষী
শুন্যাছে পরকালের বাঁশি।
সাহেবি জুলুমের নক্‌শা
কৈহ্যা রাইত্‌ হয়ন্যা ফর্সা
জুলুম সাক্ষী কুঠিবাড়ি
রামচাঁদপুর কাছারিবাড়ি

www.pathagar.com

যোখির‍্যা পুকুর গুহাঘাঁটা
আজও আছে সে সাক্ষীট্যা।
আঠারোশো পঁচানব্বই সালে
রামচাঁদপুরে কুঠি করলে
রাজা রামচন্দ্রের হাঁকে
রামচন্দ্রপুর নাম ডাকে
পাশে ছোট শারিন নদী
এটাই সাহেবিঘাট যুদি
মোদিনীপুর জমিদার
এখ্যানে জমিদারি তার
দু-লাক্ একর বেশি জমি
হুকুম দখল করেন তিনি
চলে নীল রেশমী জুলুম
ভাষায় হয়না তার মালুম।
আঠারোশো একষট্টি সালে
নীল বিদ্রোহ দেখা দিলে
এলাকায় বড় নামধারী
দিয়ানোতুল্লাহ্ চৌধুরী
উনি নীল বিদ্রোহী নেতা
এট্যা কিংবদন্তি কথা।
শ' শ' বিদ্রোহী চাষী
হাতে তুইল্যা লিলে অসি
তারা খোদ নেতার হুকুমে
সংঘবদ্ধ জনে জনে
দু দিগ্ থাইক্যা হামলা চলে
কুঠি বাড়ি চাই দখলে।
কুঠি বাড়ির যতো দালাল
তারা সভাই হৈলো বেহাল
সাহেব গুহাপথে চম্পট
সোঁতে লিয়্যা এঞ্জিল বোট।
মেমসাহেব তো খান্নাসী
গুলি ছাড়ে কসি কসি
ফাঁক বুইঝ্যা দিয়ানোতুল্লাহ্
মেমসাহেবের ধরে গলা
তার বুকের ওপর চৈড়্যাহ্
মেয়ের বুক দিলে ফাইড়্যা
মেমসাহেবের জবান ডায়েরি

www.pathagar.com

দিয়ানোতুল্লাহ্ হত্যাকারী।
সে তখন আত্মগোপন করে
বেতবাড়িয়্যা জঙ্গল ভিতরে
বোয়ালীয়া পির নাম
এই জঙ্গলে তার দরগা-ধাম।
দিয়ানোতুল্লাহ্ কেশের রায়
বারো বছর সাজা হয়
সাজা ভৈর জঙ্গলেতে রয়
রাইতে ইদিগ্ উদিগ্ যায়
সাজা সমায় পার হৈলো
আইনের ফ্যাক্ড়ায় মাফ পাইলো।
বারো বছর লুকিয়াছিলো
তাই লুকা চৌধুরী নাম হৈলো
শরিকদারের কাছে গিয়্যা
সম্পত্তির ভাগ চাহিয়্যা
ব্যর্থ হৈলো যখন
হাঁইট্যা হজ্বে করে গমন।
প্রবাদ বাক্য আছে বর্তমান
সত্য মিথ্যা জানে রহমান
'ব্যাঙ করে কারকুর
সাপ বলে হরি
এ্যাতোদিনে ফুরাইলো রে
লুকা চৌধ্রীর কড়ি।'
সাত বছর গত হয়
দ্যাশে ফিরে দ্যাশের ভাই
মহারাজপুর নিজের ঘর
মস্জিদে দিন কাটে তার
মস্জিদ সুলতানি আমলে করা
এই মস্জিদের পৈখোরা
মস্জিদে কাটিল জীবন।
একশো পাঁচ বছর বয়স তখন
মৃত্যুর কোলে পৈলো ঢৈল্যা
পড় সভাই ইন্ন্যালিল্ল্যাহ্
নীল বিদ্রোহের নেতা
অখন সেই কথা গাঁথা
তুমি বিপ্লবের দিশারি
ওহে দিয়ানোতুল্লাহ্ চৌধুরী
ওরফে লুকা চৌধুরী।[৬২]

www.pathagar.com

৩.

তেভাগা আন্দোলন

নব্‌গন্‌জে সাঁওতালি আন্দোলন
শুনেন শ্রোতা সর্বজন
সাঁওতাল জাতি কর্মঠ অতি
বিশ্বস্থতায় সত্যবাদী, মিথ্যাবাদী হয় তাদের দুশমন
শুনেন ... সর্বজন
নব্‌গন্‌জে ... সর্বজন।
এই আন্দোলনের কথা শুন্‌লে
শরীলের রোম হইয়্যা যায় খাড়া
সাঁওতাল বিদ্রোহ নামে আন্দোলনের ধারা
আমনুরা নাচোল রহুনপুর
সাঁওতাল বাস তখন প্রচুর।
আঠারোশো পঞ্চান্ন সালে
বিদ্রোহ করে সাঁওতালে
বৃটিশ সরকার ও জমিদার
কুঠিয়ালাদের অত্যাচার
সাঁতালি জমি খাস করো
জমিদারের পুয়া বারো
মহাজনদের কি মজা হয়
একগুণ দিলে সাতগুণ আদায়।
বিদ্রোহী সাঁতালগণ
মারে সুদখোর মহাজন
ইংরেজরাও কিছু মরে
বৃটিশ এইট্যা দমন করে।
বহু সাঁতাল মারা যায়
বৃটিশ কি করে উপায়
যতো সাঁতাল এলাকায়
নন্‌-রেগুলেশান ঘোষণা দ্যায়
সাঁতালের যে জানের ভয়
বাস করে ভিন্‌ জাগায়।
উনিশশো বত্রিশ সালে
ছিলো তাদের দাবির মূলে
সাঁওতাল শাসিত অঞ্চল
শ্যাষে বিধি হইলো কাল
সাঁতাল বিদ্রোহে যারা নেতা
জিতু-রামু সর্দারের কথা।

www.pathagar.com

সাঁতাল বৃটিশ যুদ্ধ হয়
তিরন্দাজ সাঁতাল সম্প্রদায়
বৃটিশের বন্দুকের কাছে
তীরের যুদ্ধ মাইর খাইছে
ম্যালাই সাঁতাল মারা যায়
বৃটিশের মানুষ কিছু ক্ষয়।
পরবর্তী বিদ্রোহ কাল
উনিশশো আটচল্লিশ সাল
পাকিস্তানি শাসক দল
ম্যালাই মারিল সাঁওতাল
জিতু-রামু সর্দারগণে
তে-ভাগার আন্দোলনে
জমিদার জোত্‌দারেরা
মহাজন আর দালালেরা
এ্যার ঘে টাকার আস্ফালনে
কৃষক-কুল গোরস্তানে।
সাঁতাল আর বর্গাচাষী
আন্দোলনের মোক্ষম অসি
জমিদারি উচ্ছেদ হয়
অত্যাচার কমে যায়
সাঁতাল করে জমিতে বাস
ম্যালাই ধানের করে চাষ।
সব ধান জমির মালিকের
থোড়াই থাকে সাঁতালে
জমিদারি যাওয়ার পর
বিওবানরাই জোতদার
সাঁতাল আর বর্গাচাষী
দিনমজুর এরাই বেশি।
উত্তরবঙ্গের নাম পুরানা
মহাভারতে আছে জানা
পৌণ্ড্রসমাজ নমঃশুদ্র
এ অঞ্চলে বাস করিত
ঐতিহাসিকেরা জ্ঞানের খনি
নাম দিয়্যাছে বরেন্দ্রভূমি।
সরকার জোতদার পুলিশ মিলে
সাঁতাল দাবির বৈরী হৈলে
সাঁতাল হৈলো লহুর জমি

www.pathagar.com

তাইতো লাল বরেন্দ্রভূমি
আরাক মজা বাইধ্যা গ্যালো
তে-ভাগা আন্দোলন আইলো।
সাঁওতাল বিদ্রোহ নেতারা
এ্যাতে যোগ দিলো তারা
কৃষক মজুর সাঁওতাল মিল্যা
আন্দোলন দিলে তুঙ্গে তুল্যা
এই আন্দোলনের হোতা
রমেনমিত্র যুবনেতা
তার স্ত্রী ইলা মিত্র
আন্দোলনে দ্যায় নেত্রীত্ব।
সাঁওতাল মাত্‌লা সর্দার
দলের নেতা বরাবর
আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র
নাম হৈলো নাচোল বিদ্রোহ।
ইলা মিত্রের কঠোর শ্রমে
জোয়ার আসে আন্দোলনে
সাঁতালদেরকে শিক্ষা দিতো
সাঁতালরা রাণী'মা ডাকিতো।
ইলা মিত্র বুদ্ধির বলে
সাঁতালদের ভাষা শিখ্যা লিলে
জোতদারগণ অবস্থার ফ্যারে
কিছু দাবি স্বীকার করে
গোপনে যতোসব জোতদারে
সরকারের সোঁতে আঁতাত করে।
দ্বি-মুখি নীতি লিলে তারা
আন্দোলনের নেতা ছিলো যারা
তাদের সোঁতে ওকথা বলে
নানান্ কলাকৌশলে।
জোতদার করে রিপোর্ট পাচার
গুপ্ত রিপোর্ট পায় সরকার
দারোগার সোঁতে পুলিশবাহিনী
দমন হেতু যায় তখনি।
দু'দলে যুদ্ধ বাইধ্যা গ্যালো
দারোগাসহ পুলিশ মরিল
সরকার সেনাবাহিনী প্যাঠায়
তারা ম্যালাই বাড়ি পুড়ায়

www.pathagar.com

ম্যালা মানুষ মারা যায়
ম্যালা মানুষ উধাও হয়
কিছু নেতা ভারতে পালায়
ম্যালা ধরা পইড়্যা যায়।
ইলা মিত্র রহনপুরে
রাইতের ব্যালা তারে ধরে
চলে স্টিমরোলার
নির্য্যাতন বেশুমার
বন্দিদের নানা নির্য্যাতন
সে কথা যায়না কহন
ইলা মিত্র বন্দি অবস্থায়
দশ-বিশ দিন নব্‌গন্‌জ থানায়।
সব খুনের দোষ দিলো তারে
অস্থির হৈলো অত্যাচারে
রাজশাহী সদর কারাগারে
সেলে দ্যায় এক বছর পরে।
আদালতের কাঠগড়ায়
মর্মান্তিক জবানবন্দি দ্যায়
ভাষার সাধ্য নাই বর্ণনার
যাবজ্জীবন দণ্ড হৈলো তার।
হাইকোর্টে আপিলের পর
দণ্ড কমে যায় তার
জেল খাটা শ্যাষ হৈলে
ভারতবর্ষে যায় চলে
ইলা মিত্রের বিদ্রোহ কাহিনী
সভারি কাছে পরশমণি
ইতিহাসের উজ্জ্বল নক্ষত্র
কৃষকনেত্রী ইলা মিত্র।[৬৩]

তথ্যনির্দেশ

১. ড. প্রদ্যোত ঘোষ, গম্ভীরাঃ লোকসংগীত ও উৎসবঃ একাল ও সেকাল, পৃষ্ঠা ৩৪, কলকাতা ১ম প্রকাশ, ১৯৬৯
২. ড. প্রদ্যোত ঘোষ, লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা, পুনর্বিচার, পৃ.১১, পুস্তক বিপনি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ০০৯, ১ম প্রকাশ ১৪১০
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
৪. ড. প্রদ্যোত ঘোষ, লোক সংস্কৃতি 'গম্ভীরা' পৃষ্ঠা.১০, পুস্তক বিপনী ২৭, বেনিয়াটোলা, কলকাতা- ১৯৮২

www.pathagar.com

৫. শ্রী হরিদাস পালিত, আদ্যের গম্ভীরা, জাতীয় শিক্ষক সমিতি, মালদাহ, ১৩১৯,পৃ.৬
৬. ড. প্রদ্যোত ঘোষ, লোক সংস্কৃতি ও গম্ভীরা পুনর্বিচার, পৃষ্ঠা ৭৯, পুস্তক বিপনী, ২৭ বেনিয়া টোলা লেন, কলকাতা ০০৯
৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮০
৮. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক সাহিত্য, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৮
৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৬১
১০. ড. প্রদ্যোত ঘোষ, লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা পুনর্বিচার, পৃষ্ঠা ৬৬, পুস্তক বিপনী ২৭, বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা-০০৯
১১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯৩
১২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯৫
১৩. ফাইজুর রহমান মানি(গম্ভীরা গানের নাতি), চাঁপাই গম্ভীরা, ডাক-উপজেলা ও জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ তারিখ- ২০১২ এর বিভিন্ন সময়
১৪. সাক্ষাৎকার মাহবুবুল আলম(গম্ভীরা গানের নানা), চাঁপাই গম্ভীরা, তারিখ- ২০১২ এর বিভিন্ন সময়। ও ফাইজুর রহমান মানি, প্রাগুক্ত
১৫. খাইরুল আলম,(গম্ভীরা শিল্পী) সহকারী শিক্ষক, হরিমোহন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ডাক- উপজেলা ও জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ। তারিখ- ২০১২ এর বিভিন্ন সময়
১৬. তদেব
১৭. সাক্ষাৎকারঃ মাহবুবুল আলম ও ফাইজুর রহমান মানি, প্রাগুক্ত
১৮. সাক্ষাৎকারঃ মাহবুবুল আলম ও ফাইজুর রহমান মানি, প্রাগুক্ত
১৯. সাক্ষাৎকারঃ সৈয়দ শাহজামাল, এম.এ.এল.এল.বি. রসকস চাঁপাই গম্ভীরা দল, ঘুঘুডিমা, ডাক- গোবরাতলা, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ
২০. তদেব
২১. সাক্ষাৎকারঃ সাবিনা ইয়াসমিন, প্রভাতি মহিলা গম্ভীরা দল, মসজিদ পাড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। ২৫.০৩.২০১২
২২. সাক্ষাৎকারঃ এটিএম শহীদুল আলম(বয়স- ৬১), পিতা- বিলাত আলী মণ্ডল, গ্রাম- চামাগ্রাম,ডাক- বারঘরিয়া, উপজেলা ও জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ। তারিখ- ০৭.০৬.২০১২
২৩. তাহেরা ইসলাম, স্বামী- সিরাজুল ইসলাম, মাতা- মরহুম জায়েদা বেগম, গ্রাম- বারোঘরিয়া, পোস্ট- বারোঘরিয়া, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৬২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- উচ্চ মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ২৭/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
২৪. সিরাজুল ইসলাম, পিতা- মরহুম মোজাফ্ফর হোসেন মিয়া, মাতা- মরহুম মালেকা বেগম, গ্রাম- বারোঘরিয়া, পোস্ট- বারোঘরিয়া, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৭২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতকোত্তর, সংগ্রহের তারিখ- ২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
২৫. খাইরুল আলম, পিতা- মরহুম ইদ্রিস আলী, মাতা- মৃত আলতু বেগম, গ্রাম- হরিপুর মিয়াপাড়া, পোস্ট- চাঁপাই- দূর্গাপুর, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
২৬. মাহবুবুল আলম, পিতা- সাদাতুল ইসলাম, মাতা- বিলকিস বানু, গ্রাম- চাঁপাই- দূর্গাপুর, পোস্ট- উপররাজারামপুর, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ,

www.pathagar.com

বয়স- ৬০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২১/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা

২৭. মোহিত কুমার দাঁ, পিতা- ভূদেব দাঁ, মাতা- শৈল বালা দাঁ, গ্রাম- ইসলামপুর, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৭৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২১/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা

২৮. মেহবুব রাজা, পিতা- মহবুব ইলিয়াস, মাতা- সুরাইয়া বেগম, গ্রাম- নতুন ইসলামপুর, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৬৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- উচ্চ মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

২৯. শাহ্জাহান প্রামাণিক, পিতা- মরহুম রুস্তম প্রামাণিক, মাতা- দুলু বিবি, গ্রাম- মসজিদপাড়া, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৫৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

৩০. রহিমা বেগম, স্বামী- মোঃ আব্দুর রহমান, মাতা- রওনোকআরা বেগম, গ্রাম- দলদলি, পোস্ট- ভোলাহাট, উপজেলা- ভোলাহাট, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- পঞ্চম শ্রেণী, সংগ্রহের তারিখ- ২৭/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

৩১. আকলিমা বেগম, স্বামী- মোঃ আবুল কাশেম, মাতা- খোদেজা বেগম, গ্রাম- বিশালপুর, পোস্ট- নাচোল, উপজেলা- নাচোল, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৫০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- তৃতীয় শ্রেণী, সংগ্রহের তারিখ- ২৮/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

৩২. মনোয়ারা বেগম, স্বামী- মোহাম্মদ আলী, মাতা- মুর্শেদা বেওয়া, গ্রাম- চরজোতপ্রতাপ বালুবাগান, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৩৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- উচ্চ মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ০১/১২/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

৩৩. অনন্যা ইয়াসমিন অংকন, পিতা- আবুল কাশেম অনু, মাতা- নিলুফার ইয়াসমিন, গ্রাম- পাঠানপাড়া, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ১৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- দশম শ্রেণী, সংগ্রহের তারিখ- ০২/১২/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

৩৪. আকলিমা বেগম, স্বামী- মোঃ আবুল কাশেম, মাতা- খোদেজা বেগম, গ্রাম- বিশালপুর, পোস্ট- নাচোল, উপজেলা- নাচোল, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৫০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- তৃতীয় শ্রেণী, সংগ্রহের তারিখ- ২৮/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

৩৫. মোঃ মেহেদি হাসান, পিতা- মোঃ রেজাউল করিম, মাতা- আকলিমা খাতুন, গ্রাম- চাঁন্দলাই, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ২৭ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২৭/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

৩৬. সাক্ষাৎকার: মোসাঃ রুপিয়ারা বেগম (বয়স– ৩৬), স্বামী– মো. একরামুল হক, গ্রাম– বেহুলা, ডাক– গোবরাতলা, উপজেলা ও জেলা– চাঁপাই নবাবগঞ্জ। সাক্ষাতের তারিখ– ০৯.০২.১২

www.pathagar.com

৩৭. তদেব
৩৮. তদেব
৩৯. সাক্ষাৎকার: মোসাঃ মুসলেমা খাতুন (বয়স−১৮), পিতা− মো. সাইদুল হক, গ্রাম− বেহুলা, ডাক− গোবরাতলা, উপজেলা ও জেলা− চাঁপাই নবাবগঞ্জ। সাক্ষাতের তারিখ− ১৩.০২.১২
৪০. সাক্ষাৎকার: মোসাঃ পিয়ারা বেগম (বয়স− ৩৮), স্বামী− মো. মহসিন আলী, গ্রাম− বেহুলা, ডাক−গোবরাতলা, উপজেলা ও জেলা− চাঁপাই নবাবগঞ্জ। সাক্ষাতের তারিখ− ১৩.০২.১২
৪১. শাহ্জাহান প্রামাণিক, পিতা- মরহুম রুস্তম প্রামাণিক, মাতা- দুলু বিবি, গ্রাম- মসজিদপাড়া, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৫৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৪২. আবুল কাশেম অনু, পিতা- আব্দুল কুদ্দুস, মাতা- আসমা খাতুন, গ্রাম- পাঠানপাড়া, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- উচ্চমাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ০২/১২/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৪৩. অনন্যা ইয়াসমিন অংকন, পিতা- আবুল কাশেম অনু, মাতা- নিলুফার ইয়াসমিন, গ্রাম- পাঠানপাড়া, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ১৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- দশম শ্রেণী, সংগ্রহের তারিখ- ০২/১২/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৪৪. শাহ্জাহান প্রামাণিক, পিতা- মরহুম রুস্তম প্রামাণিক, মাতা- দুলু বিবি, গ্রাম- মসজিদপাড়া, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৫৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৪৫. শ্রী সমর সাহা, পিতা- মৃত সরজ সাহা, মাতা- সুনীতি সাহা, গ্রাম- মিস্ত্রিপাড়া, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৩৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- উচ্চমাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৪৬. গোলাপী বেগম, স্বামী- নওসাদ আলী মিস্ত্রি, মাতা- জরিনা বেগম, গ্রাম- মহারাজপুর, পোস্ট- মহারাজপুর, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৫০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- পঞ্চম শ্রেণী, সংগ্রহের তারিখ- ০৩/১২/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৪৭. রহিমা বেগম, স্বামী- মোঃ আব্দুর রহমান, মাতা- রওনোকআরা বেগম, গ্রাম- দলদলি, পোস্ট- ভোলাহাট, উপজেলা- ভোলাহাট, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- পঞ্চম শ্রেণী, সংগ্রহের তারিখ- ২৭/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৪৮. কৃষ্ণ লাকড়া, পিতা- যতিন লাকড়া, মাতা- আন্ধারী লাকড়া, গ্রাম- বিশালপুর, পোস্ট- নাচোল, উপজেলা- নাচোল, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৫০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- চতুর্থ শ্রেণী, সংগ্রহের তারিখ- ২৮/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা

www.pathagar.com

৪৯. মিনতী এক্কা, পিতা- কেষ্ট এক্কা, মাতা- সুধনী এক্কা, গ্রাম- বিশালপুর, পোস্ট- নাচোল, উপজেলা- নাচোল, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৩৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ২৮/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা
৫০. বাসন্তি তিগ্গা, পিতা- রামলাল তিগ্গা, মাতা- কামিনী তিগ্গা, গ্রাম- খান্দুরা, পোস্ট- নাচোল, উপজেলা- নাচোল, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ২৮/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৩:৩০ টা
৫১. সুবর্ণা কুজুর, পিতা- জীবন কুজুর, মাতা- রজনী কুজুর, গ্রাম- কোচাইবাড়ী, পোস্ট- কসবা, উপজেলা- নাচোল, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ২৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ২৮/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৩:৩০ টা
৫২. স্বপ্না কিসপট্টা, পিতা- পাত্রাস কিসপট্টা, মাতা- দিপালী কিসপট্টা, পোস্ট- ধানসুরা, উপজেলা- নাচোল, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ২৪ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ২৮/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা
৫৩. গোপিন মূর্মু, পিতা- ছোটে মূর্মু, মাতা- সন্ধ্যা টুডু, গ্রাম- চাপড়া, পোস্ট- বিনোদপুর, উপজেলা- শিবগঞ্জ, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ২২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ২৮/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা
৪৪. দেবীলাল টুডু, পিতা- বিরু টুডু, মাতা- সীতা হেমব্রম, গ্রাম- দেলবাড়ী, পোস্ট- গোবরাতলা, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ২৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ২৯/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা
৫৫. কর্নেলুইস মূর্মু, গ্রাম- দেলবাড়ী, পোস্ট- গোবরাতলা, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৯ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ২৯/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা
৫৬. সীমা মূর্মু, স্বামী- নরেন মার্ডি, মাতা- অনিতা মার্ডি, গ্রাম- ঝিকড়া, পোস্ট- নাচোল, উপজেলা- নাচোল, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৩০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ২৮/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা
৫৭. মাহবুবুল আলম, পিতা- সাদাতুল ইসলাম, মাতা- বিলকিস বানু, গ্রাম- চাঁপাই- দূর্গাপুর, পোস্ট- উপররাজারামপুর, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৬০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২১/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা
৫৮. খাইরুল আলম, পিতা- মরহুম ইদ্রিস আলী, মাতা- মৃত আলতু বেগম, গ্রাম- হরিপুর মিয়াপাড়া, পোস্ট- চাঁপাই- দূর্গাপুর, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৫৯. ফাইজুর রহমান মানি, পিতা- মরহুম ইউনুসুর রহমান, মাতা- উমরাতুন নেসা, হাসপাতাল রোড, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৯ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৬০. আমানুল হক, পিতা- মরহুম আলহাজ নুরুল হক, মাতা- মৃত মালেকা খাতুন, গ্রাম- বারোঘরিয়া, পোস্ট- বারোঘরিয়া, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-

www.pathagar.com

চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৫৯ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতকোত্তর, সংগ্রহের তারিখ- ২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:৩০ টা

৬১. আমানুল হক, পিতা- মরহুম আলহাজ নুরুল হক, মাতা- মৃত মালেকা খাতুন, গ্রাম- বারোঘরিয়া, পোস্ট- বারোঘরিয়া, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৫৯ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতকোত্তর, সংগ্রহের তারিখ- ২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:৩০ টা

৬২. মেহবুব রাজা, পিতা- মহবুব ইলিয়াস, মাতা- সুরাইয়া বেগম, গ্রাম- নতুন ইসলামপুর, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৬৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- উচ্চ মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

৬৩. নাজমা বেগম, পিতা- মহবুব ইলিয়াস, মাতা- সুরাইয়া বেগম, গ্রাম- নতুন ইসলামপুর, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

www.pathagar.com

লোকবাদ্যযন্ত্র

গীত, বাদ্য ও নৃত্য–এই তিনের সমন্বিত রূপ হলো সংগীত। মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত সুরধ্বনিকে অধিক মধুর করে তোলে বাদ্যধ্বনি। সংগীত ও নৃত্যে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার প্রাধান্য পেলেও মানবজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্র যেমন–ধর্ম-কর্ম, উৎসব-অনুষ্ঠান, শোভা, যুদ্ধক্ষেত্র প্রভৃতিতে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার আছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয়ভাবে তৈরি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার লক্ষণীয়। স্থানীয়ভাবে দেশীয় বিভিন্ন বাঁশ-কাঠ, কাঁসা-লোহা তার ইত্যাদি সামগ্রী ব্যবহার করে এসব বাদ্যযন্ত্র তৈরি করা হয়ে থাকে।

এসব লোকবাদ্যের মধ্যে ঢোল, বাঁশি, করতাল, খোল, খঞ্জনি, তবলা, মাদল, একতারা, দোতারা, সেতারা, মন্দিরা, হারমোনিয়াম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব বাদ্যযন্ত্র স্থানীয়ভাবে তৈরি।

বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ, মেরামত কারখানা জেলা, উপজেলা ও গ্রমাঞ্চলেও রয়েছে। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাতেও এসব বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত রয়েছে।

১. বাঁশি

বাঁশি চাঁপাইনবাবগঞ্জের সবচেয়ে জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্র। এখানকার সব সম্প্রদায়ের ছোট-বড় সব শ্রেণির মানুষ বাঁশি বাজিয়ে আনন্দ উপভোগ করে থাকে। বাঁশি স্বয়ংসিদ্ধ বাদ্যযন্ত্র; সুতরাং গান, নাচ বা অন্য বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই নানা রাগে সুর তুলতে পারে।

বাঁশি তৈরির উপকরণ অতি সাধারণ। তবলা, বাঁশের সরু একটি পোড় (দুই গিটের মধ্যবর্তী অংশ) দিয়ে বাঁশি তৈরি করা হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জে বিভিন্ন ধরনের বাঁশির ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

আড় বাঁশি

আড় বাঁশি বা মুরলী এখানে সবচেয়ে জনপ্রিয় বাদ্য। প্রায় এক হাত লম্বা এই বাঁশিতে মোট ৭টি গোল ছিদ্র থাকে। এর মধ্যে একটি উপরে গিটের কাছে, অন্যগুলো নিচের দিকে একই রেখা বরাবর থাকে। বাঁশির আড়াআড়ি মুখের কাছে ধরে ফুঁ দেয়া হয়। আর ছয়টি ছিদ্র পথে দুই হাতের ছয় আঙ্গুলের সঞ্চালন দ্বারা স্বর নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অধিকাংশ লোক সংগীত যেমন– গম্ভীরা, আলকাপ ও পল্লীগীতিতে আড় বাঁশি ব্যবহার করা হয়।

www.pathagar.com

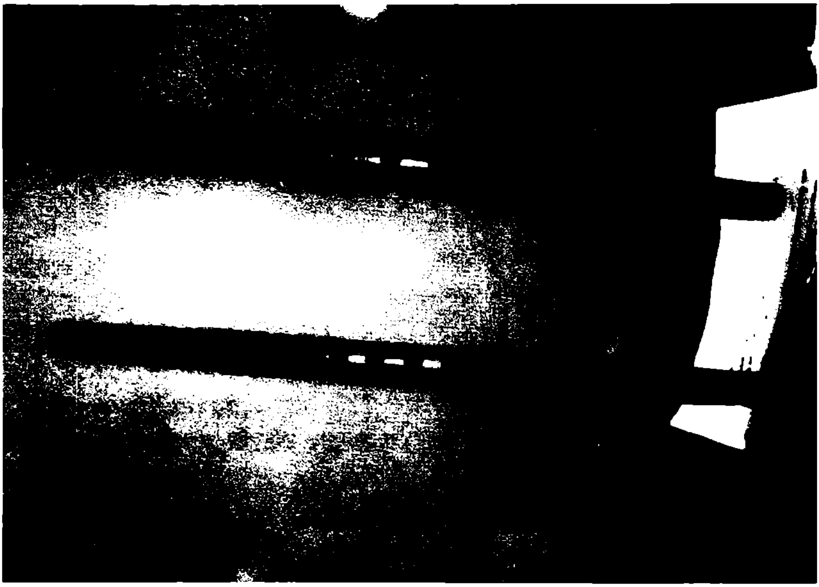

বাঁশি

কদ বাঁশি

কদ বাঁশির আকৃতি ভিন্ন প্রকৃতির। ফুঁ দেয়ার জন্য এর মাথায় একটি ছিদ্র থাকে। যা হুইসেলের মতো মুখে পুরে বাজানো হয়। এই জন্য মাথাটি তেরছা বা বাঁকা ভাবে কাটা হয়। কদ বাঁশি সোজাসুজি ধরে বাজানো হয়। এতে সুর তোলার জন্য ৬টি ছিদ্র থাকে।

পাতা বাঁশি

গাছের পাতার কিছু অংশ মুখে পুরে সামান্য বাঁকা করে হাত ধরে ফুঁ দিয়ে বাজানো বাঁশি চাঁপাইনবাবগঞ্জে পাতা বাঁশি নামে পরিচিত। দক্ষ বাদক এই পাতার বাঁশির সাহায্যে গানের সুর পর্যন্ত তুলতে পারে।

ভেপুঁ

পাকা আমের আঁটির অঙ্কুর গজিয়েছে কিংবা চারা সামান্য বড় হয়েছে, এরূপ অবস্থায় তা মাটি থেকে তুলে বাইরের শক্ত খোলস ছাড়িয়ে নিয়ে একপাশ তেরছা ভাবে ঘষে কদ বাঁশির মতো 'মুখা' তৈরি করতে হয়। এই তেরছা অংশ মুখে পুরে ফুঁ দিলে পুঁ ধ্বনির সৃষ্টি হয়। এতে পল্লির ছেলে-মেয়েরা খুব আনন্দ উপভোগ করে থাকে।[১]

২. একতারা

চাঁপাইনবাবগঞ্জের অধিকাংশ লোকশিল্পী একতারা বাজিয়ে গান গেয়ে থাকেন। একতারা তৈরি করতে উপাদান হিসেবে লাউয়ের গোল, বাঁশ, তার ও চামড়ার দরকার হয়।

পাকা লাউয়ের গোলের উভয় দিক কেটে নিচের অংশে চামড়া লাগাতে হয়। একটা তল্লা বাঁশ বা শক্ত কঞ্চির মাথায় গিট রেখে দুই ফালি করে ফেড়ে লাউয়ের গোলের দুই পাশ চিমটার মতো করে আটকে দেয়া হয়।

চামড়ার তলদেশ থেকে একটি তার এনে বাঁশের উপরের মাথায় একটি খিলের সাহায্যে পেচিয়ে বাঁধা হয়। আঞ্চলিক ভাষায় একে 'কান' বলা হয়। কান টান ঢিল করে একতারা স্বর নিয়ন্ত্রণ করা হয়।[২]

৩. দোতারা

চাঁপাইনবাবগঞ্জের গম্ভীরা, আলকাপ ও কবিগানে দোতারা ব্যবহৃত হয়। এই যন্ত্রে চারটি তার থাকে, কিন্তু বাজানো হয় দুটি।

এজন্য এর নাম দোতারা। লম্বা 'ডই' এর আকার বিশিষ্ট কাঠের মূল কাঠামোর সাথে ছাগলের চামড়ার ছাউনি দিয়ে দোতারা তৈরি করা হয়। তার ও চামড়া ছাড়া দোতারা অন্যান্য অংশের নাম কান, ঘোড়া, ফেসি ও কাঠ। দোতারা ঘোড়ার ফেসির সঙ্গে তার বাঁধা থাকে।

ফেসি হলো লোহা বা পিতলের একটা ক্ষুদ্র চাকতি। চামড়ার ছাউনির উপর মাঝামাঝি জাগায় একটা টুকরা কাঠ থাকে একে 'ঘোড়া' বলা হয়। তারগুলো ঘোড়ার উপর দিয়ে টেনে মাথায় কানের সাথে বাঁধা হয়।

দোতারার অপর একটি অংশ 'কটি' বা 'খুটনি' যা গরু-মহিষের বা হাড় দিয়ে তৈরি করা হয়। দোতারা বাম হাতে আড়াআড়িভাবে ধরে ডান হাতে কটি দ্বারা তারে আঘাত করে সুর সৃষ্টি হয়।[৩]

৪. ঢোল

ঢোল অতি প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র। ঢোল গলা থেকে কোমড় পর্যন্ত ঝুলিয়ে নেচে নেচে নানা ছন্দে বাজানো হয়। একটি মোটা কাঠের খণ্ড ভেতর দিক বাটালি দ্বারা ফাঁকা করে দুই প্রান্তে গরু বা ছাগলের চামড়া লাগিয়ে ঢোল তৈরি করা হয়। কাঠের খোলের মাধ্যভাগ একটু স্ফিত হয়। উভয় মুখের চারপাশে যুক্ত পিতলের আংটা বা রিং এর সঙ্গে টানা বাঁধা হয়। ডান দিকে ডান হাতে আট-দশ ইঞ্চির একটা মাথাওয়ালা গোল কাঠির আঘাত দিয়ে আর বাম দিকে বাম হাতের করতল ও আঙ্গুলি সঞ্চালন করে ঢোল বাজানো হয়।

৫. খোল

মাটি অথবা কাঠ নির্মিত খোলের দুই প্রান্তে চামড়া লাগিয়ে এবং চামড়ার টানা বেঁধে খোল তৈরি করা হয়। এর এক প্রান্ত সরু অপর প্রান্ত ঈষৎ প্রশস্ত হয়। কোলে রেখে অথবা সামনের মাটিতে রেখে দুই হাতের তালু ও আঙুল দিয়ে বাজানো হয়। খোল কীর্তনের একটি আবশ্যিক বাদ্যযন্ত্র।

www.pathagar.com

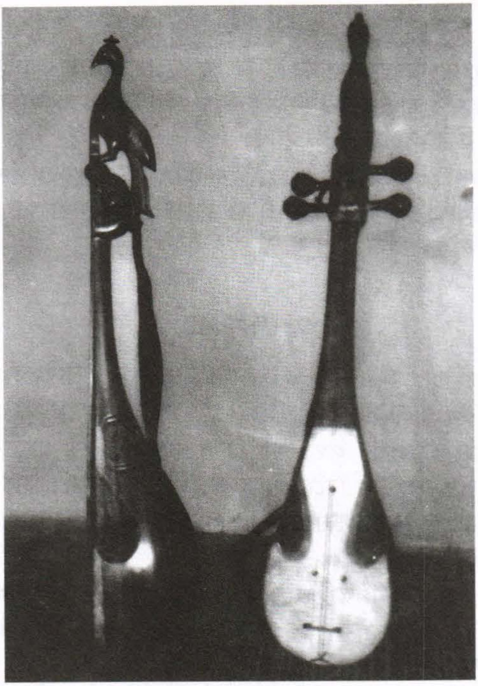

দোতারা

তথ্যনির্দেশ

১. মো. শামশুদ্দিন, পিতা- মরহুম লোকমান বিশ্বাস, মাতা- মরহুম হাসিনা বেগম, গ্রাম- মহারাজপুর, পোস্ট- মহারাজপুর, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৭ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতকোত্তর, সংগ্রহের তারিখ- ২৬.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

২. গোপীনাথ দাস, পিতা- প্রশান্ত দাস, গ্রাম- শুক্রবাড়ি, পোস্ট- চৌডালা, উপজেলা- গোমস্তাপুর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৬১ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- পঞ্চম শ্রেণী, সংগ্রহের তারিখ- ২৭.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

৩. মুহম্মদ এলতাস উদ্দিন, পিতা- এসাহাক মণ্ডল (শাহু), মাতা- মরহুম আফরোজা বেগম, গ্রাম- চান্দলাই, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৮৪ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতকোত্তর, সংগ্রহের তারিখ- ২৬.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

www.pathagar.com

লোকউৎসব

বাঙালির উৎসবের শেষ নেই। আসলে বাঙালির মানসিকতা হল দূরকে নিকট করা। এ আন্তরিকতার গুণেই সবাইকে নিয়ে উৎসবে মেতে উঠতে চায় বাঙালি। শত দুর্যোগ দুর্বিপাকে, শোষণে, অত্যাচারেও বাঙালির উৎসব প্রিয় মানসিকতায় ভাটা পড়েনি।

মানুষ নিঃসঙ্গ একাকীত্বের দিন থেকে সমষ্টি জীবনের উত্তরণের পথেই উৎসবের সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মানুষের উৎসব কবে? মানুষ যেদিন আপনার মনুষ্যত্বের শক্তি বিশেষভাবে স্মরণ করে। বিশেষভাবে উপলব্ধি করে সেই দিন। উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করে মহৎ।' মানুষ যেহেতু সমাজবদ্ধ জীব সেহেতু পরস্পর পরস্পরের সাথে মিলে মিশে থেকে নিজেদের মনুষ্যত্ব বোধ জাগ্রত করার জন্য উৎসবের ভূমিকা যথেষ্ট।

প্রখ্যাত ফোকলোরবিদ ড. দুলাল চৌধুরী বলেছেন, লোকউৎসব হলো লোক কেন্দ্রিক জীবনধারার বা লোকজীবনের অনুগত সমবেত উল্লাস মুখরিত অনুষ্ঠান বা ক্রিয়াকর্ম। সাধারণভাবে লোক উৎসব বলতে বোঝায় গ্রামীণ জগণের উৎসব।[১] তবে সাধারণ লোকউৎসবগুলি দীর্ঘ সময় ধরে অনুষ্ঠিত হয় যাতে সমাজের সর্বস্তরের ও সব বয়সের লোকজন অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। গ্রামীণ মানুষের জীবনধারাকে সার্থক ও সম্ভাবনাময় করে তোলার জন্যই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জে লোকউৎসবগুলো বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতি সত্তাসহ স্থানীয় অধিবাসীরা বিভিন্ন লোকউৎসব পালন করে। বিশ্বায়নের প্রভাবে বাঙালি সংস্কৃতি যেভাবে পাল্টে যাচ্ছে সেখানে উৎসবের পরিবর্তন হবে বলাই বাহুল্য। তারপরেও বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয় চাঁপাইনবাবগঞ্জের লোকউৎসব সমূহ।

১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব

বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন অর্থাৎ পহেলা বৈশাখ বাঙালির একমাত্র লৌকিক উৎসব। বাঙালি লোকচারে বহু বিভাজন বিদ্যমান। ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী ও অঞ্চল এরকম নানাবিধ বিভক্তিতে বিভিন্ন রকম উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়ে থাকে। বাংলা বছরের প্রথম দিনটি সেদিক থেকে এক সার্বজনীন রূপ লাভ করেছে। আর এ সার্বজনীন হওয়ার কারণেই এটি বাঙালির সর্ববৃহৎ লোকউৎসব। এখানে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র কিংবা আঞ্চলিকতার বিভাজন নেই। অঞ্চলভেদে এ উৎসব বৈশিষ্ট্যের রকমফের হতে পারে কিন্তু উৎসব হিসেবে এ দিনটির সার্বজনীন স্বীকৃতি ও ব্যাপক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণকে তাৎপর্যপূর্ণ করেছে।

www.pathagar.com

নববর্ষের শোভাযাত্রার প্রস্তুতি পর্বে জামাই-বউ ও অন্যান্য

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সদর থেকে শুরু করে উপজেলাগুলোর গ্রামাঞ্চলেও নববর্ষ ও বৈশাখি উৎসব অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয়। লাল পাড়ের সাদা শাড়ি বা সাদা জমিনে লোকজ মোটিফ ও ডিজাইনের শাড়ি পড়ে এখানে মেয়েরা নববর্ষ উদ্‌যাপন করে। সাদা ও বিভিন্ন রঙের অলংকৃত পাঞ্জাবি ও পাজামা পড়ে পুরুষেরা। এসব পোশাক পরে এবং বিভিন্ন সাজে সজ্জিত হয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে হাজার হাজার নারী-পুরুষ। বিভিন্ন জীব-জন্তুর প্রতিকৃতি নিয়ে গরু গাড়ি, ঘোড়া গাড়ি নিয়ে এই শোভাযাত্রা বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ করে। পরে সাজসজ্জার জন্য অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হয়।[২]

নববর্ষকে উৎসব মুখর করে তোলে বৈশাখি মেলা। আবহমানকাল ধরে আমাদের দেশে বৈশাখি মেলা চলে আসছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মেলাতে ধর্মগত দিক পরিলক্ষিত হয়। ধর্মীয় প্রভাবে অনেক মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের বৈশাখি মেলার কোন ধর্মীয় ভিত্তি নেই। এটি বাঙালির সংস্কৃতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ। সাংস্কৃতিক ধারার একটি বিশিষ্ট উৎসব হিসেবে প্রতি বছর চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় এ মেলা বসে থাকে। মেলার পাশাপাশি চলে সপ্তাহব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

মেলায় পাওয়া যায় কারুপণ্য, লোকশিল্পজাত পণ্য, কুটির শিল্পজাত সামগ্রী, মৃৎশিল্পজাত সামগ্রী, শিশু-কিশোরদের জন্য বিভিন্ন ধরনের খেলনা, রঙবেরঙের বেলুন, মেয়েদের প্রসাধনী সামগ্রী, বিভিন্ন লোকখাদ্য–খই, বাতাসা, মিষ্টি, পাঁপড় প্রভৃতি।

www.pathagar.com

নববর্ষ উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ 'হালখাতা'। শহরাঞ্চলে হালখাতা কমে গেলেও গ্রামাঞ্চলে এখনও বিপুল উৎসাহের সঙ্গে হালখাতা উদ্‌যাপিত হয়। ক্রেতা-বিক্রেতা মিলনের এক মধুর মুহূর্ত হিসেবে হালখাতা সত্যিই অনন্য লোকঅনুষ্ঠান।

বর্ষবরণ উৎসব একটি সার্বজনীন উৎসব। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান অর্থাৎ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালি মাত্রই এ উৎসবে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করে।

২. নবান্ন উৎসব

নবান্ন বাঙালির লোকজ উৎসবগুলোর মধ্যে অন্যতম। নবান্ন উৎসব ফসলের উৎসব। সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসে এ উৎসব হয়ে থাকে। তবে পৌষ-পার্বণেও কোন কোন অঞ্চলে নবান্ন পালন করা হয়ে থাকে। চাঁপাইনবাবগঞ্জে অগ্রহায়ণ ও পৌষ উভয় মাসেই এ উৎসব পালিত হয়। পৌষ মাসে চাঁপাইনবাবগঞ্জে পিঠা-পুলির উৎসব করা এবং এখানকার কাঁচা-পাকা রাস্তার ধারে বিভিন্ন রকম পিঠা-পুলি বিক্রি করার অপরূপ দৃশ্য চোখে পড়ে। কৃষকরা মাঠ থেকে মাড়াই করে ধান গোলায় নিয়ে যাওয়ার পর তাদের ছেলে মেয়েরা পিঠা-পুলির জন্য বায়না ধরে। কৃষাণ গৃহিণীরা মেতে উঠেন পিঠা তৈরির কাজে। শুরু হয় পিঠা খাওয়ার ধুম।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার রহনপুর পৌর এলাকার বাবুরঘোন গ্রামে প্রতিবছর অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে নবান্ন উৎসব উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। প্রতিবছর গ্রামের কৃষান-কৃষানীর ছেলে-মেয়েদের মনে আনন্দ দেয়ার জন্য নবান্ন উৎসবের আয়োজন করে থাকেন বাবুরঘোন গ্রামের উত্তর রহনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মমতাজ বেগম। এলাকার ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের শিক্ষিকাকে ৩ কেজি করে ধান সংগ্রহ করে দিয়ে এই উৎসবকে সফল করে তোলে। প্রায় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী ও এলাকার উৎসাহী কৃষানীরা এতে অংশ নেয়। ওই দিন এলাকাটিতে এ উৎসবে পিঠা খাওয়ার ধুম পড়ে যায়। লাল পাড় বিশিষ্ট হলুদ শাড়ি ও কাঁচা গাঁদাফুলের মালা পড়ে ছাত্রী ও বয়োবৃদ্ধারা সারাদিন পিঠা তৈরির কাজে ও নাচে-গানে মেতে উঠে। গ্রাম-বাংলার ঢেঁকি ও যাঁতার শব্দে ঐদিন মুখরিত থাকে গ্রামের গৃহগুলো। ছেলে-মেয়েদের সংগ্রহ করা ধান থেকে তৈরি ঢেঁকি ছাটা চাল যাঁতায় পিশা আটা দিয়ে তৈরি ভাপাপিঠা, তিলপিঠা, আন্ধাসা, ক্ষীরসহ হরেক রকম পিঠা-পুলি খেতে আসে উৎসুক মানুষ। আবার প্যাকেট করে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বাসায় পৌঁছে দেয়া হয় পিঠা। পিঠা খেতে আসা উৎসুক অতিথিদের গ্রাম-বাংলার গীত গেয়ে আনন্দে মাতিয়ে রাখে ওই ছাত্র-ছাত্রীরা। গ্রামের এই ঐতিহ্যকে উৎসাহ যোগাতে ছুটে আসেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় সংবাদকর্মীরা।

গত ১২ পৌষ ১৪২০ বেশ ব্যাপক পরিসরে নবান্ন উৎসব পালিত হয় বাবুরঘোন গ্রামে। আয়োজন সম্পর্কে মমতাজ জানান, তাঁর নানা-নানি বহু যুগ ধরে বিভিন্ন পিঠা-পুলি বানিয়ে গ্রামের কৃষান-কৃষাণীদের দাওয়াত করে খাওয়াতেন, সে থেকেই এ ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে প্রতিবছর গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে তিনি উৎসবটি পালন করে আসছেন। তাঁকে এ কাজে সহযোগিতা ও উৎসাহ যুগিয়ে আসছেন তাঁর বড় বোন কলেজ শিক্ষক শামিমা আখতার ও এলাকার সর্বস্তরের মানুষ।

www.pathagar.com

নবান্ন উৎসব

৩. ঈদ উৎসব

মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনে বাৎসরিক দুটি ঈদ উৎসব পালিত হয়ে থাকে। এ উৎসব দুটো হচ্ছে 'ঈদুল ফিতর' ও 'ঈদুল আযহা'। দীর্ঘ এক মাস রোজা রাখার পর তথা সিয়াম সাধনার পর যে ঈদ পালন করা হয় তাই 'ঈদুল ফিতর'। একে রমজানের ঈদ বা রোজার ঈদ বলা হয়। রমজানের দু মাস দশ দিন পর যে ঈদ পালন করা হয় তা-ই 'ঈদুল আযহা'। চাঁপাইনবাবগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষায় একে কোরবানির ঈদ বা 'বকরি ঈদ' বলা হয়।

ঈদ উৎসবের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। এ উৎসব শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়, জাতীয় জীবনে এর প্রভাব অপরিসীম। তাই এই উৎসব সম্পর্কে বিশিষ্ট ফোকলোরবিদ শামসুজ্জামান খান যথার্থই বলেছেন, "ঈদ এখন বাংলাদেশের জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। মূলত মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলেও ধীরে ধীরে এ উৎসব সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনা প্রবাহ ঈদোৎসবের চারিত্র্যে এনেছে নানা পরিবর্তন। .... শুধু ধার্মিক মুসলমান নয় কোটি কোটি মানুষের রুচি, রুজি, সংগঠন, সংযোগ, তৎপরতা, আনন্দ, পেশা বহু কিছুর সঙ্গে এখন জড়িয়ে গেছে ঈদ।"[৩]

ঈদুল ফিতরের দিন দু রাকাত ওয়াজিব নামাজ জামায়াতে ঈদগাহে আদায় করতে হয়। সেদিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে গোসল করে খোসবু-আতর মেখে নতুন

www.pathagar.com

পোশাক পড়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের ছোট বড় সকলেই ঈদগাহে নামাজ পড়তে যায়। নামাজ পড়ার আগে 'সদকায়ে ফেতরা' আদায় করা ওয়াজিব। ফেতরা হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে দু'সের পরিমাণ গম বা সে পরিমাণ অর্থ খয়রাত করা হয়। ফেতরার পয়সা গরিব আত্মীয়-স্বজন ও ফকির-মিসকিনদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। প্রত্যেক বাড়িতে সেদিন বিভিন্ন রকম সুস্বাদু খাবারের আয়োজন করা হয়। ঈদুল আযহার দিন গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি কোরবানি দেয়া হয়। কোরবানির এক তৃতীয়াংশ গোস্ত গরিব-মিসকিনদের মধ্যে, এক-তৃতীয়াংশ আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিলি করা হয়।

ঈদের নামাজ শেষে কোলাকুলির মধ্যদিয়ে পারস্পারিক হৃদ্যতার প্রকাশ ঘটায়। কারো সঙ্গে মনমানিল্য থাকলেও এদিন সবাই তা ভুলে যায়। মাঠ থেকে বাড়ি ফিরে ছোটরা মুরুব্বিদের কদমবুসি করে সালামি আদায় করে। এটা এখন স্থানীয় সামাজিক আচারে পরিণত হয়েছে। সালামি পেয়ে শিশু-কিশোররা খুব আনন্দ পায়। ঈদের দিন বা পরের দুই দিন প্রতিবেশি ও আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি সেজেগুজে বেড়ানো ঈদের আনন্দ ও খুশিকে বাড়িয়ে তোলে।

৪. শারদীয় দুর্গোৎসব

হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব হচ্ছে শারদীয় দূর্গোৎসব। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দূর্গাপূজো হয় চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বারোঘরিয়া গ্রামে। স্বাধীনতা পূর্ব অবিভক্ত মালদহের দক্ষিণ প্রান্তে একটি উল্লেখযোগ্য বর্ধিষ্ণু গ্রাম এটি। এখানে সাহেবদের নীলকুঠি ছিল, ছিল মালদহের বিশিষ্ট জমিদার যদুনন্দন ও আশুনন্দন চৌধুরীর কাছারী বাড়ী।

লক্ষ্মী, স্বরসতী, কার্তিক, গণেশ, শিবসহ ২২ টি মূর্তি পরিবেষ্টিত দেবী দুর্গা সম্বলিত এ সর্ববৃহৎ দুর্গাপূজো সবার কাছে 'বাইশ পুতুল' নামে পরিচিত। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার দর্শনার্থী বাইশ পুতুল দেখতে বারোঘরিয়া এসে থাকেন প্রতি বছর।

দেবীর পায়ে নিবেদন করেন তাঁদের প্রাণের শ্রদ্ধা। পূজাকে কেন্দ্র করে মন্দিরের চারপাশে একসময় জমে উঠতো বিরাট লোকমেলা। কাঠের আসবাবপত্র, কাগজ ও সোলার খেলনায় সমৃদ্ধ এ মেলায় হাজার হাজার শিশু, কিশোর, যুবক ও বৃদ্ধের সমাবেশ ঘটতো।

মেলা জমে উঠতো নবমী ও দশমীর দিন। এখন আর তেমন বড় আকারে মেলা বসে না। রাস্তার দুধারে কিছু দোকান বসে। কিন্তু পূর্বের মতো মেলা প্রাঙ্গণে ধর্মীয় সংগীতের আসর, বিচিত্রানুষ্ঠান ও নাটক মঞ্চস্থ হয়ে থাকে।[৪] বিসর্জনের দিন বিকেল থেকেই মহানন্দা নদীর তীরে ভক্তের ভীড় জমে ওঠে। বভিন্ন অঞ্চল হতে একে একে প্রতিমাগুলো এসে জমা হয় সেখানে। নানাবিধ পণ্যসম্ভারে সকল সম্প্রদায়ের বিক্রেতা ও ক্রেতার সমাবেশে দশমীর মেলা জমজমাট হয়ে ওঠে। নৌকা বাইচের পর ভক্তরা চোখের পানিতে বিদায় জানান 'বাইশ পুতুল' কে।[৫]

www.pathagar.com

৫. রথউৎসব

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদরে প্রায় কত বছর ধরে উত্তরবঙ্গ বৈষ্ণব সংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে 'রথ উৎসব'। কখন থেকে এই উৎসবের সূচনা এ সম্পর্কে কেউ সঠিকভাবে বলতে না পারলেও এই উৎসবের বয়স শতবর্ষ অতিক্রম করেছে এতে সবাই একমত। এ প্রসঙ্গে মোহিত কুমার দাঁ বলেন, বাংলা ১৩০০ সনে চাঁপাইনবাবগঞ্জে রথ উৎসবের সূচনা হয়।[৬]

প্রথমে দুটো বিশালাকার রথ এ উৎসবে ব্যবহৃত হতো। রথদুটো ছিল একটি পিতলের অপরটি লোহার। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনতা-বিরোধীরা রথ দুটি ভেঙে ফেলে এবং পিতল ও লোহা আত্মসাৎ করে। বর্তমানে একটি কাঠের রথ উৎসবে ব্যবহৃত হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহর ছাড়াও সদর উপজেলার শিবতলা ও বারোঘরিয়া, শিবগঞ্জ উপজেলার আলিডাঙা ও বাবুপাড়া, গোমস্তাপুরের মহন্ত স্টেট ও সার্বজনীন দূর্গা কমিটি এবং চৌডালার কামারপাড়া ও বাইশ পুতুল মন্দিরে রথ উৎসব হয়।

তিথি অনুসারে আষাঢ় মাসের যে কোন সপ্তাহে রথ উৎসব শুরু হয়ে নয় দিনব্যাপী স্থায়ী হয়। রথ উৎসবের কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন জগন্নাথ। তবে এখানকার রথে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের মূর্তি থাকে। আর রথ উপলক্ষে পূজা-অর্চণা ও আলোচনার আয়োজন করা হয়ে থাকে। আমন্ত্রপত্র মুদ্রণ করে আমন্ত্রণ জানানো হয় ধর্মপ্রাণ হিন্দু সমাজ ও জেলার বিশিষ্ট সুধীজনকে।[৭]

৬. জন্মাষ্টমী

পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মতিথি জন্মাষ্টমী। শ্রীকৃষ্ণ এ ধরাধামে আলো ঝলমল কোন জাঁকজমক সমারোহে নয়; বরং এক বর্ষণমন্দ্রিত রাতের অন্ধকারে পৃথিবীর মাটিতে নেমে এসেছিলেন। তিনি এলেন মজাচারী বংশের লৌহ শৃঙ্খলিত এক দুঃখিনী মায়ের কোলে, অন্ধকার কারাভ্যন্তরে। তাঁর এ ভরা ভাদরে সকলের অনাদারে আগমনক্ষণে কেউ আপ্যায়ন করে জয় শঙ্খধ্বনি বাজায় নি, কণ্ঠে পুষ্পহারও পরায়নি। একদিন এই কৃষ্ণই কংসকে বধ করে পৃথিবীতে এনেছিলেন আনন্দের ফল্গুধারা।

চাঁপাইনবাবগঞ্জে জন্মাষ্টমী অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। বর্ণাঢ্য এদিনে শোভাযাত্রা আলোচনা সভা ও প্রীতি ভোজের মাধ্যমে ছোট-বড় সবাই মিশে যায় আনন্দে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের শিবতলা মন্দির থেকে বের হয় সবচেয়ে বড় শোভাযাত্রা। সকাল ৮ টার মধ্যে নানান সাজে সজ্জিত হয়ে হাজারো সনাতন হিন্দু ধর্মাবিলম্বীরা শোভাযাত্রায় অংশ নেন।

রাধাকৃষ্ণ, কংসসহ বিভিন্ন শহর প্রদক্ষিণ হয়ে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা সারা শহর প্রদক্ষিণ করে। তারপর আলোচনা সভায় দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট জনেরা। বাড়িতে বাড়িতে চলে আপ্যায়ন। জেলা শহরের মতো উপজেলা ও বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জেও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে জন্মাষ্টমী উদ্‌যাপিত হয়।[৮]

www.pathagar.com

শোভাযাত্রা

৭. ওরস

পহেলা মহরম হযরত শাহ নেয়ামতউল্লাহর জন্ম ও মৃত্যুর দিন বলে পরিচিত। এই দিনে প্রতিবছরই এখানে 'ওরস পালন' করা হয়ে থাকে। এছাড়া ভাদ্র মাসের শেষ শুক্রবার এখানে অন্য একটি ওরস পালন করা হয়। এ দিনই অধিকাংশ লোক এখানে জমায়েত হয়ে থাকেন। এ দিনেরই ফজিলত বেশি বলে অনেকের ধারণা। হযরত এদিনে ইসলাম প্রচারের জন্য সর্বপ্রথম গৌড় নগরীতে পদার্পণ করেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবারের দিন আসরের নামাজের পর সারারাত ব্যাপী 'জেকের-আজকার' অনুষ্ঠিত হয়। ওরস কমিটির পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মিলাদ শরিফ পাঠ করান হয়।[৯]

শুক্রবার বাদ জুম্মা হযরতের মাজারে গিলাফ পরানো হয়। এই গিলাফ প্রদান করেন পির সাহেবের বংশধর নবাবগঞ্জ নিবাসী আলহাজ্ব শাজাহান আলী। তিনি পির সাহেবের কন্যা কাদিরণ নেশার বংশধর।

৮. আশুরা

মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা.) এর দৌহিত্র ইমাম হোসেনের শাহাদাত বরণ ও কারবালা প্রান্তরে সংঘটিত যুদ্ধের বিষাদময় ঐতিহাসিক ঘটনার স্মরণেই আশুরা পালিত হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জে বর্তমানে শিয়া সম্প্রদায়ের বসবাস না থাকায় এখানে কোন তাজিয়া

www.pathagar.com

তৈরি হয় না, হয় না কোন বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। তবে একসময় শহরের মসজিদ পাড়ায় তাজিয়া তৈরি হতো। উদ্‌যাপিত হতো বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান। মর্শিয়া জারির কয়েকটি দল ছিল তারা শহরে-গ্রামে-গঞ্জে লাঠিখেলা ও ঝান্ডিগান পরিবেশন করত।

তাজিয়া বা শোভাযাত্রা না হলেও প্রতিবছর আশুরা উপলক্ষে অনেক নারী-পুরুষ দুই দিন রোজা পালন করেন। মসজিদে এবং স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার পৌরসভা, ইউনিয়নের পরিষদের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ভোজের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এক কথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ধর্মীয় আবেগ এবং ভাবগাম্ভীর্য সহকারে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরে পালিত হয় মহরমের আশুরা।

৯. বিয়ে উৎসব

মানব-জীবন চক্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো বিবাহ। বিবাহ একটি অনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে নবীন যুবক-যুবতীর জীবনে সার্বিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। তাদের একক জীবনের এখানেই অবসান ঘটে এবং এখান থেকেই তাদের চলার পথ হয় অভিন্ন।

বিবাহের উদ্দেশ্য একাধিক। তন্মধ্যে বৈধ সন্তানের জন্মদান অন্যতম। আর এই কারণেই দম্পত্তির একই গৃহে বসবাস, যৌনসম্ভোগ, পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহযোগিতা, সহমর্মিতা এবং দাম্পত্য জীবনের দীর্ঘস্থায়িত্ব একান্ত আবশ্যক। এ লক্ষ্য সামনে রেখেই বিবাহের আচার অনুষ্ঠানসমূহ উদ্ভাবিত হয়েছে। রচিত হয়েছে সামাজিক, ধর্মীয় এবং আইনগত বিধি-বিধান। বাঙালি বিবাহ আচার সর্বস্ব। অধিকাংশ আচারই অশুভ ব্যক্তি, প্রতিরোধক। যেমন– বর যে পথে বিবাহ করতে যায়, সেই পথে বধূসহ প্রত্যাবর্তন করে না। অন্য পথ দিয়ে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে। বরাবর এই আচরণের তাৎপর্য হলো, অপদেবতা বা জ্বীনের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটানো। এ ধরনের অসংখ্য লৌকিক বিশ্বাস বাঙালি সমাজে প্রচলিত রয়েছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জে বিবাহ সম্পর্কিত প্রচলিত লোকাচার দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও এখানকার অধিবাসীরা বিবাহ অনুষ্ঠানের এমন কিছু আচার পালন করে থাকে যা অবশ্যই অন্যান্য এলাকার চেয়ে স্বতন্ত্র।[১০]

সাধারণত বিবাহের তৃতীয় দিনে বরের বাড়িতে 'বউভাত' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই দিন কন্যাপক্ষের আত্মীয়রা নিমন্ত্রিত হন। প্রীতিভোজে অংশগ্রহণ উপলক্ষে আমন্ত্রিতরা বর-কনের জন্য উপহার সামগ্রী নিয়ে আসেন। বউভাতের পরে কন্যাপক্ষ মেয়ে জামাইকে নিয়ে যায়। বিবাহের আট দিবস পরে কন্যার মা-বাবা মেয়ে জামাই আনতে যায়। এজন্য একে অষ্টমঙ্গলা বা আট মঙ্গলা বলা হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জের গ্রামঞ্চলের মানুষ জন্ম ও বিবাহ সম্পর্কিত ক্রিয়ানুষ্ঠানের প্রতি খুবই আস্থাশীল। তার পূর্বে যা কিছু দীর্ঘ আনুষ্ঠানিকতায় সম্পন্ন হতো, তা অনেক বেশি সংক্ষিপ্ত হয়েছে।[১১] কোনো কোনো পরিবারে বিবাহ উপলক্ষে গায়ে হলুদ ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান পরিলক্ষিত হয় না। সময় স্বল্পতার কারণে আজকাল গায়ে হলুদ ছাড়াই বিবাহ কার্য সম্পন্ন হতে দেয়া যায়। তবে শুধু সময় স্বল্পতা নয় অর্থনৈতিক বিষয়টিও এসবের পেছনে একটি উল্লেখযোগ্য কারণ।

www.pathagar.com

১০. সোহ্‌রাই

সাঁওতালদের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ববৃহৎ উৎসব হলো সোহরাই উৎসব। পৌষ-মাঘ মাসে এ উৎসব পালিত হয়। এ সময় আমন ধানে সবার ঘর ভরে ওঠে। নির্বিবাদে ফসল ঘরে তোলার জন্য ফসল দেবতাকে ধন্যবাদ জানানোই এই পূজা-উৎসবের মূল উদ্দেশ্য। গ্রামের লোকেরা মাঝি হাড়ামের কাছে গিয়ে উৎসবের দিন ধার্য করে। সপ্তাহব্যাপী চলে উৎসব। এই উৎসবের প্রারম্ভে 'উম' (পবিত্রকরণ) নিয়মের মাধ্যমে বাড়ি-ঘর ও উঠান-প্রাঙ্গণ পানি এবং গোবরের ছিটা দিয়ে পবিত্র করা হয়। তারপর তারা দলবদ্ধ হয়ে মাঠে গমন করে এবং সেখানে নৃত্যগীত অনুষ্ঠিত হয়।

সোহরাই উৎসবের সাতদিন ধরে চলে পূজা, নাচ-গান, ভোজসভা, পচানি বা হাঁড়িয়া খাওয়া ইত্যাদি। যুবক-যুবতীরা বিচিত্র সাজে– মেয়েরা শাড়ি পড়ে, খোঁপায় শিমুল বা মহুয়া ফুল গুঁজে বাড়ি বাড়ি ঘুরে নাচ গান করে। উৎসবের সময় তাদের আনন্দের সীমা থাকে না। সাঁওতাল সমাজের মাঝি, জগমাঝি, পারাণিক, নাইকে ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এসময় শোভাযাত্রা করে এবং ঘরে ঘরে পিঠা-পুলি তৈরি হয়। বিভিন্ন পশু, মুরগী, কবুতর বলি দেয়া হয় এবং তার মাংস রান্না করে সকলকে খাওয়ানো হয়।

সোহরাই উৎসবের পঞ্চম দিনে পাড়ার সকলে মিলে নদীতে বা খাল বিলে মাছ ধরতে যায়। মাছ ধরার পর মাঝি হাড়াম সেই মাছগুলো গ্রামের অংশগ্রহণকারীদের পরিবার অনুসারে ভাগ করে দেন। উৎসবের ষষ্ঠ দিন তারা নিজের বাড়িতে আহার না করে প্রতিবেশীদের বাড়িতে আহার করে থাকে। সোহরাই উৎসবের সময় শিকার করার একটি রীতি প্রচলিত আছে। গ্রামের লোকেরা দলবেঁধে শিকারে যায় এবং শিকারে প্রাপ্ত পশু-পাখির মাংস তারা বণ্টন করে নেয়। এসব গ্রামে খেলাধুলারও (কুস্তি, লাঠি খেলা, তীর চালনা ইত্যাদি) আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই খেলা সাধারণত জগমাঝি বা পারাণিকের বাড়ির চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে আপ্যায়নের ব্যবস্থাও করা হয়। খেলা শেষে যুবকেরা বাড়ি ফিরে গেলে মেয়েরা তাদের পা ধুয়ে দেয়।[১২]

সোহরাই উৎসবের প্রধান পূজোটাই হয় প্রথম দিনে। সেই পূজা দেখা মেয়েদের নিষিদ্ধ। এই পূজায় আতপচাল, সিঁদুর ও অন্যান্য উপকরণ বোঙ্গার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয় এবং এক একটি মুরগী বলি দিয়ে তার রক্ত বেদীর এক একটি খোপে লেপে দেয়া হয়। তারপর বেদীর অদূরেই মুরগী ও পোলাও রান্না করে সাবাইকে খাওয়ানো হয়। আপ্যায়ন পর্ব শেষ হলে বাড়ির মালিকের নির্দেশে প্রতিবাড়ির রাখালেরা তাদের গাভীর মাথায় তেল মাখিয়ে গাভীগুলোকে পূজার স্থানে নিয়ে আসে এবং পূর্বে একটি বিশেষ স্থানে ডিম স্থাপন করা জায়গায় গাভীগুলোকে তাড়া করে নিয়ে যায়। যে গাভী সেই ডিম ভাঙে বা ডিম স্পর্শ করে সে গাভীর মালিককে ভাগ্যবান মনে করা হয়। সবাই বিশ্বাস করে যে, সে ব্যক্তি পরবর্তী বছর অধিক ফসল পাবে। এই ভাগ্যবান ব্যক্তিকে পরবর্তী পূজার প্রথম দিনে এক হাঁড়ি পচানি দিতে হয়। উৎসবের দ্বিতীয় দিনে নিজ নিজ বাড়িতে পূজা হয়। তৃতীয় দিনে শিকার করে বাড়ি ফিরে এসে যুবকরা একটি কলাগাছ কেটে নিয়ে গিয়ে মাটিতে পুতে দণ্ডায়মান করে রাখে। কলাগাছটির গায়ে

www.pathagar.com

তিনটি পিঠা আটকানো থাকে। দূর থেকে যুবকেরা তীর নিক্ষেপ করতে থাকে। তীর কলাগাছে লাগার সঙ্গে সঙ্গে সবাই ছুটে এসে পিঠা নেয়ার চেষ্টা করে। এরপর কলাগাছটি তিনটি টুকরো করা হয় এবং যে প্রথম তীরটি কলাগাছে বিধিয়েছিল তার কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর অন্যান্য সবাই তাকে কাঁধে নিয়ে প্রথমে যার মাঝি হাড়ামের বাড়ি, তারপর যথাক্রমে জগমাঝি ও নাইকের বাড়ি যায় এবং প্রত্যেকের বাড়িতে একটুকরো করে কলাগাছ রেখে দেয়। তাদের বাসায় তারা যথেষ্ট আপ্যায়িত হয়। এভাবেই শেষ হয়ে সোহরাই উৎসবের মূল পর্ব। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম দিনেও কিছু কিছু আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে যা পূর্বে উপস্থাপন করা হয়েছে। সোহরাই উৎসব আসলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও আনন্দের উৎসব। কোনো কোন সময় এ উৎসব সাতদিনের অধিক অনুষ্ঠিত হয়। আবার তিনদিনেও শেষ হয়।[১৩]

১১. বাহা উৎসব

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের আরেকটি অন্যতম প্রধান উৎসব হলো 'বাহা' উৎসব। সাঁওতালী ভাষায় 'বাহা' শব্দের অর্থ ফুল। ফাল্গুন মাসে এ উৎসব পালিত হয় তাই কেউ কেউ একে বসন্ত উৎসব বলেও অভিহিত করে থাকেন। আবার কেউ বলেন 'পুষ্প উৎসব'।

বসন্তের আগমনে শাল, শিমুল, পলাশ, মহুয়া, চম্পা ইত্যাদি ফুল ফুটতে থাকে। প্রকৃতি তখন বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়। তখন সাঁওতাল যুবক-যুবতীর মনেও রঙ ধরে। 'বাহা' উৎসবের পর থেকে সাঁওতাল মেয়েরা তাদের চুলের খোঁপায় রঙ-বেরঙের ফুল পরতে শুরু করে। এই উৎসবের পূর্বে সাঁওতাল মেয়েরা কোন ফুল ব্যবহার করতে পারে না।

সোহরাই উৎসবের মতো বাহা উৎসবও খুব উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। এ উৎসব চলে তিনদিন। এ উৎসবেরও প্রচুর খরচ হয়, পূজাতে প্রয়োজন হয় মুরগীর। কিন্তু এ উৎসবে হাঁড়িয়া বা পচানী খাওয়ার কোন বিধান নেই। বাহা উৎসবের পূজা হয় বনের ভেতর।

এজন্য তারা দুটো ঘর বাঁধে, একটি গোঁসাই-এর জন্য, অপরটি মোরেইকো বোঙ্গার জন্য। এই পূজাতে শালফুলের ব্যবহার আবশ্যক। অন্যান্য পূজার মতো এ পূজাতেও নাইকে বিভিন্ন বোঙ্গার উদ্দেশ্যে চাউল, সিঁদুর, ধান-দূর্বাসহ মোরগ বিল দিয়ে থাকে। শিকার যাত্রা ও উৎসবের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। পূজা ও শিকার ছাড়াও উৎসবে নাচগান, ভোজপর্ব ও হাঁড়িয়া পানের প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়।[১৪]

১২. এরো উৎসব

আষাঢ়-শ্রাবণ এই দুই মাসে সাঁওতাল সম্প্রদায় প্রতি বছর এরো উৎসব পালন করে থাকে। এরো উৎসব হলো ফসলের বীজ বোনার উৎসব। ক্ষেতে ফসলের বীজ যাতে ঠিক মতো গজায়, যাতে ফসল ভালো হয় ইত্যাদি শুভ কামনা করে এই উৎসব পালন করা হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে কলা, বাতাসা, মুড়ি, আতপ চাউল ইত্যাদি নিয়ে নাইকে এই পূজা সম্পন্ন করে। এ পূজার সময় নাচ, গান হয় না। পূজা শেষে সমবেত সকলে হাঁড়িয় বা পচানী খায়। এ সময় তারা ফসলের গান গায় সাঁওতালী ভাষায়।[১৫]

১৩. সারহুল উৎসব

সারহুল উৎসব সাধারণত চৈত্র মাসে উদ্‌যাপন করা হয়। শীতে গাছের পাতা শুকানো হয়ে ঝরে যায়, চৈত্র মাসে গাছে গাছে নতুন পাতা গজায়। হালকা সবুজ রঙে অরণ্য ছেয়ে যায়। ওরাওঁরা অনেক গাছের পাতা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। কেউ কেউ অভাবের সময় শুধু গাছের পাতা বা মূল খেয়ে বেঁচে থাকে, এ সময় গ্রাম রক্ষাকারী আত্মাকে স্মরণ করে তারা পূজা অর্চনা করে।[১৬]

পার্বণের সময় প্রতিটি পরিবার তাদের ঘরে নিজেদের পূর্বপুরুষের কথা স্মরণ করে পূজা দেয়। তাঁদের জন্য কিছু খাদ্য ভোগ দেয়।

ভোগগুলো ঘরের মধ্যে একটি চোঙায় রাখা হয় এবং পরিবারের সকলের সুস্থতা কামনা করে প্রার্থনা করা হয়। কোন কোন পরিবার মোরগ ইত্যাদি বলি দিয়ে থাকে। সারহুল পার্বণের মূল তাৎপর্য হলো সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর বিয়ে। এই উৎসব চলাকালীন সময়ে নাচ-গানের মাধ্যমে প্রত্যেক ওরাওঁ পরিবার ঘরের দরজায় প্রচুর পানি ঢালে এবং শালফুল ঘরের চালে ঝুলিয়ে রাখে।

১৪. কারাম উৎসব

কারাম ওরাওঁদের সবচেয়ে বড় উৎসব। ভাদ্রমাসে সাধারণত এ উৎসব পালন করা হয়। কারাম উৎসব পালনের সঙ্গে ওরাওঁদের একটি কাহিনী জড়িত আছে। তাদের মতে, কারাম বৃক্ষ রক্ষাকর্তা।

ইতিহাসের কোন এক সময় ওরাওঁ জাতি অন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সময় গভীর জঙ্গলে পালিয়ে কারাম বৃক্ষের নীচে আশ্রয় নিয়েছিল। কারাম বৃক্ষ যেন তাদের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল। এ ঘটনাকে স্মরণ করার জন্য কারাম উৎসবের আয়োজন করা হয়ে থাকে।[১৭] উৎসব উপলক্ষে কারাম গাছের ডাল কেটে আনা হয় এবং তা ঘরের উঠানের মাঝখানে পোঁতা হয়।

তারপর পূজা হয়, নাচ গান হয় এবং কাহিনী পালাগান মঞ্চস্থ হয়। কারাম উৎসব চলাকালীন সময়ে অবিবাহিত যুবক-যুবতীরা উপবাস করে থাকে। নব বিবাহিতা মেয়েরা এ সময় শ্বশুরবাড়ি থেকে বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসে। মেয়েরা এ সময় শ্বশুরবাড়ি থেকে ফল-মূল, কাপড়সহ নতুন ডালিতে করে উপঢৌকন নিয়ে আসে।

এজন্য কারাম উৎসবকে মিলন ও আনন্দের উৎসবও বলা হয়ে থাকে। এ উৎসবের মাধ্যমে বোনেরা ভাইদেরকে স্মরণ করে থাকে। একটি প্রবাদ আছে 'আপন কারাম ভাইকা ধারাম।' উৎসব শেষে কারামের ডালগুলোকে জলাভূমিতে ডুবিয়ে দেয়া হয়।[১৮]

www.pathagar.com

১৫. খারিয়ানি উৎসব

ওরাওঁ সমাজ অগ্রহায়ণ মাসে এ উৎসব পালন করে থাকে। আমন ধান উঠার সময় ধান মাড়াইয়ের জায়গাকে পবিত্র করার জন্যই মূলত এ উৎসব। উৎসবে পূজাও দেয়া হয়। গ্রামের পাহান বা পুরোহিত এ পূজা পরিচালনা করেন। পুরোহিত ভগবানের উদ্দেশ্যে একটি মোরগ এবং গ্রাম দেবতার উদ্দেশ্যে লাল একটি মোরগ বলি দেন। তারপর ভগবানের উদ্দেশ্য করে পানি উৎসর্গ করা হয় এবং উপস্থিত লোকজনদের জন্য নিজেদের তৈরি পঁচানি বা মদ দেয়া হয়।[১৯]

১৬. ফাগুয়া

ওরাওঁ সমাজের নববর্ষের নাম 'ফাগুয়া'। ফাগের অর্থ আবীর। এই উৎসবে ব্যবহৃত হয় প্রচুর 'ফাগ' বা আবীর। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় এ উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

উৎসবের প্রথমে পাহান বা পুরোহিত অফুলন্ত শিমুল গাছের একটি, ভেরেণ্ডা গাছের একটি এবং জিগা গাছের একটি শাখা কেটে গ্রামের বাইরে পূজোর জন্য নির্ধারিত স্থানে পুতে রাখে। অতঃপর গ্রামের ছেলেমেয়েরা প্রতিটি বাড়ি থেকে এক আঁটি করে শুস্ক খড় নিয়ে এসে শাখা গায়ে হেলান দিয়ে রেখে দেয়। কিছু খড় মেলে দেয়া হয় শাখাগুলোর ওপরে। এ পর্যায়ে পাহান একটি জীবিত মোরগকে খড়ে আবৃত করে একটি ডালের নীচে রেখে দেয়। ততোক্ষণে গ্রামের সবাই ঢোল, বাদল, করতাল, বাঁশী বাজাতে বাজাতে সেখানে এসে উপস্থিত হয়।[২০]

এরপর পুরোহিত একটি শাখা হাতে নিয়ে তিনবার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে এবং শাখার সঙ্গে হেলান দিয়ে রাখা খড়ের আঁটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। সেসময় উপস্থিত জনতা সমস্বরে তাদের ভাষায় বলে ওঠে– বিগত বছরের সকল অকল্যাণের ন্যায় এবছরের সকল অকল্যাণ, রোগ, শোক, যন্ত্রণা দূর হয়ে থাকে। আগুন নেভার পূর্বেই পুরোহিত দ্রুত শাখা তিনটির গোড়া পরিষ্কার করে ফেলে এবং তার হাতের ধারালো দা দিয়ে এক কোপে শাখাটি দ্বি-খণ্ডিত করে ফেলে। খণ্ডিত শাখার অগ্রভাগ থেকে পুরোহিত একটুকরা কেটে অন্যত্র পুতে দেয়।

এভাবে অপর দুটি শাখাও পুতে দেয়া হয়। শাখার মাঝখানের অংশটি গ্রামের ছেলে-মেয়েরা আনন্দের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে গ্রামের বাইরে নিয়ে যায়, পথের পাশে পুতে রাখে। সবাই খড়ের ছাই ভস্ম শরীরে মাখে সারা বছরের রোগ-শোক থেকে মুক্ত থাকার জন্য। এমনিভাবে উৎসবের মধ্য দিয়ে পূর্ণিমা রজনী অতিক্রান্ত হয়।

ওরাওঁরা সকল প্রকার ভালো কাজের পূর্বে ডানডা কাটনা উৎসব করে থাকে। যেমন নতুন ঘর তুললে, গরু বা মহিষ ক্রয় করলে, সন্তানের জন্ম হলে কোন বড় উৎসবের আগে তারা এ উৎসব পালন করে মঙ্গলের জন্য। ওরাওঁদের কোন উৎসবই মদ বা ভাত থেকে তৈরি পচানি ছাড়া হয় না। পচানি যেন উৎসবেরই অপরিহার্য উপাদান।[২১]

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

১. ড. দুলাল চৌধুরী, 'লোকউৎসব' বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, আকাদেমি অব ফোকলোর, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ২৮৫

২. সিরাজুল ইসলাম, পিতা- মরহুম মোজাফ্ফর হোসেন মিয়া, মাতা- মরহুম মালেকা বেগম, গ্রাম- বারোঘরিয়া, পোস্ট- বারোঘরিয়া, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৭২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতকোত্তর, সংগ্রহের তারিখ- ২৬.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

৩. শামসুজ্জামান খান, 'ঈদোৎসব ও তার রূপান্তর', আধুনিক ফোকলোর চিন্তা, নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৪৪-৪৫

৪. প্রশান্ত কুমার পাল (গোপাল), মিলন পাল, পিতা- রতিকান্ত পাল (ঝড়ু পাল), মাতা- পূর্ণশশী পাল, গ্রাম- বারোঘরিয়া, পোস্ট- বারোঘরিয়া, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৬৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- উচ্চমাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ২৬.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

৫. তোসলিম উদ্দীন, পিতা- মরহুম বাদশা মিয়া, গ্রাম- বারোঘরিয়া, পোস্ট- বারোঘরিয়া, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- উচ্চমাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ২৬.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

৬. মোহিত কুমার দাঁ, পিতা- ভূদেব দাঁ, মাতা- শৈল বালা দাঁ, গ্রাম- ইসলামপুর, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৭৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২১.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা

৭. লিপি সাহা, পিতা- ধনঞ্জয় সাহা, মাতা- হিমলতা সাহা, গ্রাম- রাজারামপুর মাস্টারপাড়া, পোস্ট- রাজারামপুর, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ২৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২১.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা

৮. নিতাই চন্দ্র কর্মকার, পিতা- দয়াচাঁদ কর্মকার, মাতা- অর্চনা রানী কর্মকার, গ্রাম- শিমুলতলা, পোস্ট- বারোঘরিয়া, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ২৩ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- উচ্চমাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ২১.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা

৯. মাযহারুল ইসলাম তরু, গৌড় থেকে চাঁপাই, প্রাইম পাবলিকেশনস, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ২০০৭, পৃ. ৪৬

১০. মোহিত কুমার দাঁ, পিতা- ভূদেব দাঁ, মাতা- শৈল বালা দাঁ, গ্রাম- ইসলামপুর, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৭৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২১.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা

১১. মো. গোলাম জাকারিয়া, পিতা- আলহাজ আবুল কাসেম বিশ্বাস, মাতা- জমিলা বেগম, গ্রাম ও ডাক- চৈতন্যপুর, উপজেলা- শিবগঞ্জ, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২৩.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৩:০০ টা

www.pathagar.com

১২. দেবীলাল টুডু, পিতা- বিরু টুডু, মাতা- সীতা হেমব্রম, গ্রাম- দেলবাড়ী, পোস্ট- গোবরাতলা, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ২৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ২৯.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা

১৩. কর্নেলুইস মূর্মু, গ্রাম- দেলবাড়ী, পোস্ট- গোবরাতলা, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৯ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ২৯.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা

১৪. সীমা মূর্মু, স্বামী- নরেন মার্ডি, মাতা- অনিতা মার্ডি, গ্রাম- ঝিকড়া, পোস্ট- নাচোল, উপজেলা- নাচোল, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৩০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ২৮.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা

১৫. গোপিন মূর্মু, পিতা- ছোটে মূর্মু, মাতা- সন্ধ্যা টুডু, গ্রাম- চাপড়া, পোস্ট- বিনোদপুর, উপজেলা- শিবগঞ্জ, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ২২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ২৮.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা

১৬. কৃষ্ণ লাকড়া, পিতা- যতিন লাকড়া, মাতা- আন্ধারী লাকড়া, গ্রাম- বিশালপুর, পোস্ট- নাচোল, উপজেলা- নাচোল, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৫০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- চতুর্থ শ্রেণী, সংগ্রহের তারিখ- ২৮.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা

১৭. বাসন্তি তিগ্‌গা, পিতা- রামলাল তিগ্‌গা, মাতা- কামিনী তিগ্‌গা, গ্রাম- খান্দুরা, পোস্ট- নাচোল, উপজেলা- নাচোল, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ২৮.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৩:৩০ টা

১৮. সুবর্ণা কুজুর, পিতা- জীবন কুজুর, মাতা- রজনী কুজুর, গ্রাম- কোচাইবাড়ী, পোস্ট- কসবা, উপজেলা- নাচোল, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ২৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ২৮.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৩:৩০ টা

১৯. স্বপ্না কিসপট্টা, পিতা- পাত্রাস কিসপট্টা, মাতা- দিপালী কিসপট্টা, পোস্ট- ধানসুরা, উপজেলা- নাচোল, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ২৪ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ২৮.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা

২০. মিনতী এক্কা, পিতা- কেষ্ট এক্কা, মাতা- সুধনী এক্কা, গ্রাম- বিশালপুর, পোস্ট- নাচোল, উপজেলা- নাচোল, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৩৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ২৮.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা

২১. কৃষ্ণ লাকড়া, পিতা- যতিন লাকড়া, মাতা- আন্ধারী লাকড়া, গ্রাম- বিশালপুর, পোস্ট- নাচোল, উপজেলা- নাচোল, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৫০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- চতুর্থ শ্রেণী, সংগ্রহের তারিখ- ২৮.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা

www.pathagar.com

লোকমেলা

বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই বছরের বিভিন্ন সময় লোকমেলার আয়োজন হয়ে থাকে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাও এর ব্যতিক্রম নয়। একই বছরে এক স্থানে দুবার মেলা বসার রীতি নেই বললেই চলে। এগুলোতে সাধারণত যাত্রা, লোকনাট্য, সার্কাস, পুতুল নাচ, নাগরদোলা, মটরসাইকেল খেলা, কদাচিৎ ক্ষেত্রে সিনেমা ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়ে থাকে।

এইসব মেলায় প্রচুর কাঠের মালা-মাল বিক্রি হয়ে থাকে। তাছাড়া বিক্রি হয়ে থাকে শিশুর খেলনা ও নানা রকম মিঠাই, বিভিন্ন পিঠা। এই মেলাগুলো সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক হয়ে থাকে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের উপজেলাগুলোতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপলক্ষে বেশ কিছু মেলা অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নে কয় একটি লোকমেলার নাম তুলে ধরা হলো।

চাঁপাইনাবাবগঞ্জ সদর : চাঁপাইনবাবগঞ্জ রথের মেলা, মহারাজপুর মেলা, কালিনগর মেলা, রানিহাটি মেলা, লক্ষরহাটি মেলা, অনুপনগর মেলা, সরজন মেলা, চরবাগডাঙ্গা মেলা।

শিবগঞ্জ উপজেলা : রানীনগর মেলা, কানসাট মেলা, চৈনত্যপুর মেলা, চককিত্তি মেলা, তোক্তিপুর মরাগঙ্গা স্নান মেলা, পোল্লাডঙ্গা মেলা।

গোমাস্তাপুর উপজেলা : যাতাহারা মেলা, কালুপুর মেলা, আড্ডা মেলা।

নাচোল উপজেলা : হাটবাকইল মেলা, নাচোল মেলা।

ভোলাহাট উপজেলা : পোল্লাডাঙ্গা মেলা।[১]

কয়েকটি উল্লেখ্যযোগ্য মেলার বিবরণ নিম্নরূপ :

১. তত্ত্বিপুর গঙ্গাস্নানের মেলা

মাঘ মাসের সপ্তমী তিথিতে শিবগঞ্জ উপজেলার তত্ত্বিপুরে মরাগঙ্গা অর্থাৎ পাগলা নদীতে গঙ্গাস্নান হয়ে থাকে। জেলা ও জেলার বাইরে থেকে পুণ্য প্রত্যাশী হিন্দু সম্প্রদায় স্নানের উদ্দেশে এ জলাশয়ে সমবেত হয় এবং স্নান করে। স্নান উপলক্ষে এখানে বসে লোকমেলা। বিভিন্ন আসবাবপত্র, মিঠাই ও খেলনা বেচাকেনা হয় এই মেলায়। হিন্দুদের পাশাপাশি প্রচুর মুসলমানদেরও সমাগম হয়। কিছুদিন পূর্বেও অর্থাৎ বছর কুড়ি আগে বাঁহুকে বা ভারে মালপত্র বহন করে দূরদূরান্ত থেকে মানুষের আগমন ঘটত। যোগযোগ ব্যবস্থা সহজ হওয়ায় এখন বাসে বা লোকযন্ত্র ভুটভুটি, নসিমন ইত্যাদিতে মানুষেরা স্নান উপলক্ষে মেলায় আসে।[২]

www.pathagar.com

২. রথমেলা

এ অঞ্চলে রথযাত্রা উৎসবের উল্টা রথযাত্রায় লোকমেলা বলে। মেলা চলে দীর্ঘদিন ধরে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার সামনে রাস্তার দুধারে মেলা বসে। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে মেলায় হাজারো মানুষের আগমন ঘটে। মেলায় পাওয়া যায় লোকশিল্পজাত পণ্য, মাটির তৈরি খেলনা, পুতুল, ব্যাংক, বিভিন্ন পাত্র। ময়রাদের দোকানে চলে ঐতিহ্যবাহী চমচম, রসগোল্লা, জিলাপি, ছানা জিলাপি, খুরমা, গোলজাম ইত্যাদির জমজমাট কেনাবেচা। রংবেরঙের বেলুন, বাঁশি ছাড়াও মেলায় বসে অসংখ্য মনোহারি দোকান। ঈদগাহ মাঠের সামনে বসে কাঠের তৈরি বিভিন্ন আসবাবপত্রের দোকান।[৩] বড় ইন্দারা মোড়ে কামারেরা নিত্য প্রয়োজনীয় লোহার সামগ্রীর দোকান নিয়ে বসেন। রথের দিনে মেলা বসলেও প্রায় একমাস ধরে চলে এই লোকমেলা।

৩. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা

চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে চাঁপাইনবাবগঞ্জে মেলা বসে। প্রবীণদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে জানা যায়, এক সময় চৈত্রসংক্রান্তিতে চাঁপাইনবাবগঞ্জের গ্রামাঞ্চলে চড়ক পূজা অনুষ্ঠিত হতো।[৪] কিন্তু বর্তমানে এদিনটি মেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে চৈত্রসংক্রান্তিতে মেলা শুরু হয় এবং সেই মেলা বৈশাখি মেলায় পরিণত হয়ে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে চলে।

তথ্যনির্দেশ

১. সাক্ষাৎকার : মো. আনিসুর রহমান(বয়স- ২৩), পিতা- মো. রাব্বিল হোসেন, গ্রাম ও ডাক- গোবরাতলা, উপজেলা ও জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ। তারিখ- ১৮.০৪.২০১২
২. সাক্ষাৎকারঃ রেবিনা খাতুন (বয়স- ৪৬), স্বামী- মো. আনসার আলী মিস্ত্রি, গ্রাম- চামাগ্রাম (নতুন গাঁ), ডাক- বারঘরিয়া, জেলা- চাঁপাই নবাবগঞ্জ। তারিখ- ১৬.০৪.২০১২
৩. লিপি সাহা, পিতা-ধনঞ্জয় সাহা, মাতা-হিমলতা সাহা, গ্রাম- রাজারামপুর মাস্টারপাড়া, পোস্ট- রাজারামপুর, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ২৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২১.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা
৪. মোহিত কুমার দাঁ, পিতা- ভূদেব দাঁ, মাতা- শৈল বালা দাঁ, গ্রাম- ইসলামপুর, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৭৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ-২১.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা

www.pathagar.com

লোকাচার

১. অন্নপ্রাশন

এটি সারাদেশেরই একটি ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক অনুষ্ঠান, যা যুগ যুগ ধরে পালিত হয়ে আসছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাতেও এর প্রচলন রয়েছে। স্থানীয় ভাষায় এটিকে 'ভাত ছুঁয়ানি' বলা হয়। শিশু জন্মের পর বাঙালির প্রধান খাদ্য ভাত খাওয়ার উপযোগী হলে এ অঞ্চলে শিশুর মুখে ভাত দিয়ে 'ভাত ছুঁয়ানি' করা হয়।

অঞ্চলের হিন্দু সমাজ জন্মের ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে পুত্রের এবং সপ্তম মাসে কন্যার অন্নপ্রাশন করে থাকে। মুসলিম সমাজেও জন্মের পঞ্চম বা ষষ্ঠ মাসে শিশুর মুখে ভাত দিয়ে থাকে।

সব পরিবার যে এটি করে এমনটি নয়। আবার অবস্থাসম্পন্নরা করে এমনটিও নয়। কোন কোন পরিবার শিশু জন্মের পর মেজাজ মর্জি অনুযায়ী পারিবারিক ভাবে অনুষ্ঠানটি করে থাকে। সামর্থ্য অনুযায়ী পাড়া-পড়শি, আত্মীয়-স্বজনরা এর সবকিছুই নিমন্ত্রণ করে থাকে।

২. খড়ের গাদার অনুষ্ঠান

এ জেলায় খড়ের গাদা দেওয়ার সময় ছোটখাট পারিবারিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। পূর্বে অনুষ্ঠানটির প্রচলন বেশি হলেও বর্তমানে কমছে। নতুন ধান ওঠার পর ধান মাড়াই করা হয়। ধান মাড়ায়ের পর খড়গুলোকে বিশেষ পদ্ধতিতে স্তুপাকারে সংরক্ষণ করা হয়। এ অনুষ্ঠানের সময় শ্রমিক ও পাড়া-পড়শি সবাই মিলে কাজে অংশ নেয় এবং গৃহস্থবাড়িতে ভরপেট মাংস ভাত ও ক্ষীর খায়।

৩. নাক ও কান ফোঁড়ানি

সৌন্দর্যের কারণে নারীদের নাক ও কানে গহনা পরা বিশ্বব্যাপী একটি প্রচলিত রীতি। বিভিন্ন দেশে কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরুষরাও নাক কানে গহনা পরে। বাংলাদেশে সাধরণত মেয়েরা গহনা পরার উদ্দেশ্যে নাক ও কান ছিদ্র করে।

চাঁপাই নবাবগঞ্জেও এটি ব্যাপক ভাবে প্রচলিত। জেলার কোন কোন বাড়িতে নাক ও কান ফোঁড়ানির দিন পারিবারিক অনুষ্ঠান হয়। এতে পাড়া-পড়শি ও বান্ধবীরা নিমন্ত্রণ পায়। অনুষ্ঠানটিতে মেয়েলি গীতের ব্যবহার আছে। বিয়েতে যে সমস্ত গান কনের গহনার জন্য গাওয়া হয়, তা-ই এখানে পরিবেশিত হয়।

www.pathagar.com

৪. জামাই ষষ্ঠী বা আমৈত

বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতিতে জামাই আদর একটি প্রাচীন প্রচলিত রীতি। এই দিন জামাইকে নতুন জামা-কাপড় ও সমর্থ্য অনুযায়ী উন্নত মানের খাদ্য পরিবেশন করা হয়। চাঁপাইনাবাবগঞ্জে আমৈত অনুষ্ঠান হয় আম পাকার সময় ও শ্বশুর বাড়ি পার্শ্বস্থ যেকোন মেলার সময়। আমের সময় উন্নত জাতের পাকা আম দুধ ও চিতাই সহযোগে আপ্যায়নের বিশেষ অনুষ্ঠানটি সাধারণভাবে আমৈত হিসেবে পরিচিত। আমের সঙ্গে আমৈত শব্দটির সম্পর্ক স্পষ্ট। তাছাড়া শ্বশুর বাড়ির আশেপাশে মেলার সময়ও জামাইকে দাওয়াত করে উত্তম খাদ্যে তৃপ্ত করা হয়। এই উৎসবে জামাইকে নতুন জামা-কাপড় ও মেলা দেখার জন্য টাকা-পয়সা দেয়ার রীতি প্রচলিত।

৫. আকিকা বা শিশু নামকরণের অনুষ্ঠান

এটি বিশ্বব্যাপী একটি ইসলামি রীতি। সারাদেশের মতো চাঁপাইনাবাবগঞ্জ জেলাতেও আঁকিকার প্রচলন রয়েছে। পুত্র সন্তানের জন্য দুটি ও কন্যা সন্তানের জন্য একটি পশু কোরবানি করার পর শিশুর নামকরণ করা হয়। গরিব পরিবারগুলো অনেক ক্ষেত্রে এটি করতে পারে না। তবে দেরিতে হলেও গরিব মানুষও আকিকা দিয়ে থাকে। স্থানীয় রীতিতে আকিকার অনুষ্ঠানের দিন পাড়া-পড়শি ও আত্মীয়-স্বজনরা দাওয়াত পায়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পাড়া-পড়শিদের নিমন্ত্রণ না করে আকিকার মাংস বাড়ি বাড়ি বিলি করা হয়।

৬. মানসিক বা মানত

মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য আল্লাহকে সন্তুষ্টির জন্য এ জেলায় মানতের প্রচলন রয়েছে। মুসলমানরা মসজিদে ও মাজারে, হিন্দুরা পূজার থানে অর্থ ও বস্তুর বিনিময়ে মানত করে থাকে। হিন্দুরা অবশ্য দেব-দেবীর কাছে তাদের মানত করে থাকে। ধর্মসিদ্ধ না হলেও কখনও কখনও ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে হিন্দুরা মাজারে এবং মুসলমানরা দেবীর থানে মানত করে। মানুষ অসুখ বিসুখে মুক্তি, মামলা জয়, সন্তান প্রাপ্তি ইত্যাদির জন্য মানত করে থাকে। এখানে মানতের গান হিসেবে মাদার পির ও সত্য পিরের গান ক্ষয়িষ্ণু ধারায় বিদ্যমান। বিপদগ্রস্ত লোক এক, তিন, পাঁচ, অর্থাৎ সাত দিনের বিজোড় সংখ্যায় মাদার ও সত্য পিরের গান করিয়ে নেয়। বোয়ালিয়া পিরের দরগার দিঘিতে কাঠ ও মাটির ঘোড়া দিয়ে এবং দুধ,চিনি, কলা ইত্যাদি ভাসিয়ে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষ মানত করে থাকে।

৭. রাখাল ফোটা

'রাখাল ফোটা' চাঁপাইনবাবগঞ্জের রাখালদের নিজস্ব লোকাচার। মাঠে গিয়ে রাখালরা বিশেষ লতা-গুল্মের থেতানো রস একে অন্যের কপালে টিপের মতো পরিয়ে দেয়। ঐ রসটির চামড়া পোড়ানোর ক্ষমতা রয়েছে। ফলে কপালে আমৃত্যু টিপের মতো দাগ

www.pathagar.com

থেকে যায়। এভাবে রাখালরা একে অন্যের সঙ্গে দোস্তি পাতায় অর্থাৎ বন্ধুত্ব করে। সেদিন তারা বাড়ি থেকে মাঠে নিয়ে আসা খাদ্য সামগ্রী বদল করে খায়। ঐ সময় কেউ কেউ ডান হাতের তর্জনী কিংবা মধ্যমায় পাঁচন বা গরু চরানো লাঠি উলম্ব ভাবে বিশেষ কায়দায় আঙুলে রাখে এবং শূনে আঙুলটিকে উপর-নিচে দোল দিতে থাকে। সেই সাথে তারা রাখালি ছড়া কাটে :

১
ডিগ্নি লড়ি, ডিগ্নি পাল
গরু চরে পাল,পাল।[১]
২
ঠিক্কা লাঠি ঠিক্কা পাল
গরু চরাবি কতকাল
লাঠি যখন পড়বে
গরু তখন মরবে।[২]

৮. তেরিহা

এটি গো-মহিষদের মঙ্গলের জন্য রাখাল ও পালনকারী গৃহস্থের এক বিশেষ অনুষ্ঠান। বাংলা সনের ফাল্গুন মাসের ১৩ তারিখে গরু-মহিষকে উত্তমরূপে ধোয়া-মোছার পর শিং ও খুরে তেল মাখানো হয়। এই দিন গৃহস্থ ক্ষীর রেধে নিজেরা খায় এবং পশুকে খাওয়ায়। এ লোকাচারটি অনুষ্ঠিত হয় গো-মহিষাদির বংশবৃদ্ধি, দুধ বৃদ্ধির পাশাপাশি অসুখ বিসুখ থেকে মুক্ত থাকার জন্য।

৯. বিয়ে উপলক্ষে লোকাচার

বিয়ে ধর্মীয় ভাবে সম্পন্ন হলেও এর বিভিন্ন আচার-আচারাদি অধিকাংশই স্থানিক রীতিতে সম্পন্ন হয়। বিয়ের অনুষ্ঠানের মধ্যে বেশ কিছু উপআনুষ্ঠানিকতা রয়েছে। যেমন, ঘটক আগমন, বিয়ে বায়না, থুবড়া ও গায়ে হলুদ, স্নান ও গায়ে হলুদ, ডালা আগমন, সাজ-সজ্জা, বিয়ে ঘেরা, হাত ধুয়ানি, বিদায়, আট মঙ্গলা ইত্যাদি। নিম্নে এগুলো সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো।

ঘটক আগমন

এই অঞ্চলে মেয়ের বাড়িতে প্রথম ঘটক আগমন করে থাকে। ঘটক এসে প্রথমে কনের পিতা-মাতার সাথে কথা বলে। সে দিন ঘটককে তুষ্ট করার উদ্দেশে ভাল-মন্দ খাওয়ানো হয়। কথাবার্তা সন্তোষজনক হলে কাছের আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে এর মধ্যে ছোটখাট পারিবারিক অনুষ্ঠান হয়ে যায়। তখন বান্ধবী, বোন, ভাবি, নানি-দাদি ইত্যাদি মিলে মেয়েলি গীত পরিবেশন করে।

আইব্যারির মুখে নাই পান

www.pathagar.com

আইব্যারি ভাবিতে ভাবিতে যায়
কাণ্টায় আছে আলুর পাতা
আইব্যারি পান বুল্যা খায়
আইব্যারির মুখে নাই চুন
আইব্যারি ভাবিতে ভাবিতে যায়
কাণ্টায় আছে পাখির গু
আইব্যারি চুন বুল্যা খায়
আইব্যারির মুখে নাই খর
আইব্যারি ভাবিতে ভাবিতে যায়
গলিতে আছে পুড়া মাটি
আইব্যারি খর বুল্যা খায়
আইব্যারির মুখে নাই পান
আইব্যারি ভাবিতে ভাবিতে যায়
গলিতে আছে গাব্ধিলার বিচি
আইব্যারি জদ্দা বুল্যা খায়
আইব্যারির মুখে নাই পান
আইব্যারি ভাবিতে ভাবিতে যায়
মা'ন্দে আছে খেজুরের বিচি
আইব্যারি সুফারি বুল্যা খায়।[৩]

পাত্র-পাত্রী নির্বাচন

বিবাহের ক্ষেত্রে প্রথম কার্যক্রম হচ্ছে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন। পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের সাধারণত তাদের পারিবারিক অবস্থা, বংশ, শিক্ষা, রূপ, গুণ, স্বভাব-চরিত্র কোষ্ঠী, দৈহিক লক্ষণ এবং মানসিক অবস্থা হলো বিচার্য বিষয়। সারাদেশের মতো চাঁপাইনবাবগঞ্জেও পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে এ বিষয়গুলো অনুসরণ করা হয়ে থাকে। তবে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিছু লৌকিক সংস্কার স্থানীয় মানুষ মেনে চলেন যা হয়তো এ জেলার বাইরে পরিদৃষ্ট হবে না বলেই মনে হয়। যেমন– পাত্রী দর্শনের যাত্রাকালে অথবা যাত্রাপথে বাধাগ্রস্থ হলে কিংবা অশুভ লক্ষণাদি দৃষ্ট হলে সেদিনের মতো যাত্রা স্থগিত করা হয়। পাত্র-পাত্রী দর্শনে বেজোড় সংখ্যক লোক যাবার রীতি কড়াকড়িভাবে মেনে চলা হয়। তবে আজকাল পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ঘটা করে লোক না গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কথাবার্তার মাধ্যমেই পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করা হয়ে থাকে।

পানচিনি

বিবাহের দ্বিতীয় আনুষ্ঠানিকতা হচ্ছে পানচিনি। পাত্র-পাত্রী পছন্দের পরপরই চাঁপাইনবাবগঞ্জে পানচিনির আয়োজন করা হয়ে থাকে। সাধারণত কন্যার পিতৃগৃহে পানচিনি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠানে বরপক্ষ কর্তৃক কন্যাকে স্বর্ণের আংটি বা টাকা দেয়া হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে আংটি পড়িয়ে বিয়ের পাকা কথা দেয়া হয় এই

www.pathagar.com

অনুষ্ঠানে। তারপর চলে আপ্যায়নের পালা। বিয়ের পাক কথা এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হয় বলে এর গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।[২৬] চাঁপাইনবাবগঞ্জে হিন্দু সমাজেও এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিম সমাজের চেয়ে তাদের আনুষ্ঠানিকতার ঘটাও বেশি। অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ, জ্ঞাতি, কুটুম্ব এবং কুলীনেরা উপস্থিত থাকেন। অনুষ্ঠানের জন্য যা যা প্রয়োজন হয় তা হচ্ছে–থালা, কলসী, তেল, সিঁদুর, ধান, দূর্বা, দোয়াত, কলম, কাগজ এবং পাত্র-পাত্রী উভয়পক্ষ থেকে একটি করে রৌপ্য মুদ্রা ও শালগ্রাম শিলা।[২৭] উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে সাক্ষী রেখে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বর্তমানে আনুষ্ঠানিকতার প্রাচুর্য অনেক কমে গেছে।

থুবড়া খাওয়ানো

বিয়ের দিনক্ষণ, মোহরানা ও উপহার দেয়াথোয়ার সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত হয়ে গেলে, বর ও কনের বাড়িতে স্বতন্ত্র ভাবে থুবড়া ও গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান শুরু হয়। বর কিংবা কনেকে আপন আপন আত্মীয়ের বাড়ি নিয়ে গিয়ে নতুন কাপড় দিয়ে সাজানো হয় এবং স্থানীয় মিঠাই দ্বারা মিষ্টিমুখ করানো হয়। নতুন পাটিতে বর বা কনে বসে থাকে।[৪] সে সময় বোন, ভাবি বা বান্ধবীরা নতুন গামছা বা শাড়ির আঁচলে বর বা কনের মুখ ঢেকে রাখে। যে ব্যক্তি মিষ্টিমুখ করাবে, সে প্রথমে বান্ধবীদের টাকা-পায়সা দিয়ে তুষ্ট করে ঢাকা মুখ ছাড়িয়ে নেয়–কাঁসার থালায় রাখা কাঁচা হলুদ মুখে মাখায়।

থুবরা খাওয়ানো

www.pathagar.com

তারপর মুখে মিষ্টি তুলে দেয়। এভাবে একের পর এক পরিবারের সবাই একই কায়দায় কাজটি সম্পন্ন করে। সাথে চলতে থাকে মেয়েলি গীত :

খাব না খাব না খাব না রে
কা'ল্যা গুড়ের ক্ষীর খাব না রে
আরসের মা মাগি জানে না রে
ধলো গুড়ের ক্ষীর কেনে রান্ধেনি রে
বসব না বসব না বসব না রে
ছিঁড়্যা সোঁপে হামরা বসব না রে
আরসের মা মাগি কি জানে না রে
লয়্যা সোঁপ কেনে কিনেনি রে।[৫]

ডালা আগমন

বিয়ের আগের রাতে বর পক্ষের বাড়ি থেকে কনে পক্ষের বাড়িতে বিভিন্ন দ্রব্যাদি নিয়ে এক বা একাধিক ডালা আসে। যাতে একাধিক শাড়িসহ কনে সাজানোর বিভিন্ন দ্রব্যাদি থাকে। ডালায় ফুল, বিভিন্ন মিষ্টান্ন ইত্যাদিও থাকে।[৬] কদাচিৎ ক্ষেত্রে ডালাতে টিয়ে, ঘুঘু,বাবুই কিংবা শালিকও লক্ষ করা গেছে। যে ব্যক্তি ডালা বহন করে আনে সে সহজেই ডালা নামাতে চাই না। তাকে আর্থিক বখশিস দিয়ে ডালা নামানো হয়। ডালা নামানো হলে শুরু হয় মেয়েলি গীত :

ডালা না ডালা
মহারাজপুরের ডালা হে আরস
ডালা ঘুঁচাইয়্যা দ্যাখ
উ না ডালাতে আছে গরির লাখের ব্যাসর হে আরস
ডালা না ডালা
মহারাজপুরের ডালা হে আরস
ডালা ঘুঁচাইয়্যা দ্যাখ
উ না ডালাতে আছে গরির গলার মালা হে আরস
ডালা না ডালা
মহারাজপুরের ডালা হে আরস
ডালা ঘুঁচাইয়্যা দ্যাখ
উ না ডালাতে আছে গরির গায়ের বেলাউজ হে আরস
ডালা না ডালা
মহারাজপুরের ডালা হে আরস
ডালা ঘুঁচাইয়্যা দ্যাখ
উ না ডালাতে আছে গরির সাত পিন্ধনের শাড়ি হে আরস
ডালা না ডালা
মহারাজপুরের ডালা হে আরস
ডালা ঘুঁচাইয়্যা দ্যাখ

www.pathagar.com

উ না ডালাতে আছে পায়ের মানান আলতা হে আরস
ডালা না ডালা
মহারাজপুরের ডালা হে আরস
ডালা ঘুঁচাইয়্যা দ্যাখ
উ না ডালাতে আছে হাতের মানান চুড়ি হে আরস
ডালা না ডালা
মহারাজপুরের ডালা হে আরস
ডালা ঘুঁচাইয়্যা দ্যাখ
উ না ডালাতে আছে মাথার মানান ফিতা হে আরস
ডালা না ডালা
মহারাজপুরের ডালা হে আরস...।[৭]

সাজ-সজ্জা

সকালে গোসল দেয়ার পর কনেকে বিয়ের উদ্দেশে নতুন জামা-কাপড় ও নতুন গয়না পরানো হয়। তারপর প্রসাধনী– মুখসজ্জা, নখপালিস, কেশবিন্যাস ও আলতার মাধ্যমে অপরূপা করে তোলা হয়। যাতে বর তার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়। আধুনিক যুগে বিউটি পার্লারের ব্যবহার বাড়লেও চাঁপাইনবাবগঞ্জে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরানো রীতিতেই সাজ-সজ্জার কাজটি সম্পন্ন করা হয়।

এ্যাতটুকুন সিঁথ্যা রে সোনার বুলবুল রে
তোকে সেন্দুর মানায়ছে সোনার বুলবুল রে
এ্যাতাটুকুন লাখে রে সোনার বুলবুল রে
তোকে ব্যাসর মানায়ছে সোনার বুলবুল রে
এ্যাতটুকুন কানে রে সোনার বুলবুল রে
তোকে পাশা মানায়ছে সোনার বুলবুল রে
ব্যালনা হোনে হাতে রে সোনার বুলবুল রে
তোকে বালা মানায়ছে সোনার বুলবুল রে
চ্যাপ্টা হোনে গলায়ে রে সোনার বুলবুল রে
তোকে মালা মানায়ছে সোনার বুলবুল রে
ডাঁসা ডাঁসা চোখে রে সোনার বুলবুল রে
তোকে কাজল মানায়ছে সোনার বুলবুল রে।[৮]

বিয়ে ঘেরা

পূর্বে এই জেলায় সমস্ত বিয়েই আসত সাজানো গরু গাড়িতে। গরু গাড়ি বিলুপ্তপ্রায় বলে এখন আসে যান্ত্রিক লোকযানে। ভুটভুটি, নসিমন, কিংবা অবস্থাভোদে বাস-মিনিবস-মাইক্রোবাস-কার ইত্যাদিতে। তবে এগুলোও সাজানো থাকে। দেখলেই বোঝা যায়, এগুলো বিয়ের গাড়ি। বরযাত্রী কনে পক্ষের বাড়ি সামনে আসলে, মেয়ে

www.pathagar.com

পক্ষের বন্ধু-বান্ধবীরা রঙীন সাজানো দড়ি দিয়ে তাদের যাত্রা ব্যহত করে। বখশিস পেলে ছেড়ে দেয়। এখানেও গীত রয়েছে।

গাড়ির গাড়ি বৈর‍্যাতি যায়
আরসের গলিতে
গাড়ির গাড়ি ডুলি গ্যাল
কিনুর বিহ্যাতে

ঢোল বাজে খোল বাজে
বাজেরে বাঁশি
ঘুইর‍্যা ঘুইর‍্যা তালি বাজায়
বিন্দ্যার ঘে শশী।

ঝামাক ঝামাক জং বাজে
বলদের গলাতে
ঘোড়ার পায়ের খুর বাজে
খট খটিতে।

চোডালাতে ঝিলিক মারে
কালাচাঁন নশা
ডুলি বাসরে পহর গনে
পুন্নি চাঁন খসা।

ডহার ঘুইর‍্যা ধুলা উড়ে
মরার খরাতে
গাড়ির দিঘল বহর হন্যা
কিনুর বিহ্যাতে।

ডহার ঘুইর‍্যা বাজনা বাজে
জং ঢোল কাঁসি
নশার ঠোঁটে বিজলি চমকে
আরসের মুখের হাঁসি।[৯]

বরসজ্জা

ছেলের বিবাহের উদ্দেশ্যে গমনের প্রাক্কালে মায়ের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করার রীতি চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রচলিত রয়েছে। বিদায় নেয়ার সময় মা ছেলেকে তার বুকের দুধের ধার শোধ নিতে বলেন। ছেলে তখন ফিরে এসে মাতৃদুগ্ধের ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দেয়। মা এরপর ছেলেকে স্বহস্তে মিষ্টান্ন খাইয়ে বিদায় দেন। হিন্দু সমাজে ছেলে বিবাহ করতে যাবার আগে উঠানে আলপনা আঁকা স্থানে গুরুজনদের প্রণাম

www.pathagar.com

জানিয়ে স্থাপিত পিঁড়িতে গিয়ে বসে। মা ছেলের মাথায় ধান-দূর্বা দিয়ে এবং বরণডালা ছুঁইয়ে তাকে এক বাটি দুধ পান করান। দুধ পান করে ছেলে মাকে প্রণাম করে। মা ছেলেকে মনে মনে আশীর্বাদ করেন। অন্যান্য গুরুজনেরাও তাকে এভাবে আশীর্বাদ করেন। তারপর ছেলের মাথায় শোলার টোপর দিয়ে কোলে করে বাইরে আনা হয়। এ সময় উলু ধ্বনির পাশাপাশি মঙ্গলগীত গাওয়া হয়ে থাকে।

বরবরণ

হিন্দু বিবাহে বরবরণের প্রথা আছে। সাধারণত দুইবার তাকে বরণ করা হয়। একবার করেন কন্যার পিতা আরেকবার অন্তঃপুরে কন্যার মাতা জামাতাকে বরণ করেন। এই দুইবার বরণ হচ্ছে একবার শাস্ত্রীয় মতে আর একবার স্ত্রী আচার মতে। শাস্ত্রীর মতে বরণ করেন কন্যার পিতা; স্ত্রী-আচার মতে কন্যার মাতা।

৫/৭ অথবা ততোধিক বেজোড় সংখ্যক নারী বস্ত্রালংকারে সজ্জিত হয়ে শঙ্খ ও 'উলুধ্বনি' সহকারে বরকে সাতবার প্রদক্ষিণ করেন এবং বরণডালার দ্রব্যসমূহ একে একে তার শরীরে ছোঁয়ান। এভাবে বরণ করেন বরকে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের মুসলিম সমাজেও বরণের ক্ষেত্রে শঙ্খ ও উলুধ্বনি ছাড়া সব পদ্ধতিই প্রায় অভিন্ন। তবে অন্যান্য স্থানের মতো বর কনের বাড়িতে পৌঁছালে চাঁপাইনবাবগঞ্জেও বাঁশ দিয়ে গেট ধরে টাকা আদায় করা হয়ে থাকে।

হাত ধোয়ানি

চাঁপাইনাবাবগঞ্জ জেলায় বিয়ের দিন বরের খাওয়া শেষ হলে কনের বান্ধবী বা বোনেরা হাত ধোয়ানোর জন্য সাবান ও তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সন্তোষজনক বখশিস না পেলে তারা তোয়ালে সাবান ও পানি বরকে দেয় না। এই বখশিস নিয়ে বর পক্ষ ও কনে পক্ষের কথাবার্তা বেশ মাজাদার ঝগড়ায় রূপ নেয়। নানা কথার শেষে সন্তষজনক বখশিস পেয়ে শেষপর্যন্ত কনে পক্ষ বরের ও কখনও কখনও বরের বন্ধুদেরও হাত ধুয়ে দেয়।

বিয়ে বিদায়

চাঁপাইনাবাবগঞ্জ জেলার বিয়েগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে দিনের বেলায় সম্পন্ন হয়। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত কনের বাড়িতে চলে বিয়ের নানা আনুষ্ঠানিকতা। বিয়ে পড়ানো শেষ হলে খাওয়া-দাওয়া, হাত ধোয়ানি, গল্প-গুজব ইত্যাদির পর বিকাল বেলায় বিদায় পর্ব শুরু হয়। সেটি যেন কান্নার ভেতর দিয়ে এক আনন্দ অনুষ্ঠান। কনে পক্ষের মায়মুরুব্বিরা একের পর এক কনের হাত বরের হাতে তুলে দিয়ে সমর্পণ ও শুভ জীবনের জন্য দোয়া করে। তখন আবশ্যিক রূপে কনে ও কনে পক্ষের কাছের স্বজনরা আনন্দাশ্রু ঝরায়। এই বিদায় পর্বের জন্য রয়েছে আলাদা মেয়েলি গীত :

ত্যালে কাজলে মানুষ করিনু পায়র্যাকে
কে বা লিয়্যা গ্যাল হামার পায়র্যাকে
নবীন বয়সের পায়র্যা হামার ক্যামনে বন্দীছে পরের ঘরে
লালনপুরের লাল ডোরা ভোলাহাটের চিরোনি

আস্তে কর‍্যা সিংড়াও হামার পায়র‍্যাকে
কেশে য্যান না লাগে
সাত সোহাগের পায়র‍্যা হামার কে লিয়্যা গ্যাল
হামার পায়র‍্যাকে বুঝাও তোমরা নীরবে বসিয়্যা
হামার পায়র‍্যাকে
বাপ মায়ের সোহা'গ্যা পায়র‍্যা
কে বা লিয়্যা গ্যাল হামার পায়র‍্যাকে
কেটা লিয়্যা গ্যাল রে
কাঁচা নিন্ধের পায়র‍্যা হামার
ক্যামনে বন্দীছে পরের ঘরে।[১০]

বধূবরণ

পুত্র নববধূসহ বাড়ি ফিরলে তাদের দু'জনকে বাড়ির আঙ্গিনায় দাঁড় করিয়ে প্রথমে পুত্রের ও পরে বধূর মাথায় তিন মুষ্টি ধান-দূর্বা দিয়ে মাতা এবং প্রবীণা আত্মীয় কর্তৃক বরণ করার রীতি রয়েছে চাঁপাইনবাবগঞ্জে। বর বিয়ে করে ফিরলে বধূকে কোলে নিয়ে বাড়ির আঙ্গিনায় আনার রীতি এখানে প্রচলিত ছিল, কিন্তু বর্তমানে তা আর নেই বললেই চলে।[১১]

ফুলশয্যা

বিবাহের রাতে বরের বাড়িতেই ফুলশয্যার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। ফুলশয্যার রাতকে বাসর রাতও বলা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই রাত থেকেই নব দম্পত্তির নতুন জীবন শুরু হয়। বাসর ঘরেই বর তার নববধূর ভরণপোষণের যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে। বর এই সময় তার স্ত্রীর হাতে একটি কাপড় দিয়ে ভরণপোষণের আঙ্গিকার করে। এই রাতে সাধারণত স্বামী-স্ত্রী প্রথম যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। বাসর রাতের পর বর-বধূকে আনুষ্ঠানিকভাবে গোসল করানো হয়। একে 'বাসি গোসল' বলা হয়। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়েই বাসি গোসলের প্রচলন রয়েছে।[১২]

বিহাই জাফত (নেমন্তন্ন)

বিয়ের পর একরাত শ্বশুর বাড়িতে থেকে পরদিন কনে তার বরসহ বাপের বাড়ি ফিরে আসে। তবে তারা নিজেরাই ফিরে আসে না। কনের পক্ষের লোক স্বদলবলে গিয়ে মেয়ে-জামাইকে নিয়ে আসে। নতুন কুটুমের বাড়িতে দাওয়াত খেয়ে বর-কনেকে নিয়ে আসার অনুষ্ঠানই হলো বিহাই জাফত(স্থানীয় ভাষায়)।[১৩]

১০. খৎনা বা মুসলমানি

মুসলিম সম্প্রদায়ের বিধান অনুযায়ী ৫/৭ বছর বয়সী ছেলে বা কিশোরের লিঙ্গের অগ্রভাগ ঢেকে রাখার অংশ চামড়া কেটে ফেলে দেয়ার আনুষ্ঠানিকতাকে খাৎসা বা

www.pathagar.com

মুসলমানি বলা হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষায় একে 'খাৎনা' ও 'সুন্নাত কাজ' বলে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় এ খাৎতার কাজটি করেন 'ওস্তা' নামক এক শ্রেণির পেশাজীবী মানুষ। তারা সনাতন পদ্ধতিতে এ কাজ সম্পন্ন করে থাকেন। একটি ধামা (বড় আকারের ডালা) তে শিশুটিকে বসানো হয়। তারপর একজন শক্ত সামর্থ মানুষ বিশেষ কায়দায় শিশুকে ধরেন। তারপর শিশুটির চোখে পানপাতা দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। ওস্তা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে শিশুটির লিঙ্গের অগ্রভাগের চামড়া কেটে ফেলেন বাঁশের চোঁচা দিয়ে।

তারপর কাটা অংশে ঘুটার ছাই মাখিয়ে দেন। এতে রক্ত অত্যন্ত অল্পসময়ে বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে তারা আধুনিক ঔষধ পত্র এবং ডেটল বা শ্যাভলন ব্যবহার করে থাকেন। খাৎনা উপলক্ষে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার আয়োজন করা হয়ে থাকে। আগের দিন শিশুটিকে হলুদ মাখানো হয়। খাওয়ানো হয় থুবড়া। বাড়িঘর সাজানো হয় ফুল দিয়ে। খাৎনা সম্পন্ন হওয়ার পর সেদিন অথবা কয়েকদিন পর প্রতিভোজের আয়োজন করা হয়। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশীগণকে গরু-খাসি জবাই করে আপ্যায়ন করার রীতি এখনও প্রচলিত রয়েছে চাঁপাইনবাবগঞ্জে।[১৪]

অতিসম্প্রতি শহরাঞ্চলে ওস্তার মাধ্যমে খাৎনা দেয়ার পরিমাণ কমে গেছে। শহরের বিভিন্ন ক্লিনিকে ডাক্তাররা এখন খাৎনা দেয়ার কাজ করে থাকেন। এটি নিরাপদ এবং পদ্ধতি বিকাশ সম্মত। তবুও গ্রামাঞ্চলে সনাতন পদ্ধতিতে খাৎনা কাজ অব্যাহত রয়েছে। প্রবীণেরা মনে করেন ওস্তারা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এবং যথাযথভাবে খাৎনার কাজ করেন। তাই তাঁরা হাসপাতাল ক্লিনিকের পরিবর্তে ওস্তার কাছে খাৎনা দিতে ছেলের মা-বাবাকে উৎসাহিত করে থাকেন।

১১. সাধ ভক্ষণ

স্ত্রীলোক গর্ভবতী হলে 'তার বাঁচার আশা থাকে না'। তাই প্রবাদ বাক্যটির প্রতি লক্ষ রেখে গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-পড়শি গর্ভবতী স্ত্রীলোকের সাত মাসের গর্ভাবস্থায় সকলে পৃথক পৃথকভাবে এক একটি খাবারের আয়োজন করে। গ্রামীণ কথায় একে 'সাধ খাওয়ানো' বলে। এই সাধ খাওয়ানো উপলক্ষে মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-পড়শীরা পায়েস, পিঠা, পোলাও, বিরাণী, সেমাই ও অন্যান্য মিষ্টান্ন দ্রব্য প্রস্তুত করে।

মনকি গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের মনে যা যা খেতে সাধ জাগে, এ সময় তারা সবকিছুই খায়। মরণ-জীবনের কথা বলা যায় না হেতু এ সময় সকল আত্মীয় গর্ভবতী স্ত্রীলোককে দেখতে আসে এবং সকলেই গরু গাড়ির পিছনে 'ঝাইলসা' অর্থাৎ বড় বড় মোরগ, মুরগী, হাঁস কবুতর, খাসি, রুই, চিতল, কাতল ও মাগুর মাছ এবং বস্তাবন্দি পোলাওয়ের চিক চাল, গুড়, চিনি ইত্যাদি বেঁধে নিয়ে আসে। এরপর পালা করে সকলে রান্না করে গর্ভবতী স্ত্রীলোককে খাওয়ায় এবং আদর সোহাগে আপ্লুত করে। প্রত্যহ

www.pathagar.com

এমনি ধরনের আদর সোহাগ ও নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণের মধ্য দিয়ে গর্ভবতী স্ত্রীলোক সাত মাসের সীমানা অতিক্রম করে।[১৫]

চাঁপাইনবাবগঞ্জের হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই 'সাধভক্ষণ' একটি উল্লেখযোগ্য লোক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে উভয় সম্প্রদায়ই এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকে। পূর্বে এ ধরনের আমন্ত্রণ দেয়ার প্রথা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ আকারে ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা ব্যাপকতা লাভ করেছে। এখানাকার মানুষ আমন্ত্রণপত্র ছাপিয়ে 'সাধভক্ষণ' অনুষ্ঠানে সুধীজনদের আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রচলিত রীতি হচ্ছে প্রথম গর্ভ ধারণ করলে প্রসূতিকে সাধভক্ষণের পর পিতৃগৃহে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তার প্রথম সন্তান ভূমিষ্ট হয়।[১৬]

চাঁপাইনবাবগঞ্জের লোকসমাজের বিশ্বাস গর্ভাবস্থায় একজন নারী যা যা খেতে ইচ্ছা করে তা যদি খেতে না পায় তাহলে তার প্রসব কষ্ট হয়। তবে সাধারণ বিশ্বাস হলো, প্রসূতির অপূর্ণ ইচ্ছা গর্ভস্থ সন্তানকে প্রভাবিত করে। সে লোভী হয়। প্রকৃতপক্ষে গর্ভস্থ সন্তান মাতৃরস শোষণ করেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলে মাতৃদেহে জৈবরসের ঘাটতি পড়ে। প্রতিটি নারী প্রথম সন্তান প্রসবের সময় জীবনাশঙ্কায় দেহে-মনে দুর্বল হয়ে পড়ে। এই কারণেই সাধভক্ষণ অনুষ্ঠানে তার প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়া হয়।

১২. ষেটেরা

সন্তান জন্মের ছয় দিনের সময় 'ষেটেরা' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা চাঁপাইনবাবগঞ্জের একটি প্রচলিত রীতি। এখানাকার হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে 'ষেটেরা' অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। এই দিন হিন্দুদের ষষ্ঠী অথবা সূতিকাগোষ্ঠীর পূজা হয়, মুসলিমরা মিলাদ অথবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সাধারাণ বিশ্বাস হলো-ষেটেরা রাতে ফেরেস্তা অথবা বিধাতা পুরুষ এসে শিশু ভাগ্য লিখে যান। শিশুর নাভি থেকে নাড়ি শুকিয়ে পড়তে ৪/৫ দিন সময় লাগে। নাভি পড়ে যাওয়ার পরই সাধারণত শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠার হয়ে থাকে। ছয় দিনের দিন যেহেতু অনুষ্ঠানটি হয় সেহেতু এর নাম 'ষেটেরা'।[১৭]

হিন্দু ও মুসলিম সমাজে 'ষেটেরা' অনুষ্ঠানের সময় এবং নিয়ম মৌলিক দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও পদ্ধতিগত দিক দিয়ে বেশকিছু ভিন্নতা লক্ষ্যণীয়। নিম্নে উভয় সম্প্রদায়ের 'ষেটেরা' অনুষ্ঠানের বিবরণ দেয়া হলো :

হিন্দু সম্প্রদায়

১. ষেটেরার দিন মা নবজাত শিশুকে হলুদ মিশ্রিত পানিতে ভেজানো ন্যাকড়া দিয়ে মুছিয়ে দেয় এবং সারা শরীরে তেল মাখিয়ে জলের ছিটা দেয়।
২. ঘর গোবর দিয়ে লেপে তাতে সুসজ্জিত বিছানা করে শোয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
৩. শিশুকে ঘুম পাড়ানোর আগে মা শিশুর চোখে কাজল এবং বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল দিয়ে কপালে চন্দনের ফোটা দেয়।

www.pathagar.com

৪. শিশুকে পূর্বদিকে মাথা রেখে শোয়ানো হয় এবং মাথার দিকে (শিয়রে) দোয়াত, কাগজ, কলম রেখে দেয়া হয়।
৫. শিশুকে একটি সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়।
৬. শিশু ঘুমিয়ে গেলে মা দরজা বন্ধ করে আহার করতে বসে।
৭. শিশু কেঁদে উঠলে মা তাকে কোলে নিয়ে স্তন্য পান করায়।
৮. ওই দিন নামকরণ হলে শিশু জেগে উঠার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঠাকুরদাদা বা ঠাকুরমার কোলে দেয়।
৯. ষেটেরার দিন মা উপবাস থাকে। সে নতুন কাপড় পরিধান করে।[১৮]

পূর্বেই বলা হয়েছে স্থানীয় হিন্দু সমাজের লোকবিশ্বাস এই দিনেই বিধাতা শিশুর ভাগ্য লিখতে আসেন। শিশু যতক্ষণ বিছানায় নিদ্রাচ্ছন্ন থাকে ততক্ষণ বিধাতা লিখতে থাকেন। লেখা শেষ হলেই শিশু কেঁদে ওঠে।

ষেটেরার দিন হিন্দু সম্প্রদায় আঁতুড় ঘরে দুইটি কলার ডোঙ্গা নতুন কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখে। একটি ডোঙ্গায় ধান ভর্তি করে তার ওপরে হর্তুকি, পাঁচটি কদমা এবং কাঁচা হলুদ রাখে। অপরদিকে থাকে আম্ররস, হর্তুকি আর জল। একটি বড় প্রদীপ ৬/৭টি সলতে থাকে। আঁতুড় ঘরে, 'হরেকৃষ্ণ হরে রাম' লিখে রাখা হয়। মা দেবতার উদ্দেশ্য প্রণাম করে শিশুকে কোলে নিয়ে ছয় আনাজের তরকারী দিয়ে ভাত খেতে বসে এবং প্রথম ভাত মুখে দিয়ে শিশুর মুখেও সে খাবার স্পর্শ করে। এমন করলে ভবিষ্যত জীবনে শিশুর সেসব খাবার সহ্য হয় বলে বিশ্বাস রয়েছে।

মুসলিম সম্প্রদায়

১. ষেটেরার দিন শিশুকে নতুন কাপড় দেয়া হয়, লাল সুতা এবং লোহার খাড়ুও দেয়া হয়।
২. শিশুর মাথার চুল কামানো হয়।
৩. রাতে শিশুর মাকে মাছ খাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়।
৪. রাতে একটি কুলায় ৫/৭ সের পমািণ আমন ধান, একটি বই, খাতা, কলম, দোয়াত শিশুর শিয়রে রাখা হয়।
৫. সেদিন কোরআন তেলাওয়াতের ব্যবস্থা করা হয়।
৬. বিভিন্ন তরকারি দিয়ে একটি ঘণ্টা এবং মিষ্টান্ন ও মাছ, মাংস রান্না করে ভোজ পর্ব সেদিনের অন্যতম দিক।
৭. ওই রাতে কেউ ঘর থেকে বের হতে পারে না।
৮. আহার পর্বে মা শিশুকে কোলে নিয়ে খায়।
৯. আহার পর্ব শেষে অনেক রাতে মা শিশুকে কোলে নিয়ে পশ্চিমমুখি হয়ে মাটিতে সেজদা দিয়ে তার সন্তানের হায়াত ও বিদ্যা বুদ্ধি কামনা করে।[১৯]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, চাঁপাইনবাবগঞ্জের লোকায়ত সমাজের বিশ্বাস যে, ষেটেরার রাতে শিশুর ভাগ্য নির্ধাতি হয়।

www.pathagar.com

১৩. নামকরণ

জন্মের দশম রাতে শিশুর নামকরণ করার বিধান রয়েছে হিন্দু শাস্ত্রে। তা সম্ভব না হলে শিশুর অন্নপ্রাশনের সময় নামকরণ করার নিয়মও রয়েছে। মধ্যযুগে বাঙালি হিন্দু সমাজে ব্যাপকভাবে অন্নপ্রাশনের সময় নামকরণের রীতি ছিল। মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজে জ্যোতিষী ডেকে জাতক-জতিকার নামকরণ করা হতো। নামকরণের ব্যাপারে অসংখ্য সংস্কার রয়েছে। যে বারে সন্তান ভূমিষ্ট হয় সেই বার অনুসারে নাম রাখার রীতি আজো চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রচলিত রয়েছে। এখানে মঙ্গলবার ছেলের জন্ম হলে তার নাম মংলা, বুধবার জন্ম হলে বুধু বা বুধো নাম রাখতে দেখা যায়। চাঁপাইনবাবগঞ্জের মুসলিম সমাজ শরীয়ত মতে নামকরণ পরবর্তী সময়ে শিশুর আকিকা হয়ে থাকে। ছেলে হলে দুটি এবং মেয়ে হলে একটি ছাগল বা গরুর ভাগ কোরবানি করার নিয়ম রয়েছে। আকিকার মাংস, ছেলে-মেয়ের বাবা-মা'র খাওয়া নিষেধ থাকে।[২০]

১৪. শিশুর জন্মের পর আজান বা শংখধ্বনি

পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো শিশুর জন্মগ্রহণ। শিশু জন্মগ্রহণ করা মাত্রই আজান দেওয়ার নিয়ম রয়েছে মুসলমান পরিবারে। কারণ শিশু জন্মলাভ করেই যাতে আল্লাহর রাসুলের নাম ও নামাজের ডাক শুনতে পায়। কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি হলেও ঐ সময় আজান দেওয়ার নিয়ম চালু আছে মুসলমান পরিবারে। শুধুমাত্র ছেলেশিশুর জন্য আজানের নিয়ম থাকলেও মেয়েশিশুর জন্মের কারণে আজানের প্রচলন নেই। এটি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পুরুষ প্রাধান্যের ফল মনে হয়। শহরবন্দরে বেশিরভাগ শিশুই আজকাল জন্ম নিচ্ছে ক্লিনিকে এবং হাসপাতালে। উলুধ্বনি এবং শঙ্খধ্বনি করা হয় হিন্দু পরিবারে সন্তান জন্ম নেওয়ার পর। শিশু জন্মের পর সাধ্য অনুযায়ী পাড়া-প্রতিবেশীকে এবং আত্মীয়-স্বজনকে মিষ্টি বিতরণের নিয়ম এখনও চালু আছে।[২১]

তথ্যনির্দেশ

১. সাক্ষাৎকার : মো. আনিসুর রহমান(বয়স-২৩), পিতা- মো. রাব্বিল হোসেন, গ্রাম ও ডাক- গোবরাতলা, উপজেলা ও জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ। তারিখ–১৮.০৪.২০১২
২. সাক্ষাৎকার : বাবু (বয়স-৪৮), পিতা- মুহম্মদ ফজলুর রহমান, উপজেলা ও জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ। তারিখ– ২০১১,২০১২,২০১৩ সালের বিভিন্ন সময়
৩. সাক্ষাৎকার: রেবিনা খাতুন (বয়স–৪৬), স্বামী–মো. আনসার আলী মিস্ত্রি, গ্রাম–চামাগ্রাম (নতুন গাঁ), ডাক–বারঘরিয়া, জেলা–চাঁপাই নবাবগঞ্জ। তারিখ–১৬.০৪.২০১২
৪. মহবুব ইলিয়াস, আলকাপ গান সরকার ও আলকাপ গান বিষয়ক গ্রন্থ রচয়িতা, নিমতলা, ডাক ও জেলা–চাঁপাই নবাবগঞ্জ এর অপ্রকাশিত রচনা থেকে সংগৃহীত
৫. নিজস্ব সংগ্রহ : রেবিনা খাতুন, প্রাগুক্ত
৬. সাক্ষাৎকার: আলহাজ ফজলে বারী (ফাঁকু মাস্টার, প্রাক্তন ইউ.পি.চেয়ারম্যন-১৯৭২),(বয়স- ৮১),পিতা-এসানউদ্দীন মণ্ডল, গ্রাম-চামাগ্রাম, ডাক-বারঘোরিয়া,

www.pathagar.com

উপজেলা ও জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ; বংশীরঞ্জন পাল (বয়স-৮৯), পিতা-যতীন্দ্রনাথ পাল, গ্রাম ও ডাক- বারঘরিয়া, উপজেলা ও জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ

৭. সাক্ষাৎকার: রেবিনা খাতুন, প্রাগুক্ত

৮. সাক্ষাৎকার : মরিয়ম বেগম (বয়স-৪৩), স্বামী–মো. সাইফুল ইসলাম, গ্রাম–চকনরেন্দ্র, ডাক–মল্লিকপুর, জেলা–চাঁপাই নবাবগঞ্জ। তারিখ–২৮.০৩.২০১২

৯. মহবুব ইলিয়াস, আলকাপ গান সরকার, প্রাগুক্ত

১০. সাক্ষাৎকার : নাসিমা খাতুন, প্রাগুক্ত

১১. মলি, পিতা-মরহুম আক্কাশ উদ্দীন মাস্টার, মাতা-মর্জিনা বেগম মিনি, গ্রাম-ছত্রাজিতপুর, পোস্ট-ছত্রাজিতপুর, উপজেলা-শিবগঞ্জ, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৪০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ-২২/১২/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

১২. মিতুল, পিতা-মরহুম আক্কাশ উদ্দীন মাস্টার, মাতা-মর্জিনা বেগম মিনি, গ্রাম-ছত্রাজিতপুর, পোস্ট-ছত্রাজিতপুর, উপজেলা-শিবগঞ্জ, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৩৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-উচ্চমাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ-২২/১২/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

১৩. শওকতারা বেগম, (বয়স-আনু ৬৫), স্বামী- মোহাঃ ফজলে বারী মাস্টার, গ্রাম-চামাগ্রাম, ডাক- বারঘোরিয়া, উপজেলা ও জেলা- চাঁপাইনাবাবগঞ্জ; মোহিত কুমার দাঁ(বয়স-৬৮), পিতা-ভূদেব দাঁ, গ্রাম-বড়ো ইন্দারা মোড়, ডাক উপজেলা ও জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। তারিখ- ১২.০৫.২০১২

১৪. শাহ্‌জাহান প্রামাণিক, পিতা-মরহুম রুস্তম প্রামাণিক, মাতা-দুলু বিবি, গ্রাম-মসজিদপাড়া, পোস্ট-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৫৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ-২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

১৫. আকলিমা বেগম, স্বামী-মোঃ আবুল কাশেম, মাতা-খোদেজা বেগম, গ্রাম-বিশালপুর, পোস্ট-নাচোল, উপজেলা-নাচোল, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৫০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-তৃতীয় শ্রেণী, সংগ্রহের তারিখ-২৮/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা।

১৬. তাহেরা ইসলাম, স্বামী-সিরাজুল ইসলাম, মাতা-মরহুম জায়েদা বেগম, গ্রাম-বারোঘরিয়া, পোস্ট-বারোঘরিয়া, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৬২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-উচ্চ মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ-২৭/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

১৭. গোলাপী বেগম, স্বামী-নওসাদ আলী মিস্ত্রি, মাতা-জরিনা বেগম, গ্রাম-মহারাজপুর, পোস্ট-মহারাজপুর, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৫০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-পঞ্চম শ্রেণী, সংগ্রহের তারিখ-০৩/১২/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

১৮. গীতা রানী দাস, পিতা-সুবল চন্দ্র দাস, গ্রাম-বারোঘরিয়া তাঁতিপাড়া, পোস্ট-বারোঘরিয়া, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৪৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-উচ্চমাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ-০৭/১২/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

১৯. মোঃ গোলাম জাকারিয়া, পিতা-আলহাজ আবুল কাসেম বিশ্বাস, মাতা-জমিলা বেগম, গ্রাম ও ডাক-চৈতন্যপুর, উপজেলা-শিবগঞ্জ, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৪৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ-২৩/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৩:০০ টা

www.pathagar.com

২০. নাজমা বেগম, পিতা-মহবুব ইলিয়াস, মাতা-সুরাইয়া বেগম, গ্রাম-নতুন ইসলামপুর, পোস্ট-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৪৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ-২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
২১. ফাইজুর রহমান মানি, পিতা-মরহুম ইউনুসুর রহমান, মাতা-উমরাতুন নেসা, হাসপাতাল রোড, পোস্ট-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৪৯ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ-২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

www.pathagar.com

লোকখাদ্য

আবহমান বাঙালির উৎপন্ন দ্রব্যের শীর্ষে যেমন ধান, খাদ্য তালিকায় শীর্ষে তেমনি রয়েছে ভাত। ভাত শুধু বাঙালির প্রধান খাদ্যই নয়, তার সভ্যতা সংস্কৃতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অন্যতম কেন্দ্র বিন্দু। বাঙালির জীবন জীবিকার সংগ্রাম যেমন ভাতের সংগ্রাম তার চিরকালীন সমস্যাও তেমনি 'হাঁড়ির ভাই না নিতি আবেশী, বাঙালির কৃষি কেন্দ্রিক সভ্যতা প্রধানতই ধান কেন্দ্রিক। ধানকে বাঙালি তার সন্তানের মতোই ভালোবাসে, তাই আদর করে নাম রাখে অঞ্জন লক্ষ্মী, অমৃতশালী, আঁধারকালী, উত্তমশালি, আকাশমনি, পক্ষীরাজ, পদ্মরাজ, গন্ধরাজ, পারিজাত, কাঁশফুল, বাসমতি, শঙ্খমুখী, গৌরীকাজল, মাধবলতা, মধুমালতী, মানিকশোভা, চিনিসাগর, কালজিরা, বেগুনবিচি, গোলাপভোগ, বাদশাভোগ, কুমারভোগ ইত্যাদি। তন্মধ্যে কোনো কোনো ধানের ভাত যেমন দক্ষিণবঙ্গের বালাম, উত্তরবঙ্গের কাটারিভোগ এবং পূর্ববঙ্গের বিরুই বাঙালির রচনায় রীতিমতো দিগ্বিজয়ী।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিখ্যাত চালের মধ্যে রঘুসাইল, আতপ, চিনিআতপ, গোপালভোগ, বাঁশফুল, চিনিসাগর, বাসমতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এখানকার অন্নরন্ধন এবং ভোজনের রীতিও বহুমুখী এবং বিচিত্র। জাউভাত, ফেনভাত, পান্তাভাত, কড়কড়ে বাসিভাত কিংবা গাঁজিয়ে কাঞ্জি করেও খাওয়ার নিয়ম এখানে রয়েছে। তবে গরম ধূমায়িত ঝরঝরে ভাত খাওয়াই স্বাভাবিক ও সাধারণ রীতি। ফেন গলিয়ে অথবা না গলিয়েও উত্তম ঝরঝরে ভাত রান্না চলে।

শাক-ভাত বাঙালির প্রিয় ও পরম আদরের। নানা কৌশল ও রীতিতে শাক রন্ধন করে বাঙালি রমণী সমাজে সুখ্যাতি কুড়াতেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জের সাধারণত কলমীশাক, পুঁই শাক, পালং শাক, কচু শাক, মূলা শাক, কলাই শাক, মটর শাক, লাউ শাক, পাট শাক, কুমড়া শাক, লাল শাক, অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানকার শাক রান্নায়ও বৈচিত্র্য আছে। সাধারণত জ্বাল দিয়ে শাকের রস শুকিয়ে তেলে ভেজে শাক রান্না করা হয়। তবে কোনো শাল আস্ত কোনোটা কুচি কুচি করে কেটে, কোনোটা পাটায় পিশে, রান্নার নিয়ম রয়েছে।

১. কলাইয়ের রুটি

কলাইয়ের রুটি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার অধিবাসীদের সকালে নাস্তা হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয় লোকখাদ্য। এক ভাগ কলাইয়ের আটার সাথে দুই ভাগ চাউলের আটা একত্রে পানি দিয়ে উত্তম করে মাখানো হয়। মাখানো নরম আটা পরিমাণমত নিয়ে দুই হাতে

www.pathagar.com

কৌশলে গোলাকার রুটি তৈরি করা হয়। মাটির খোলায় অল্প তাপে সেঁকে তা খাবারের উপযোগী করা হয়। মরিচ দিয়ে বাঁটা লবনের সাথে পেয়াজ, ধনেপাতা ও সরিষার তেল মিশিয়ে এক ধরনের চাউনি তৈরি করা হয়। পোড়া বেগুন ভর্তা ও এর স্বাদ বৃদ্ধি করে। কলাইয়ের রুটি বেশ পুষ্টিকর খাদ্য। ছোট-বড় সব গৃহস্থ ঘরে আজ এর আছে। উল্লেখ্য যে, চাঁপাইনবাবগঞ্জের যা চরাঞ্চলের মাটিতে কলাইয়ের ফলন ভাল হয়।[১]

কলাইয়ের রুটির দোকান

২. নকশি পিঠা

আবহমান বাংলার লোকসংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হচেছ পিঠা। পিঠা বাঙালি জীবনের হাজার বছরের ঐতিহ্য। নারী শিল্পের পরম উদ্ভাবন, লোক ঐতিহ্যের রোমান্স বাঙালির পিঠা শিল্প। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালি জীবনেও পিঠা ছিল অতীত বাস্তব রূপরসের আকর। নানা উৎসব অনুষ্ঠান, ঈদ, পূজা, খাতনা, আকিকা, বিবাহ, সব-ই। বরাত প্রভৃতি উৎসব আনন্দের দিন পিঠা ছাড়া যেন মোটেই জমে না। পিঠা ভক্ষণের রীতি নবান্নের দিনে রীতিসিদ্ধ পরম একটি লোকাচার। পৌষ সংক্রান্তির দুই তিন দিন ধরে পিঠা পার্বণ বহুকাল থেকে বাঙালির জাতিগত ও নৃতাত্ত্বিক ইতিহাসকে মুখর করে রেখেছে। পিঠার প্রধান ও মূল উপকরণ চালের গুড়া। এর সঙ্গে গুড়, নারকেল বা নারকেলের খিরসা, দুধ, তালের রস, ইত্যাদি ভিন্নতর কৌশলে মিশিয়ে, কখনো তেল

www.pathagar.com

ঘিয়ে ভেজে, কখনও তার-আখ-খেজুর-কলার রসে ডুবিয়ে নানা জাতের ও বৈশিষ্ট্যের পিঠা তৈরি হয়।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল উৎসব অনুষ্ঠানে, ব্রত পার্বণে, পূজা-ঈদে, লৌকিক পীর-ফকির, আউলিয়া-দরবেশের সিন্নিতে, লৌকিক দেব-দেবীর পূজাতে পিঠা তৈরির রেওয়াজ আছে। পৌষ পার্বণ বা পৌষ পিঠা এমনি একটি সার্বজনীন অনুষ্ঠান। পিঠা তৈরির বৈশিষ্ট্য স্বাদ ও রুচির বৈচিত্র্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জের মেয়েদের কৃতিত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। চাঁপাইনবাবগঞ্জের লোকায়ত সমাজে সুস্বাদু, সুচারু এবং সুরুচি সম্পন্ন পিঠা তৈরি শুধু মহিলাদের ব্যক্তিগত বলে বিবেচিত। এই সামাজিক-পারিবারিক ঐতিহ্য-আভিজাত্য এবং ইজ্জত সম্ভ্রমের প্রতিযোগিতাই সম্ভবত চাঁপাইনবাবাগঞ্জের পিঠাকে স্বাদ, রুচি, বৈচিত্র্যে এবং কারুকার্যে অভিনব করে সৃষ্টি করার প্রেরণা যুগিয়েছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের বহু বিচিত্র ধরনের পিঠা তৈরি হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে এখানকার পিঠার একটি সংক্ষিপ্ত অসম্পূর্ণ তালিকা দেয়া যেতে পারে– পাটিসাপটা, দুধ পিঠা, ধুপি পিঠা, চিতোই পিঠা, আঁধাসা পিঠা, গুড় পিঠা, পাতা পিঠা, বড়া পিঠা, তালের পিঠা, নারকেল পিঠা, পুষণী, পিঠা, কলা পিঠা, গড়গড্যা, রস পিঠা ইত্যাদি।[২]

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ছাঁচের সাহায্যেও পিঠা তৈরি করা হয়ে থাকে। ছাঁচের সাহায্যে তৈরি পিঠা 'নক্‌শি পিঠা' নামে পরিচিত। সাধারণত মাটি, পাথর, কাঠ এবং ধাতুর দ্রব্যাদি দ্বারা পিঠা তৈরির নক্‌শা ছাঁচ তৈরি করা হয়। মাটির ত্রিকোণ বৃত্ত, অর্ধচন্দ্র, জ্যামিতিক নক্‌শা তৈরির জন্য নানা ধরনের ফুল মাছ, পশু-পাখির ছাঁচ তৈরি করা হয়। এসব ছাঁচের তৈরি মিষ্টান্ন–পিঠা গ্রামীণ অঞ্চলের মেলার একটি বৈশিষ্ট্য। সন্দেশ, আমসত্ত, দুধ, লাড়ু, গুড়ের পাটালি ছাঁচের মাধ্যমেই তৈরি হয়ে থাকে।

মিষ্টি প্রস্তুত করবার সময় চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিল্পীগণ এক সময় বিভিন্ন ধরনের জীব-জন্তুর আকৃতির ছাঁচ তৈরি করতেন। যেমন– ময়ূর, ঘোড়া, মাছ, দেব-দেবী যেমন–লক্ষ্মী উল্লেখযোগ্য। মহরম এবং শব-ই-বরাতের সময় মুসলিম কারিগরেরাও নানা ধরনের নক্‌শি পিঠা মিষ্টি তৈরি করে গ্রাহকদের মনোরঞ্জন করতেন। পূজা-পার্বণ উপলক্ষে হিন্দু কারিগরেরা বিশেষ বিশেষ ধরনের নক্‌শি পিঠা তৈরি করে থাকে। ছাঁচ তৈরি নাড়ু যৌতুক হিসেবে কন্যার বাড়িতে পাঠাবার প্রথা এক সময় এখানে প্রচিলত ছিল। এমনকি ছাঁচে তৈরি আমসত্ত পূজার নৈবেদ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

গ্রামের মেয়েদের শিল্পবোধের পরিচায়ক নক্‌শি পিঠাতে কখনো কখনো সৎ বা নীতিবাক্যের ছাপ দেখা যায়। যেমন–'সুখে থাক', 'শুভ বিবাহ' ইত্যাদি। চাঁপাইনবাবগঞ্জের নক্‌শি পিঠার নানা নাম রয়েছে–কাজল লতা, ভ্যাট ফুল, পদ্ম দীঘি, সাগর দীঘি, শঙ্খলতা, চম্পাবরণ, চিরলপাতা ইত্যাদি। সুদৃশ্য সুঘ্রাণ বিশিষ্ট মুখরোচক এসব নক্‌শি পিঠা আত্মীয়-স্বজন, অতিথি, জামাই আপ্যায়নে এক অত্যাবশ্যক লৌকিক চিত্রকলা। নক্‌শি পিঠা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জনাব আলমগীর জলিল বলেন, "নামমাত্র পিঠা, বিশেষত নক্‌শি পিঠাকে কেন্দ্র করে বাঙালি শিল্পীমনা নারী জাতি স্বীয় মন মেজাজ, সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস নানাভাবে উৎসারিত করে।

www.pathagar.com

নকশি পিঠা

'পৌষালী উৎসব' অর্থাৎ পিষ্টক ভক্ষণের পরবে পিঠার আশ্রয়ে অভূতপূর্ব সনাতন সৌন্দর্যলিপ্সু মনের বহিঃপ্রকাশে সহায়তা করে। পিঠা বিচিত্র রংরূপ ও স্বাদের সঙ্গে তার ফোঁড়ে ফোঁড়ে রূপায়িত হয় বাঙালি নারী মনের শত কামনা-বাসনা, সুখ সাচ্ছন্দ্য ও সাংস্কৃতিক ভাব-ভাবনা।"[৩]

তথ্যনির্দেশ

১. রহিমা বেগম, স্বামী-মোঃ আব্দুর রহমান, মাতা-রওনোকআরা বেগম, গ্রাম-দলদলি, পোস্ট-ভোলাহাট, উপজেলা-ভোলাহাট, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৪৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-পঞ্চম শ্রেণি, সংগ্রহের তারিখ-২৭.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
২. আকলিমা বেগম, স্বামী-মোঃ আবুল কাশেম, মাতা-খোদেজা বেগম, গ্রাম-বিশালপুর, পোস্ট-নাচোল, উপজেলা-নাচোল, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৫০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-তৃতীয় শ্রেণী, সংগ্রহের তারিখ-২৮.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৩. আলমগীর জলিল, বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতি, ব্র্যাক প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২৫

www.pathagar.com

লোকনাট্য ও লোকনৃত্য

ক. লোকনাট্য

লোক-জীবন কথা অবলম্বনে লোককবিদের রচিত নাট্যগুণ সম্পন্ন সৃষ্টিগুলো লোকনাট্য নামে পরিচিত। লোকনাট্য পরিবেশনায় থাকে গীত, নৃত্য ও অভিনয়।

গ্রামীণ-বাংলার লোকসমাজে প্রচলিত পুরাণ, বিশ্বাস, রূপকথা, উপকথা, ধর্মীয় চরিত্র, বা সাধারণ মানুষের জীবন চিত্রকে অবলম্বন করে যে সব নাটকীয় আখ্যান বাড়ির উঠানে, মন্দির প্রাঙ্গণে বা খোলা আকাশের নিচে দর্শকদের উপস্থিতিতে গ্রামের মানুষেরাই অভিনয় আকারে উপস্থাপন করে থাকে। নাট্যকলা ও ফোকলোর বিশেষজ্ঞদের লোকনাটকের বয়াতি, দোহার বা শিল্পী এবং দর্শক নিরক্ষর সাধারণ মানুষ। লোকনাট্যের স্মৃতি নির্ভর পালগুলো মুখে মুখেই প্রচার হয়ে আসছে।

আলকাপ

চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রচলিত এক শ্রেণির লোকসংগীতের নাম 'আলকাপ'। 'আলকাপ' শব্দটি আরবি শব্দজাত, শব্দটির অর্থ মস্করা, ঢং বা কৌতুক। এটি একজাতীয় পালাগান। গ্রাম্য গাথা, উপকাহিনি বা সামাজিক বিষয়বস্তু নিয়ে আলকাপ রচিত হয়।[১] প্রাচীন গম্ভীরা উৎসব থেকে আলকাপের উৎপত্তি। আধুনিক আলকাপের সূচনা বর্তমান চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার মোনাকষা গ্রামের বোনাকানা নামক জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে। বিগত শতাব্দীতে আলকাপ এখানে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বিভিন্ন কারণে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এ গানের চর্চা হ্রাস পায়।

আলকাপ গান পরিবেশন রীতি : গানের শুরুতেই যন্ত্রসহযোগে কনসার্ট বাজানো হয়। একে আঞ্চলিক ভাষায় 'গদ' বলা হয়ে থাকে। গদের পর পরই জয়ধ্বনি দেয়ার প্রথা রয়েছে। জয়ধ্বনিগুলো সমবেত কণ্ঠে সঙ্গীত সাধক তানসেন, দলের সরকার এবং বিভিন্ন দেব-দেবীর নামে হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত :

তানসেন ওস্তাদ কী জয়
জামিনী সরকার কী জয়
সরস্বতী দেবী কী জয়
ইত্যাদি।

আসর বন্দনা : বাংলা কাব্যে বন্দনা রীতি সুদূর প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত পরিব্যপ্ত। এই রীতি শুধু বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে নয়, সংস্কৃত, হিন্দি, ফার্সি এবং পাশ্চাত্যের অন্যান্য ভাষায় রচিত কাব্যের মধ্যেও প্রচলিত। সূচনালগ্ন

www.pathagar.com

থেকেই আলকাপ গানে বন্দনা রয়েছে। এসব বন্দনা হচ্ছে শিববন্দনা, সরস্বতীবন্দনা, গণেশবন্দনা, কার্তিকবন্দনা ইত্যাদি। এবারে একটি আসর বন্দনা নমুনা দিয়ে বন্দনার একটি রূপ দেখানো যেতে পারে–

সরস্বতী বন্দনা

বন্দি বীণাপাণি, বিদ্যাদায়িনী
শ্বেত সরস্বতী, সরোজবাসিনী
কণ্ঠে দে মা সুর লহরী
যন্ত্রে দে মা শব্দ মাধুরী
চিত্তে জ্বেলে দে জ্ঞানের প্রদীপ
বক্ষে শক্তি, জ্ঞানদায়িনী
বন্দি বীণাপাণি, বিদ্যাদায়িনী ॥
মন্দিরে তব আলোর বন্যা
বিশ্বমাতা স্বনাম ধন্যা
আমরা কয়জন করি নিবেদন
শ্রীচরণে রাখি মধুর বাণী।
বন্দি বীণাপাণি বিদ্যাদায়িনী
শ্বেত সরস্বতী সরোজবাসিনী ॥[২]

আলকাপের সরকারেরা অধিকাংশই মুসলিম হলেও হিন্দু দেব-দেবীদের নিয়ে এ ধরনের বন্দনা রচনা করে তাঁরা নিজেদের অসাম্প্রদায়িক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সরকারদের এ বৈশিষ্ট্য তাঁদের মহান করে তুলেছে।

দ্যাশবন্দনা ও অন্যান্য ছড়া : আসর বন্দনার পর সরকার দাঁড়িয়ে দ্যাশবন্দনা ও অন্যান্য ছড়া বন্দনা পরিবেশন করে থাকেন। নিম্নে একটি দ্যাশ বন্দনার দৃষ্টান্ত দেয়া হলো :

দ্যাশ বন্দনা

বাংলা মা তোর আকাশ মাটি জল
তোর গতর হতে এই মাটিতে
সুবাস বহে চিরকাল
বাংলা মা তোর আকাশ মাটি জল ॥
পরথমে বন্দিনু জরমদাতা বাপ-মার চরণ
তারপরে বন্দিনু আমি দশ কোটি জনগণ
শিরোদিগে বন্দিনু পরবত হিমালয়
যার গতরের ঘামে দ্যাশের মাটি ভিজায়
ভাটিতে বন্দিনু আমি বঙ্গোপসাগর
হরেক রকম মাছ জরমে এ জলের ভেতর
দ্যাশ বিদ্যাশের জাহাজ নুঙ্গুর হয় বাংলা ঘাটে
বাংলার ঘরের ঢুকার এই তো দরজা
এই ঘরের শোভা দশ কোটি প্রজা।

www.pathagar.com

পূবেতে বন্দিনু চিক্যাশ বাংলার আসমানে
চান্দির ল্যাহান চিকচিক্যা রৈদ দ্যাশের জমিনে
পচ্ছিমে বন্দিনু সোনামসজিদ তোহাখানা
এখ্যানে গাড়্যাছিল পীর দরবেশ আস্তানা।
উপরে বন্দিনু আসমান ভগবান রহমান
যার দয়ার গুণে গাহি আজক্যার এই গান।
তারপরে বন্দিনু হামার পায়ের তলের মাটি
যে মাটিতে গড়িল পাক এই দেহ পরিপাটি।
মাটি হামার দ্যাশের সোনা মাটি হামার মা
কুনকালে কে ছুইলে হৈবে দশ কোটি সোনা
ভাবি দিনের ভাবনা বন্দিনু দ্বন্দ্ব মন্দ হোক অচল
তোর গতর হৈতে এই মাটিতে সুবাস বহে চিরকাল।
বাংলা মা তোর আকাশ মাটি জল।[৩]

বন্দনা ছড়ায় ধুয়া, পরধুয়া একটি বৃহৎ অন্তরা থাকে। অন্যান্য ছড়ার বিষয়ও বিচিত্র হয়ে থাকে। যেমন : রেশম শিল্পের ছড়া, মৃৎ শিল্পের ছড়া, লোহার ছড়া, মাছের ছড়া, ছিচকে চোরের ছড়া ইত্যাদি।

খ্যামটা : দ্যাশ বন্দনা শেষ হবার পর শুরু হয় খ্যামটা। প্রথমে যন্ত্রীরা সুর বাজান। সুর অনুসরণ করে ছোকরা দাঁড়িয়ে নৃত্য পরিবেশনের পর সে গানও শুরু করে। তখন গান ও নৃত্য একসাথে চলতে থাকে এবং দর্শক-শ্রোতারা পুলকিত হয়। নিম্নে একটি খ্যামটা গানের দৃষ্টান্ত দেয়া হলো–

খ্যামটা

ধুয়া : সাধেরও বধূয়া, লীল্যা মন চান্দুয়া
লীল আসমানের তলে
লাল ঠেঁঠি কিন্যা দিল্যা
ছাপা সৈনজ্যামুনির ফুলে।
সাধের ... তলে ॥
তোমার ব্যাসোর লাখে পড়িনু
লোতুন ঠেঁঠি সানঝে পিন্ধিনু
সুন্দরী কলসী কাঁখে লিয়্যা
গেনু লীল যবুনার কূলে,
সাধের ... তলে ॥
মন যবুনা উথান পাথাল
প্রেম যবুনার ঢেউ
চান্নি লিশি বাজায় বাঁশি
তুমি বিনা না কেউ
সোনা ফুল চিলমিল চিলমিল
বাঁশের ডগায় ঝুলে।

www.pathagar.com

সাধের ... তলে ॥[৪]

ফার্স বা দ্বৈতসঙ্গীত : খ্যামটার পরই সাধারণত ফার্স পরিবেশিত হয়ে থাকে। এক আসরে দুই বা ততোধিক ফার্স পরিবেশনের রীতি প্রচলিত রয়েছে।

ফার্স : মোনা ও ময়না

মোনা : তুমি হামার রেশমী উরমাল
বুক পকেটে রও চিরকাল
বুকের জ্বালা আর কি সহ্য যায়
মোর ময়নারে–
লদ্দীর পানি কত বহ্যা যায়
মোর চান্দোরে–
জৈবন জ্বালায় জীবন পুইড়্যা ছাই ॥
ময়না: তুমি হামার রুলের কালি
কাজল বইল্যা চোখে তুলি
চোখের জ্বালা তবু মিটে নাই
মোর মোনারে–
সোঁতের জলে পিরিত ভাঁসাই
মোর মোনারে
তুমি বিনা প্রাণে বাঁচা দায় ॥
মোনা: তুমি হামার ভাদৈর‍্যাজল
চোভুর মারি সন্ধ্যা সকাল
পিড়িত বানে ডুব্যা মরতে চাই
মোর ময়নারে–
মন পিঞ্জিরায় ভোর‍্যা রাখতে চাই
মোর চান্দোরে–
ছাতিম তলায় বাঁশি বাজায় ॥
ময়না: তুমি হামার কপালের টিপ
হাতের ওপর সাঁঝের প্রদীপ
সাঁঝের বেলায় তুলসী তলায়
মোর সোনারে–
প্রসাদ আন্যা তোমারে খাওয়াই ॥
উভয়ে: মোনা ময়না চল যাইনা
লোতুন ঘর করি ঠিকানা
বালুর চরে একটি ঘর বসাই
মোর মোনারে–
সাগর কুলে একটি ঘর উঠাই
মোর মোনারে
মনের বনে একটি ঘর বানাই ॥[৫]

www.pathagar.com

এভাবে ফার্স পরিবেশনের পর আবার কনসার্ট বেজে ওঠে। ছোকরা তার স্থান থেকে উঠে যন্ত্র সঙ্গীতের তালেতালে নৃত্য পরিবেশন করে দর্শক-শ্রোতাদের মাতিয়ে তোলে।

আলকাপ পালা : ছোকরার নৃত্যের পর একজন গায়ক বন্দনা ছড়া পরিবেশন করেন। বন্দনা ছড়ার পর শুরু হয় অভিনয় সমৃদ্ধ আলকাপ পালাতে সাধারণত সমাজ ও পারিবারিক জীবনের চিত্র প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এখানে একটি প্রাচীন এবং বহুল প্রচলিত আলকাপ পালা উপস্থাপন করা হলো–

আলকাপ পালা : যৌতুকের বলি

বারোঘরিয়ার সেলিমের মেয়ে রাহেলার সাথে মহারাজপুরের বারু ঘরামির ছেলে রহিমের বিয়ে হয়েছে বছর দুয়েক আগে। রহিম এক বেসরকারী অফিসের পিয়ন। তাদের এক বছরের এক মেয়ে রয়েছে। কিছুদিন যাবত রহিম রাহেলা বাপের আর্থিক সংকটের কথা ভেবে বাবার বাড়ি যেতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে।

ধুয়া : রহিম : রাহেলা তুমি বাপের বাড়ি যাও
সবাই যৌতুক দ্যায়
সব জাঁওই পায়
হামার চাওয়া কি অন্যায়
তিন হাজার টাকা আন্যা দ্যাও।

রাহেলা : বাপুকে কহ্যাছিনু
তোমার জাঁওই টাকা চাহে
কুনঠে পাবো টাকা ব্যাটা
বাপু কহে
টাকা ব্যাগোর ঘর খানটা
ভালো করতে পারিন্যা
বাসষ্যার সমা পানতে ভিজে
তুই কি তা জানিস না। (কাঁদতে থাকে)
রহিম : কতো কুহুক জানে মাগী
চোখের পানি ফ্যালে
বাপের ময়া সারা ঘন্টা
হামি হনু পরে ব্যাটা
খাইতে পিনতে যে দিবে
সেঠে চল্যা যা।

রাহেলা : হামার সংসার শ্যাষ হৈলা
আলা তুমি ঘাটা দ্যাও
ছাইল্যা কেনে প্যাটে দিল্যা
তোমার ছাইল্যা তুমি ল্যাও
দুনিয়াদারী কাঁচের চুরি
সংসার হৈল জানের বড়ি

কুন দুনিয়ায় যাবো হে নাথ
সেই কথা কও। (কাঁদতে থাকে)

এদিকে রহিম সকাল-সন্ধ্যা গ্রামের যুবতী মেয়ে ফিনিদের বাড়ি যাওয়া আসা করে। তার সাথে মন দেয়া নেয়া শুরু করে। ফিনি বেকার নয়, সে স্থানীয় পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরে মাঠকর্মীর চাকুরি করে। তার আর্থিক অবস্থা বেশ ভালো। রহিম চিন্তা করে যে, সে ফিনিকে বিয়ে করলে দু'জনের বেতনে সংসার চালিয়েও বেশ কিছু টাকা জমানো যাবে। তাই সে রাহেলাকে ছেড়ে দিয়ে ফিনিকে বিয়ে করতে আগ্রহী।

ধুয়া : রহিম : মন রংগ্যাছে হলদ্যা ঝিংগ্যা ফুলে
হলৈদ্যা মন
মদন মিলন
ফিনি, হৈবে কুন কালে।
তোমার লাগি
সংসার ত্যাগী
সব গিরহ্যা দ্যাও খুলে ॥

ফিনি : ঝিংগ্যা লতার কটি ডগা কসকস্যা রয়
হৈলদ্যা ফুলে
মালা গাঁথিলে
লাল ধাগা চাই
মনের ডগায়
মালা গাঁথায়
গিরহ্যা দরকার হয়না
সেই গিরহ্যাতে
তোমার হামার ভাবের পরিচয় ॥

রহিম : গিরহ্যা দিয়া বাঁধবো ফিনি
তোমার পিরিত ঘর
তুমি হামার
হামি তোমার
কেহু লই অপর ॥

ফিনি : সব কথার কথা শেষ কাজী ডাক্যা আনো
কাজীর কাছে
কলম আছে
গিরহ্যা দ্যাওয়ার লেগ্যা
মুলবী দিয়্যা
গিরহ্যা হবে মন ॥

ফিনির সাথে রহিমের বিয়ে হয়ে যায়। স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের কথা শুনে রাহেলা কান্না কাটি শুরু করে, সারা দিন কিছুই না খেয়ে থাকে। মায়ের দুধ ইচ্ছে মতো খেতে পায়নি

www.pathagar.com

বলে মেয়েটাও কাঁদে। এমন সময় রহিম নতুন বউ ফিনিকে নিয়ে বাড়ি এসে রাহেলাকে বলে –

রহিম : ঘর ছাইড়্যা যা ঢেঁকির ঘরে
এঘরে তোর জাগা নাই
ফিনি এখন ঘরের মালিক
হামি যে আর পুরুষ হই।
মালিকানা অর হাতে
তোর কাম ঝাড়া মুছাতে
যা কহে তা শুনবি
তাই করবি সই।

রাহেলা মেয়েকে কোলে করে দু'খানা চট হাতে নিয়ে ঢেঁকি ঘরে যায়। একটি চট মেঝেতে বিছিয়ে অন্যটি সামনে ঝুলিয়ে দিয়ে বসে পড়ে। রহিম নতুন বউ ফিনিকে নিয়ে শোবার ঘরে যায়। মধ্যরাতে রাহলো সুর করে কাঁদে–

মাগে, ক্যানে প্যাটে ধৈর্‌য়্যা ছিলিগে
মা ওগে মাগে
মাগে, ক্যানে মানুষ কৈর‍্যা ছিলিগে
মা ওগে মাগে
মাগে, ক্যানে সোহাগ কৈর‍্যা ছিলিগে
মা ওগে মাগে
মাগে তোর বুকের দুধের এ্যাতো জ্বালাগে
মা ওগে মাগে
মাগে আর যে সহিতে পারিন্যা গে
মা ওগে মাগে
বাপুজী,টুটি চিপ্যা ক্যানে মারোনি
ওজী বাপুজী
বাপুজী,বড় ক্যানে করল্যা বাপুজী
ওজী বাপুজী
বাপুজী, বিহ্যা ক্যানে দিল্যা বাপুজী
ওজী বাপুজী
বাপুজী,আর যে সহা যায় না বাপুজী
ওজী বাপুজী।

রাহেলার বিলাপ শুনে রহিম বিরক্ত হয়ে ঘর থেকে বাইরে এসে বলে,' এই মাগী লক কর‍্যা থাক। মুখ বুইজ্যা থাক্ নাতো পাইন্যা পিট্যা করবো।' রাহেলা চুপ করে।

পরেরদিন সকাল বেলা রাহেলার মেয়েটি মা মা করে কাঁদছে, রহিম ঘর থেকে বেরিয়ে বলছে, নবাবজাদীর নিন্দ কি এখুনও ভাঙেনি'? তবুও রাহেলার সাড়া নেই। রহিম প্রচণ্ড রেগে লাঠি হাতে নিয়ে ঢেঁকি ঘরের সামনে গিয়ে একটানে চটখানা খুলে

ভেতরের দিকে তাকিয়ে যা দেখে তাতে তার আক্কেল গুড়ুম। রাহেলা ঘরের তীরে ঝুলছে, পরণে পেটিকোট, গায়ে ব্লাউজ। সে শাড়ি খুলে তীরের সাথে ঝুলিয়ে ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে খবরটি চারিদিকে প্রচার হয়ে যায়। থানার দারোগা-পুলিশ, পাড়ার লোকজন ও ছেলে মেয়েদের ভিড়ে রহিমের বাড়ি ভরে যায়। দারোগা রাহেলার বাবাকে ডেকে বেশ কিছু প্রশ্ন করেন এবং রহিমকে, গ্রেফতার করে লাশ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়ে চলে গেলেন। ফিনি পলাতক। লোকসংগীত শিল্পী দুলাল ফকির গেয়ে উঠলো :

বিধিরে রাহুতে গ্রাসিল পূর্ণশশী
হায়রে রাহুতে গ্রাসিল পূর্ণশশী
মা হৈল যৌতুকের বলি গলায় দিয়্যা ফাঁসি
মনরে রাহুতে গ্রাসিল পূর্ণশশী।
মা মা বলে ডাকি যারে
সেই মা গেছে স্বর্গপুরে
নরক কুণ্ড আমার ঘরে জ্বলছে দিবা নিশি।
বিধিরে রাহুতে গ্রাসিল পূর্ণশশী
যে মায়ের বুকের দুধ খাইনু
সে মায়ের গলায় ফাঁসী দিনু
এইমত তার ঋণ শুধিনু দ্যাখো হে জগৎবাসী
মনরে রাহুতে গ্রাসিল পূর্ণশশী।[৬]

উপর্যুক্ত আলকাপ পালাগানে সামাজিক ব্যাধি যৌতুক প্রথার কথা বলা হয়েছে। যৌতুক প্রথার কারণে প্রতিদিনই কত ঘর ভাঙছে, ঝরে যাচ্ছে অমূল্য প্রাণ, এই গানে তারই একটি জীবন্ত ছবি তুলে ধরা হয়েছে। এভাবেই আলকাপ পরিবেশিত হয়। এখানে উলেখ্য যে, একই জায়গায় দুই বা ততোধিক দল ৪/৫ খানি আলকাপ গান পরিবেশন করে থাকে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত আলকাপ বন্দনা, খ্যাম্‌টা, ফার্স ও পালা গান নিচে উপস্থাপন করা হল :

আসর বন্দনা

আসর বন্দনা (প্রাচীন):
এই গান আসরের শুরুতে ছোক্‌রা পরিবেশন করে

বন্দি বীণাপাণি, বিদ্যাদায়িনী
শ্বেত সরস্বতী সরোজবাসিনী
কণ্ঠে দে মা সুর লহরি
যন্ত্রে দে মা শব্দ মাধুরী
চিত্তে জ্বেলে দে জ্ঞানের প্রদীপ
বক্ষে শক্তি, জ্ঞানদায়িনী
বন্দি ... দায়িনী।

www.pathagar.com

আলকাপ গানের আসরে কেরামত সরকার, জালাল (ছোকড়া) ও অন্যান্য শিল্পি

প্রবীণ আলকাপ শিল্পী লক্ষ্মীকান্ত পাল (ঝড়ু পাল)

www.pathagar.com

আলকাপ গানের আসরে লোক বাদ্যযন্ত্রীদের সঙ্গে সরকার ও অন্যান্য শিল্পী

আলকাপ গানের আসরে দর্শকদের একাংশ

www.pathagar.com

মন্দিরে তব আলোর বন্যা
বিশ্বমাতা স্বনম ধন্যা
বিশ্বমাতা স্বনাম ধন্যা
আমরা কয়জন করি নিবেদন
শ্রীচরণে রাখি মধুর বাণী
বন্দি... দায়িনী
... সরোজবাসিনী।[৭]

বন্দনা (ছড়া) : চণ্ডীমঙ্গল

ধুয়া : শুনেন ভাই দশজনা
চণ্ডীমাতার কথা কিছু কৈরে যায় বর্ণনা
দশোভূজা পায়না পূজা মানুষ বাদে মা
শুনেন্ ... বর্ণনা।
আধ্যাশক্তির চণ্ডীমাতা
স্বর্গে তাহার বাস,
মর্তলোকে পূজা লিব্যার
হইলো তাহার খায়েশ।
মহাদেবকে কহিল, স্বামী
নীলাম্বরকে প্যাঠাও তুমি
মর্তে মানুষ জাইত্ ভিতরে
হামার পূজা স্যান্যা করে
দোহাই তোমার এই মিনতি
রাখো হামার প্রাণপতি।
শিব এই কথা শুন্যা
কহে, ভাইব্যা কিছু পাইন্যা
বিনা দোষে ক্যামন কৈর‍্যা
মর্তে প্যাঠাই নীলাম্বর‍্যা।
শুন্যা চণ্ডী বুদ্ধি আঁটে
যতো বুদ্ধি ছিলো ঘঠে,
স্বর্গে ছিলো নীলাম্বর
স্ত্রী ছায়ানাম তার
ফুল তুল্তোক্ ফুল বাগানে
পূজা দিতোক্ শিবের ধামে।
মাইয়া-মদে স্বর্গ ধামে
দিন কাটাই খুব আরামে
একদিন রোঝিক্যার মতো
য্যামুন তুলে অবিরত,

www.pathagar.com

নানান রকম ফুল তুলে
লাল লীল হ্যোল্দ্যা মিলে
ফুল তুলে থোকা থোকা
তুইল্যা বোঝাই করে ঝাঁকা।
হ্যানো সমা চণ্ডীমাতা
গ্যালো নীলাম্বর সেথা
বিষ-পোকা রূপ ধৈরে
ঢুঁক্লো ফুলের ভিতরে।
নীলাম্বর ফুল লিয়্যা সোঁতে
মন্দির গ্যালো পূজা দিতে,
থানেতে ঢালিলে ফুল
শিবে, পোকা মারে হুল
চ্যম্ক্যা উঠে কীট-কামড়ে
অভিশাপ দ্যায় নীলাম্বরে।
মাটির দুনিয়্যাতে যাও
ব্যাধ হইয়্যা জরম ল্যাও
বিন্যা দোষে হৈলো দুষি
দেব্তাদারী প্যইলো খসি।

শিবের অভিশাপের পর
অভিশপ্ত নীলাম্বর
দুনিয়্যাতে নাইম্যা আইলো
ধর্মকেতুর ঘরে গ্যালো।

ধর্মকেতু নাম শিক্যারি
শিক্যারগিরি দুনিয়্যাদারি
ধর্মকেতুর স্ত্রীর প্যাটে
ব্যাধ হৈয়্যা জরম লিলো বটে,
কালকেতু নাম ধরে
স্ত্রী ছায়া আরাক্ ঘরে
আরাক্ ব্যাধের বেটি হৈয়্যা
চৈল্যা আইলো এই দুনিয়্যা।
ছায়ানাম হৈলো ফুল্লোরা
দু-ঝনা বান্ধ্লো গাঁট্ছড়া
বয়স এগারো বছর
বিহ্যা হয় দু-ঝনার ভিতর
কালকেতু শিকার কৈর্যা খায়

www.pathagar.com

এভাবে দিন কাইট্যা যায়
কালকেতু আর ফুল্লোরা
অখন দুনিয়্যার মানুষ তারা।
কালকেতুর গুণোগান
শিকারিতে ম্যালাই নাম
কালকেতুর ছাড়া শরে
বড় বড় জন্তু মরে
বাঘ হরিণ সিংহও
সভাই তখন ভয়ে ভীত।
পশুরা সব এক্‌ঠে হৈয়্যা
চণ্ডীমাকে বলে গিয়্যা
তুমি বাঁচাও চণ্ডীমাতা
কালকেতু মোদের হন্তা
চণ্ডী কহে বেশ বেশ
শুরু হৈলো চণ্ডী রেশ।

কালকেতু বনে বনে ঘুরে
জন্তু নাই বনের ভিতরে
চণ্ডীদেবীর ছিন্‌হ্যারীতে
কালকেতু হয়র‍্যানীতে
লুকিয়া রাখে যতো জন্তু।
শিক্যার পাইন্যা কালকেতু
মনের দুঃখে যাই ফির‍্যা
ফের গ্যালো পাঁহাত কৈর‍্যা
ঘাড়ে ধনুক হাতে তীর
ঢুকিলো বনের ভিতির
একটাও শিকার কুন্‌ঠি নাই
গুহি-সাঁপ দেখতে পাই
গুহি-সাঁপ বে-সাইত্যা জন্তু
ভাবে তখন কালকেতু
দুদিন থাইক্যা অনাহারে
রাগের ঠ্যালায় গরগর করে
গুহি-সাঁপ বান্ধা লিয়্যা
বাড়িতে আসে ফিরিয়্যা।
ফুল্লোরা কাইন্দা কাইন্দা কয়
দুদিন অনাহারে যায়,
কালকেতু কহে ভালো

www.pathagar.com

গুহি-সাঁপটা আইন্ধ্যা ফ্যালো
বিমল্যার ঘে বাড়ির দিগে যাও
চাইট্যা খুদি ধার ল্যাও
আন্ধা-বাড়াহ্ করো তুমি
হাটে থাইক্যা আমি হামি।
কালকেতু হাটের পথে যায়
ফুল্লোরা খুদিকে বারহাই
গুঁহি-সাঁপ সে চণ্ডীমাতা
রূপ-বদল করেন সেথা
এক অপূর্ব সুন্দরী
খাড়ো আইগ্ন্যাতে ছুঁড়ি,
বাড়ি ফিরা্যা ফুল্লোরা
ছুঁড়ি দেইখ্যা দিশ্যাহারা
ফুল্লোরা কহে তুই কে?
ছ্যাচ্চা কথা কৈহ্যা দে
ছুঁড়ি কহে ফুল্লোরাকে
তোর স্বামী আইন্যাছে হাঁকে।

ফুল্লোরা : তোমার কিবা পরিচয়
আসল নিবাস কোথায়?

ছুঁড়ি : কালকেতু গেছে কুন্ঠে
হাঁমাকে আইন্যাছে এইঠে

ফুল্লোরা : তুমি ভালো খুব সুন্দরী
ফির্যা যাও নিজের বাড়ি

ছুঁড়ি : অখন এইট্যা হামার বাড়ি
উ-কুন্ঠে গ্যালো হাঁকে ছাড়ি।
ফুল্লোরা কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে
দৌড়ে যায় হাটের পথে
স্বামীর সোঁতে দেখা হয়
সবকথা খুইল্যা কয়।
কালকেতু অবাক্ সব শুন্যা
বাড়ি ফির্যা যায় দুজনা
দেইখ্যা অন্য মাইয়া লোক
কেতুর কপালে ওঠে চোখ
কালকেতু কহে বারে বারে
চৈল্যা যাও বাড়ির বাহিরে।
কথার জওয়াব নাহি দ্যায়
খালি চুপ কৈর্যা রয়

www.pathagar.com

কালকেতু রাইগ্যা গ্যালো
ধুনুকে তীর জুইড়্যা দিলো
মাইর‍্যা ফ্যালার মনে কৈর‍্যা
টান্ দিলো ধুনুক ধৈর‍্যা।
এক ঘটনা ঘৈটা গ্যালো
চণ্ডী স্বমূর্তি ধৈর‍্যা লিলো
চোখের সামনে এ্যামুন ব্যাপার
ব্যাধ্ বাইধ্যানী হয় চমৎকার।
চণ্ডী কহে শুনো ব্যাধ্
হামার বড়ো আছে সাধ
তোরা দুনিয়্যা মাঝার
হামার পূজা প্রচার কর
ম্যালাই দিবো সোনা-দানা
রাজ্য দিবো একখানা।
মাইয়্যা-মদ্দে রাজি হৈলো
সাত কলসি সোনা পাইলো
দেবী বনের মৈদ্ধে গিয়্যা
সোনা দিলো দ্যাখিয়া।
সাত কলসি সোনা আছে
বাঁহুকে কৈর‍্যা বহিছে
দু-কলসি কৈর‍্যা তিনব্যার
একটা রহে শ্যাষবার।
দেবী রহে পাহারায়
কালকেতু লিয়্যা যায়
শ্যাষ্টা লিয়্যা পালাই যুদি
তাহিলে বাদ সব ফুন্দি
তাই মাকে সোঁতে লিয়্যা
তার কাঁখে দি তুলিয়্যা
এই কথা মনে কৈরা
মাকে কহে মন ভৈর‍্যা।
কালকেতু কহে ভালো
একটা কল্সি লিয়্যা চলো
যুদি কাহুকি না দ্যাও
মাগো তুমি কাঁখে ল্যাও।
দেবী তাতে রাজি হয়
কলসি কাঁখে তুইল্যা ল্যায়
কালকেতু যায় আগে আগে

www.pathagar.com

ফির‍্যা দ্যাখে যদি ভাগে
চণ্ডীতো আছে পাছাদিগে
হামি আছি সব আগে
কালকেতু খুবি বোকা
নিজের কাছে নিজের ধোকা।

কালকেতু ধনী হৈলো
গুজরাটে বন কাইট্যা শহর বানাইলো
পূজার প্রচার হৈলো যতো
মন্দির হৈলো শত শত।

ভারুদত্ত নামে চতুর
মন্ত্রিত্ব চাহে কালকেতুর
কালকেতু রাজি হৈলো না
ভণ্ডু চালাই চুগ্‌লিপনা।
ভাড়ুদত্তেরব ভণ্ডামি
শুরু হৈলো তখুনি
কালিঙ্গরাজ দরবারে
রাজায় বুঝায় চাট্টি মেরে
যুদ্ধ কৈলে দখল পাবেন
ইট্যা সত্য এট্যা ভাবেন।
রাজা রাজি হৈয়্যা গ্যালো
যুদ্ধ শুরু কৈর‍্যা দিলো
যুদ্ধ না জানার কারণে
কালকেতু হারলো এখ্যানে।
কালকেতু পরাজিত
ফুল্লোরার কথা মতো
ধানের কুঁঠিতে লুকায়
রাজা তাকে চ্যুঁড়্যা পাই
কলিঙ্গরাজ বন্দি কৈরে
থুইলো তারে কারাগারে।
কালকেতু দেবীঘরে রাজা
অখন্ দ্যাখো ক্যামুন মজা
চণ্ডী কালকেতুর স্মরণে
সাড়া দিলো নিজো গুণে
রাজাকে স্বপনে দ্যাখ্যায়
ছাড়ো কালকেতু মহাশয়
কালকেতু হামার ভক্ত

www.pathagar.com

অখনি করহ মুক্ত
রাজ্য বুঝাইয়্যা দিবে
যাহা নিছো ফির‍্যা দিবে।
হ্যানো স্বপন দেইখ্যা রাজায়
কালকেতুকে ছাইড়্যা দ্যায়
রাজ্যশুদ্ধ ফির‍্যা দ্যায়
তাকে গুজরাটে প্যাঠায়
কালকেতু ফের রাজা হৈলো
ফুল্লোরা রাণী রহিলো।
ম্যালাই দিন রাজা-রাণী
বুড়াহ্ হৈলো যখুনি
একটা কুনু শুভদিনে
নীলাম্বর ছায়ার সনে
স্বর্গে ফির‍্যা গ্যালো
চণ্ডীকাব্য থাইম্যা রহিলো ॥[৮]

খ্যামৃটা

ধুয়া : আর কতদূর ওহে ঠাকুর
তোমার মথুরা
কুলে দিনু কালিরে বন্ধু
জল বিনা জল-সিন্ধু
তুমি কালা জীবন ধৈর‍্যা
আর ... মথুরা।
পুন্নি নিশি বাজে বাঁশি
কদমতলার ঘাটে
তোমার বাঁশি বাজে বন্ধু
আমার মনের মাঠে
সাত পঁহাতে মন গঙ্গাতে
বহে সিনান ধারা
তুমি ... ধৈর‍্যা
আর ... মথুরা।

নকশি কাঁথার বন্দনা (ছড়া) : শরীফ

ধুয়া : নবাবগন্জে বাড়ি
নাম : শরীফ আব্দুল বারী
নক্‌শি কাঁথা ঢাকা শহরে
বিক্রয় করি।
নানান্ রংয়ের নক্‌শি কাঁথা

www.pathagar.com

হরেক রকম ডিজাইন আঁকা
বহু রকমারি।
নক্‌শি কাঁথা ঢাকা শহরে
বিক্রয় করি
নবাবগন্‌জে ... করি।

আছে লাল সবুজ কালো
গোলাপি হলুদ আর ধলো
মেরুন ফিরোজা নীল
আছে বট্‌ল বুলো।
আছে বারো রঙ্গা নক্‌শি কাঁথা
নক্‌শি সুন্দরী
নক্‌শি কাঁথা ঢাকা শহরে
বিক্রয় করি
নবাবগন্‌জে ... করি।
আছে হরিণ নক্‌শি কাঁথা
আছে শাপলা নক্‌শি কাঁথা
আছে দোয়েল নক্‌শি কাঁথা
ইলিশ নক্‌শি কাঁথা আছে
কই সত্য কথা–
আছে গোলাপ গাভী হংসরাজ
তবলা বেহালা নক্‌শি আছে
তানপুরা এস্‌রাজ।

আছে বারো নক্‌শার নক্‌শি কাঁথা
নক্‌শায় আছে দ্যাশের কথা
নকশি মাঠে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে
বারো কোটি ব্যথা।
নেবেন্‌গো নক্‌শি কাঁথা
নক্‌শি কাঁথা ঢাকা শহরে
বিক্রয় করি।
নবাবগন্‌জে বাড়ি
নাম : শরীফ আব্দুল বারী
নক্‌শি কাঁথা ঢাকা শহরে বিক্রয় করি।[৯]

মনসা-মঙ্গল বন্দনা (ছড়া)

ধুয়া : শুনেন শ্রোতা মহাজন

www.pathagar.com

মনসাদেবীর কিছু করিব বর্ণন
নব্‌গঞ্জের আঞ্চলিক কথা
থাক্‌বে কিছু গীতে গাঁথা
সেই গাঁথুনি করবো সমাপন
শুনেন ... মহাজন।
চাঁদ নামে ছিলো এক বণিক সদাগর
ম্যালা দিন ভৈর ছিলেন স্বর্গের ভিতর
স্বর্গের মধ্যে নাকি সভারি সুখ হয়
সেই কথা কহে কতো জ্ঞানী-গুণী ভাই।
কপালে তার সুখ সহিল না মনসার কারণে
চাঁদের উপর ক্ষেপ্যা গ্যালো একদিন অকারণে
অভিশাপ দিলো তাকে মর্তে জরম লিবার
চাঁদ কহে হামি পূজা কোরবোনা তোমার।
মর্তে জরমিল চাঁদ স্ত্রী হয় সনকা
গোপনে মনসা পূজা করে সনকা একা
চাঁদ করে শিব পূজা সে দেখিলো একদিন
সনকা মনসা পূজা করে সবদিন।
ক্ষেপ্যা গিয়্যা মঙ্গলঘট ভাঙ্গে লাত্‌ মাইর্যা
মান খুয়া যায় হাঁ-র মনসা পূজা কৈর্যা
চ্যাং মুড়ি কানি সেতো হামা বরাবর
হৈবেনা অর পূজা এই বাড়ির ভিতর।
সভাই জানে মনসা খান্নাসীতে খাসা
চাঁদ ভিঠায় ঘুগ্‌গু খান্নাসী মনসা
দ্যাশের ভিতর সাপের জুলুম বেজাই বাইড়াহ্‌ গ্যালো
মনসা দুনিয়্যাতে সাপের দেবী হৈলো।
সাপের জুলুমে সভাই হৈলো নাচার
দিন্‌কে-দিন খান্নাসীপনা বাড়েহ্‌ মনসার
চাঁদের এক বন্ধু মৈলো সাপের কামড়ে
নামিলো দুখের ছাঁইহ্যাঁ চাঁদের অন্তরে।
খান্নাসী মনসা চাঁদের ছয় ব্যাটা খাইলো
হামাকে পূজা দ্যাও চাঁদকে কহিলো
রাগের চোটে মনসাকে করে লাঠিপিট্যা
চাঁদের মাইরে মনসার কাঁকইল্‌ গ্যালো ফাইট্যা।
সনকা কাঁন্দিয়্যা কহে চাঁদ সদাগরে
পূজা দ্যাও মনসার সবি পাবো ফিরে
ধন-দৌলত বাড়ি ঘর পাবো ছয় ব্যাটা
ওহে নাথ মনসার পূজা দ্যাও আঁইট্যা।

www.pathagar.com

ধন থাইকা মান বড় শুনো হামার রাণী
ব্যাটা শোগে জার জার সনকা বেন্যানী
সনকার ছয় ব্যাটা সবি গ্যালো মইর‍্যা
এক ব্যাটা চাইহ্যা লিলে মনসাকে ধৈর‍্যা।
মনসা কহিলো শুনো সনকা বেন্যানী
মরবে বিহ্যার রাইতে বর দিনু হামি
বাসর ঘরে নিশি পহরে এইতো লিখন
সর্পাঘাতে তোর ব্যাটা হৈবে নিধন।

সনকা : ছয় ব্যাটাহারা হৈনু এক ব্যাটা দ্যাও
হাত পাইত্যা চাহি মাগো মোর মাথা খাও
শরীল ক্ষয় হৈলো মাগো ব্যাটার যে কারণে
মনোবাঞ্ছা পুরা করো কহি তোর সদনে।

মনসা : এক ব্যাটা দিবো তোকে সনকা সুন্দরী
লখিন্দর নাম থুবি এই আশা করি।

সনকা : বর বাদে এক ব্যাটা করো মাগো দান
তাহিলে পুরিবে মাগো মম মনস্কাম।

মনসা : চাঁদ বেন্যা যদ্দিন পূজা নাহি দ্যায়
বর ছাড়া তদ্দিন ব্যাটা পাওয়া যায়
এই কথা কৈহ্যা দেবী চাঁদের কাছে যায়
বাণিজ্যেতে যাইছো চাঁদ তোমার পূজা চাই।

চাঁদ : চ্যাং মুড়ি কানি শুন্ কচু বনের পোকা
তোর পূজা দিবো হামি পাইয়াছিস কি বোকা
সামনে হৈন্যা হৈট্যা যা ওরে কানি চ্যাং
না–হটিলে বাইল্যাট ঝাইড়্যা ভাইঙ্গ্যা দিবো ঠ্যাং।
কটু কথা শুইন্যা দেবী করিল্যা গমন
আরও ম্যালা ঠেক্‌বে চাঁদ বুঝিনু অখন
বাণিজ্যির লাইগ্যা চাঁদ বিদ্যাশেতে গ্যালো
ম্যালা টাকার মালামাল কিনিয়্যা ফেলিল।
কুনু লোকে কহে সপ্ততরি মধুকর
কেহু কহে চৌদ্দ ডিংগ্যা ভাসিল এব্যার
হামি বুঝ মাঝামাঝি এই হিসাব ধরো
মালামাল বোঝাই হৈলো দশ কিম্বা বারো।
সমুদ্দুর পাড়িহ্ দ্যায় লায়ের বহর
মনসা হাজির হৈলো চাঁদ বরাবর।

মনসা : এইব্যার পূজা দ্যাও চাঁদ সদাগর
ঘাঁটায় ম্যালায় বিপদ আছে তোমার।

চাঁদ : হামার হাতে তোর পূজা হৈবেনা দুনিয়্যাতে

www.pathagar.com

শ্যাষ কথা কৈহ্যাদিনু তোর সাক্ষ্যাতে।
মনসা : তাহিলেরে দুরাচার শ্যাষ কথা শুন্
সব হারিয়া থাক্‌বে না তোর ভাতে খাওয়া নুন্।
চাঁদ : সারাজীবন-ভৈর তোকে দেব্‌তা মানিনা
তুই কানি নুন্ চুন্নি সেট্যা হামার জানা
গমন করিল্যা দেবী রাগে গরগর
তুফান উঠ্যা গ্যালো সমুদ্দুর মাঝার।
সব লা ডুইব্যা গ্যালো সমুদ্দুর জলে
পূজার বদলে দেবী এই বদ্‌লা লিলে
খ্যামোতার খল্ কতো আছে দুনিয়্যায়
এটুকুন কাগচে তাকি কহা যায়।
এইমতো ম্যালাদিন ভাইসা চলে চাঁদ
মনসা এরই মধ্যে ফান্দিল এক ফাঁদ
একখান্‌টা কাঠ দিলো পানিতে ভাসাইয়া
ভাবে মনে চাঁদ বুঝি লিবে তা ধরিয়্যা।
এই প্যাঁচ চাঁদ তখন বুঝিতে পারিল
ঘিন্না কৈর‍্যা সেই কাঠ আরনা ধরিল
এক সময় তীরে আইস্যা উঠিল যখন
বারো বছর কাইট্যা গেছে দুখের জীবন।
বাড়ি ফির‍্যা দ্যাখে ব্যাটা নাম লখিন্দর
দুখের মধ্যে সুখের আলা দ্যাখে সদাগর
ব্যাটার বিহ্যা দিব্যার লাইগ্যা মন হৈলো ঠাহর
বহু ঠিক হইয়্যা গ্যালো উজানি নগর।
বহুর রং কাঁচা হল্যোইদ্ য্যানো কাঁচা সোনা
বেহুলা সুন্দরী নাম কহে সর্বজনা
লহার বাসর বানায় চাঁদ সদাগর
বাসর বঞ্চিবে বেহুলা-লখিন্দর।
ছ্যান্দা ছাড়া তৈরি করো লহার বাসর
চাইরি পান্‌জোর দেখ্যা লিও ঘরের ভিতর।
মনসা : হামার ঢুঁকার ঘাঁটা থুইয়ো মিস্‌তিরি
কথা না শুনিলে হৈবে জীবনের বরি
আর য্যানে এই কথা কহিতে না হয়
বাসর ঘরে তোমার পাবো পরিচয়।
মিসতিরি (মিস্ত্রি) : দয়া কৈরো মাগো আমার দেবী মনসা
ঘাঁটা থুইয়্যা দিব মনে আছে সে আশা
এক সুতি ঘাঁটা তুমি পাইবে সেখ্যানে
ছ্যাচ্চা কথা কহ্যা দিনু তোমার সামনে।

www.pathagar.com

বিহ্যা হৈয়্যা গ্যালো বেহুলা-লখিন্দর
দু-ঝনা ঢুঁকিল গিয়্যা লহার বাসর
পতি সোঁতে শুইয়্যা সেথা বেহুলা সুন্দরী
লম্ভা চুল ঝুল্যা পড়ে মাইঝ্যর উপরি।
সাঁপ এক উঠ্যা পড়ে লম্ভা চুল বাইহ্যা
ড্যোংশিলে লখিন্দরে উঠে চিখ্ড়াইয়্যা
চিখ্ড়্যান্ শুনিয়্যা উঠে বেহুলা সুন্দরী
ডংশা নাগ পালায় য্যামুন চোর কৈরা চুরি
কান্দিয়্যা কান্দিয়্যা বেহল্ হৈলো বেহুলা
মরা পতি দেইখ্যা সতী হতবাক হৈল্যা।

ধুয়া : বেহুলা : তুই কি হামার গ্যাঁতি রে নাগ
তুই কিরে দুষমন
কি দোষে ড্যোংশিল্যা ওরে নাগ
কি ভুলে অখন
সাধামতি পরান পতি
ফুলেরই মতন
তুই ... দুষমণ।
পতি হামার আরশির মতন
পাপ নাই পরানে
কি পাপে করিলি পাপী
কৈহ্যা যা এখ্যানে
এক ঝোনাকে খাইলিরে নাগ
এক ঝোনাকে থুইলি
দু-ঝোনাকে না খাইয়্যা
ক্যান্যা পালিয়্যা গেলি
ক্যামুন কৈর্যা বাঁচি
হামার কাঁন্দে ত্রিভুবন
তুই ... দুষমণ।
ক্যালার ভুঁড় ভাইসা চলে মরা পতি লিয়্যা
জিন্দা পতি লিবে বেহুলা স্বর্গধমা গিয়্যা
এই পণ কৈর্যা বেহুলা ভুঁড়ে উঠ্যাছিল
ঘাঁটায় ম্যালা দুঃখ-কষ্ট পাইতে থাকিল।
রাইত দিন ভাইস্যা চলে সমায়-ক্ষণ নাই
প্যইচ্যা প্যইচ্যা লখিন্দরের মাংস খইস্যা যায়
এক ঘাট ছাইড়্যা লখিন্দরের মাংস খইস্যা যায়
এক ঘাট ছাইড়্যা ভুঁড় আরাক্ ঘাট যায়
আরাক্ ঘাট থাইক্যা ভুঁড় শত ঘাট ছাড়াই।

www.pathagar.com

এইমতো দিন কতক ঘাটের ঘাঁটাতে
ভুঁড় ভিঁড়্যা গ্যালো গিয়্যা দেবীপুর ঘাটেতে
এই ঘাট থাইক্যা ভুঁড় আরতো চলে না
কাইট্যা গ্যালো কয়দিন এ ঘাটের ঠিকানা।
রোঝি রোঝি এক ধোবানি কাপড় ধোয় এখ্যানে
বেহুলা সবি দ্যাখে রাখে নিরীক্ষণে
ধুবির একটা কাঁইচ্যা ছাইল্যা করে জ্বালাতন
এক বাড়িতে মাইর্যা ফেইল্যা কাপড় ধোয় তখন।
কাপড় ধোয়া শ্যাষ হৈলে বাড়ি যায় যখন
সেই ছাইল্যাকে জিন্দ্য কৈর্যা লিয়্যা যায় তখন
এইসব কাম দেইখ্যায় বেহুলা ভাবে মনে
এই ধুবি মরা মানুষ জিন্দ্য করতে জানে।
একদিন ধোবানির ধরে দুই পাও
দহাই মা তোমার হামার পতিকে বাঁচাও
ধুবি কহে তোমার পতি মনসার বরে
মৈর্যাছে সাঁপের কামড়ে বাঁচাই ক্যামুন কৈরে।
দেব্‌তারা স্বর্গে আছে সেইখ্যানে যাও
লাছন্‌ তারা পছন্দ করে লাছন্‌ দ্যাখাও
লাছন্‌ দিয়্যা যুদি তার যে শন্‌ ভুলাইতে পার
যা চাহিবা তাই দিবে এই ঘাঁটা ধরো।
আশার আলা দেখতে পাইল্যা বেহুলা সুন্দরী
দিলে হাঁটা সেই ঘাঁটা যেথা স্বর্গপুরী
লাছনে লাছনে ভরে স্বর্গের সভা
লাছন্‌ দেইখ্যা দেবতারা দ্যায় বাহ্‌ব্বা।
এ্যামুন লাছন্‌ লাছো মোরা বহুদিন দেখিনি
কি বর চাও তুমি সেই কথা শুনি
এই কথা মহাদেব য্যামুনি কহিল
বেহুলা মরা পতির জীবন চাহিল।
মহাদেব সেইমতো রাজি হইয়্যা গ্যালো
মনসা, চাঁদের কাছে পূজার দাবি দিলো
বেহুলা কহিল তুমি সব ফির্যা দিব্যা
তাহিলে সদাগরের পূজাতো পাইবা।
সাত ব্যাটা বারো লা যাতো মালামাল
এখনি ফির্যা দ্যাও না করিয়্যা ছল্‌
সবকিছু ফির্যা দিলো দেবী মনসায়
লখিন্দর জিন্দ্য হৈলো বেহুলার জয়।
সদাগর ছুইট্যা আইলো বেহুলার কাছে
শ্বশুরের পাও ধৈর্যা কান্দিয়্যা কহিছে–

www.pathagar.com

ধুয়া: বেহুলা: বাবাগো দেব্‌তার পাকা
সব ঘাঁটা
তেত্রিশ কোটির মধ্যে
মনসা একটা
মানুষ জাইতের পূজা ছাড়া
দেব্‌তার রহেনা– দেবত্বটা
তেত্রিশ ...একটা
বাবাগো ...ঘাঁটা।
মানুষ বিন্যা কিচ্ছু হয়ন্যা
মানুষ বিন্যা এই দুনিয়্যা
অজর্‌মা রহিবে সারা কাল
বেহেস্ত দোজখ স্বর্গমর্ত
মানুষের লাইগ্যা সবি– তো
মানুষ জাইত্‌ট্যাই খাঁটি সত্য
বুঝো হে দেশো– পাল
এই মানুষই লিয়্যা অ্যান্‌ছে
ধর্ম-কর্মটা
তেত্রিশ... একটা
বাবাগো ... ঘাঁটা।
একটা পূজা মা মনসার
মুখ ঘুরিয়্যা দ্যাও একবার
বেমুখা হৈয়্যা ওগো বাবা
ফেল্যা দ্যাও তো ফুলটা
তেত্রিশ ... একটা
বাবাগো ... ঘাঁটা।
চাঁদ : বেমুখা হৈয়্যা ...মনসার থানে
এক ফুল ফেল্যা দিনু সভাই জানে
সেই থাইক্যা মনসার পূজা দুনিয়্যাতে
মনসা-মঙ্গল শ্যাষ করিনু কুনুমতে।[১০]

ছিচ্‌কে চোরের বন্দনা (ছড়া)

ধুয়া : চোর : আমার বাড়ি তিন পাহাড়ি কোটাল পুকুরে
বাংলা ভারতে দিনে-রাইতে বেড়াই চুরি করে
কোটাল পুকুরে দাদারে, কোটাল পুকুরে
আমার ... পুকুরে।

বছরে তিন মাস চুরি করি
গাঁও-গেরামে সিঁদেল চুরি

www.pathagar.com

হাট-বাজারে পকেট মারি
ভদ্দর লোককে চিটিং করি
ম্যালাই মাইর খাইনু সেদিন ঠগের পাল্লায় পড়ে
দাদারে ... পুকুরে
আমার ... পুকুরে।

মস্‌লা বাঁটা শিল-পাটা
হাঁস-মুরগি ঢেঁকি যাঁতা
চুরি করি পুরানা কাপড়
লুঙ্গি গামছা আর চাদর।
পুরানা এনামেল হাঁড়ি
পান্তা নুন্ পেজ তরকারি
একটাই বড় চুরি করি
গরু পাঁঠা ছাগল বক্‌রি।
কায়দা মাথইল দাউলি
হাঁইস্যা কাত্তি আর বাউলি
চটি খড়ম আর জুতা
বাইরষই পুরানা ছাতা।
চুরি করি নাঙল জুঁয়াল
বানা বিত্তি আর ধিয়াল
মাছ বাজারে মাছ চুরি
কসাই খানার দাও ছুরি।
চা-র দোকানের কাপ
মুদিখানার খালিয়া ঢপ্
থায় কামারের কারখানা
হাথুড় লিহি আর মাঠ্‌না।
কুনুসমায় সাইকেল চুরি
মস্‌জিদের দেয়াল ঘড়ি
কোরান কেতাব আর তস্‌বি
চুরির কথা কতো শুন্‌বি।
চুরি মালে দাম কম
থানিদ্দারের বেজাই আরাম
বড় চুরি সোনা-চাঁন্দি
ধরা পইলে হাজত বন্দির।
মাটের কালাই মটর-মস্‌রি
হামার এইট্যা সোঝা চুরি
সেদিন স্টেশনের ধারে

www.pathagar.com

হামাকে স্যান্ডেল পিটা করে।

পুলিশ বাবাজি ভাল জবড়
দ্যাখ্যা হোলেই ট্যাঁকের খবর
ব্যাটা দ্যাখাকরস্ নাই
দেনা যাহা কিছু পাই
এই কামে পার্বণী লাগে ভাই
এইট্যা সহজ কাম্ নাই।

এইখ্যানে করি শ্যাষ
চুরি করি সারা দ্যাশ
হামার বাড়ি তিন পাহাড়ি
কোটাল পুকুরে
বাংলা ভারতে দিনে-রাইতে
বেড়াই চুরি করে।[১১]

বন্দনা (ছড়া)

প্রতিমা শিল্প

ধুয়া : পূণ্যময়ী বাংলা আমার প্রাণের প্রাণ
বাংলা মাকে হাজারো প্রণাম
সব্‌সে খাঁটি বাংলার মাটি
সোনার চেয়ে বেশি দাম
বাংলা মাকে হাজারো প্রণাম
পূণ্যময়ী ... প্রাণ।
এই মাটিতে শিল্প গড়ি সাতপুরুষ তামাম গো
এই মাটিতে ... তামাম।
মাটি আমার অন্নপূর্ণা
মাটি আমার মায়ের গয়না
শ্রীদামচন্দ্র ভাস্কর নাম
বারোঘোরিয়ায় নিজ ধাম গো।
পিতা সুরেশচন্দ্র ভাস্কর
বল্‌ছি আশি শ্রোতা বরাবর
আমরা বংশ-পরমপ্রায়
দেব-দেবীর প্রতিমা বানায় গো।
পিতামহ কুড়াচন্দ্র ভাস্কর
প্রতিমার উত্তম কারিগর
সব পূজার প্রতিমা বানায়
লক্ষ্মী সরস্বতী কানাই।

www.pathagar.com

ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বর
শ্যামা গঙ্গা মোন্‌শার
কার্ত্তিক গনেশ শিত্‌লা পূজা
অন্নপূর্ণা দশভুজা গো।
তেত্রিশ কোটি দেবতার
কিছু কিছু বানায় তার
এই পেশা পূর্ব-পুরুষের
এখনও চল্‌ছে তাহার জের গো।
দ্যাশের মাটি মাতৃভূমি
মাতৃভূমির পদ্‌ চুমি
এই মাটিতে সাতপুরুষ নিদান
মাটিকে হাজারো প্রণাম
পূণ্যময়ী বাংলা আমার প্রাণের প্রাণ।[১২]

বন্দনা (ছড়া) : মৃৎশিল্প
আস্‌বাব শিল্প

ধুয়া : মাটি দিয়ে বানাই যত ব্যবহার্য আস্‌বাব
গো মাটি দিয়ে বানাই যত ব্যবহার্য আস্‌বাব
মাটির শিল্প মাটির গল্প বল্‌বো আমি সব।
বদনা বর্ত্তন কলসি হাঁড়ি
ফুলের টাব গরুর চাড়ি
ছাইদানি আর ফুলদানি
বানাই ব্যাংক পয়সাদাবি।
ধুপ দেওয়ার ধুপ্‌চি গড়ি
প্রদীপ দিয়ালি করি
খোলা রুটি ভাজা বানাই
মুড়ি ভাজা ঝাঁজর গড়াই।
বানাই দইয়ের কাঁতারি
চুকাই নক্‌শিদার হাঁড়ি
মাটির গেলাস মাটির সরা
হুঁকার কল্‌কি মাটির খোরা।
পুতুল আরও কতকি
বানাই রকমারি পাখি
সাত-পুরুষের এই পেশা
ধরে আছে মাটির নেশা।
আমাদের মাটির ঘরে বাসা
এই মাটি মোদের আশা

www.pathagar.com

এই মাটিতে জনম আমার।
এই মাটিতে মরণ আমার
এই মাটি দ্যাশের খাঁটি দিশা
অন্য দ্যাশের চাইতে খাসা
নাম গোপাল পাল
বাবা ঝড়ু পাল
বারোঘোরিয়া ধাম
বাংলা মাকে হাজারো প্রণাম
পূণ্যময়ী বাংলা আমার প্রাণের প্রাণ।[১৩]

খ. লোকনৃত্য

নৃত্য হলো এমন এক আঙ্গিকের ললিতকলা, যা পরিবেশনা দ্বারা দৃশ্যযোগ্য হয়। অন্য কথায়, নৃত্য হলো পরিবেশনা শিল্প (Performing Art)। তাল, মুদ্রা, ছন্দ, লয়, গতি ও ভাব সহযোগে নিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলিত অঙ্গভঙ্গিকে বলে নৃত্য। প্রকৃতপক্ষে নৃত্যের ছন্দময় গতিভঙ্গির মাধ্যমে ভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

দীর্ঘকালের শিক্ষা, সাধনা ও অনুশীলনের মাধ্যমে নৃত্যের কলা-কৌশল আয়ত্ত করতে হয়। অন্যদিকে লোকনৃত্যের লিখিত কোন শাস্ত্র নেই; শিক্ষা বা প্রশিক্ষণেরও কোন ব্যবস্থা নেই। লোকশিল্পীরা প্রধানত অন্যের কাছ থেকে দেখে শিখে থাকে। সরলতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা লোকনৃত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

১. গাজনের নাচ

হিন্দু সমাজে প্রচলিত একটি উৎসবের নাম গাজন। চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের পূজা উপলক্ষে গাজন উৎসব পালিত হয়। সূর্যপূজা পরবর্তী পর্বে শৈবধর্মের প্রভাবে শিবপূজায় রূপান্তরিত হয়। সূর্য দেবতার আর এক রূপ ধর্মঠাকুর। ডোম সম্প্রদায়ের লোক ধর্মঠাকুরের পূজা করে থাকে।

সূর্য বা ধর্মঠাকুরের পূজায় গামার কাঠের পিঁড়ি ব্যবহৃত হয়। গামার শব্দের সংস্কৃতায়িত রূপ গম্ভীরা বলে মনে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। শিবের অপর নাম গম্ভীর। শিবকে গিয়ে গাজন উৎসবে একধরনের নৃত্য পরিবেশিত হয়।[১৪] এই নৃত্যকে গাজনের নাচ বা গম্ভীরা নাচ বলে। অবিভক্ত বাংলার মালদহ জেলার ভোলাহাট ও শিবগঞ্জ ছিল এর প্রাণকেন্দ্র। বর্তমানে উভয় স্থানই চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার অন্তর্গত।

২. ছোকরা নাচ

ছোকরা নাচ কোন স্বতন্ত্র নাচ নয়। আলকাপ গানের অংশবিশেষ হলো ছোকরা নাচ। আলকাপ গানের দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে পালা দীর্ঘ সময় ধরে পরিবেশিত হয়।

www.pathagar.com

সাঁওতালদের উৎসব

দর্শক শ্রোতাদের বিশ্রাম দেওয়ার জন্য মাঝে মাঝে আসরে ছোকরা প্রবেশ করে কিছুক্ষণ নাচ-গান করে।[১৫] মেয়ের সাজে সজ্জিত পুরুষ নর্তককে ছোকরা বলে। স্থানীয় গ্রামীণ সমাজে নাচ-গান এমনিতে নিন্দিত, তার উপরে মেয়েদের অংশগ্রহণে একেবারে অচল। এরূপ অবস্থায় বালকদের মেয়েলি পোশাক পরিয়ে আসরে নামানো হয়। গ্রামের উঠতি বয়সি যুবকরা ছোকরা নাচ উপভোগ করে আনন্দ লাভ করে।[১৬] ছোকরা নাচে পরিবেশিত গানগুলো নিম্নরূপ :

১

ধুয়া : আইজ্‌তো আইস্‌ব্যারে বন্ধুর এই ঘাঁটা দিয়্যা
রোঝি রোঝি হ্যাঁট্যা যাও মুখ ঘুরিয়্যা
আঁধোন সাইর‍্যা
মাথা ঘুঁইষ্যা
খোপা তুলিনু বন্ধু তোমার লাগিয়্যা।
লাইরোল ত্যাল্ দিয়্যা
চুল মাখিয়্যা
বেণি গাঁথিনু বন্ধু তোমার লাগিয়্যা
লাল ফিত্যা দিয়্যা
টুপা তুলিয়্যা
খোপা বান্ধিনু বন্ধু তোমার লাগিয়্যা ॥

www.pathagar.com

চন্দন ঘুঁষিয়্যা
মুখ ফোটা দিয়্যা
চন্দন পরিনু বন্ধু তোমার লাগিয়্যা
চ্যারাক্ জ্বালিয়্যা
কাজল পাড়িয়্যা
চোখে কাজল পরিনু বন্ধু তোমার লাগিয়্যা ॥
সেন্দুর কোইট্যা খুইল্যা
কপাল সিঁথি ভৈর্যা
সেন্দুর পরিনু বন্ধু তোমার লাগিয়্যা
রুপার চুরি থুইয়্যা
কাঁচচুরি লিয়্যা
চুরি পরিনু বন্ধু তোমার লাগিয়্যা।
দু-পাঁ ধুইয়্যা
লাল রং গুইল্যা
আল্তা পরিনু বন্ধু তোমার লাগিয়্যা
হাতের কুনি কাইট্যা
পা-র কুনি কাইট্যা
পালিস লাগাইনু বন্ধু তোমার লাগিয়্যা।
আটপ্যাইর্যা খুইল্যা
তোলার কাপড় লিয়্যা
কাপড় পরিনু বন্ধু তোমার লাগিয়্যা
ছাড়বোনা তোমারে আছি ঘাঁটা ঘেরিয়্যা
আইজ্তো আইস্ব্যারে বন্ধু এই ঘাঁটা দিয়্যা
রোঝি রোঝি হ্যাঁট্যা যাও মুখ ঘুরিয়্যা।[১৭]

২

ধুয়া : ভাব বুঝনা ভবের ভবচান্দ্
মন বুঝেনি মনের মধুছন্দ্
কথার বধূ ব্যথা হবে
কে জানিতো হবে সকাল-সান্ধ্
ভাব ... মধুছন্দ্।
সৈন্জা মুনি ঝুইর্যা পড়ে
প্রতিদিন পঁহাতে
ডোগা ভাইঙ্গা তুল্লে সেট্যা
রোজ লাগে পূজাতে
ব্যথার ভরে ঝইর্যা পড়ে
ব্যথা হৈলো ফান্দ্

মন ... মধুছন্দ্
ভাব ... ভবচান্দ্।
গাঙ্গের জল কুন্ঠে যাও
সোঁতে লিয়্যা চলো
শান্তির সাগরে সখা
সেই ছিলো ভাল
ভবের মানুষ ভাবের কাঙ্গাল
বিনি প্রেমের বান্ধ্
মন ... মধুছন্দ্
ভাব ... ভবচান্দ্।[১৮]

তথ্যনির্দেশ

১. ড. প্রদ্যোত ঘোষ, লোকসঙ্গীত গম্ভীরা, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৮৬
২. মহবুব ইলিয়াস, পিতা- মরহুম মোহাম্মদ আলী, মাতা- মরহুম আলিফ বেগম, গ্রাম- নতুন ইসলামপুর, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৭৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- প্রাথমিক, সংগ্রহের তারিখ- ০৫/০৩/২০০৪ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৩. নাজমা বেগম, পিতা- মহবুব ইলিয়াস, মাতা- সুরাইয়া বেগম, গ্রাম- নতুন ইসলামপুর, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৪. মেহবুব রাজা, পিতা- মহবুব ইলিয়াস, মাতা- সুরাইয়া বেগম, গ্রাম- নতুন ইসলামপুর, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৬৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- উচ্চ মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৫. মহবুব ইলিয়াস, পিতা- মরহুম মোহাম্মদ আলী, মাতা- মরহুম আলিফ বেগম, গ্রাম- নতুন ইসলামপুর, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৭৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- প্রাথমিক, সংগ্রহের তারিখ- ০৫/০৩/২০০৪ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৬. নাজমা বেগম, পিতা- মহবুব ইলিয়াস, মাতা- সুরাইয়া বেগম, গ্রাম- নতুন ইসলামপুর, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৭. মহবুব ইলিয়াস, পিতা- মরহুম মোহাম্মদ আলী, মাতা- মরহুম আলিফ বেগম, গ্রাম- নতুন ইসলামপুর, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৭৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- প্রাথমিক, সংগ্রহের তারিখ- ০৫/০৩/২০০৪ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

www.pathagar.com

৮. নাজমা বেগম, পিতা- মহবুব ইলিয়াস, মাতা- সুরাইয়া বেগম, গ্রাম- নতুন ইসলামপুর, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৯. মহবুব ইলিয়াস, পিতা- মরহুম মোহাম্মদ আলী, মাতা- মরহুম আলিফ বেগম, গ্রাম- নতুন ইসলামপুর, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৭৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- প্রাথমিক, সংগ্রহের তারিখ- ০৫/০৩/২০০৪ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
১০. জয়চাঁন্দ সরকার, পিতা- লক্ষ্মীকান্ত পাল, গ্রাম- নতুন বাজার, পোস্ট- বারোঘরিয়া, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৬০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- প্রাথমিক, সংগ্রহের তারিখ- ১৩/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
১১. মেহবুব রাজা, পিতা- মহবুব ইলিয়াস, মাতা- সুরাইয়া বেগম, গ্রাম- নতুন ইসলামপুর, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৬৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- উচ্চ মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
১২. আবদুস সালাম কেরামত, পিতা- মো. মালেক উস্তুর, মাতা- জুবাইদা খাতুন, গ্রাম- পলশা, পোস্ট- চাঁপাই, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৫২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- উচ্চ মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ২৫/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
১৩. জয়চাঁন্দ সরকার, পিতা- লক্ষ্মীকান্ত পাল, গ্রাম- নতুন বাজার, পোস্ট- বারোঘরিয়া, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৬০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- প্রাথমিক, সংগ্রহের তারিখ- ১৩/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
১৪. মাহবুবুল আলম, পিতা- সাদাতুল ইসলাম, মাতা- বিলকিস বানু, গ্রাম- চাঁপাই- দূর্গাপুর, পোস্ট- উপররাজারামপুর, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৬০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২১/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা
১৫. লোকসংস্কৃতি, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা- ৭, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৯৬
১৬. মহবুব ইলিয়াস, পিতা- মরহুম মোহাম্মদ আলী, মাতা- মরহুম আলিফ বেগম, গ্রাম- নতুন ইসলামপুর, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৭৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- প্রাথমিক, সংগ্রহের তারিখ- ০৫/০৩/২০০৪ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
১৭. জয়চাঁন্দ সরকার, পিতা- লক্ষ্মীকান্ত পাল, গ্রাম- নতুন বাজার, পোস্ট- বারোঘরিয়া, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৬০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- প্রাথমিক, সংগ্রহের তারিখ- ১৩/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
১৮. মহবুব ইলিয়াস, পিতা- মরহুম মোহাম্মদ আলী, মাতা- মরহুম আলিফ বেগম, গ্রাম- নতুন ইসলামপুর, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৭৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- প্রাথমিক, সংগ্রহের তারিখ- ০৫/০৩/২০০৪ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

www.pathagar.com

লোকক্রীড়া

মানুষ কেবল ব্যবহারিক জীবনে জীবিকাবহুল কাজ নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না, কাজের ফাঁকে ফাঁকে অবসর প্রয়োজন। নিস্পৃহ বিশ্রাম আবার বেদনাবহ। এজন্য মানুষের অবসর উপভোগ নিমিত্ত আমোদ-ফূর্তি চাই। মানুষ এ যাবত চিত্তবিনোদনের বহু উপায় ও উপকরণ আবিস্কার করেছে। নাচ-গান, খেলাধুলা, গল্পগুজব, ভ্রমণ, শিকার প্রভৃতি এর মধ্যে পড়ে। উপযোগিতা ও বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে খেলাধুলাই এগুলোর মধ্যে উত্তম। খেলাধুলার ভেতর দিয়ে মানব জীবনের দুটো প্রধান উপকার সাধিত হয়–

১. দৈনন্দিন জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিকতার মধ্যে আবিষ্ট মনের মুক্তি; এ মুক্তি সাময়িক হলেও জীবন যাত্রার পথে নবশক্তির সঞ্চার করে।

২.শরীর চর্চা ও স্বাস্থ্য রক্ষা; কায়িক শ্রম সাপেক্ষ খেলাধুলায় শরীরের সুস্থতা ও সবলতা বৃদ্ধি পায়, মানুষ দীর্ঘায়ু হয়। জীবন যাপনের উভয়বিধ উপযোগিতা থেকে মানুষ খেলাধুলা চর্চা করে আসছে।[১]

বাংলাদেশের লোকক্রীড়া ফোকলোর অন্তর্ভুক্ত। অশিক্ষিত জনসাধারণ নিজেদের শরীর চর্চার জন্য এবং সর্বোপরি আনন্দ বিধানের জন্য বহু খেলাধুলা, ব্যায়াম ও প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করেছে। এগুলোর কিছু সংখ্যক হয়তো শুধু অঙ্গভঙ্গি ছাড়াও বিশেষ বিশেষ নিয়ম কানুন অনুসরণ করে বহু খেলায় উদ্ভাবন করা হয়েছে যা এখনো দেশে দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এমনকি সুসভ্য সমাজের বহু কঠোর নিয়মতান্ত্রিক খেলাধুলাও এই সমস্ত লোকখেলাধুলা থেকে প্রেরণা গ্রহণ করেছে। এই পর্যায়ের ফোকলোর এর মধ্যে হা-ডু-ডু, নোন্তা, ছিবুড়ি, ডাংগুলি, কানামাছি, নৌকা বাইচ, ষাঁড়ের লড়াই এবং আরো বহু ধরনের খেলাধুলার নাম করা চলে।[২]

শুধু খেলার জন্যই খেলার উৎপত্তি হলেও এর ভেতরে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাহিনীর কোনো অভাব নেই। কেননা গ্রামীণ খেলাধুলা কোনো কল্পনাপ্রসূত পস্নটের ওপর নির্মিত হয়নি, হয়েছে বাস্তবধর্মী ঘটনাপ্রবাহকে কেন্দ্র করে। সুতরাং লোকক্রীড়াকে আমাদের জীবনযাত্রা তথা জীবনের ঘাত–প্রতিঘাতের দলিল হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।[৩] এদিক দিয়ে গ্রামীণ খেলাধুলার গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং জাতীয় জীবনের ইতিহাস নির্মাণে এগুলো সহায়ক, তেমনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিপূরকও বটে। আমি চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রচলিত খেলাধুলার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, খেলার উপকরণ, স্থান প্রভৃতির ওপর গুরুত্ব দিয়ে এখানকার খেলাধলার শ্রেণিবিন্যাস করেছি। চাঁপাইনবাবগঞ্জের লোকক্রীড়াকে মোট ১২টি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

শ্রেণিবিন্যাস নিম্নরূপ :

১. অস্ত্র, লাঠি ও শক্তির খেলা
২. গুটি বা ঘুঁটির খেলা
৩. গুড্ডির খেলা
৪. চোখ বাঁধা খেলা
৫. কোট বন্দি বা ছকের খেলা
৬. ছড়ার খেলা
৭. ধাঁধার খেলা
৮. তাসের খেলা
৯. নাট্যধর্মী খেলা
১০. পশু–পাখির খেলা
১১. পানির খেলা
১২. ঘর কন্না খেলা।

১. অস্ত্র লাঠি ও শক্তির খেলা

রশি টানাটানি খেলা : রশি টানাটানি চাঁপাইনবাবগঞ্জের অতি জনপ্রিয় খেলা। পাট বা নারকেলের ছোবড়া দিয়ে পাকানো মোটা সোটা ৫/৬ ইঞ্চি ব্যাসার্ধের ও ২০/২২ হাত লম্বা রশি থাকে। দুদলের সমসংখ্যক প্রতিদ্বন্ধীর মধ্যে শক্তির পরীক্ষা হয়। প্রতিপক্ষ ১০/১২ জন খেলোয়াড় থাকে। উভয়পক্ষের প্রধান খেলোয়াড় রশিটির দুইপ্রান্তে নিজ নিজ কোমরে পেঁচিয়ে ধরে। রশিটির মধ্যবর্তী অবস্থানের মাটিতে দাগ দিয়ে রেখে উভয়পক্ষের খেলোয়াড়রা দু'দিক থেকে টানতে শুরু করে। এভাবে টানতে টানতে যে পক্ষে মধ্যবর্তী অবস্থান রেখা অতিক্রম করে অপর দলকে নিজেদের দিকে টেনে আনতে পারে সে দল জয়ী হয়।

ইংরেজি টাগ-অব-ওয়ার খেলাকেই চাঁপাইনবাবগঞ্জে রশি টানাটানি খেলা বলা হয়ে থাকে যা বগুড়া অঞ্চলের কৃষি এবং শ্রমজীবী সমাজে[৪] এবং নরসিংদীতে[৫] 'কাছি টানাটানি' খেলা নামে পরিচিত।

রশি টানাটানি খেলার জন্য ৩০/৩৫ মিনিট সময় নির্ধারিত থাকে। এই সময়ের মধ্যে যে দল যত বেশি প্রতিপক্ষের মধ্য রেখা অতিক্রম করে নিজেদের দিকে আনতে পারবে সে দল তত বেশি নম্বর পাবে। বেশি পয়েন্ট প্রাপ্ত দলকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়ে থাকে। তবে সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন ক্রীড়ানুষ্ঠানে একবারই রশি টানা হয়ে থাকে, এতে যে পক্ষ অন্য পক্ষকে মধ্য রেখা অতিক্রম করাতে পারে তারা জয়ী হয়।[৬]

রশি টানাটানি খেলায় যথেষ্ট শারীরিক শক্তি ও কৌশলের প্রয়োজন। প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে সমতা ব্যতিরেকে পরাজয় অনিবার্য। রশি যথেষ্ট মোটা ও মজবুত না হলে প্রচণ্ড টানাটানির ফলে ছিঁড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আঘাত পাবার আশংকা থাকে।

www.pathagar.com

লাঠি খেলা : আদিম যুগ থেকেই সর্বস্তরের মানুষ লাঠির ব্যবহারের অভ্যস্ত। তখন লাঠি ব্যবহৃত হতো কখনো শিকারের উদ্দেশ্যে, কখনো বা শিকারের হাতিয়ার রূপে। কিন্তু ধাতু বা আগ্নেয়াস্ত্র আবিস্কারের ফলে সমাজ জীবন থেকে এই লাঠির প্রচলন আস্তে আস্তে উঠে যায়। জমিদারদের আমলে লাঠিয়াল বাহিনী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সে সময় প্রত্যেক জমিদারই এই লাঠিয়াল দলকে যোদ্ধা হিসেবে ভরণপোষণ করতেন। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে এই লাঠিয়াল বাহিনী সমাজ থেকে লুপ্ত হয়ে যায়। ফলে এই লাঠি বর্তমানে খেলার উপকরণ হিসেবে টিকে আছে।[৭]

লাঠি আদিম যুগের হাতিয়ার হলেও লাঠি খেলার উদ্ভব সম্ভবত মধ্যযুগে সামন্ত জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায়।[৮] লাঠি খেলা প্রসঙ্গে ড. ওয়াকিল আহমদ বলেন, "যুদ্ধক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তা ফুরানোর পর লাঠি নিয়ে শৌর্য-বীর্য ও কলা কৌশলের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আখড়াগুলি, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।" বর্তমানে মহরম উপলক্ষে লাঠি খেলা অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে পরিচিত হয়। এদেশে মহরম উৎসব প্রচলিত হওয়ার সময় থেকে এ প্রথা চলে আসছে বলে ধরে নেয়া যায়।[৯] লাঠি একমাত্র উপকরণ নয়-ছোরা, থালা প্রভৃতি নিয়ে নাচ দেখানো হয়। তাই এ খেলাকে আধা-নাচ-আধা খেলা বলে অভিহিত করেছেন সুরেন্দ্র মোহন পঞ্চতীর্থ মহাশয়।[১০]

চাঁপাইনবাবগঞ্জের আবা-বৃদ্ধ-বনিতার প্রিয় খেলা হিসেবে লাঠি খেলার নাম উল্লেখ করা যায়। বিশেষত মহরম, বিবাহ, খাতনা প্রভৃতি উপলক্ষে লাঠি খেলার আয়োজন হয় বলে একে আধা অনুষ্ঠানিক খেলা বলা চলে। লাঠি খেলাকে কৃত্রিম দ্বৈত যুদ্ধ বলা যেতে পারে। কখনো লাঠি, ছোরা, রামদা, তলোয়ার, বাঁশের চোখা ফলক ইত্যাদি দিয়ে নানা ভঙ্গিতে নানা কায়দায় এক হাঁটু গেড়ে বসে, দাঁড়িয়ে বা ঘূর্ণনরত অবস্থায় আক্রমণ ও আক্রমণ প্রতিহত করার খেলা।[১১]

আবার একক লাঠি খেলায় সামনে, পেছনে, পাশে আড়াআড়িভাবে, মাথার ওপরে, দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে লাঠি ঘুরানোতেই প্রকৃত আনন্দ ও সৌন্দর্য নিহিত আছে।[১২]

লাঠি খেলা সাধারণত বহির্বাটির আঙিনায় বা কোনো সমতল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। খেলা শুরুর প্রাক্কালে খেলোয়াড়েরা উচ্চস্বরে গাজী পীরের[১৩] বন্দনা গেয়ে থাকে। লাঠি খেলায় মোট ১০/১২ জন খেলোয়াড় থাকে। কম বয়সী ছেলে থাকে ৪/৫ জন। একজন ঢুলী ও একজন কাঁসি বাদক থাকে। খেলোয়াড়দের পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি, কোমরে গামছা বাধা ও পায়ে ঘুঙুর থাকে। এই দ্বৈত খেলায় উভয়ে উভয়ের প্রতি 'হেঁই' বা 'খবরদার' ইত্যাদি শব্দ অতি দীর্ঘলয়ে উচ্চারণ করে। খেলার প্রতিটি পর্যায়ে ঢুলী ও কাঁসি বাদকের সক্রিয় ভূমিকা আছে। ঢুলী ঢোলের দ্বারা খেলা নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিটি খেলা ধীর তালে আরম্ভ হয়ে দ্রুত তালে শেষ হয়। দর্শকদের আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে, লাঠিখেলায় কতকগুলো নৈপণ্য আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদর্শিত হয়। শক্তি শারীরিক কাঠামো, প্রচুর শক্তি সাহস ও ক্ষিপ্রতা ব্যতিরেকে এ খেলায় নৈপুণ্য লাভ করা যায় না। ব্যায়াম হিসেবে লাঠিখেলা অতি উৎকৃষ্ট।

www.pathagar.com

চাঁপাইনবাবগঞ্জে লাঠিখেলা সাধারণত মহরম মাসে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। খেলায় খেলোয়াড়রা দু'দলে বিভক্ত হয় কারবালার মর্মান্তিক যুদ্ধের অভিনয়ও করে থাকে। একদল এজিদের অপরদল ইমাম হোসেনের। এতে একে অন্যের প্রতি এমনভাবে আক্রমণ করে মনে হল লাঠির আঘাতে মারা যাবে। কিন্তু প্রতিপক্ষের প্রতিরোধ কৌশলও চমকপ্রদ। খেলা শুরু হলে বুকে, মাথায়, হাতে সর্বত্র অবিরাম আক্রমণ চলে। বর্তমানে সমঝদারের অভাবে লাঠিখেলা বিলুপ্তির পথে।

রিং ডাণ্ডা : রিং ডাণ্ডা চাঁপাইনবাবগঞ্জের অত্যন্ত জনপ্রিয় লোকখেলা। ডাঙ্গুলি খেলা এখানে রিং ডাণ্ডা খেলা নামে পরিচিত। এ খেলায় সোয়া হাত পরিমাণ লম্বা মসৃণ ও গোলাকার কাঠের দণ্ড ও পাঁচ আঙ্গুল পরিমাণ লম্বা আরেকটি কাঠের দুই দিক ছুঁচালো ছোট দণ্ড ব্যবহৃত হয়। বড়টির নাম ডাণ্ডা আর ছোটটির নাম রিং। মাঠে গরু ছেড়ে দিয়ে রাখাল ছেলেরা এই খেলায় মগ্ন হয়। দু'পক্ষে সমান সংখ্যক খেলোয়াড় থাকে।

রিং ডাণ্ডা খেলার নিয়ম হচ্ছে মাঠের এক প্রান্তে একটি ছোট্ট গর্ত করা হয়। গর্তটি গুটি অপেক্ষা কম দৈর্ঘ্যের হয়। গর্তে হেলান দিয়ে গুটিটি বসালে এর মাথা কিছুটা উঁচিয়ে থাকে। তাতে ডাণ্ডা দিয়ে আঘাত করা সুবিধাজনক। গর্তকে বরা হয় 'গুত্তি'। গুত্তিতে রিং স্থাপন করে ডাণ্ডার অগ্রভাগ চোঙে আস্তে টোকা দিয়ে দূরে নিক্ষেপ করা হয়। বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা তা লুফে নেবার চেষ্টা করে। লুফে নিতে ব্যর্থ হলে রিংকে সেই স্থান থেকে গুত্তির রাখা ডাণ্ডাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেয়। যদি রিং ডাণ্ডাকে স্পর্শ করে তাহলে সেই খেলোয়াড় মৃত বলে গণ্য হবে। আর রিং ডাণ্ডাকে স্পর্শ না করলে উক্ত খেলোয়াড় রিং-এর ওপর আস্তে টোকা মেরে উঠিয়ে তারপর তাতে আঘাত করে দূরে পাঠিয়ে দেয় এবং রিংটি যেখানে গিয়ে পড়ে সেখান থেকে ডাণ্ডা দিয়ে মেপে আসে আর মুখে উচ্চারণ করে–

এঁউড়ি, দেঁউরি, তিলুয়া, চৌরী, চাম্পা, শেখ, সুতেক।

এভাবে অপর দলের খেলোয়াড় খেলতে থাকে। উভয় দলের খেলা শেষ হলে গণনা করা হয়। গেম গণনার পর। যে দলের গেম বেশি হয় তারা অপর দলকে 'খাটায়' খাটানেরা অর্থ হচ্ছে বিজয়ী দলের প্রত্যেক খেলোয়াড় একে একে ডাণ্ডার ওপর রিং টোকা দিয়ে যতবার নাচাতে পারে ততবার জোরে জোরে মারে। এভাবে সমস্ত খেলোয়াড় রিংকে দূরে পাঠানোর পর বিপক্ষ দলকে দম ধরে গুত্তিতে ফিরে আসতে হয়। যদি সকল খেলোয়াড় দম ধরে গুত্তিতে ফিরে আসতে পারে, তাহলে সেই দল অপর দলকে খাটাতে সুযোগ পায়। এভাবেই খেলা চলতে থাকে। যদি কোনো দল দম ধরে গুত্তিতে ফিরে আসতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সেই দল পরাজিত বলে বিবেচিত হয়।

২. গুটি বা ঘুঁটির খেলা

চাঁপাইনবাবগঞ্জের গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের গুটি বা ঘুঁটির খেলার প্রচলন রয়েছে। এসব খেলার মধ্যে ছয় ঘুঁটি, ষোল ঘুঁটি, বাঘ বন্দি, জোড়-বেজোর, বত্রিশ ঘুঁটি, ঘুঁটি তোলাতুলি ইত্যাদি অন্যতম। মূলত অবসর সময়ে ঘরে বাইরে সর্বত্র ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এমন কি বয়স্ক ব্যক্তিদেরও যথেষ্ট অভিনিবেশ সহকারে ঘুঁটি খেলতে দেখা যায়। ঘুঁটি খেলা চিত্তবিনোদন ছাড়াও মস্তিষ্কের উৎকর্ষ সাধনের যথেষ্ট সহায়ক।

www.pathagar.com

ছয় ঘুঁটি খেলা : ছয় ঘুঁটি খেলা সাধারণত দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে হয়ে থাকে। মেঝেতে ছক এঁকে দু'পক্ষ ছয়টি করে মোট ১২টি ঘুঁটি নিয়ে খেলে থাকে। চিহ্নিতকরণের সুবিধার্থে ঘুঁটি দু'রঙের বা ভিন্ন ধরনের আকৃতির হয়। মধ্যের ফাঁকা ঘরটি থেকে চাল শুরু হয়। যে আগে বিপক্ষের ঘুঁটি ডিঙিয়ে সবগুলো খেয়ে ফেলতে পারে সেই জেতে। তবে প্রথমে কে চাল দেবে তা নির্ধারিত হয় টসের মাধ্যমে। কারণ প্রথম চাল দেয়ার ওপর খেলার অনেক কিছু নির্ভর করে। নিম্নে ছয় ঘুঁটির একটি ছকের নমুনা দেয়া হলো :

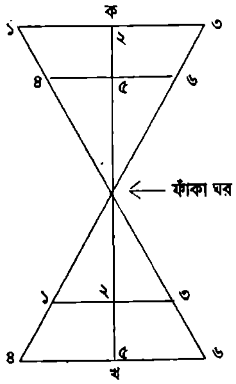

নয় ঘুঁটি খেলা : নয় ঘুঁটি ছয় ঘুঁটি খেলার মতোই। এতে শুধু উভয় পক্ষে নয়টি করে ঘুঁটি দিয়ে খেলে থাকে। নয় ঘুঁটি খেলার ছকটি ছয় ঘুঁটির ছকের মতোই।

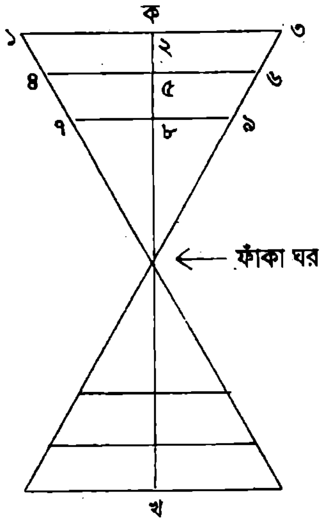

www.pathagar.com

ষোল ঘুঁটি খেলা : ষোল ঘুঁটি খেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জের অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের ছোট-বড় সবাই এ খেলা থাকে। দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে এ খেলা হয়ে থাকে। উভয় খেলোয়াড় ১৬টি করে মোট ৩২টি ঘুঁটি দিয়ে এ খেলা খেলে। খেলার সুবিধার্থে উভয়পক্ষের ঘুঁটির বর্ণ আলাদা হয়। খেলার ছকের মধ্যে লাইন ফাঁক থাকে। একের পর এক চাল দিয়ে যে খেলোয়াড় প্রতিদ্বন্দ্বীর সব ঘুঁটি খেয়ে ফেলতে পারে সে-ই জিতে। ষোল ঘুঁটি খেলার ছক নিম্নরূপ–

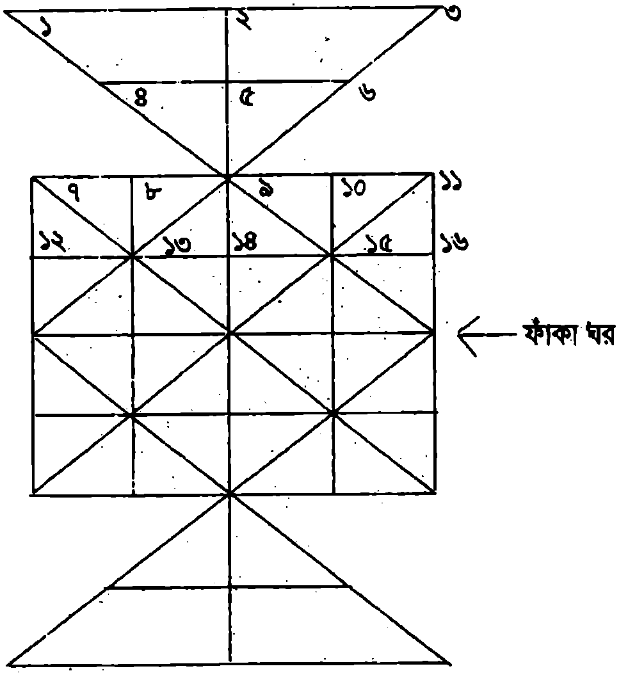

ষোল ঘুঁটি বুদ্ধি প্রধান খেলা। খেলার পদ্ধতিটিতে ছকে ছকে যুদ্ধের কৌশল প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এদিক থেকে খেলাটি দাবার সমধর্মী বলা যেতে পারে। এটি দাবা খেলার গ্রাম্য সংস্করণ। দাবার কয়েক নামে মোট ১৬টি ঘুঁটি চালাতে হয়। ধৈর্য্য, সর্তকতা ও কৌশলের সঙ্গে দেখতে হয় বলে বয়স্করাও এতে অংশগ্রহণ করে থাকে। সময় সাপেক্ষ এ খেলাটি অসবর যাপনেরও অন্যতম উপায়।

ষোল ঘুঁটি খেলাটি শুধু চাঁপাইনবাবগঞ্জেই নয় বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত।[১৩] যুদ্ধ বিদ্যার ছায়াতেই উক্ত খেলাটি উদ্ভাসিত হয়েছে উক্ত নাম থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ দেশে মোগল-পাঠনের যুদ্ধ ঐতিহাসিক ব্যাপার। ষোড়শ শতক এই যুদ্ধের কাল। যুদ্ধের স্মৃতি আশ্রিত খেলাটি ঐ সময়ের পর থেকে এদেশে চালু হতে পারে বলে অনুমান করা যায়।

www.pathagar.com

বত্রিশ ঘুঁটির খেলা : চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রচলিত ঘুঁটির খেলাগুলোর মধ্যে বত্রিশ ঘুঁটির খেলা অন্যতম। এটি ষোল ঘুঁটি খেলার মতোই। শুধু ঘুঁটির সংখ্যা প্রতিপক্ষে ৩২টি করে মোট ৬৪টি। চালের সুবিধার জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে লাইন ফাঁকা থাকে। খেলার ছকটি জটিল বলে বয়স্কদের মধ্যে এর প্রচলন বেশি। নিম্নে বত্রিশ ঘুঁটি খেলার ছকের নমুনা দেয়া হলো–

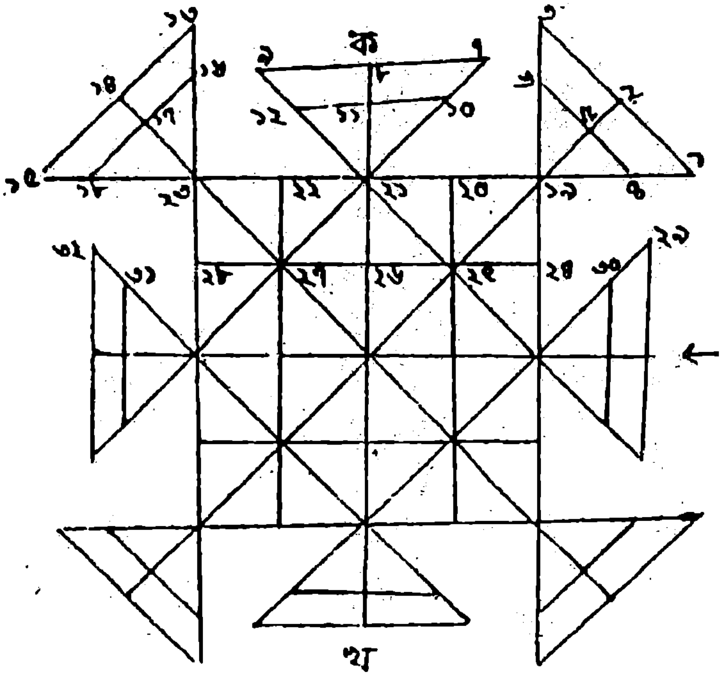

জোড়-বেজোড় খেলা : চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিশু-কিশোরদের অত্যন্ত প্রিয় খেলা। ইটের ছোট ছোট টুকরো, তেতুলের বিচি, লিচুর বিচি, দেবদারু, কোড়ি ইত্যাদি এ খেলার উপকরণ। দু'জন খেলোয়াড় প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক গুটি হাতে নেয়। প্রতিদ্বন্দ্বীর চোখের আড়ালে গুটি বদল করে মুষ্টিবদ্ধ দু'হাত সামনে প্রসারিত করে জিজ্ঞাসা করে–'বলে জোড় না বেজোড়?' উত্তরে অপর খেলোয়াড় যদি সঠিক বলে ফেলে তাহলে হাতের সবগুলো সে পেয়ে যাবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে খেলা চলে। যে সবগুলো জিতে নেয় সে বিজয়ী হিসেবে ঘোষিত হয়। এ খেলার জয়-পরাজয় সম্পূর্ণ অনুমান নির্ভর। খেলাটি পুরোপুরি জুয়াধর্মী। বুদ্ধি কৌশল খাটিয়ে এতে জয়ী হবার সম্ভাবনা নেই।

ঘুঁটি তোলা তুলি খেলা : চাঁপাইনবাবগঞ্জের ১০/১২ বছরের ছেলেমেয়েরা ঘুঁটি তোলা তুলি খেলা খেলে থাকে। ৫টি ইটের ছোট টুকরো এ খেলার উপকরণ। দু'জন মুখোমুখি বসে, একজন প্রথমে মাটিতে ঘুঁটি ৫টি ছড়িয়ে দেয়, তারপর একটি ঘুঁটি

www.pathagar.com

হাতে নিয়ে তা উপরে ছুড়ে দেয়। ছুড়ে দেয়া ঘুঁটিটি মাটিতে পড়ার পূর্বেই উক্ত ঘুঁটিসহ মাটিতে ছড়ানো ঘুঁটিগুলো তুলতে হয়। প্রথমে একটি করে, তারপর দুটি করে, তিনটি করে এবং শেষে এক সঙ্গে চারটি ঘুঁটিই তুলতে হয়। এভাবে চলতে চলতে যখন তার হাত থেকে হঠাৎ কেনো ঘুঁটি পড়ে যায় তখন অপরপক্ষে ঘুঁটি তোলার সুযোগ পায়। অপরপক্ষের চেয়ে সে যদি বেশিক্ষণ বা বেশিবার ঘুঁটি তুলতে পারে তাহলে সে জয়ী হয়।

৩. গুড্ডির খেলা

চাঁপাইনবাবাগঞ্জের গ্রামাঞ্চলের একটি বহুল প্রচলিত জনপ্রিয় খেলা হলো গুড্ডি বা ঘুড়ির খেলা। আমোদ-প্রমোদের খেলা হিসেবে এটি শীর্ষস্থানীয়।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ক্ষেতে ধান পাট বপনের পর হতে যখন অবসর সময় থাকে তখন গুড্ডির খেলার ধুম পড়ে যায়। লাল-নীল, সাদা-কালো, সবুজ-হলুদ, কাগজের গুড্ডিতে তখন ছেয়ে যায় আকাশ। হাতের কাজ সেরে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে আকাশের পানে তাকিয়ে এই দৃশ্য উপভোগ করে। কখনো রঙ মাখানো মাঞ্জা সুতো, কখনো বিনা রঙের সুতো দিয়ে ঘুড়ি উড়ানো হয়। ডিমের কুসুম, ভাতের ফেন, এ্যারারুট, গাব সিদ্ধ প্রভৃতির সঙ্গে মিহি কাঁচের গুড়ো মিশিয়ে সুতায় মাখানো হয়। একে চাঁপাইনবাবগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষার মাঞ্জা করা বলে। মাঞ্জা করা সুতো হয় প্রচণ্ড ধারালো। এই সুতো অন্য গুড্ডির সুতোয় লাগা মাত্রই তা কেটে দেয়।

একজনের গুড্ডির সুতা দিয়ে অন্যের গুড্ডির সুতোয় প্যাঁচ লাগিয়ে কেটে দেয়াই হচ্ছে গুড্ডির খেলার আকর্ষণীয় বিষয়। যার সুতোর ধার বেশি হয়, সে সারাক্ষণ অন্যের গুড্ডির সাথে প্যাঁচ খেলে এবং গুড্ডির সুতো কেটে দেয়। এই সুতো কাটা গুড্ডিগুলো বাতাসে ভাসতে ভাসতে ৪/৫ মাইল দূরে চলে যায়। এই সুতো কাটা গুড্ডি ধরার জন্য ছেলে-বুড়ো নির্বিশেষে সবাই মাইলের পর মাইল দৌড়াতে থাকে। বলাবাহুল্য যে, এই সুতো কাটা গুড্ডি যে যখন ধরতে পারে, সে গুড্ডি তখন তারই হয়। সব সুতো কাটা গুড্ডি উদ্ধার করা সম্ভব হয় না। কোনো কোনো গুড্ডি বিলের পানিতে পড়ে। নষ্ট হয়ে যায়, আবার কোনো কোনোটি গাছের মগডালে বেঁধে ছিঁড়ে যায়। কিন্তু এমনি গুড্ডি উদ্ধারের জন্য তরুণ ও যুবকদের চেষ্টার অন্ত থাকে না।

বাবলার আঠা গুড্ডি তৈরির সর্বোত্তম আঠা। আকৃতি ও নির্মাণ কৌশলের দিক দিয়ে একটি গুড্ডি অন্য গুড্ডির চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। কোনোটিতে লেজ আছে, কোনোটিতে লেজ নেই। চাঁপাইনবাবগঞ্জে সচরাচর ৫ প্রকার গুড্ডি দেখা যায়। যথা–চং গুড্ডি, পতিনা গুড্ডি, নেংটা গুড্ডি, সাপ গুড্ডি ও মানুষ গুড্ডি।

প্রবীণ ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়–এক সময় চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিভিন্ন গ্রামে ঢোল শহরৎ করে গুড্ডি খেলার আয়োজন করা হতো। গুড্ডির খেলাকে কেন্দ্র করে খোলা ময়দানের আশে-পাশে রীতিমতো মেলা বসত। এই মেলায় দূর-দূরান্ত থেকে বহু দোকানী তাদের দোকান পসার নিয়ে আসত। বাঁশের বাঁশি, তালপাতের ভেঁপু, ঝুনঝুনি, মাটির নানা ধরনের পুতুল–এগুলো ছিল গুড্ডির মেলার আকর্ষণীয়

www.pathagar.com

সামগ্রী। একটি কমিটির নিকট এন্ট্রি ফি জমা দিয়ে খেলায় অংশগ্রহণ করতো। খেলায় বিজয়ী গুড্ডির মালিককে মেডেল প্রদান করা হতো।[১৪] বর্তমানে এ ধরনের প্রদিযোগিতার আয়োজন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে।

৪. চোখ বাঁধা খেলা

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিশু-কিশোরদের মাঝে চোখ বাঁধা বিভিন্ন খেলা বেশ প্রিয়। এসব খেলার মধ্যে কানামাছি, লুকোচুরি ও চোরচোর খেলা অন্যতম। নিম্নে এখানকার চোখ বাঁধা খেলাগুলোর পরিচিতি ও নিয়ামাবলী উপস্থাপন করা হলো।

৫. কানামাছি খেলা

কানামাছি দলবদ্ধ ও আনন্দদায়ক খেলা। খেলার শুরুতে একজন খেলোয়াড় দু'চোখ কাপড়ের পট্টি দিয়ে বেঁধে দেয়া হয়। যার ফলে তার ভূমিকা হয় একজন অন্ধ বা কানার মতো। অন্যান্য খেলোয়াড় চারদিক থেকে এই চোখ বাঁধা খেলোয়াড়কে মাছির মতো ঘিরে ঘিরে তার গায়ে-মাথায় মৃদু টোকা দিয়ে ছড়া কাটে-

কানামাছি ভোঁ ভোঁ
যাকে পাবি তাকে ছোঁ।

চোখ বাঁধা খেলোয়াড়টি তখন চারটিকে হাত বাড়িয়ে অন্য খেলোয়াড়দের ধরতে চেষ্টা করে। কখনো বা এদিক সেদিক দৌড় দিয়ে কাউকে ধরে ফেলতে চায়। সেও ছড়া আবৃত্তি করে-

আমি মানি জানি না
পরের ছেলে মানি না।
ইত্যাদি।

চোখ বাঁধা খেলোয়াড়টি যতক্ষণ পর্যন্ত একজনকে ধরতে না পারে ততক্ষণ পর্যন্ত খেলা চলতে থাকে। যখন সে একজন খেলোয়াড়কে ধরে চিনে ফেলে তখন সে কানার ভূমিকা থেকে মুক্তি পায়। যে খেলোয়াড়কে কানা ধরে সে তখন কানার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। আবার এই নিয়মে খেলা চলতে থাকে।

কানামাছি খেলায় প্রথমে কে কানা হবে তা নির্ণয়ের পদ্ধতিটা বেশ চমকপ্রদ। প্রথমে খেলোয়াড়েরা পাশাপাশি দাঁড়ায়। তারপর ১, ১০, ২০, ৩০...................... ১০০ পর্যন্ত উচ্চারণ করে। যার ভাগে ১০০ পড়ে সে খালাস হয়। তারপর হওয়া খেলোয়াড়ের পরের খেলোয়াড় থেকে গণনা শরু হয়। এভাবে সবশেষে যে থেকে যায় সে-ই কানা হিসেবে বিবেচিত হয়। তার চোখ বেঁধে খেলা শুরু হয়।

কানামাছি খেলাটি অত্যন্ত প্রাচীন।[১৫] এটি নিরাপদ খেলা, ছেলেমেয়ে সকলেই এ খেলা খেলতে পারে। ছড়া আবৃত্তি ও ক্রীড়াভিনয় এ খেলার অন্যতম আকর্ষণ। নানা প্রকার ছড়া এ খেলাকে আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য করে তোলে।

www.pathagar.com

৬. লুকোচুরি খেলা

চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রচলিত লোকখেলাধুলার মধ্যে লুকোচুরি একটি উল্লেখযোগ্য ও হৃদয়গ্রাহী খেলা। খেলাটিতে ৩ শ্রেণির খেলোয়াড়ের প্রয়োজন হয়। এই ৩ শ্রেণির খেলোয়াড় 'রাজা', 'চোর' এবং 'সাধারণ খেলোয়াড়' নামে অভিহিত হয়ে থাকে। সাধারণ খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে রাজা ও চোর নির্বাচন করা হয়।

খেলার শুরুতে রাজা চোরের দু'চোখ হাত দিয়ে ঢেকে রাখে। এই সুযোগে সাধারণ খেলোয়াড়েরা তাদের সুবিধা মতো গোপন স্থানে গিয়ে আত্মগোপন করে। অতঃপর চোরের দু'চোখ খুলে দেয়া হয়। চোর তখন লুকিয়ে থাকা খেলোয়াড়দের খুঁজে বের করার জন্য চেষ্টা করে। খুঁজতে খুঁজতে চোর যখন আত্মগোপনকারী কোনো একজন খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে দিয়ে রাজাকে স্পর্শ করতে সমর্থ হয়, তখন সে সাধারণ খেলোয়াড় হিসেবে গণ্য হয়।

অন্যদিকে চোর যাকে স্পর্শ করে সে তখন চোরের ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু চোর অন্য খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে রাজাকে স্পর্শ করার পূর্বেই যদি ছোঁয়া প্রাপ্ত খেলোয়াড় রাজাকে স্পর্শ করে ফেলে তাহলে সে আর চোর হিসেবে গণ্য হবে না। চোর পূর্বের মতোই চোর হিসেবে বিবেচিত হবে।[১৬]

৭. চোর চোর খেলা

কানামাছি খেলার অনুকরণে চাঁপাইনবাবগঞ্জের গ্রামাঞ্চলে একটি খেলা প্রচলিত রয়েছে। খেলাটি চোর চোর খেলা নামে পরিচিত। এ খেলায় দু'জন খেলোয়াড় মুখোমুখি মাটিতে বসে সামনের দিকে পা প্রসারিত করে। উভয় খেলোয়াড়ের পা একত্রে স্থাপন করে গোড়ালি নিচে রেখে পায়ের পাতা উর্ধ্বমুখী করে। একে একে সব খেলোয়াড় লাফ দিয়ে পা ডিঙ্গিয়ে যায়।

তারপর উভয় খেলোয়াড় ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গলির ওপর বাম পা পূর্ব পদ্ধতিতে উর্ধ্বমুখী করে এবং সকল খেলোয়াড় তা লাফ দিয়ে ডিঙ্গিয়ে যায়। তারপর উভয় পায়ের ওপর হাত লম্বাকরে রাখা হয়। আবারো খেলোয়াড়বৃন্দ তার ওপর দিয়ে লাফিয়ে যায়। যে ডিঙ্গাতে ব্যর্থ হয়, সে তখন চোর হিসেবে বিবেচিত হয়। চোরের দুচোখ রুমাল বা কাপড় দিয়ে বাঁধা হয়। অন্যান্য খেলোয়াড়েরা চোরের চারপাশে চোর চোর বলে ঘোরাফেরা করতে থাকে। চোখ বাঁধা খেলোয়াড় বা চোর কাউকে ছুঁতে পারলেই সে চোর থেকে মুক্তি পায় এবং ছোঁয়া প্রাপ্ত খেলোয়াড়টি চোর হয়। এভাবেই খেলা চলতে থাকে।[১৭]

৮. কোটবন্দি ও ছকের খেলা

চাঁপাইনবাবগঞ্জের সর্বত্রই বেশকিছু কোটবন্দি ও ছকের খেলার প্রচলন রয়েছে। এসব খেলার মধ্যে দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, হা-ডু-ডু, বৌছি, বাঘবকরি, রুমাল চুরি, নুনতা ইত্যাদি অন্যতম। নিম্নে এসব খেলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থাপন করা হলো।

www.pathagar.com

৯. দারিয়াবান্ধা বা বন্দন

দারিয়াবন্ধা চাঁপাইনবাবগঞ্জের গ্রাম ও শহরাঞ্চলের একটি জনপ্রিয় খেলা। খোলা জায়গায় নির্দিষ্ট ঘরে কেটে দারিয়াবান্ধা খেলা হয়। বালক-বালিকা এমনকি বয়স্করা এতে অংশগ্রহণ করতে পারে।

দারিয়াবান্ধার 'ছক' বা 'কোর্ট'-এ খেলার প্রধান এবং একমাত্র উপকরণ। এই ছকের ভেতরেই খেলাটি জমে ওঠে। এজন্যে খেলার শুরুর পূর্বেই মাটির ওপর দাগ কেটে 'ছক' তৈরি বা 'কোর্ট' কাটা হয়। অনেক স্থানে আবার কোদাল দিয়ে কেটে ছক তৈরি করা হয়ে থাকে।

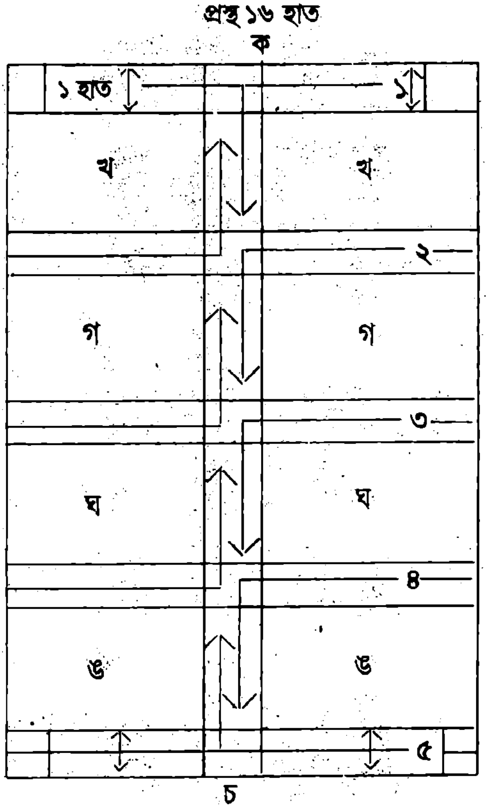

দারিয়াবান্ধা খেলার কোর্ট দৈর্ঘ্য ৩১/৩২ হাত ও প্রস্থ ১৫/১৬ হাত। প্রস্থের দিকে পাঁচটি স্থানে এক হাত সমান্তরাল দুটি রেখা টানা হয়। একে বলে 'পাথইর‍্যা' (প্রস্থ থেকে), অপর দুটি এক হাত সমান্তরাল রেখা দৈর্ঘ্যের মাঝ দিয়ে সমস্ত ঘরকে সমান

www.pathagar.com

দু'ভাগে ভাগ করে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষায় একে 'শিরগাঁড়া' বলে। প্রথম ও শেষ কোটের দৈর্ঘ্যের দিককার দুই প্রান্ত রেখা থেকে এক হাত ভেতরে দুটি করে চারটি দাগ কাটা হয়।

দারিয়াবান্ধা খেলায় প্রতিপক্ষে পাঁচজন করে মোট দশজন খেলোয়াড় থাকে। এর কম সংখ্যক খেলোয়াড় নিয়েও খেলা চলতে পারে। তবে খেলোয়াড় সংখ্যা বেশি হওয়া দরকার। খেলোয়াড় বন্টনের একটি পদ্ধতি এ খেলার লক্ষ্য করা যায়। এতে বন্টনে পক্ষপাত হয় না। পদ্ধতিটি হচ্ছে–খেলা শুরুর আগে খেলোয়াড়রা জোড়ায় কাঁধ ধরে একটু দূরে গিয়ে চুপি চুপি নিজেদের ছদ্মনাম গ্রহণ করে। দু'জন হয় দলনেতা। অন্য চার জোড়া খেলোয়াড় পর্যায়ক্রমে দলনেতাদের সামনে এসে বলে 'ডাক ডাক কার ডাক'? দলনেতা দ্বয়ের একজন বলে–'আমার ডাক, আমার ডাক।' তখন জোড়া খেলোয়াড় তাকে প্রশ্ন করে 'আম নেবে না জাম নেবে?' একজন দেলনেতা যদি বলে, 'আম নেব'। তাহলে আম নামধারী আহ্বানকারী দলনেতার পক্ষে যায়। অপরজন অর্থাৎ জাম যার অপর দলনেতার পক্ষে। এ ধরনের বন্টনরীতির কারণে খেলোয়াড় বন্টনে কোনো বৈষম্য হয় না।

খেলার শুরুর পূর্ব মুহূর্তে কোন দল কোন অবস্থানে খেলবে তা টসের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। সাধারণত সিকি পয়সার মাধ্যমেই টস করা হয়ে থাকে। এক পক্ষ শাপলা ও অপর অক্ষ বাঘ নিয়ে নিরপেক্ষ একজনের মাধ্যমে টস করায়। পরপর তিনবার টস করার পর যে পক্ষ দুইবার জয়ী হয় তারা প্রথমবার খেলার সুযোগ পায় অপরপক্ষ তাদের প্রতিরোধের জন্য প্রতিটি দাগের মাঝে দাঁড়ায়।

প্রস্থের দিকের এক হাত সমান্তরাল রেখার ভেতরে টসে বিজিত দলের পাঁচজন খেলোয়াড় প্রতিরোধ করে দাঁড়ায় ও বিজয়ী দলের পাঁচজন বিপক্ষের ছোঁয়া বাঁচিয়ে ক স্থান থেকে চ স্থানে পৌঁছাতে চেষ্টা করে। কেউ নির্বিঘ্নে 'চ' এ পৌঁছাতে পারলে সে পাকা হিসেবে বিবেচিত হয়। সেই পাকা খেলোয়াড় বিপক্ষের খেলোয়াড়দের ছোঁয়া বাঁচিয়ে পুনরায় চ থেকে ক স্থানে পৌঁছাতে পারলে তারা এক বদ্দনে এগিয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত এভাবে বিপক্ষের ছোঁয়া বাঁচিয়ে বদ্দন দিতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম পক্ষের খেলা চলে। একজন ছোঁয়া দিলে পুরো দল বিপক্ষ দলের মতো ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।[১৮]

দারিয়াবান্ধা খেলায় দু'ধরনের লম্বালম্বি রেখা দুটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই ঘরটি আগলানোর মাধ্যমেই খেলার ভাগ্য নির্ধারিত হয় বলেই দলের সবচেয়ে চালাক ও বুদ্ধিসম্পন্ন খেলোয়াড়কে এই দায়িত্ব দেয়া হয়ে থাকে।[১৯]

দারিয়াবান্ধা খেলাটি ঠিক যেন যুদ্ধের মতো, শত্রু বূহ্য ভেদ করে সফলতা অর্জনের কঠিন পরীক্ষা এতে নিহিত। সীমিত স্থানে ছুটোছুটি করে প্রতিপক্ষকে ফাঁকি দেবার জন্য প্রান্তরেখা দিয়ে হাতের কৌশলে, লাফিয়ে একটি কোর্ট সম্পূর্ণ ডিঙ্গানোতে সমস্ত অঙ্গ সঞ্চালনের ফলে উৎকৃষ্ট ব্যায়াম হয়। একজনের ভুলে সমগ্র দলকে তার খেসারত দিতে হয়। তাই প্রত্যেকের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সমান। তা পালনে ব্যর্থ হলে পরাজয় অনিবার্য।

www.pathagar.com

১০. গোল্লাছুট

গোল্লাছুট চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রচলিত একটি গ্রামীণ খেলা। জেলার সর্বত্র এবং বছরের সব সময়ই এ খেলা হয়ে থাকে। এতে খেলোয়াড়ের সংখ্যা সীমাবদ্ধ থাকে না। খেলোয়াড়ের সংখ্যা অনুপাতে এ খেলার মাঠের আয়তন ছোট বড় হয়। পরিমিত সীমানায় দৌড়ের দ্রুততার উপরেই খেলাটির সাফল্য নির্ভর করে। হা-ডু-ডু বা বৌচির মতো দৌড়ানোর সময় শ্বাসরুদ্ধ করতে হয় না। তবে ছোঁয়া ছুঁয়ির ব্যাপার আছে।

অংশগ্রহণে ইচ্ছুক খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে নির্বাচিত দু'জন দলনেতা প্রচলিত রীতি (দারিয়াবান্ধা খেলায় উল্লেখিত) অনুযায়ী খেলোয়াড়বৃন্দকে দু'ভাগে বিভক্ত করে নেয়। একটি ছোট্ট গর্ত খেলার কেন্দ্রীয় সীমানা। ৪০/৫০ হাত দূরে ইট-পাথর অথবা কোনো গাছ বহি:সীমানা হিসেবে নির্ধারিত হয় কেন্দ্রীয় গর্ত (আঞ্চলিক ভাষায় গোল্লা) থেকে ছুটে গিয়ে সীমানায় অবস্থিত গাছটিকে ছোঁয়াই হলো এ খেলার মূল লক্ষ্য। আর এ থেকেই এ খেলার নাম হয়েছে গোল্লাছুট।

দল প্রধানদ্বয় টসের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর বিজয়ী দলের নেতা গর্তের ভেতর পায়ের গোড়ালি স্থাপন করে দাঁড়ায়। অন্যান্য খেলোয়াড়েরা পরস্পর হাত ধারাধরি করে লম্বা হয়ে গর্তকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে। বিপক্ষের খেলোয়াড়েরা সতর্কভাবে ওঁতপেত থাকে। ঘুরতে ঘুরতে কেন্দ্রের বেষ্টন থেকে যার বা যাদের হাত ছুটে যাবে তাদেরকে দ্রুত দৌড়ে দূরে নির্দিষ্ট করা সীমা অতিক্রম করতে হবে। বিপক্ষের খেলোয়াড়দের লক্ষ্য সেই ছুটে যাওয়া খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে দেয়া। বিপক্ষ খেলোয়াড়ের ছোঁয়া এড়িয়ে সীমান্তে পৌঁছতে পারলে সেই খেলোয়াড় গোল্লা বা গর্তে এসে দাঁড়াবে। আর বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় তাকে সীমান্ত রেখায় পৌঁছার পূর্বে ছুঁয়ে ফেললে সে মৃত বলে বিবেচিত হবে। এভাবে সবাই মৃত হলে অপর অক্ষ তখন গোল্লায় পা দিয়ে খেলা শুরু করবে। যদি সবাই বিপক্ষ দলের ছোঁয়া বাঁচিয়ে নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করতে পারে তাহলে এক গেমে এগিয়ে যাবে।

বলা বাহুল্য যে, গোল্লাছুট খেলার ভেতর দিয়ে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি, হানাদার সম্পর্কে সতর্কতা এবং বন্দি মুক্তি করার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়।

১১. হা-ডু-ডু

হা-ডু-ডু খেলায় দুটো দল থাকে। প্রত্যেক দলে আটজন করে খেলোয়াড় থাকে, তবে ছয় জন করে খেলোয়াড় নিয়ে হা-ডু-ডু খেলা হতে পারে। প্রতি দলের খেলোয়াড় একের পর এক এক দমে ছড়া আবৃত্তি করে বিপক্ষ দলের ঘরে প্রবেশ করে সেপক্ষের কাউকে ছুতে চেষ্টা করে। কিন্তু প্রতিপক্ষের দ্বারা আক্রান্ত হলে দম শেষ হওয়ার আগে যদি সে নিজেকে মুক্ত করে নিজ এলাকায় আসতে না পারে তাহলে সে মৃত বলে বিবেচিত হবে। অন্যদিকে, বিরুদ্ধপক্ষের কাউকে স্পর্শ করে নিজ এলাকায় ফিরে আসতে পারলে বিরুদ্ধপক্ষের সে খেলোয়াড় মৃত হিসেবে গণ্য হবে। এভাবে একটি দলের সকল খেলোয়াড় মৃত না হওয়া পর্যন্ত খেলা চলতে থাকে।

www.pathagar.com

খেলা শুরু হলে একপক্ষের যে কোনো একজন মাঝ রেখা থেকে শ্বাসরুদ্ধ করে অপরপক্ষের কাছাকাছি যার কাউকে স্পর্শ করে মেরে আসতে। খেলোয়াড়টি দম বন্ধ করে আছে তা জানানোর জন্য প্রতি গ্রাহ্যস্বরে হা-ডু-ডু বা হা টিক টিক বা কপাটি কপাটি প্রভৃতি অর্থহীন ধ্বনি অথবা দুই চরনের ছড়া আবৃত্তি করে থাকে। ছড়াগুলো সাধারণত স্বীয় বীরত্ব ব্যঞ্জক অথবা প্রতিপক্ষের প্রতি অবমাননাকর ও বিদ্রুপাত্মক হয়ে থাকে।[২০]

হা-ডু-ডু খেলা সাধারণত কোর্ট কেটে খেলা হয়ে থাকে। এই কোর্টের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মাপ হয় ২১×১৪ বর্গ হাত। অতঃপর এই ঘরটির মাঝে একটি সরলেখা দ্বারা সমান দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়।

হা-ডু-ডু খেলার উল্লেখযোগ্য দিক হলো বিপক্ষের খেলোয়াড়কে মেরে স্ব-পক্ষের খেলোয়াড়কে জীবিত করা। এটি প্রতিযোগিতার খেলা। সারাবছরই এ খেলা চলে। বর্ষাকালে মাটি নরম থাকে বলে প্রতিযোগিতামূলক খেলার জন্য এটিই বিশেষ উপযুক্ত সময়। বর্ষাকালে নবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ ও ভোলাহাট থানার বিভিন্ন গ্রামে বেশ আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে হা-ডু-ডু প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ী ও বিজিত দলের জন্য মূল্যবান পুরস্কারের ব্যবস্থা প্রতিযোগিতা ব্যবস্থাপনা কমিটি করে থাকে।

দু'পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দলবদ্ধ হা-ডু-ডু খেলার অন্তর্নিহিত গুণ বিচারে কৌম জীবনের সংগ্রামশালী একটা মনোভাবের পরিচয় অনুসন্ধান করা যায়। সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে প্রতিপক্ষদের মেরে ফিরে আসা অথবা প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাতে ধরাপড়া যুদ্ধের কৌশল ও পরিণতিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। আক্রমণকারীকে ধরার জন্য আক্রান্ত দল পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে একটা বৃহ্য রচনা করে। সাহসী যে, কুশলী যে, বৃহ্য ভেদ করে শত্রুকে মেরে চলে আসে। দূর্বল আর দক্ষতাহীন যে, সে ধরা পড়ে, বন্দি হয়। প্রাচীনযুগে এদেশে যুদ্ধের কৌশলটা ছিল এরূপ। তখন দৈহিক শক্তি, মনোবল ও কৌশলতার দ্বারা জয়-পরাজয় নির্ভর করতো।[২১]

১২. বৌ-ছি খেলা

বৌ-ছি চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিশু-কিশোরদের একটি প্রিয় খেলা। এতে দুটি পক্ষ থাকে এবং উভয়পক্ষে ৮/১০ জন করে খলোয়াড় থাকে। খেলার প্রচলিত নিয়মানুযায়ী সমতল ভূমিতে ২০/২২ হাত ব্যবধানে দু'টি ঘর কাটা হয়–একটি 'বউঘর' অপরটি 'খেলোয়াড় ঘর।'

খেলোয়াড় ঘর	→ ২০/২২ হাত →	বউঘর

বউঘরের খেলোয়াড়কে বুড়ি বলে। বলাবাহুল্য বৌ-চি খেলায় এই বুড়ির ভূমিকাই প্রধান। কেননা, বুড়ির সফলতা ও বিফলতার ওপরই এই খেলার জয়-পরাজয় নির্ভর করে। সুতরাং বুড়ি যাতে তার অবস্থান 'বউঘর' থেকে বেরিয়ে খেলোয়াড় ঘরে যেতে না পার সেজন্য প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়েরা বুড়ির চারপাশে অবস্থান করে।

www.pathagar.com

অন্যদিকে বুড়ির খেলোয়াড়রাও বুড়িকে তাদের ঘরে আনার জন্য বেশ তৎপর। তারাও এক একজন এক এক নিঃশ্বাসে 'ছি' দিয়ে বুড়ির আশে পাশে অবস্থানরত বিপক্ষদলের খেলোয়াড়দের তাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে। তারা বিপক্ষ দলের কোনো খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে ফেললে সে মৃত বলে বিবেচিত হবে। এ খেলায় যে একবার মারা যায় পরবর্তী খেলা শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে জীবিত হতে পারে না। সুতরাং মারা পড়ার ভয়ে প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা যখন দিক-বিদিক ছুটাছুটি করে তখন সুযোগ বুঝে বুড়ি ঘর থেকে বরিয়ে দে-ছুট... একেবারে খেলোয়াড়দের ঘরে। এতে তারা এক পয়েন্ট লাভ করে। আর বুড়ি বউঘর থেকে ছুটে যাবার সময় প্রতিপক্ষের যদি কেউ তাকে ছঁয়ে ফেলে তাহলে বুড়ি মারা যাবে বা মৃত বলে বিবেচিত হবে। এতে দলটি এক পয়েন্ট থেকে বঞ্চিত হবে, অন্যদিকে প্রতিপক্ষ তখন খেলার যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। এভাবে খেলা চলতে থাকে।

বৌ-ছি ব্যায়াম সর্বস্ব ও অত্যন্ত আনন্দদায়ক খেলা। এতে কোনো বস্তু-সরঞ্জাম নেই। বউকে ঘিরে বিপক্ষ দলের অবরোধ এবং স্বপক্ষের সে অপরোধ ভেদ করে বউ এর মুক্তির চেষ্টার মধ্যে প্রাচীনকালেও বিবাহরীতির ছায়াপাত থাকতে পারে। এদিকে এটি বেশ কৌশলপূর্ণ ও সতর্কতামূলক খেলা।[২২]

১৩. বাঘ-বকরি খেলা

বাঘ-বকরি চাঁপাইনাবাবগঞ্জের একটি জনপ্রিয় লোকখেলা। এটি যুদ্ধের খেলা। আক্রমণ ও আত্মরক্ষার প্রতি লক্ষ রেখে যেমন দাবার ঘুঁটির চাল দিতে হয়, বাঘ-বকরিরও তাই! দাবার আছে যুদ্ধের কৌশল আর বাঘ-বকরিতে আছে শিকারের কৌশল।

বাঘ-বকরি খেলায় বাঘ ও বকরি এই দুই পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ঘুঁটির সংখ্যা ৩৮। ০ চিহ্নিত চারটি স্থানে আটটি করে বকরি ও অন্য যে কোনো দুই ঘরে দুটি করে বাঘ থাকে। প্রথম চাল বাঘ। বাঘ বকরি ডিঙাতে পারলে একটি বকরি খাওয়া হয়।

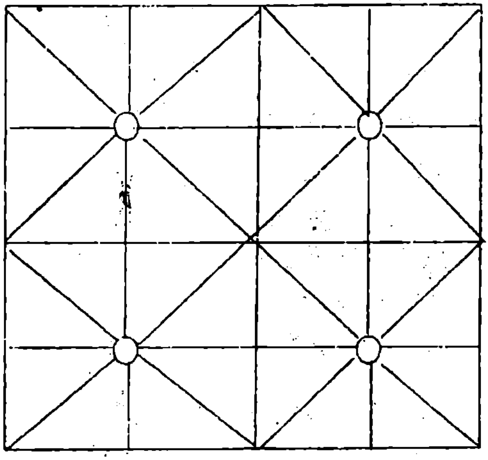

www.pathagar.com

তখন ঘুটিটি বাঘের দখলে যায় ও এটি ছকের বাইরে রেখে দেয়া হয়। অনুরূপভাবে বকরিও ঘর দখল করে বাঘকে বন্দি করে। বাঘ বকরিকে খেতে চায়। বাঘের চালার উপায় না থাকলে বাঘ পরাজিত বা বন্দি হয়। এ খেলাটি কোথাও কোথাও বাঘ বন্দি নামেও পরিচিত।

বাঘ-বকরি খেলাটি অত্যন্ত প্রাচীন। ড. ওয়াকিল আহমদ–এর মতে, আত্মরক্ষার জন্য তো বটে আবার ব্যবসায়ের কারণেও লোক জীবন্ত বাঘ শিকার করে। বাঘ শিকারের যথেষ্ট কৌশল অবলম্বন করতে হয়। গর্ত করে ও গরু-ছাগল বেঁধে ফাঁদ পেতে বাঘ-শিকারের রীতি এদেশে প্রচলিত আছে। সমাজ জীবনের এ ছবি থেকে বাঘ-বকরি বা বাঘ বন্দি খেলার উদ্ভাবন হয়ে থাকতে পারে।[২৩]

চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের মধ্যবর্তী দাউদপুর মৌজা, পাঠানপাড়া ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ গ্রামসহ সর্বত্রই দুর্ভেদ্য জঙ্গল ছিল। এসব জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে বাঘ বাস করতো বলে জানা যায়। বকরিকে 'টোপ' হিসেবে ব্যবহার করে বাঘ শিকারের ঘটনার আলোকে অত্রাঞ্চলে বাঘ-বকরি খেলার উদ্ভব হয় বলে আমরা ধারণা করতে পারি।

১৪. রুমাল চুরি

রুমাল চুরি দলবদ্ধ ছেলেমেয়েদের চিত্তবিনোদন ও অবসর যাপনই এ খেলার মূল উদ্দেশ্য। রুমাল চুরি খেলার শুরুতে একদল ছেলেমেয়ে কেন্দ্রের দিকে মুখ করে গোল হয়ে বসে। অত:পর উক্ত দল থেকে একজনকে 'চোর' সাব্যস্ত করা হয়। যে চোর হয় সে একখানা রুমাল নিয়ে খেলোয়াড় বেষ্টনির চারপাশে ঘুরতে থাকে। ঘুরতে ঘুরতে সে রুমালখানি সাবধানে এবং সবার অলক্ষ্যে যে কোনো একজন খেলোয়াড়ের পেছনে রেখে দেয়।

রুমালখানি যার পেছনে রাখে, সে টের না পেলে চোর দ্রুত ঘুরে এসে তার পিঠে কিল বসিয়ে দেয়। খেলোয়াড় আগে জানতে পারে যে তার পেছনে চোর রুমাল রেখেছে, তখন সে রুমালখানি নিয়ে তার জায়গা থেকে উঠে ঘুরতে শুরু করে। চোর তখন তার শূন্য স্থানে গিয়ে বসে পড়ে। দ্বিতীয় ব্যক্তি রুমাল নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে কোনো এক খেলোয়াড়ের পেছনে রুমাল রেখে তাকে মারার সুযোগ গ্রহণ করে। এভাবে রুমাল চুরি খেলা চলতে থাকে।

রুমাল চুরি খেলায় গ্রাম্য সমাজের ছবি আছে। চুরি সমাজের চোখে অপরাধ। মারধোর করে চোরকে শাস্তি দেয়া হয়। সমাজ জীবনে এরূপ একটা ঘটনা বালক-বালিকারা খেলার ভেতর দিয়ে অভিনয় করে থাকে।

১৫. নুনতা খেলা

নুনতা খেলায় বেশ ক'জন খেলোয়াড় একটি বৃত্তের মধ্যে দাঁড়ায়। একজন বৃত্তের বাইরে ১০/১৫ হাত দূরে দাঁড়িয়ে বলে 'নুনতা বলোরে'। তখন বৃত্তের ভেতরের সকলে সমস্বরে উত্তর দেয়–'এক হলো রে'। এভাবে বৃত্তের বাইরের খেলোয়াড়টি বারবার

www.pathagar.com

'নুনতা বলো রে', 'তিন হলো রে' ইত্যাদি। এভাবে সাত পর্যন্ত গণনা শেষ হলেই খেলা শুরু হয়।

সাত পর্যন্ত গণনা হওয়া মাত্রই বৃত্তের খেলোয়াড়রা হুড় মুড় করে বৃত্ত থেকে বেরিয়ে যায়। বাইরে অবস্থানরত খেলোয়াড়টি তখন দ্রুত গিয়ে প্রবেশ করে। তারপর সে শ্বাসবন্ধ করে বাইরের খেলোয়াড়দের ছুঁতে চেষ্টা করে। সে যত জনকে ছুঁতে পারে তারা তার দলভুক্ত হয়। দম ফেলার আগেই সে ঘরে ফিরে এসে আবার দম ফেলে দেয় তাহলে খেলোয়াড় যদি কেউ তাকে ছুঁয়ে ফেলে তখন সে বাইরের খেলোয়াড়দের দলভুক্ত হয়। আর যে ছুঁয়ে ফেলে সে বৃত্তের ভেতর প্রবেশ করে। এভাবেই নুনতা খেলা চলতে থাকে।

১৬. ছড়ার খেলা

চাঁপাইনবাবগঞ্জে নিম্নলিখিত খেলাগুলো প্রচলিত রয়েছে।

আগডুম বাগডুম খেলা: আগডুম বাগডুম দলবদ্ধ খেলা। অন্তত ৪/৫ জন কি আরও বেশি খেলোয়াড় ঘরের বিস্তৃত মেঝে কিংবা চক্রাকারে বসে এ খেলা খেলে। সকলেই আসন পিঁড়ি করে বসতে হয়। খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন হল দলপতি। এই দলপতি ছড়ার এক একটি শব্দ উচ্চারণান্তে একজনের হাঁটু স্পর্শ করে খেলা পরিচালনা করে।

এক একজনের হাঁটু একের পর এক স্পর্শ করে যাবার সময় প্রত্যেক খেলোয়াড় উৎকণ্ঠিত নজর রাখে দলপতির হাতের দিকে যাতে সে কোনোভাবে বাদ দেয়া না হয়। ছড়ার শেষ শব্দটি যার হাঁটুতে এসে শেষ হয় সে গুটিয়ে রাখে। যার হাঁটু আগে গুটানো হয় তার স্থান হয় প্রথমে। শেষ খেলোয়াড়ের পরাজয় হয়। ছড়ার শেষ কথাটি শোনার জন্য সবার আগ্রহ থাকে। ছড়াটি হচ্ছে–

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে
ঢাক ঢোল ঝাঁঝর বাজে ॥
বাজতে বাজতে চললো ঢুলি।
ঢুলি গেল কমলাফুলি ॥
কমলাফুলির টিয়েটা।
সুর্যি মামার বিয়েটা ॥
আয় রঙ্গ হাটে যাই।
পান শুপারি কিনে খাই ॥
একটা পান ফোঁপরা।
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া ॥
কচি কচি কুমড়ো ঝোল।
ওরে খুকু গা তোল ॥
হলুদ বনে কলুদ ফুল।
তারার নামে টগর ফুল ॥[২৪]

www.pathagar.com

এই খেলা বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত রয়েছে। এতে ছড়াটিতে কিছু পাঠান্তর দেখা যায়। খেলার পদ্ধতি প্রায় অভিন্ন। এ খেলার উৎপত্তি ও নামকরণ সম্পর্কে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "আগডুম' অর্থ অগ্রবর্তী ডোম সৈন্যদল, 'বাগডুম' পার্শ্ববর্তী ডোম সৈন্যদল এবং 'ঘোড়াডুম' অশ্বারোহী ডোম সৈন্যদল। এককালে ডোম সৈন্যই বাংলার পশ্চিম সীমান্ত রক্ষা করতো।[২৫] এই ডোম সৈন্যের বিশেষ প্রতাপ ও প্রতিপত্তি ছিল। আগডুম বাগডুম খেলার মধ্য দিয়ে তাদের এই প্রভাব প্রতিপত্তির কিছু পরিচয় পাওয়া যা।

ইকড়ি মিকড়ি খেলা : ইকড়ি মিকড়ি ছড়ার খেলা। ছড়ার চরণ থেকেই খেলার নামকরণ হয়েছে। ছড়ার কথার অর্থ ধরে কাব্যরূপ ফুটে ওঠে না; তবে কতক ছড়ার সাথে খেলার সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। এসব স্থলে বীরত্বের ভাব অথবা অবমাননাকর উক্তি থাকায় খেলার প্রধান আকর্ষণ যে প্রতিযোগিতা তার ধর্ম প্রকাশ পায়।[২৬] ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হাটু মুড়ে বসে সামনের মাটিতে দু'হাত উপুড় করে রাখে। একজন ছড়া আবৃত্তি করে–

ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি
চামের ব্যাটা লখিনদোর
সূর্য হলো ডামাডোল
ডামাডোলে বাড়িতে
উড়ন্ত কবিতর
সেই কবিতর মারা পড়েলো
খোপ্পের ভেতরে।[২৭]

প্রধান খেলোয়াড় এক একটি শব্দ বা শব্দাংশ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি হাতের পাঞ্জা স্পর্শ করে। ছড়ার শেষ শব্দটি যার হাত স্পর্শকালে উচ্চারিত হয় সে হাত তুলে পেট বা বগলের রাখা হাত গরম করতে থাকে। একে একে সবার হাত পেট ও বগলের রাখা হলে প্রধান খেলোয়াড় সবার হাত পরীক্ষা করে দেখে গরম হয়েছে কিনা। যার হাত ঠান্ডা থাকে সে হয় চোর। চোর হওয়া অপমানজনক ব্যাপার। এতেই তার পরাজয়।

ইকড়ি মিকড়ির প্রথমাংশ game of chance এর পর্যায়ভুক্ত। শেষাংশে চোর সাব্যস্ত করা এবং তাকে শাস্তি দেয়ার অভিনয়ের মধ্যে সামাজিক প্রথার অনুকরণ আছে।

দ্রুত উচ্চারণ কসরতের খেলা : কে অতি দ্রুত ও অধিকক্ষণ করে বিশুদ্ধভাবে নির্দিষ্ট কতকগুলো ছড়া আওড়াতে পারে, ছেলেমেয়ের মধ্যে তার প্রতিযোগিতা চলে। এতে জিহ্বার জড়তা জড়তা কাটে, নির্ভুলভাবে দ্রুত কথা বলার কৌশল আয়ত্ত হয়। দৃষ্টান্ত–

চুলে ত্যাল দিলে
চুল তাজা হয়।[২৮]

www.pathagar.com

দ্রুত বলার সময় চুল উচ্চারণ অনেক ক্ষেত্রে ভুল হয়ে যায়। এতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে হাসির হুল্লোড় ওঠে। এ ধরনের অসংখ্য ছড়া প্রচলিত রয়েছে। ছড়াগুলোতে প্রায় সমধ্বনি বিশিষ্ট শব্দের বাহুল্য লক্ষ্যযোগ্য। এজন্য দ্রুত উচ্চারণের সময় সহজেই শব্দের হেরফের ঘটে।

উপন্টি বাইস্কোপ খেলা : উপন্টি বাইস্কোপ এই অঞ্চলের একটি জনপ্রিয় খেলা। এটি মেয়েলি খেলার অন্তর্ভুক্ত হলেও কখনো কখনো ছোট ছোট ছেলেও এতে অংশগ্রহণ করে থাকে। উপন্টি বাইস্কোপ খেলা শুরুর প্রাক্কালে দু'জন খেলোয়াড় পরস্পর তাদের হাত দু'খানি উঁচু করে ধরে ফাঁদের আকারে দাঁড়ায়। অন্যান্য খেলোয়াড় একে একে সেই ফাঁদের ভেতর দিয়ে পার হতে থাকে এবং ছড়া আবৃত্তি করে। ছড়াটি হচ্ছে–

উপন্টি বাইস্কোপ
নাইন টেন তেইশ কোপ
চুলটানা বিবি আনা
সাহেব বাবুর বৈঠকখানা
সাহেব বলেছে যাইতে
পান সুপারী খাইতে
পানের বোঁটা মরিচ আটা
স্পিরিং এর চাবি আঁটা
আমার নাম মধুমালা
গলায় দিব মুক্তার মালা।[২৯]

ছড়াটি যখন শেষ হয়, সেই মুহূর্তে ফাঁদের নিকটতম ছেলে বা মেয়ে ফাঁদে ধরা পড়ে। যে ধরা পড়ে তাকে দু'জনে দু'হাত ও দু'জন দু'পা ধরে ঘুরে বেড়ায়। এভাবেই পর্যায়ক্রমে খেলা চলতে থাকে।

উপন্টি বাইস্কোপ খেলায় বুদ্ধি প্রয়োগ দ্বারা জয়ী হওয়া যায় না। এতে সামান্য শারীরিক ব্যায়াম হয়। খেলাটির ছড়ায় বিকৃতরূপে কিছু ইংরেজি শব্দের অবতারণা লক্ষ্য করা যায়। এ থেকে খেলাটি ইংরেজ আমলে সৃষ্টি বলে অনুমিত হয়।[৩০]

হাঁটি হাঁটি পা পা খেলা : শিশুরা সাধারণত ৮/৯ মাসের মধ্যে হাঁটতে শেখে। অনেক ক্ষেত্রে এর বিপরীত ভাব পরিলক্ষিত হয়। এসব শিশুকে নিয়ে মা-বাবার চিন্তার শেষ থাকে না। কি করে শিশু হাঁটতে শিখবে এই নিয়ে তারা দিনরাত চিন্তা ভাবনা করেন। হাঁটি হাঁটি পা পা খেলাটি তাদের এই চিন্তা-ভাবনার ফসল। বয়সের সন্ধিক্ষণে শিশুরা হাঁটতে পারলে তারা সেই শিশুর হাত ধরে ঘরের মেঝে অথবা প্রশস্ত আঙ্গিনা দিয়ে হেঁটে নিয়ে বেড়ায় ও ছড়ায় আবৃত্তি করে দৃষ্টান্ত–

আমার ভাই হাঁটেরে
সোনার নুপুর পায়।
হাঁটতে হাঁটতে ভাইটি আমার
রাজ্যের দূর যায়
আমার ভাইরে হাঁটে রে

www.pathagar.com

টাপুর টাপুর পায়।
এই উড়ে এই পড়ে
দুঃখ নাহি পায় ॥

১৭. ধাঁধার খেলা

শিশুদের মানসিক বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার ক্ষেত্রে ধাঁধার খেলার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ খেলার ভেতর দিয়ে তাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয় এবং তারা যে কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ অর্জন করে। সুতরাং এ ধরনের খেলার উপযোগিতা অনস্বীকার্য। আসলে এ খেলার ধাঁধা ছড়ার আকারেই উপস্থাপিত হয়। ফলে ধাঁধার খেলায় ছড়া আবৃত্তির অপরিমেয় সুখ ও আনন্দ শিশুমনকে প্রাণবন্ত ও উচ্ছল করে তোলে।[৩১] ধাঁধাঁর খেলায় সাধারণত ১০ থেকে ২০ জন পর্যন্ত খেলোয়াড় থাকে। এরা কোনো ছায়াঘেরা স্থানে সমান সংখ্যক দুটি দলে বিভক্ত হয়ে বসে। অত:পর একজন প্রশ্নকর্তা নিযুক্ত হয়ে উভয়দের মাঝখানে বসে ধাঁধা আবৃত্তি করে এবং সমবেত খেলোয়াড়দের কাছে উত্তর জিজ্ঞাসা করে। এভাবে ধাঁধা জিজ্ঞাসা ও উত্তর দেয়ার মধ্য দিয়ে খেলা চলতে থাকে। যে দল ধাঁধাঁর বেশি উত্তর দিতে পারে, সেই দল খেলায় জয়লাভ করে। ধাঁধা রূপকধর্মী। বাচ্যার্থে ধাঁধার অর্থ উদ্ধার করা যায় না, ব্যঞ্জণার্থে উদ্দিষ্ট বস্তু-সূত্র অনুসন্ধান করতে হয়। ধাঁধার রহস্যাবৃত্ত উত্তরের অনুসন্ধানের প্রচেষ্টায় শিশুর আঙ্গিক ক্রিয়া কৌশলের চেয়ে মানসিক বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা বেশি হয়।[৩২]

শিশুদের সমস্যা সমাধানের শক্তি প্রবল। সমাধানের মধ্যে একটু মজা বা আনন্দের আস্বাদ পেলে শিশুরা প্রবলভাবে উৎসাহিত হয়। এ ব্যাপারটা সম্পর্কে আমাদের পূর্বপুরুষেরা অবহিত ছিলেন। তাই তাদের অনেকটা সময়ই তারা সমস্যা পূরণে ব্যয় করতে পেরেছেন।[৩৩]

নিম্নে ধাঁধার দৃষ্টান্ত দেয়া হলো :

আকাশেতে আছি আমি গগনেতে নাই
কাননেতে আছি আমি অরণ্যেতে নাই
উত্তর–'ক' অক্ষর
একটুখানি ঘরে চুন কাম করে।
উত্তর–ডিম
খুললে ঘর, বন্ধ করলে লাঠি।
উত্তর–ছাতা

১৮. তাস জাতীয় খেলা

তাস খেলার অনুকরণে চাঁপাইনবাবগঞ্জের ছোট ছেলেরা 'ঠিকানা' নামে এক প্রকার খেলা খেলে থাকে। খেলার উপকরণ ভাঙ্গা মৃৎপাত্রের ভাঙ্গা টুকরো ও সিগারেটের প্যাকেট। এক ইঞ্চি গভীর এবং ২/৩ ব্যাস বিশিষ্ট একটি গর্ত খোঁড়া হয়। একে বলে

www.pathagar.com

গুত্তি। গুত্তিতে দাঁড়িয়ে একজন মৃৎ পাত্রের টকুরো দূরে ছুঁড়ে মারে এবং প্রতিপক্ষের অগোচরে কিছু সংখ্যক তাস বাজি রাখে। প্রতিপক্ষ তখন মৃৎপাত্রের টুকরোটির পতনস্থল থেকে তার নিজস্ব টুকরোটি গুত্তিতে ছুঁড়ে মারে। টুকরোটি গুত্তিতে পড়লে বা এক তাসের দৈর্ঘ্যের সমান দূরত্বে পড়লে খাওয়া হয় অর্থাৎ প্রতিপক্ষ বাজি হারে। দ্বিতীয় দফায় গুত্তি থেকে ছুঁড়ে প্রতিযোগীর মৃৎপাত্রের টুকরো স্পর্শ করতে পারলে বিপক্ষকে খাওয়া হয়। এভাবে খেলে যে অধিক সংখ্যক তাস পায় সেই জয়ী হয়।

১৯. নাট্যধর্মী খেলা

চাঁপাইনবাবগঞ্জে নাট্যধর্মী খেলা খুব একটা দেখা যায় না। তবে গ্রামীণ শিশু-কিশোরেরা বুড়া-বুড়ির খেলা ও টিয়ারে টিয়া নামে দুটো খেলা খেলে থাকে সেগুলোকে নাট্যধর্মী খেলা বলা যেতে পারে।

২০. বুড়া-বুড়ির খেলা

বুড়া-বুড়ির খেলা একটা কৌতুকপ্রদ খেলা। খেলাটির ভেতর পল্লী বাংলার কৃষাণ-কৃষাণীরা মিলন-বিরহের বাস্তব চিত্র বিধৃত হয়। ফলে গ্রাম বাংলার সকল মানুষের কাছে একটি অত্যন্ত প্রিয় খেলা। খেলাটি নাট্যধর্মী বলে এর নাটকীয় সংলাপগুলো একে প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় করে তোলে।

এ খেলার দু'জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে। একজন গাঢ় চুন দিয়ে গোঁফ তৈরি করে এবং কিছু চুনের পানি মাথায় ঢেলে দিয়ে পাকা চুলের মতো করে বুড়ো সাজে। অপরজন চুল পাটের আঁশ দিয়ে তৈরি করে এবং শাড়ি পরে বুড়ি সাজে।

বুড়ি হাতের লাঠিতে ভর দিয়ে কোমর বাঁকিয়ে, ফোকলা মুখে পান চিবুতে চিবুতে দু'এক পা করে অগ্রসর হতে থাকে। এমন সময় বুড়ো লাঙ্গন কোদাল কাঁধে করে সেখানে উপস্থিত হলে তাদের মধ্যে কথোপকথনের শুরু হয়–

বুড়াঃ ভাত রাধ্যা দিব্যা তুমি
হাল বাহিতে যামু হামি।
বুড়িঃ ভাত রান্‌তে পারবোনা
বাপের বাড়িত যামু হামি।
বুড়াঃ বাপের বাড়ি যাইব্যা তুমি
চুল ধর‍্যা আনমু হামি।
বুড়িঃ চুল ধর‍্যা আনব্যা তুমি
খাম ধর‍্যা থাকমু হামি।
বুড়াঃ খাম ধর‍্যা থাকব্যা তুমি
কান ধর‍্যা আনমু হামি।
বুড়িঃ কান ধর‍্যা টানব্যা তুমি
থুক দিয়্যা পালামু হামি।
বুড়াঃ থুপ দিয়্যা পলাব্যা তুমি

www.pathagar.com

চুল ধর‍্যা টানমু হামি।
বুড়িঃ চুল ধর‍্যা টানব্যা তুমি
আগুনে পুড়্যা মরমু হামি।
বুড়াঃ আগুনে পুড়্যা মরব্যা তুমি
তোমার সাঁথে মরমু হামি।[৩৪]

স্বামী-স্ত্রীর মান-অভিমান, হাসি-কান্না ও প্রেম-প্রীতি দিয়ে গড়ে ওঠা সংসার জীবনের বাস্তব চিত্র পাওয়া যায় খেলাটিতে।

২১. টিয়ারে টিয়া খেলা

টিয়া পাখির নামের সঙ্গে যুক্ত অভিনয়ধর্মী এই খেলাটি ছোট ছেলেমেয়েদের খুবই প্রিয়। দলের একজন উপুড় হয়ে দুই হাতের তালু মাটিতে ভর দিয়ে দুই পা পিছনে প্রসারিত করে টিয়া পাখি সাজে। অন্যেরা দু'পাশে দাঁড়িয়ে টিয়ার দু'পা এক হাত পরিমাণ উর্ধ্বে লম্বালম্বিভাবে ধরে রাখে ও দু'জন মুষ্টিবদ্ধ হাত তার পেটের নিচে রাখে। টিয়া ও অন্যদের মধ্যে প্রশ্নোত্তর ছড়া কাটা চলে। প্রশ্ন করার সময় টিয়ার পিঠে মৃদু থাপ্পড় দেয়া হয়। টিয়া প্রতিবারই হামাগুড়ি ছেড়ে ক্রমান্বয়ে শরীরের উর্ধ্বাংশ পেছনের দিকে উল্টিয়ে উপভোগ্য ভঙ্গিতে জবাব দেয়–

টিয়ারে টিয়া
কিরে ভাই টিয়া
তোর বউয়ে কি রানছে?
বাগুন ভাজা।
আমাকে একটু দিবে?
এককই বাড়িতে ভাংতাম মাজা।[৩৫]

২২. পশু-পাখির খেলা

চাঁপাইনবাবগঞ্জের পশু-পাখি বিষয়ক বেশকিছু খেলা প্রচলিত রয়েছে। এসব খেলার মধ্যে কুমির কুমির, মোরগের লড়াই, সাপের খেলা, বানরের খেলা অন্যতম। নিম্নে খেলাগুলোর পরিচয় ও নিয়ামবলী আলোচনা করা হলো।

কুমির কুমির খেলা : কুমির কুমির খেলা দলবদ্ধ বালক-বালিকার খেলা। গ্রামের ছেলেমেয়েরা অবসর মুহূর্তে একত্র হয়ে এ খেলা খেলে থাকে। খেলায় খেলোয়াড় সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। উঁচু-নিচু জায়গা এ খেলার উপযুক্ত স্থান। উঁচু-নিচু স্থানের অভাবে ছেলেমেয়েরা চৌকি ও মেঝের ওপরে খেলতে পারে। দলের একজন প্রথমে কুমিরের ভূমিকা নেয়। সে নিচু স্থানে ওঁৎ পেতে থাকে। অন্যেরা গোসল করতে নিচে নামে। তারা কুমিরকে লক্ষ্য করে বলতে থাকে, 'কুমিররে তোর জলে নেমেছি।' কুমির সুযোগ পেলেই তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা পালাবার চেষ্টা করে। যে ধরা পড়ে সে

www.pathagar.com

কুমির হয় আগের কুমির অন্যান্য খেলোয়াড়দের সঙ্গে একত্রিত হয়। কুমির কুমির খেলা এভাবেই চলতে থাকে।

মোরগের লড়াই : আদিবাসী ও কৃষিজীবী সমাজের প্রিয়খেলা মোরগের লড়াই। এ খেলার জন্য মোরগকে বিশেষভাবে শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। সাধারণত শীতকালের দুপুর বেলায় মোরগের লড়াই হয়ে থাকে। স্বভাবগত ভঙ্গিতে ঝুঁটি ফুলিয়ে দুই মোরগের আক্রমণ দৃশ্য দেখার মতো। এ লড়াইয়ে যে মোরগ বিজয়ী হয় সে মোরগের মালিক পরাজিত মোগরটি পেয়ে থাকে।

জীব-জন্তুর প্রতি ছোটদের আকর্ষণ স্বাভাবিক। সে হিসেবে মোরগের লড়াই তাদের জন্য চিত্তাকর্ষক। ছোটরা নিজেদের মধ্যে মোরগ লড়াই খেলে। ৮/১০ জন বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে বাম হাতে বাম পা পেছন দিকে ধরে রাখে। মুষ্ঠিবদ্ধ ডান হাত বুকের কাছে রেখে পরস্পর পরস্পরকে এক পায়ে লাফাতে লাফাতে কাঁধের মাধ্যমে আঘাত করে। এই বৃত্তবেষ্টনীতে এলোপাথারি আক্রমণে নির্দিষ্ট ভঙ্গি বজায় রাখে যে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে সেই বিজয়ী হয়।

সাপের খেলা : শ্রাবণ মাসের দিনগুলোতে চাঁপাইনবাবগঞ্জের গ্রামে গ্রামে সাপের খেলা সহজেই চোখে পড়ে। দূর্গাপূজার পর একাদশী তিথিতেও সাপ খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সাপের খেলায় খেলোয়াড় নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি করে এবং গান গাইতে গাইতে ঝাঁপির মুখ খোলে। সাপের মুখের কাছে হাত নাড়তে নাড়তে বলে ওঠে–লেচে আয় মা কালনাগিনী। তারপর গান ধরে–

বেহুলা কাইনদো না কাইনদো না
কানদিলে লখার পাব্যা না।
লোহার আঁচির লোহার প্রাচীর
বেহুলা আর কাইনদো নারে ॥[৩৬]

এইভাবে গান গেয়ে ফনার কাছে হাত দেয়। সাপ ছোবল মারতে চায়। তখন খেলোয়াড় বলে ওঠে–

'খা খা খা বক্ষিলারে খা
গাইটে পয়সা বান্ধ্যা যে না দেয়
তার চোক্ষু উপড়াইয়া খা।[৩৭]

গান এবং কথার সঙ্গে সঙ্গে যখন দ্রুততালে বীণা বাজে তখন সাপের উর্দ্ধাংশ দোলে। শোনা যায় ফোঁস ফোঁস শব্দ। সাপুড়ে কখনো হাঁটু এগিয়ে, কখনো মুঠো ঘুরিয়ে বিচিত্র সুর ও তালের সৃষ্টি করে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তখন ভিড় করে সাপের খেলা উপভোগ করে থাকে।

বানরের খেলা : জীব-জন্তুর বিভিন্ন খেলার মধ্যে বানরের খেলা ছোটদের কাছে খুবই আনন্দদায়ক। বানরের অনুকরণ দক্ষতা বিস্ময়কর। বানর অতি সহজেই যে কোনো অভিনয় আয়ত্ব করতে পারে। মেয়েদের চুলের ভেতর থেকে উকুন খুঁজে বের করে মারা, করমর্দন করা, সালাম করা, নামাজ পড়া, বধূর ঘোমটা দেয়া, শ্বশুরবাড়ি যাত্রাকালে নতুন বধূর কান্না, মাথায় পিঠার বোঝা নিয়ে লাঠি ঠুকে বৃদ্ধের নাত

www.pathagar.com

জামাইয়ের বাড়ি যাওয়া, বাচ্চা কোলে নেয়া, তালে তালে হাঁটা, ডিগবাজী খাওয়া, চড় দেয়া ইত্যাদি খুবই কৌতকপ্রদ। শিশুরা শুধু নয় বড়রাও খুব আনন্দের সঙ্গে বানরের খেলা উপভোগ করে থাকেন।

২৩. পানির খেলা

চাঁপাইনবাবগঞ্জে অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল রয়েছে। তাই এখানে বেশকিছু পানির খেলার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। এসব খেলার মধ্যে নৌকা বাইচ প্রধান। নিম্নে চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রচলিত পানির খেলাগুলোর পরিচিতি উপস্থাপন করা হলো।

ব্যাঙ খেলা : চাঁপাইনবাবগঞ্জের নদী-নালা, খাল-বিলের আগাছামুক্ত পানিতে ছোট ছেলেরা ব্যাঙ খেলা খেলে থাকে। এতে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি খেলোয়াড়ের হাতে থাকে পাতলা মৃৎপাত্রের ২/২.৫ ইঞ্চি মাপের ভাঙ্গা টুকরো, যা চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভাষায় 'খোলা' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে খেলোয়াড়েরা একে একে পানির ওপর দিয়ে টুকরোগুলো সজোরে ছুঁড়ে মারে। এগুলো ব্যাঙের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে বেশ দূরে গিয়ে ডুবে যায়। যার ঢিল দর্শনীয়ভাবে যত দূরে যায়, সে-ই বিজয়ী হয়। এ খেলায় বাহুর যথেষ্ট ব্যায়াম হয়।

ডুব সাঁতার : নদীমাতৃক বাংলাদেশে আত্মরক্ষা ও জীবিকা এই উভয়বিধ প্রয়োজনে ডুব সাঁতার জানা অপরিহার্য। ডুব সাঁতারে দক্ষ না হলে নৌকাডুবি বা লঞ্চ ডুবি থেকে আত্মরক্ষা, ডুবন্ত লোক বা নৌকা উদ্ধার, মাছ ধরা, বেশি পানিতে পাট কাটা ও জাগ দেয়া, পঁচনো পাট পানির নিচ থেকে উদ্ধার ইত্যাদি কাজ সম্ভব নয়। বর্ষাকালে নদী-নালা, খাল-বিলে গোসলের অজুহাতে ছোট ছেলেমেয়েরা হাঁসের মতো বেপরোয়া ডুব সাঁতার কাটে।[৩৮] ডুব সাঁতারকে চাঁপাইনবাবগঞ্জে এ শ্রেণির আনন্দদায়ক খেলা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তিন ধরনের ডুব দেয়ার প্রচলন রয়েছে–

১. ডুব দিয়ে অপেক্ষাকৃত অনেক সময় পানির নিচে থাকা
২. গভীর পানির তলদেশ থেকে কাদা তুলে আনা এবং
৩. ডুব দিয়ে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করা।

ডোবাডুবির ফলে অনেকক্ষণ দম রাখার ক্ষমতা আয়ত্ব হয়। অনেকে কয়েক মিনিট ধরে ডুবে থাকতে পারে। ব্যায়াম হিসেবে ডুব সাঁতার অতি উৎকৃষ্ট।

উপুড় চিৎ সাঁতার : চাঁপাইনবাবগঞ্জে উপুড় ও চিৎ সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দ্রুত নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রমের জন্য উপুড় সাঁতার আর চিৎ সাঁতারে দরকার দূরত্ব অতিক্রম অথবা অনেকক্ষণ পানিতে ভেসে থাকা।

২৪. নৌকাবাইচ

বাঙালির ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ খেলাধুলার মধ্যে নৌকাবাইচ সবচেয়ে জনপ্রিয়। কারণ নদী মাতৃক বাংলাদেশে সর্বত্রই এ খেলার প্রচলন রয়েছে। উৎসব মুখর পরিবেশে একসময় অনুষ্ঠিত হতো নৌকাবাইচ। এখন আর সে অবস্থা নেই। চাঁপাইনবাবগঞ্জ

www.pathagar.com

জেলায় অতি প্রাচীনকাল থেকেই নৌকাবাইচ এর প্রচলন রয়েছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জএর বেশ কয়েকটি পয়েন্টে নৌকাবাইচ অনুষ্ঠিত হতো। বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হতো বাইচ।

এসব বাইচের স্থানগুলো হচ্ছে- বারোঘরিয়া, বিরামপুর, শিবগঞ্জ, গোসায়বাড়ি, ধাইনগর, শুক্রবাড়ি, দামস, চককীর্তি, হোগলা দামস, গোমস্তাপুর, আঁখহীরা শৈল্যা, চককীর্তির দাঁড়া প্রভৃতি। দূর্গাপূজা উপলক্ষে বারোঘরিয়ায় নিয়মিতভাবে নৌকাবাইচ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এছাড়া সদরঘাটে দূর্গা বিসর্জনের দিন নৌকাবাইচ হয়। আউসধান কাটার পর চিত্তবিনোদনের জন্য হোগলার দামস, শুক্রবাড়ি দামস, আঁখহীরা শৈল্যা, অরুণবাড়ি বেহুলা, কোপরা গোসায়বাড়ি, ধাইনগরের জলাশয়ে এ নৌকাবাইচ হয়ে থাকে।

শিবগঞ্জ উপজেলার বিরামপুরস্থ বাঁশবাড়িয়ার বিলের পাশে চারদিনব্যাপি মেলা বসিয়ে নৌকা বাইচের আয়োজন করা হয়। আউসধান উঠার পর বাইচ উপলক্ষে কখনো কখনো আলকাপ গানের আসরও বসানো হতো। নৌকা বাইচে যারা দাঁড় টানে তাদের 'পাইট' বলা হয়। তাদের গায়ে থাকতো একই রঙের জার্সি। এক একটি নৌকায় থাকে ১ জন মাঝি, ১ জন উৎসাহদাতা, ৮ জন পাইট অথবা ৬ জন পাইট। গলুইতে যিনি বসেন তাকে 'গলুইর পাইট' বলা হয়। আর থাকতো 'চ্যালাটের পাইট'। গলুইর পাইট থাকে বামে আর চ্যালাটের পাইট বসে ডানে। বাইচের সময় নৌকায় আরও একজন থাকে, তাকে বলা হয় 'চড়নদার বা জাজ'।

বাইচের দূরত্ব ১ থেকে ২ মাইল নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। বর্তমান সময়ের চেয়ে অতীতের বাইচগুলো ছিল উৎসবমুখর ও অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল প্রচুর। তখন বাইচের সময় শ্লোগান দেয়া হতো 'জেয় আলাহ জিকি জেয়' অর্থাৎ জয় আলা জির জয়। আবার কোন কোন দল বলতো 'আলাহ রসুল কি জয়'। বিজয়ী দলের সদস্যরা দাঁড়সহ দাঁড়িয়ে পায়ের গোড়ালি দিয়ে নৌকার পাটাতনে আঘাত হানতে হানতে জয়ের গীত গাইতো 'জেয় আলাহ জিকি জেয়'। নৌকা বাইচে অংশগ্রহণকারী পাইটদের খুব ভাল করে আপ্যায়ন করেন নৌকার মালিক। বাইচের দিন খাসি, ভেড়া জবাই করে চলতো ভুরি ভোজ। সাথে থাকাতো চিনির ক্ষীর বা পায়েশ, চমচম, রসগোলা ও নানা ধরনের পিঠা জাতীয় খাবার। শ্রাবণ থেকে ভাদ্র ও আশ্বিন মাস পর্যন্ত নৌকাবাইচ চলতো।

বাইচের নৌকার পিছনের নকশাকৃত অংশ 'মহলা' নামে এবং গলুই এর সম্মুখে বসানো অংশটিকে 'কুম্ভিরা' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এর নকশায় সাধারণত বাঘ, কুমির ইত্যাদি প্রাণীর মুখের আকৃতি (খোদাই) থাকতো। এ অঞ্চলে ৮ ও ৬ দাঁড়ের পানসী নৌকার বাইচ প্রতিযোগিতা হতো। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা দাঁড় বাইতো তাদের পাইট বলা হয়ে থাকে। দাঁড় পানির মধ্যে ডুবিয়ে টানমারাকে এককথায় দাঁড়টানাকে আঞ্চলিক ভাষায় বলা হয় 'থাবা'। ছন্দবদ্ধভাবে পাইটরা দাঁড় বাইতো। যে গ্রাম বা জনপদ দিয় বাইচের নৌকা যেতো সে সমস্ত গ্রামে বা জনপদে পাইটরা বলত 'যে আলাহ জ্বি কি জেয়'। পরপর কয়েকবার এই বলদর্পী ধ্বনি সমস্বরে

www.pathagar.com

ঘোষণা করতো। এই ধ্বনি শুনে গৃহবধুরাও নদীর তীরে এসে দাঁড়াতো বাইচ দেখতে। বাইচ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীরা বিভিন্ন পুরস্কার পেত। অন্যান্য দলগুলোও পেতো সান্ত্বনা পুরস্কার। এসব পুরস্কারের মধ্যে থাকতো সোনার মেডেল, শিল্ড, কাপ, সাধারণ মেডেল, কলস, টাকা ইত্যাদি। বাইচ প্রতিযোগিতা অধিকাংশ সময়ই বন্ধুত্বপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হতো। কোন কোন সময় এই বন্ধুত্ব, শত্রুতায়ও রূপ নিতো। প্রবীণ ব্যক্তিরা জানান বাইচ প্রতিযোগিতা নিয়ে মারামারি পর্যন্ত হয়েছে কোন কোন সময় এবং তার জের চলেছে দীর্ঘদিন। নৌকা বাইচে গিয়ে অনেকে বউ পছন্দ করেছে এবং সে সূত্রে বিয়েও হয়েছে। এছাড়া অনেকের সাথে বন্ধুত্বও গড়ে উঠেছে বাইচের মাধ্যমে। নৈপূণ্য প্রদর্শনকারী 'পাইটরা' মালিকের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠতো। তারা খুব আদরযত্ন পেতো, অসুখ-বিসুখ ওষুধপত্র ছাড়াও পরিবার প্রতিপালনের জন্য আর্থিক সহায়তাও পেতো।

আর্থসামাজিক কারণে মানুষের চিত্তবিনোদনের ধরন পাল্টে যাচ্ছে। একসময় মানুষ নৌকাবাইচ উপভোগ করে আনন্দ পেতো, কিন্তু বর্তমানে ইলেট্রনিক্সের যুগে মানুষ উন্নত চিত্তবিনোদনের সুযোগ পাচ্ছে। এছাড়াও জলাশয়ে কালভার্ট, ব্রিজ, স্লুইস গেট ইত্যাদি নির্মাণের ফলে নৌকা বাইচের পরিমাণ কমে গেছে। এককথায় নৌকা বাইচের বর্ণাঢ্য আয়োজনের কথা মানুষ আজ ভুলতে বসেছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় আর তেমন নৌকাবাইচ হয় না। বিশেষ বিশেষ দিন উপলক্ষে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সুইমিং ক্লাব নৌকা বাইচের আয়োজন করে থাকে। নিয়মিত বাইচ বলতে শারদীয় দুর্গাপূজা বির্সজনের দিন বাইচ হয়ে থাকে।

এখানে চাঁপাইনবাবগঞ্জের কয়েকজন বিখ্যাত নৌকাবাইচ এর দলনেতা, পাইট ও মাঝির নাম উল্লেখ করা হলো– নৌকার মালিক-আখহিরার মহিরুদ্দিন মণ্ডল, ইজ্জত আলী, লাওঘাট্টার তারাপদ সরকার, চককির্তীর আতি মণ্ডল, মোয়াজ্জেম মণ্ডল, চাতরার আব্বাস মণ্ডল ও মোবারকপুরের এন্তাজ মণ্ডল। গলাইয়ের নামকরা পাইট আখহিরার আইয়ুব আলী, লাওঘাট্টার আরশাদ পালোয়ান, চককির্তীর ভুলু এবং চ্যালাটের পাইট আখহিরার হররোজ আলী (মৃত) ও লাওঘাট্টার আরশাদ (কানা) এবং বিখ্যাত মাঝি তবজুল মণ্ডল, এহি হাজী ও মোয়াজ্জেম প্রমুখ।

২৫. ঘর কন্যা খেলা

ছোট ছেলেমেয়েরা বড়দের রান্না-বান্না ও ঘর গৃহস্থালির অনুকরণ করে যে সমস্ত খেলাধুলা করে থাকে তাকে ঘর কন্যা খেলা বলা হয়ে থাকে।

রান্না-বান্না খেলা: রান্না-বান্না অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের অত্যন্ত প্রিয় খেলা। বড়দের সাংসারিক কার্যক্রম অনুসরণ করে ছোটরা এ খেলা খেলে থাকে। কঞ্চি দিয়ে ঘরে খুঁটি, পাতার ছাউনি দিয়ে ঘর বানানো, ঘর লেপা, চুলা তৈরি, ক্ষুদ দিয়ে ভাত রান্না, ধুলিকে চিনি কল্পনা করা। গাছের বড় পাতা কিংবা মাটির হাড়ির ভাঙা অংশ (খোলা) দিয়ে বাসন তৈরি করে শিশুরা সাংসারিক কার্যক্রমে মেতে ওঠে। কেউ কেউ আশপাশের ঝোপঝাড়ে বাজার করতে যায়। হরেক রকম কাল্পনিক সওদা বয়ে আনে খেলা ঘরে। চলে বেচাকেনা আর রান্নার অভিনয়। খাবার সময় নিচের ঠোঁট ও জিহ্বার সাহায্যে এক

ধরনের শব্দ করে পরম আনন্দে খায়। অত:পর রাত হয়েছে বলে ফুঁ দিয়ে বাতি নিভায়। সবাই চোখ বুজে শুয়ে পড়ে, বেঘোর ঘুমে নাক ডাকায়। মুহূর্তকাল ঘুমের ভান করে সবাই হল্লা করে জেগে ওঠে এবং হেসে লুটোপুটি খায়।[৪২]

পুতুল খেলা: ইতিহাসের শুরু থেকেই পুতুল শিশু-ক্রীড়ার তালিকাভুক্ত।[৪৩] ক্ষুদ্র মূর্তিকেই পুতুল বলা হয়। প্রাচীন পুতুলগুলো সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে গণ্য হয়। সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যুগে যুগে পৃথিবীতে পুতুলের ব্যবহার, উপকরণ, গঠনশৈলী ও আকৃতি-প্রকৃতির পরিবর্তন হয়েছে। পুতুল অনুকরণ স্পৃহাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অনেক সময় যাদুবিদ্যা, টোটেম, পৌরাণিক ও কাল্পনিক দিক ফুটে ওঠে। মূলত পুতুল লোকসংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ। সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, পালা-পার্বণ যেমন রথের মেলা, পৌষ সংক্রান্তি, চড়ক পূজা, শিবরাত্রি, মহরম, বিভিন্ন মেলা ও ওরশ উপলক্ষে কুমারেরা বিভিন্ন ধরনের পুতুল তৈরি করে। পুতুলের বৈচিত্র্যময় গঠন ও উজ্জ্বল রঙের বিন্যাস শিশুমনকে সহজেই আকৃষ্ট করে।

শিশু খেলনা বা পুতুল পেয়ে খুশি হয়। পুতুলকে নিয়ে তার রাজ্যের কাজ। পুতুল তার নিত্যসঙ্গী ও বন্ধু বলে তাকে ক্রীড়োৎসাহে উদ্দীপ্ত করে। জীবনানুকরণের সঙ্গে সঙ্গে এ খেলায় হয় গার্হস্থ্য ধর্ম ও কৃত্যের হাতে খড়ি। তারা পুতুল বিয়ে দেয় এবং পুতলি দিয়েই ক্ষুদ্র সংসারের স্নিগ্ধতা রচনা করে। আমোদ-প্রমোদ, হৈ-হুল্লোড় এ খেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য। পুতুলের বিয়েতে পাত্রপক্ষে ও পাত্রীপক্ষের লোকজনদের বিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়। এ খাবার সাধারণত বালু ও কাদা দিয়ে তৈরি করা হয়। ছেলেমেয়েরা সারিবদ্ধভাবে বসে মুখ নেড়ে তা খাবার চেষ্টা করে। সবশেষে বিবাহের রীতি অনুযায়ী কনে বিদায়ের মাধ্যমে খেলা শেষ হয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ লোকক্রীড়া প্রচলিত রয়েছে। এগুলো একদিকে যেমন আনন্দ ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে অন্যদিকে তেমনি জাতির গর্বের বিষয়ও বটে। এসব খেলাধুলার ভেতর দিয়ে এলাকাবাসীর নিষ্ঠা, নীতিবোধ, জ্ঞান ও জাতীয় চরিত্রের সুদৃঢ় ও সুশৃঙ্খল ভাবমূর্তি প্রকাশিত হয়ে থাকে।

তথ্যনির্দেশ

১. ড. ওয়াকিল আহমদ, বাংলার লোকসংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৭৪, পৃষ্ঠা-৪১৩
২. ড. মযহারুল ইসলাম, ফোকলোর ও লোকসাহিত্যের পঠন-পাঠন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৭৪, পৃষ্ঠা-১৭
৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭
৪. শঙ্কর সেন গুপ্ত, বাঙালির খেলাধুলা, কলকাতা ১৯৭৬, পৃষ্ঠা-৭
৫. ড. ওয়াকিল আহমদ, বাংলার লোকসংস্কৃতি, পৃষ্ঠা-৪১৬
৬. সামীয়ূল ইসলাম, বাংলাদেশের গ্রামীণ খেলাধুলা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯২, পৃষ্ঠা-৯
৭. শঙ্করসেন গুপ্ত, বাঙালির খেলাধুলা, পৃষ্ঠা-৩৯
৮. সামীয়ূল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩
৯. সামীয়ূল ইসলাম, বাংলাদেশের গ্রামীণ খেলাধুলা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯২, পৃষ্ঠা-৭

www.pathagar.com

১০. চাঁপাইনবাবগঞ্জের লৌকিক খেলাধুলা ব্যয়হীন, শ্রমহীন, ও সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এসব উপকরণের মধ্যে রয়েছে–শক্ত মাটি, খড়, লাঠি, ইটের টুকরো, কাটি সুতা, বাঁশের কঞ্চি, গুটি, পাটকাঠি, কড়ি, বিচি, গাছের ফল-ফুল, লতাপাতা, পাথর, কাগজ, ধুলোবালি, গাছ ইত্যাদি
১১. সামীয়ূল ইসলাম, বাংলাদেশের গ্রামীণ খেলাধুলা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯২, পৃষ্ঠা-১৫
১২. মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান, নরসিংদীর লৌকিক খেলাধুলা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-৮৭
১৩. মাহবুবুল আলম, পিতা- সাদাতুল ইসলাম, মাতা- বিলকিস বানু, গ্রাম- চাঁপাই-দূর্গাপুর, পোস্ট- উপররাজারামপুর, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৬০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২১/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা
১৪. সামীয়ূল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৯
১৫. মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান, নরসিংদীর লৌকিক খেলাধুলা, পৃষ্ঠা- ৬২
১৬. ড. ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৩৬
১৭. সুরেন্দ্র মোহন পঞ্চতীর্থ, পূর্ববঙ্গে মহেশ্বরদী, কলকাতা, ১৩৭২, পৃষ্ঠা- ১৭৫
১৮. মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৬২
১৯. ড. ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৩৬
২০. লোকসংস্কৃতিতে গাজী পীর বীরত্বের প্রতীক। তাই শৌর্য- বীর্যের আহ্বান কল্পেই হয়তো এক্ষেত্রে গাজী পীরের বন্দনা রীতি আছে
২১. আবদুল হক চৌধূরী, চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতি, চট্টগ্রাম, ১৩৮৭, পৃষ্ঠা- ৪১০
২২. শফিকুল ইসলাম মিন্টু, পিতা- মো. হোসেন আলী, মাতা- লালমন বেগম, গ্রাম-চরজোতপ্রতাপ, টি.বি. রোড, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- উচ্চ মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ২১/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
২৩. ড. আশরাফ সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৮০-১৮২
২৪. শরিফা খাতুন, পিতা- মরহুম আমিনুল ইসলাম, গ্রাম ও ডাক- বারোঘরিয়া, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৫২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-প্রাথমিক শিক্ষা, সংগ্রহের তারিখ- ২২/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
২৫. শরিফা খাতুন, পিতা- মরহুম আমিনুল ইসলাম, গ্রাম ও ডাক- বারোঘরিয়া, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৫২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-প্রাথমিক শিক্ষা, সংগ্রহের তারিখ- ২২/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:৪০ টা
২৬. সাক্ষাতকার: আমিনুল ইসলাম জনি, প্রাগুক্ত
২৭. সাক্ষাতকার: শরিফা খাতুন, প্রাগুক্ত
২৮. মো. গোলাম জাকারিয়া, পিতা- আলহাজ আবুল কাসেম বিশ্বাস, মাতা- জমিলা বেগম, গ্রাম ও ডাক- চৈতন্যপুর, উপজেলা- শিবগঞ্জ, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২৩/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৩:০০ টা

www.pathagar.com

২৯. মো. শহীদুল ইসলাম, পিতা- আবদুল হক, গ্রাম- আজাইপুর, ডাকঘর- বটতলাহাট, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৬৩ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- প্রাথমিক শিক্ষা, সংগ্রহের তারিখ- ২৩/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা
৩০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪২৪
৩১. সীমায়ূল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৭
৩২. আমিনুল ইসলাম জনি, পিতা- মরহুম আনিসুর রহমান, মাতা- নুরান নেসা, গ্রাম- মসজিদপাড়া, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৬ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- উচ্চ মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ২২/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৩৩. ড. আশুতোষ ভট্টচার্য, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২২৮
৩৪. সাজেনুর, স্বামী- মো. আবদুর রহমান, গ্রাম- কাদিতলা, ডাকঘর- নাচোল, উপজেলা- নাচোল, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৫৪ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- ষষ্ঠ শ্রেণী, সংগ্রহের তারিখ- ২৪/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা
৩৫. শফিকুল ইসলাম মিন্টু, পিতা- মোঃ হোসেন আলী, গ্রাম- চরজোতপ্রতাপ, টি.বি. রোড, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- উচ্চ মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ২১/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৩৬. শফিকুল ইসলাম মিন্টু, পিতা- মোঃ হোসেন আলী, গ্রাম- চরজোতপ্রতাপ, টি.বি. রোড, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- উচ্চ মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ২১/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৩৭. তরিকুল ইসলাম, পিতা- হুমায়ুন কবির, মাতা- রাজিয়া বেগম, গ্রাম- সাগরইল, পোস্ট- আক্কেলপুর, উপজেলা- গোমস্তাপুর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৬ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতকোত্তর, সংগ্রহের তারিখ- ২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় সকাল ১০:০০ টা
৩৮. সামীয়ূল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৪৭
৩৯. সামীয়ূল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৪৭
৪০. ড. ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৬৪
৪১. শঙ্কর সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২১৬
৪২. সুলতানা ফেরদৌসী স্বাতী, স্বামী- ওয়াইল হক চৌধুরী, মাতা- তাহেরা বেগম, গ্রাম- বেলেপুকুর, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতকোত্তর, সংগ্রহের তারিখ- ২৫/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৪৩. তরিকুল ইসলাম, পিতা- হুমায়ুন কবির, মাতা- রাজিয়া বেগম, গ্রাম- সাগরইল, পোস্ট- আক্কেলপুর, উপজেলা- গোমস্তাপুর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৬ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতকোত্তর, সংগ্রহের তারিখ- ২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় সকাল ১০:০০ টা
৪৪. মো. গোলাম জাকারিয়া, পিতা- আলহাজ আবুল কাসেম বিশ্বাস, মাতা- জমিলা বেগম, গ্রাম ও ডাক- চৈতন্যপুর, উপজেলা- শিবগঞ্জ, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২৩/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৩:০০ টা

www.pathagar.com

৪৫. মো. গোলাম জাকারিয়া, পিতা- আলহাজ আবুল কাসেম বিশ্বাস, মাতা- জমিলা বেগম, গ্রাম ও ডাক- চৈতন্যপুর, উপজেলা- শিবগঞ্জ, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২৩/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৩:০০ টা
৪৬. মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৯
৪৭. ড. ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৯
৪৮. মেহবুব রাজা, পিতা- মহবুব ইলিয়াস, মাতা- সুরাইয়া বেগম, গ্রাম- নতুন ইসলামপুর, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৬৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- উচ্চ মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৪৯. শাহ্জাহান প্রামাণিক, পিতা- মরহুম রুস্তম প্রামাণিক, মাতা- দুলু বিবি, গ্রাম- মসজিদপাড়া, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৫৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৫০. মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২০
৫১. সামীয়ূল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৪৮

www.pathagar.com

লোকপেশাজীবী গ্রুপ

বাংলাদেশের লোকশিল্প সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। কিছু কিছু শিল্পের ক্ষেত্রে পেশাজীবী কারিগর শ্রেণি আছে, যারা পুরুষানুক্রমে শিল্পকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। যেমন– কামার, কুমার, ছুতার, তাঁতি, সোনারু, কাঁসারি, শাঁখারি, ঘরামি, হাজাম, মালাকার, শোলাকার, ময়রা, গোয়ালা, দর্জি, নাপিত, ডোম প্রভৃতি। এরা নিজ নিজ পেশায় নিয়োজিত থেকে বহু বিচিত্র শিল্পকর্ম সৃষ্টি করে থাকেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের বুক দিয়ে মহানন্দা, পুণর্ভবা, পাগলা প্রভৃতি নদী বয়ে গেছে। এখানকার অধিবাসীদের জীবনে নদীর প্রভাব অপরিসীম হওয়ার পেশাগত জীবনে এর প্রভাব লক্ষণীয়। নদীই এ অঞ্চলের মানুষকে মৎস্যজীবী করার অনুকূল পরিবেশ জাগিয়েছে। তাই এখনও এ জেলার অধিবাসীদের অন্যতম প্রধান পেশা মৎস্য শিকার।[১]

নদী যেমন মানুষকে মৎস্যজীবী করে তুলেছে তেমনি নদীই এ অঞ্চলের জন সমাজকে কৃষির প্রতি আগ্রহী করে তুলেছে। নদীর পানি সেচ হিসেবে ব্যবহার করে কৃষক সমাজ তাদের ফসল উৎপাদনে সফল হয়েছে। এভাবে অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদা থেকে কামার, কুমার, তেলি, মুচি, ছুতার, তাঁতি, কম্বল বুননকারী কারিগর প্রভৃতি পেশাজীবী শ্রেণির উদ্ভব ঘটেছে।

১. জেলে

নদী ও খালবিল প্রধান এ দেশের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে চাঁপাইনবাবগঞ্জে। যার ফলে মৎসজীবী সম্প্রদায় জেলে এখানে থাকবে এটিই স্বাভাবিক। এখানে রয়েছে গুঁড়ি সম্প্রদায়, যারা মূলত বংশ পরম্পরায় মাছ ধরার সাথে জড়িত। তবে চাষ ভিত্তিক মছের কারণে গুড়িদের নিজস্ব অস্তিত্বে বিঘ্ন ঘটছে। এরা সাধারণত জাল দিয়ে মাছ ধরে নদী ও জলাশয়ে। এরা বিভিন্ন ধরনের জাল ব্যবহার করে থাকে যার মধ্যে খেও ও ফাঁস জাল প্রধান। এরা দিন রাত মহানন্দা, পদ্মা, পূনর্ভবা ও পাগলা ও বিভিন্ন জলাশয়ে ডিঙি নৌকাতে জাল নিয়ে দাপাদাপি করে।

মাছ ধরে গ্রামে, গঞ্জে, পাড়ায় বিক্রি করে এরা জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। বাজারে মাছের যোগান চাষভিত্তিক হয়ে যাওয়ার কারণে এদের অস্তিত্ব সংকটে রয়েছে। অবস্থাসম্পন্ন যেকোন শ্রেণীর লোক পুকুর ও জলাশয়ে মাছ চাষ করায় এদের অধিকাংশই এখন পেশাজীবী থেকে পরনির্ভর শ্রমিকে পরিণত হয়েছে। যে কয় স্থানে এদের অস্তিত্ব রয়েছে তাদের মধ্যে বারঘোরিয়া ইউনিয়নের নতুন বাজারই প্রধান। এরা হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্নবর্ণের লোক।

www.pathagar.com

২. দোহ'ড়্যা

বাঁশের খিলে নির্মিত বিভিন্ন ধরনের লোকযন্ত্রে যারা মাছ ধরে তাদের দোহ'ড়্যা বলে। এরা সাধারণত মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক। পারিবারিক ভাবে জেলার বিভিন্ন অংশে কিছু লোক এ পেশার সাথে জড়িত। এটি মূলত নদী ও বন্যা নির্ভর বলে জলাশয়ে জল কমলে এরা অন্যান্য পেশার সাথে জড়িয়ে যায়। তারপরও চাঁপাইনবাবগঞ্জে এসব মানুষ দোহ'ড়্যা নামে পরিচিত। এরা বংশ ভিত্তিক নয়, পরিবার ভিত্তিক দোহ'ড়্যার কাজ করে থাকে।

৩. কাঠ মিস্ত্রি/ ছুতার

কাঠ দিয়ে যারা বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করে তাঁদেরকে চাঁপাইনবাবগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষায় 'ছুতার' বলা হয়। ছুতারদের কেউ কেউ কাঠ মিস্ত্রি এবং সূত্রধর নামেও উল্লেখ করে। এই পেশায় আগের মতো তেমন লোক পাওয়া যায় না। বর্তমানে অনেকেই আছেন যারা অধিকাংশই আধুনিক কারুকার্যময় আসবাবপত্র তৈরি করছেন যা লাভজনক।

তাই ছোট খাট কাজে কাঠমিস্ত্রিদের পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের ছুতাররা হাল চাষের জন্য লাঙ্গল, মই, জোয়াল প্রভৃতি তৈরি করতেন। এখন কলের লাঙ্গল তৈরি হওয়ায় কাঠের লাঙ্গলের চাহিদা কমে গেছে।

ছুতাররা ঢেঁকি তৈরি করতেন আগের দিনে তাই প্রতিটি গৃহেই ঢেঁকির ব্যবহার ছিল। বর্তমানে কলে ধান ছাটায়ের ফলে ঢেঁকির প্রচলন প্রায় উঠেই গেছে। এখন আর ঢেঁকি তৈরি হয়না বললেই চলে। আগেকার দিনে প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই বেশ কিছু ছুতারের আবাস পাওয়া যেত। কিন্তু বর্তমানে সে ধরনের পাওয়া যায় না।

মহানন্দা নদীর তীরে অবস্থিত চাঁপাইনবাবগঞ্জবাসির যোগাযোগের মাধ্যম ছিল নৌকা। তখন ছুতাররা নৌকা তৈরি করতেন। সারাবছর নদীতে পানি থাকতো, জেলেরা মাছ ধরতেন। এই মাছ ধরা নৌকা তারা তৈরি করতেন।

বর্তমানে মহানন্দা নদীর উপর সেতু নির্মিত হওয়ায় যাত্রী পারাপারের জন্য নৌকা ব্যবহৃত হয়না। জেলেরা নৌকায় মাছ ধরতেন তার পরিমাণও এখন কমে গেছে। এসব কারণে নৌকা তৈরির কাজ ছুতার এমন করছেন না।

একসময় পালকি ছিল সম্ভ্রান্ত পরিবারের যাতায়াতের বাহন। তখন বিভিন্ন নক্শা দ্বারা পালকি তৈরি করতেন ছুতাররা। বর্তমানে পালকি বিলুপ্ত। তাই ছুতারদের কাজের পরিধি অনেক কমে গেছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চলে এখন ছুতারদের বাস রয়েছে। কলের লাঙ্গলের প্রচলন হওয়ায় কাঠের লাঙ্গন জোয়াল তেমন আর তৈরি করেন না ছুতাররা। প্লাস্টিকের টেবিল-চেয়ার, টুল, পিড়ি, র‍্যাক, ওয়ারড্রব, দরজা প্রভৃতি তৈরি হওয়ার ফলে ছুতারদের কর্মময় জীবনে এসেছে বিবর্তন। তারপরও তারা কাঠ থেকে তৈরি করছেন বিভিন্ন জিনিসপত্র।

www.pathagar.com

কাঠ মিস্ত্রি

৪. গাছি বা গা'ছ্যা

এরা মূলত তাল-খেজুরের রস আহরণের কাজে নিযুক্ত। এ জেলায় তাল-খেজুরের গাছ কম হলেও এই পেশার সঙ্গে কিছু লোক জড়িত। তাল গাছের চেয়ে খেজুর গাছের সংখ্যা বেশি হওয়ায় শীত কালের খেজুর রসের সঙ্গে এদের সম্পৃক্ততা বেশি। গ্রীষ্মকালে এরা তালের রস আহরোণ করে থাকে।

৫. রাজমিস্ত্রি

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পেশাজীবী হিসাবে রাজমিস্ত্রির সংখ্যা সর্বাধিক। দেশের যে ক'টি অঞ্চলে এই পেশাজীবী সবচেয়ে বেশি তার মধ্যে এই জেলা অন্যতম। পূর্বে এরা শুধু দেশের পাকা ঘর, বাড়ি ও বিভিন্ন স্থাপনা তৈরির কাজ করত। কিন্তু বর্তমানে এই পেশাজীবীর লোক নির্মাণ শ্রমিক হিসাবে অনেকেই বিদেশে যাচ্ছে এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠাচ্ছে। ফলে নির্মাণ শ্রমিক হলেও দেশের অর্থনীতিতে এদের প্রভাব রয়েছে।

৬. কলু

কলু বা তেলিদের হাতে ঘানিগাছে তৈরি সরিষার তেল চাঁপাইনবাবগঞ্জের অন্যতম কুটিরশিল্প। ঘানিগাছ গরুর চোখ বেঁধে ঘুরিয়ে সরষে, তিল প্রভৃতি পিষে যারা তেল

www.pathagar.com

বের করেন তাদেরকেই বলা হয় কলু বা তৈলকার। এ কাজের জন্য প্রয়োজন কমপক্ষে দুইজন মানুষ। অনেক ক্ষেত্রে গরুর বদলে মানুষ ঘানি টানে। টাকার অভাবে গরু কিনতে না পারলেই কেবল মানুষ ঘানি টানে। চোখ বাঁধা অবস্থায় গরু দীর্ঘসময় ঘানি টানতে পারে। একটানা খাটুনির ফলেই ঘানি টানার গরুকে 'কলুর বলদ' বলা হয়ে থাকে।

বর্তমানে ঘানিতে উৎপাদিত তেলের প্রধান উপাদান হচ্ছে সরিষা। সরিষা পিশে পিশে তা থেকে যে তেল বের হয় তার পরিমাণ খুবই কম। পরিমাণে কম হলেও এই তেলের কদর অত্যন্ত বেশি। তেল বের করার পর তেলি হাট-বাজারে বা বড় বড় মহাজনের দোকানে তেল বিক্রি করেন।

অনেকেই দেখা যায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে বাড়িতে বাড়িতে তেল বিক্রি করে। তারপরেই দোকানে তেল সরবরাহ করতে অধিক আগ্রহী।

ঐতিহ্যবাহি পেশাজীবী কলু সম্পদায়ের মানুষ শুরু থেকেই সামাজিক বৈষম্যের মধ্যেই বেড়ে উঠেছে। তাই অতীতে যেমন সামাজিক মর্যাদা ছিল না তেমনি অর্থনৈতিক সচ্ছলতার দিক দিয়ে তারা অত্যন্ত অনগ্রসর। অভাব অনটন তাদের নিত্য সঙ্গী। তাই একমাত্র সম্বল ঘানির গরুটিও তাদের বিক্রি করতে হয় এবং বাধ্য হয়ে নিজেদেকে ঘানি টানতে হয়।[২]

কলুদের তেল তৈরির জন্যে মূল উপাদান যে সরিষা ও তিল তাও চাষের জন্যে নেই প্রয়োজনমতো চাষযোগ্য জমি। সরিষাও তাদের কিনে নিতে হয় অনেক সময় চড়া মূল্যে। যৎসামান্য সরিষা তাঁরা ভাগে পান– যখন গৃহস্থঘরে সরিষা ভাঙিয়ে তেল করে নেন তখন। কলুরা খাঁটি সরিষার তেল তৈরি ছাড়াও তাঁদের ঘানিতে তৈরি করেন খৈল। আমাদের ফসলি জমির উৎকৃষ্ট সার।

একসময় ছিল চাষিরা গোবর, ছাই-এসবের পাশাপাশি কেবল খৈল ব্যবহার করতো সার হিসেবে। খৈল গরু, মহিষ এবং মাছের খাবার হিসেবেও ব্যবহারযোগ্য। কৃত্রিম যে সার মিল-কারখানায় তৈরি হচ্ছে তার চাইতে নাকি অনেক গুণে গুণান্বিত খৈল সার। কৃত্রিম উপায়ে যে সার তৈরি হচ্ছে তার রয়েছে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। কিন্তু খৈল সারের কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।

কৃত্রিম উপায় তেল তৈরিতেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ঘানির খাঁটি সরিষার তেলে নেই কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। এই শিল্পে এখনো যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা বিকাশের ফলে তৈলজীবীরা অধিকাংশ স্থানে অবলুপ্তির পথে। তবে এখনো চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চলে কলু বা তেলিদের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়।

৭. তাঁতি

চাঁপাইনবাবগঞ্জের তাঁত শিল্প অত্যন্ত সম্পৃদ্ধ। পেশাগত ভাবে তাঁতি সম্প্রদায় অত্যন্ত প্রাচীনকাল থেকেই এই শিল্পে সম্পৃক্ত থেকে জীবিকা নির্বাহ করছেন। যাঁরা শাড়ি, ধুতি,

www.pathagar.com

তাঁতি

লুঙ্গি, গামছা, মশারি প্রভৃতি হাতে চালিত তাঁত নামক যন্ত্রে তৈরি করেন তাঁদেরকে তাঁতি বলা হয়। আদিম যুগের মানুষেরা বনে জঙ্গলে বাস করতেন। গাছ-গাছালির লতা-পাতা, পশুর চামড়া, পাখির পালক দিয়ে তারা লজ্জা নিবারণ করতো। কালক্রমে কৃষিযুগের সূচনা হয়।

আর সেই সময় থেকেই মানুষ কাপড় পরতে শেখে। পোশাক মানুষকে সভ্য করে তোলে। পোশাকের এই সভ্যতা সৃষ্টিতে তাঁতিদের ভূমিকা অনন্য। খ্রিষ্টের জন্মের বহু আগে থেকেই বঙ্গদেশে বয়নশিল্পের সমৃদ্ধি ছিল।

বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকারের তাঁত রয়েছে। যেমন– জামদানি তাঁত, রেশমি তাঁত, মণিপুরী তাঁত, রেশম তাঁত প্রভৃতি। তাঁতের রকমফেরের কারণে তাঁতিদের কাজের মধ্যেও রয়েছে রকমফের।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের তাঁতিদের তৈরি রেশমের শাড়ি ও অন্যান্য কাপড় এখন সবার কাছে সমাদৃত। একটি ঘরে এক বা একাধিক তাঁত স্থাপন করে কয়েকটি বাঁশ বা কাঠের খণ্ড দিয়ে তৈরি সাধারণ তাঁতে রেশম কাপড় তৈরি হয়। রেশম তৈরিতে চরকার সাহায্যে প্রথমে সূতা কাটতে হয়। চরকার সাহায্যে সুতা কাটার পর্যায় পর্যন্ত কাজটি মূলত করে কোমল হাতের নারীরা। তাঁতের কাজ করেন পুরুষ তাঁতি।

রেশম সূতা তৈরি করার জন্য চাঁপাইনবাবগঞ্জের তাঁতিদের অধিকাংশই পলুর চাষ করেন। পলু চাষ ঋতু ভিত্তিক। কেননা তুত পাতা বর্ষা মৌসুমে জন্মে। তুত পাতা

www.pathagar.com

বিছিয়ে তার মধ্যে গুটিপোকা ছেড়ে দেওয়া হয়। মাস খানেকের মধ্যে গুটি পোকা পূর্ণাঙ্গ পলুতে পরিণত হয়। পলু গুটিপোকার লালানিঃসৃত এক প্রকার তন্তু। এক একটি গুটি পোকা নিজের চারপাশে ডিম্বাকৃতির পলু নির্মাণ করে এক সময় এর ভেতরেই আটকা পড়েই প্রাণ হারায়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের সেরি কালচার এবং ভোলাহাটে পলুর চাষ হয়। নবাবগঞ্জ সদরে বারোঘরিয়া ও লাহারপুর এবং শিবগঞ্জ উপজেলার হরিনগরে ব্যাপক ভাবে রেশম কাপড় উৎপাদিত হয়।[৩]

চাঁপাইনবাবগঞ্জের ঐতিহ্যবাহি তাঁত শিল্প আজ বিলুপ্তির পথে। আধুনিক বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রে তৈরি হচ্ছে অধিকাংশই ব্যবহারযোগ্য কাপড়-চোপড়। ইতোমধ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জের লাহারপুর ও হরিনগরের তাঁতিরা বিদ্যুৎ চালিত তাঁতে রেশম কাপড় উৎপাদন করছেন।

৮. কামার

এক সময় চাঁপাইনবাবগঞ্জে অধিকাংশই গ্রামে কামারপাড়া ছিল। বর্তমানে এর পরিমাণ অনেক কমে এসেছে। আগের মতো কামার বাড়ি হাতুড়ি পেটার শব্দ আর কানেই আসেনা। অথচ একসময় ছিল যখন গ্রামের পথে হাঁটলে কামারদের ছন্দময় টুংটাং শব্দ কানে ভাসতো।

কামাররা সাধারণত লোহা দিয়ে বিভিন্ন নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী তৈরি করে থাকেন। লোহাকে পোড়ানোর জন্য জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয় কাঠকয়লা। কামাররা প্রথমে লোহাকে আগুনে তাতান।

তারপর তাতানো লোহাকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে নক্শা অনুযায়ী বিভিন্ন জিনিসপত্র তৈরি করে থাকেন। লোহা প্রচণ্ড গরম হলে পানিতে ভিজিয়ে আবারও গরম করা হয়। তারপর আঘাত করে করে বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী তৈরি করা হয়।

চাষাবাদ ও গৃস্থালির যাবতীয় লোহা-নির্মিত যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার কামাররাই সরবরাহ করে থাকেন। লোহা-লক্কড় গলানোর জন্য একটি গর্ত করে চুল্লি তৈরি করা হয়। চুল্লিতে হাওয়া দেওয়ার জন্য নলযুক্ত চামড়ার থলি বসানো হয়।

এই যন্ত্রকে হাপর বলে। বাঁশের একটি ফ্রেমের সাথে হাপরটি বেঁধে দড়ির সাহায্যে টানা হয়। হাপর টানার কাজে একজন সহকারী থাকে সে কামারকে তপ্ত লোহা পিটাতে সাহায্য করে।

তরিতরকারি কাটার প্রয়োজনীয় হাসুয়া, বটি, মাংস কাটার জন্য দা, চাষিদের ধান কাটার জন্য কাস্তে, নিড়ানি, লাঙ্গলের ফাল, কাঠ মিস্ত্রির জন্য ছেনি, বাটাল, হাতুড়ি ইত্যাদি কাঠুরিয়ার কাঠ কাটার জন্য কুড়াল কামাররাই তৈরি করে থাকেন।

এছাড়াও গর্ত করার জন্য খুন্তি, সাবল, মাটি কাটার জন্য কোদাল, গরু-গাড়ির কাঠামোও কামাররা তৈরি করে থাকেন। ঈদুল আযহার পূর্বে কামারদের কর্মব্যস্ততা বেড়ে যায়। এখনও এই কামারদের গুরুত্ব অত্যধিক।

www.pathagar.com

কামার

৯. কম্বল কারিগর

চাঁপাইনবাবগঞ্জের একটি লোকপেশাজীবী সম্প্রদায়ের নাম কম্বল কারিগর। এই সম্প্রদায় ভেড়ার লোম দিয়ে কম্বল তৈরি করে থাকেন। এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত শিল্পীরা জাতে মুসলমান। তারা কয়েক পুরুষ ধরে এই পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন।

কম্বল কারিগররা স্থানীয়ভাবে ভেড়ার লোম সংগ্রহ করেন। সেগুলি খুব ভালো করে ধুয়ে মুছে রোদ্রে শুকিয়ে নেন। তারপর হাতে টানা চড়কায় সুতা তৈরি করেন। তাঁতের মতো সুতা টানা দিয়ে হাতের সাহায্যে মাকু এপাশ ওপাশ করে বুনন কাজ সম্পন্ন করেন।

এভাবে বোনা কম্বল ঈষৎ ভিজিয়ে পা দিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে পা দিয়ে সানা হয়। এতে কম্বল জমাট বাধে ও মসৃণ হয়। ছোট আকারের একটি কম্বল তৈরি করতে তিন চারদিন এবং বড় আকারের কম্বল তৈরি করতে সাত আটদিন সময় লাগে।[৪]

চাঁপাইনবাবগঞ্জে জেলার নয়াগোলায় সাধারণত এই শিল্পের ব্যাপক বিকাশ লক্ষ করা যায়।

www.pathagar.com

কম্বলের কারিগর

১০. ওস্তা বা হাজাম

'হাজাম'রা চাঁপাইনবাবগঞ্জের 'ওস্তা' নামে পরিচিত। ইসলামি বিধান বা রীতি অনুসারে ৫/১০ বছর বয়সী ছেলে বা কিশোরের লিঙ্গের অগ্রভাগ ঢেকে রাখা চামড়া কেটে ফেলে দেয়ার অনুষ্ঠানিকতাকে খৎনা বা মুসলমানি বা সুন্নত কাজ বলা হয়। এই চামড়া কেটে ফেলার এই কাজটি যারা সম্পাদন করেন তারাই ওস্তা। ওস্তারা ইসলাম ধর্মাবলী। এই কাজটি তারা এখনও মধ্যযুগীয় পদ্ধতিতে করে থাকেন। নির্বাচিত শিশুটিকে ধামায় বিশেষ পদ্ধতিতে বসিয়ে চোখ পান দিয়ে ঢাকা হয়। তারপর ওস্তা তাঁর অস্ত্র বাঁশের চোঁচে দিয়ে চামরা কেটে ফেলেন। অত্যন্ত দ্রম্নততার সঙ্গে তিনি এই কাজ শেষ করে কাটা অংশে গোবরের তৈরি ঘুটার ছাই লাগিয়ে দেন। এতে দ্রম্নত কাটা অংশের রক্ত বন্ধ হয় এবং ক্ষতস্থান শুকিয়ে যায়।[৫]

বর্তমানে আধুনিক পদ্ধতিতে হাসপাতাল-ক্লিনিকে খাৎনা দেয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ওস্তাদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। তারা তাদের পৈত্রিক পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় নিয়োজিত হচ্ছেন।

www.pathagar.com

১১. কাঁসারি

এরা মূলত পেতল ও কাঁসাজাত পন্যের নির্মাতা। চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরাঞ্চলে রামকৃষ্ণপুর, আজাইপুর ও মাঝপাড়া গ্রামে ৫০/৫৫ ঘর কাঁসারি রয়েছে। কিছুদিন আগেও এদের সংখ্যা বেশি ছিল। মেলামাইন ও এলুমনিয়াম পণ্যের বাজারে কাঁসার তৈরি পণ্য টিকে থাকা কঠিন।

কারণ কাঁসার দাম বেশি। এজন্য চাহিদা থাকা সত্ত্বেও শুধু দামের কারণে বর্তমানে কাঁসা পণ্য টিকে থাকতে পারছে না। তারপরও শুধুমাত্র পেশার তাগিদে তাঁরা চামচ, হাতা, খুন্তি, কুরনি, ছেচকি, বাউলি, থালা, কলসি, গ্লাস, বাটি, খুরি, ঝিনুক, বদনা, পঞ্চপ্রদীপ, কোশাকুশি, পূজার ঘন্টা, পূজার রেকাবি, পরাত, গামলা ইত্যাদি নিরলসভাবে তৈরি করে যাচ্ছে। এরা সবাই মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক।

১২. মুচি

জেলার বিভিন্ন স্থানে মুচিদের অবস্থান রয়েছে। কিন্তু এদের অবস্থা বর্তমানে ভালো নয়। কারণ গ্রামের মানুষও এখন শহুরে জুতা-স্যান্ডেল ব্যবহার করে থাকে। এরা বংশ পরম্পরায় এই পেশার সাথে সম্পৃক্ত। চাঁপাইনবাবগঞ্জে মুচিকে 'চামার' নামে ডাকা হয় বলে জেলার বিভিন্ন স্থানে চামার পাড়া রয়েছে। এরা চর্মজাত বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্র ঢোল, খোল, তবলা ইত্যাদি প্রস্তুত করে থাকে। গরু হাঁকানো 'সাঁঠা' নামক চাবুক এদেরই তৈরি। বর্তমানে কদাচিৎ এরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র বাজায়।

এদের মেয়েরা কেউ কেউ প্রসূতির রক্ত ও ফুল পরিষ্কার করে এবং শিশুর নাড়ি কেটে নগদ পয়সা উপার্জন করে থাকে। জুতা-স্যান্ডেল তৈরির কাজ কম বলে এরা মূলত ছেঁড়া জুতা মেরামত ও জুতা কালির কাজ করে থাকে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ উপজেলার বারঘোরিয়া গ্রামের চামার পাড়াটি জেলার সবচেয়ে বড় চামার বস্তি হিসাবে পরিচিত।

১৩. ময়রা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ময়রার অস্তিত্ব রয়েছে। এরা বিভিন্ন ধরনের মিষ্টান্ন খাদ্য তৈরি করে থাকে। শিবগঞ্জ উপজেলার আদি চমচম ও আদি গোল্লা অনেক দিন থেকে বেশ সুখ্যাতি নিয়ে টিকে আছে। এই শিল্পটি শিবগঞ্জ শহরাঞ্চলের দু-তিনটি পরিবার বেশ যত্নের সঙ্গে টিকিয়ে রেখেছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ উপজেলার কাহার পাড়ায় ময়রা পল্লিটি বিচিত্র ময়রা পন্যের জন্য বেশ বিখ্যাত। এদের তৈরি খাজা দেশ বিখ্যাত।

তাছাড়া এরা পাঁক, কটকটি, আদরকি, মিচ্চানি, ঝুরি ইত্যাদিও তৈরি করে থাকে। তাছাড়া গোবরাতলা গ্রামের বেশ ক'টি ময়রা পরিবারের গোল্লা ও ছানার জিলাপি তৈরিতে খ্যাতিমান। ময়রা কর্মে সংযুক্ত পরিবার গুলো অধিকাংশ হিন্দু হলেও বর্তমানে মুসলমানরাও এ কর্মের সাথে জড়িত হয়েছে।

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

১. মোহিত কুমার দাঁ, পিতা- ভূদেব দাঁ, মাতা- শৈল বালা দাঁ, গ্রাম- ইসলামপুর, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৭৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২১/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা

২. মো. মোসফিকুর রহমান, পিতা- মরহুম রেজাউর রহমান, মাতা- মরহুম ফাতেমা বেগম, গ্রাম- পাঠানপাড়া, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৫৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতকোত্তর, সংগ্রহের তারিখ- ২২/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা

৩. মো. শামশুদ্দিন, পিতা- মরহুম লোকমান বিশ্বাস, মাতা- মরহুম হাসিনা বেগম, গ্রাম- মহারাজপুর, পোস্ট- মহারাজপুর, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৭ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতকোত্তর, সংগ্রহের তারিখ- ২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

৪. মেহবুব রাজা, পিতা- মহবুব ইলিয়াস, মাতা- সুরাইয়া বেগম, গ্রাম- নতুন ইসলামপুর, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৬৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- উচ্চ মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:৪০ টা

৫. মো. সালাহউদ্দিন, পিতা- আবদুর রহিম মণ্ডল, গ্রাম- আলীসাহাসপুর, পোস্ট- গোহালবাড়ি, উপজেলা- ভোলাহাট, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৫০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ১৫/০৫/২০১০ খ্রি., সময় সকাল ১০:০০ টা

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র

ক. লোকচিকিৎসা

বাংলাদেশে অতীতে সাধারণ শিক্ষা ছিল না, ধর্ম শিক্ষা ছিল তাও একটি শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। শতাব্দী ধরে গ্রামের সাধারণ মানুষ শিক্ষা-দীক্ষা হীন জীবন যাপন করেছে। উপর্যুক্ত দারিদ্র্য-পীড়িত মানুষ আরো অসহায় ছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পদের মালিক ছিল সামন্তপতি, বৃটিশ আমলেও জমিদাররা আধা-সামন্তপতির আচরণ করেছে। মূলত কৃষকরা ভূমিদাস ছিল। ফলে সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যদশা কোনদিন ঘুচে নি। বিত্তহীন কপর্দকশূন্য অশিক্ষিত মানুষ খুব সহজে দৈব ভৌতিক অলৌকিক, জাদু, তেলেসমাতি, আচার, কুসংস্কার, অদৃষ্টবাদ ইত্যাদি দ্বারা পরিচালিত হয়ে বাঁচার সংগ্রাম করেছে। বাংলাদেশের লোকচিকিৎসার এটাই তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট।

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো চাঁপাইনবাবগঞ্জের গ্রামীণ সাধারণ মানুষ বিভিন্ন রোগ, জ্বরা, ব্যাধি থেকে সুস্থভাবে বাঁচার জন্য নানাপ্রকার গাছ-গাছালির রস, শিকড় প্রভৃতিসহ ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্য নিয়েছে। গাছ-গাছড়া ও তুকতাক ছাড়াও নানা রকম জাদু ঔষধের ব্যবহার ও নাচ-গানের ব্যবস্থা লোকচিকিৎসার অন্যতম উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

মাথাব্যথার লোকচিকিৎসা : মাথাব্যথায় ভোগেনি এমন মানুষের সংখ্যা সমাজে বিরল। স্নায়ুবিক বিভ্রাট পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল আবহাওয়া এবং মেধার অধিক পরিশ্রমজাত অবস্থার সাময়িক বহিঃপ্রকাশের ফল মাথাব্যথা।

কপালে প্রচণ্ড ব্যথা হলে চিকিৎসক প্রথমে বিষকপালী নামক একটি গাছের শিকড় উঠায়। এক নিঃশ্বাসে তিনবার নিম্নোক্ত মন্ত্র পড়ে শিকড় উঠিয়ে কপালে চেপে ধরে এদিক থেকে ওদিক তিনবার টানে। মন্ত্র :

মাথা মাথা মুর মাথা
এই মাথার বিষ,
কে ঝাড়ে? গুরু ঝাড়ে
গুরু গিয়া মাই ঝাড়ে।

তারপর শিকড়টি নদীতে বা পুকুরে ফেলে দিতে হয়। কপালের ব্যথা তা যে ধরনের ব্যথা হোক না কেন অধিক দিন স্থায়ী হয় না।[১]

পেটব্যথার লোকচিকিৎসা : অম্ল-পিত্ত দোষ, আমাশা, পাকস্থলিতে পাথর, ফোড়া, ক্যান্সার, অখাদ্য-কুখাদ্য ভোজনের ফলে পেট ব্যথা অনুভূত হয়ে থাকে। সাধারণত খাদ্যের সাময়িক বিভ্রাটজনিত কারণে সৃষ্ট পেটব্যথা নিরাময়যোগ্য। কিন্তু ক্যান্সারের

www.pathagar.com

মতো মরণব্যাধির কাছে সকলেই অসহায়। তবুও লোকচিকিৎসকরা এসব ব্যাধিরও চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। পেট ব্যথায় তারা নিম্নোক্ত মন্ত্রটি একদমে তিনবার পড়ে তেলে ফুঁ দেন। সেই তেল পেটে মালিশ করলে পেট ব্যথা নিরাময় হয়।

বাহুকা চিড়ে শিকিয়ে ভাঙ্গে
হর হর বিষ নির্ঝর ঝর
গোরলের হুংকার
ফেন্নার শরীলের বিষ
আল গেছে পর।[২]

আমাশার লোকচিকিৎসা : আমাশা নিরাময়ে লোকচিকিৎসকরা এক নিশ্বাসে তিনবার মন্ত্র পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে সেই পানি রোগীকে পান করতে দেন। সেই পানি পান করে রোগী আমাশা রোগ থেকে সুস্থ হয়ে ওঠে।

আম পরে আম খায়।
কাঁদিস নারে আমাশয়
হিরা দিলাম বাসি জল
আইজ প্যাটে হবে মল,
রক্ত মুখী রক্ত খা
মাইর‍্যা গেছে নাড়ীর ঘার।
সাইর‍্যা যা দক্ষিণে
পইর‍্যা মর সাগরে।[৩]

জ্বরের লোকচিকিৎসা: জ্বর কোন রোগ নয় রোগের উপসর্গ মাত্র। সাধারণত ম্যালেরিয়া, টায়ফয়েড, রাত, ভাইরাস প্রভাব এবং দেহের অভ্যন্তর ভাগে ক্ষত সৃষ্টি হলেই জ্বর দেখা দেয়। লোকচিকিৎসার জ্বর বিশেষ শ্রেণির একটি রোগ। এ রোগ নিরাময়ের জন্য ওষুধ-পথ্য ছাড়া ঝাড়-ফুঁক, তুক-তাকের সঙ্গে তেলপড়া, পানি-পড়া এবং বিচিকলা ব্যবহৃত হয়। ওঝারা সাধারণত পানি পড়ে রোগীকে তা পান করতে দেয়। পানিতে ফুঁ দেয়ার পূর্বে তারা এই মন্ত্র পড়ে :

জ্বর জ্বর দিন জ্বর
হাকুম করে বিষম জ্বর
ই-জ্বর কে ঝাড়ে
গুরু ঝাড়ে
গুরু গিয়া মায় ঝাড়ে
কামরূপ দেবীর দোহাই লাগে।[৪]

শিশুরোগ নিরাময়ে লোকচিকিৎসা : শিশুর রোগ নির্ণয় অনেকটাই জটিল। কারণ শিশুরা তাদের অসুস্থতার কথা ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে কান্নাই তাদের ভাবপ্রকাশের প্রধান বাহন। পেট ব্যথা, জ্বর, অজীর্ণ ইত্যাদি কারণে শিশুর কান্না বৃদ্ধি পেতে পারে। লোকচিকিৎসকরা এ ক্ষেত্রে পানি পড়া, তেল পড়া, নুনপড়া দিয়ে রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করে। শিশুকে জ্বর নিরাময়ের জন্য ওঝা বা কবিরাজ নিচের মন্ত্রটি তিনবার পড়ে ফুঁ দেয়। এতে শিশুর জ্বর ছেড়ে যায় বলে তাদের বিশ্বাস। মন্ত্র :

www.pathagar.com

কান্দিনী মুন্দিনী দুই বহিনী
নদীর জলত ঘর,
এই নাবালকের দেহ ছাড়িয়া
বৈকুণ্ঠের পথ ধর।[৫]

সাপেকাটা রোগী নিরাময়ের লোকচিকিৎসা : আমাদের দেশে সাপে কাটা রোগী চিকিৎসায় একসময় লোকচিকিৎসকদের ওপরই নির্ভর করা হতো। এখনও লোকসমাজ সাপে কামড়ানো রোগীর চিকিৎসায় ওঝা-কবিরাজে যতো বিশ্বাস, আধুনিক চিকিৎসার প্রতি ততোটা বিশ্বাসী না।

সর্পদংশনে অসুস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এলোপ্যাথি চিকিৎসকের দ্বারস্থ না হয়ে ওঝা-কবিরাজের শরণাপন্ন হয়। ওঝা কবিরাজরা তাদের সীমিত জ্ঞানের ঝুড়ি নিয়ে ঝাড়-ফুঁক, তন্ত্র-মন্ত্র দিয়ে রোগীকে সুস্থ করার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। তারা যেসব তন্ত্রমন্ত্র এক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সেগুলোর মধ্যে ডুরা বন্ধন, চাপট সাধন, হাত চালান, থালা লাগানো, চুনপড়া, মুরলি ঝাড়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

খ. তন্ত্র-মন্ত্র

মন্ত্র হচ্ছে ছন্দোবদ্ধ ও চরণাশ্রয়ী কতকগুলো শব্দের সমষ্টি। এতে মন্ত্রচারীর বিশেষ ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়। মন্ত্র হলো A wish which must without fail be fulfiled. মন্ত্র অব্যর্থ ফল প্রত্যাশা করে, এজন্য এতে আবেদন নিবেদন অপেক্ষা দাবির সুর বেশি। মন্ত্রের মধ্যে যাদুগুণ আছে (Magic Power) যাদু প্রাচীনতম ধর্ম; Animism বা সর্বপ্রাণবাদের পরবর্তী স্তর যাদু বা ইন্দ্রজাল। জীব-জড় সকল বস্তুতে প্রাণ বা আত্মা আছে– তাই সর্বপ্রাণবাদের মূল কথা। শুভ-অশুভ, ইষ্ট-অরি সকল শক্তির অধিকারী হওয়া অথবা তাকে বশে আনার ও নিয়ন্ত্রণ করার চেতনা থেকে ইন্দ্রজালের উদ্ভব।

মন্ত্র হলো জাদু বা ইন্দ্রজালের বাঙ্ময় রূপ। মন্ত্রের মধ্যে যাদু শক্তি আছে। মাদুলি, তাবিজ, কবচ ইত্যাদি মন্ত্রপূত করলে জাদুগুণ সম্পন্ন হয়। আমাদের দেশে গুণী, ওঝা, বৈদ্য, কবিরাজ, পুরোহিত, সাধু-সন্ন্যাসী, পীর-ফকির, বেদে-বেদনি, ধাত্রী প্রভৃতি পেশাদার ও অপেশাদার ব্যক্তি, মন্ত্র জানেন এবং মন্ত্রের প্রয়োগ করেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জের ব্যক্তি, গার্হস্থ্য ও সমাজজীবনের নানা ক্ষেত্রে জাদুমন্ত্রের ব্যবহার আছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার লোকসমাজে বিভিন্ন অসুখ-বিসুখ বা বিপদ আপদে এখানকার মানুষ তন্ত্র-মন্ত্রধারী মানুষের স্মরণাপন্ন হয়। ওঝাদের জাদু টোনা বা জাদু মন্ত্র সাধারণত বিভিন্ন কারণে ব্যবহৃত হয়– মানুষ বা পশুর শারীরিক রোগ, সাপেকাটা, ভয় পাওয়া, শিশু কান্না, মন ভোলানো বা প্রেমোত্তেজনা, বান মারা, বাড়ি বন্ধ ইত্যাদি। এই মন্ত্রগুলো গুপ্ত সাধনা ও গুপ্ত ধনের মতো ওঝাগণ নিজের স্মৃতিতে আগলে রাখে। যত্রতত্র প্রাকাশ করলে এগুলোর গুরুত্ব ও কার্যকারী ক্ষমতা নষ্ট হয় বলে আনেক ওঝাই বিশ্বাস করে। কেবল মনের মতো শিষ্য কিংবা সন্তানকে শেষ বয়সে ওঝাগন এসব শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়ে যায়। কোন কোন মন্ত্র অবশ্য প্রায় সকল মানুষের জানা বাক্য।

www.pathagar.com

মাছ শিকারের মন্ত্র : চাঁপাইনবাবগঞ্জে সৌখিন কিংবা পেশাদার মৎস শিকারি যারা সচারচর ছিপ-বড়শি অথবা খেউ জাল দিয়ে মাছ ধরে থাকে তারা প্রায় সকলে নিরবে বা সজোরে একটি লোকছড়া আবৃত্তি করে। এই ছড়াটি মাছ ধরা মন্ত্র হিসাবে পরিচিত। এই মন্ত্রাটির কোন গোপনীয়তা নেই। মন্ত্রাটি হলো :

থুথুড়ি মাছের ভুড়ভুড়ি
যেখানে মাছের ঘর
সেখানে হাঁর বনসি পড়।[৬]

গরুর অসুখের মন্ত্র : মানুষের অসুখ তো বটেই গরুর অসুখ হলেও মানুষ ওঝার স্মরণাপন্ন হয়। গরুকে নিম্নের মন্ত্রগুলো তিনবার পড়ে নিম পাতা দিয়ে ঝাড়লে নানাবিধ অসুখ সেরে যায় বলে ওঝাদের বিশ্বাস রয়েছে।

১
মহাদেব তুমি জানাও তো আমি জানি
হাতে কইরা যে কোন গোবাধনে ব্যাধি খাও
জলদি কইরা।[৭]

২
সোনার মাদলা বাজেত উনুর ঝুনুর রে
যে খেলা খেলিতে কালি, ডাকিনি
সে খেলা খেলিবারে
সোনার মাদলা বাজে উনুর ঝুনুররে।[৮]
ডালা ভররে ডালা ভর
কাঁচা বাঁশের ডালা ভর
শীল কমলার দু'টি ফুল
আগে যদি জানতাম আসবে
আমার কালি-ডাকিনি
মাঙ্গাইতাম গো কামিনী সেন্দুর
মাকে আনতে যাবোরে ক্ষীরায় নদীর কূল
হাতে দিবো লাল গামছা, গলায় দিবো ফুল
দেবীমাতা আয় গে মা, আমার আসরে
ধুলায় পড়ে কাঁদছি মাগো হইয়া কাতরে।
একটি ফুলের জন্য এতোই অপমান
দুয়ারেতে লাগিয়ে দিবো ফুলেরি বাগান
দেবী আয় মা আয় মা আমার আসরে। [৯]

সাপে কাটার মন্ত্র : সাপে কাটলে রোগী সুস্থ করা বা সাপের বিষ নামানোর জন্য ওঝাগণ মন্ত্রপাঠ করে থাকে। কিন্তু এর জন্য তারা কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করে না (কদাচিৎ ক্ষেত্রে অর্থ গৃহীত হয়)। তাদের মতে, সাপে কাটলে রোগী খুব কষ্ট পায় এবং তার মৃত্যু অনিবার্য, তাই তারা স্থির থাকতে পারে না। তাৎক্ষণিক রোগীর নাম ধরে

www.pathagar.com

নিজ বাড়িতে বসেই মন্ত্র পাঠ করে। আবার রোগীর বাড়িতে গিয়ে নিম পাতা, চুন পড়া, ধুলা পড়া দিয়ে সাপের বিষ নামাতে চেষ্টা করে।

সাপের বিষ মানুষের শরীরে আছে কিনা, এজন্য ওঝাগণ প্রথমে মন্ত্রপূতভাবে হাত চালিয়ে পরীক্ষা করে নেয়।

হাতচালা মন্ত্র :

১.
হাত চালাং দেবা চালং
যাহা শাফিনের বিষ
তাহে আমার হাত চল
আমি এই শাফিনের বিষকে উদ্ধার করব।[১০]

২.
অন্য একটি হাতচালা মন্ত্র–
গড়ুর গড়ুর শোগুন গড়ুল আনিকা শানিকা
এই হাতকে উঠাই গুরু আজ্ঞা
আমি উঠাই উঠ হাত শিগগির উঠ
যেখানে কালকুট সাপের বিষ সেখানে উঠ
কার দোহায় মা মনসার দোহায়।[১১]

এই মন্ত্রটি পাঠ করার সাথে সাথে ওঝার হাত চলতে থাকে এবং বিষ রোগীর শরীরের কত দূর পর্যন্ত উঠেছে, সে পর্যন্ত হাত উঠে থেমে যায়। তখন ওঝা সেখানে ধুলো অথবা চুনের বেড়া দিয়ে দাগের মাধ্যমে বন্ধনি দেয়। তারপর সেখান থেকে বিষ নামানোর প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এ সময় রোগীকে কোন কিছু খেতে দেওয়া হয় না।

বিষ নামাতে গিয়ে তারা প্রয়োজন বোধে এক বা একাধিক মন্ত্র পাঠ করে থাকে। সেই সাথে নিম পাতা দিয়ে (কেউ কেউ অন্য পাতাও ব্যবহার করে থাকে) রোগীর গায়ে আলতো স্পর্শ দিয়ে থাকে।

নিম্নে ক'টি 'বিষ নামা মন্ত্র' এর উল্লেখ করা হলো–

১
ছুঁচা চলে ছায়ে মায়ে
বিষ নামছে পায়ে পায়ে
ষোলশ ছুঁচার বিষ
নামছে পায়ে পায়ে
বিষ নাম মুখে ঘাম।[১২]

২
ধন বন্ধি ধন কুমার
উপরে বন্ধি শিশ
নিচে বিষ উপরে ধন্নি
এই ধন্নি লড়ে যাস

www.pathagar.com

শিব দুর্গার রক্ত খাস
এই ধন্নি হেলিস ফেলিস
আকাশের চাঁদ সূর্য খসে পড়িস
দোহায় মা বিষ হরির দোহায়॥ [১৩]

৩
নিচে দুল উপরে আসমান
নামিস বিষ খোদার কালেমা
এক তাল দুই তাল
নামিস বিষ খোদার কালেমা। [১৪]

৪
আষাঢ় মাসের ফুল প্রথমি ঘন বর্ষে নাম নাম বিষ[১৪]
কতই পাড়িস নিন্দ নিন্দ ভাঙ্গনু গে মা ভাঙ্গনু মস্তকের
উপর ভর তোমার লাগে পূজা হচ্ছে চট করিয়ে চল
ঢোল বাজে ঢোল বাজে মিরদং বাজে কড়হা সাজিয়ে
চলিলেন দেবি অষ্ট নাগের পাড়া অষ্ট নাগের
পাড়া দেবী সাজিয়ে চলিলেন শিশু লা বড়া মায়ে
মাথারই সিন্দুর কাজলিয়া চড়া মায়েরি চোখের কাজল
ঘর মলি বড়া মায়ের দেখিতে সিদুর কি কি বড়া
ইলুয়া বড়া, তিলুয়া বড়া, চকরা মকরা বড়া দেখিতে
সুন্দর হাড় খসে মাংস খসে শিব শঙ্কর হর হর
বিষ হর রুগির গা থেকে সর
দোহায় মা বিষ হরির দোহায়॥[১৫]

৫
কেশ মধ্যে থাকে বিষ করে টলমল
মস্তক হইতে বিষ না করিবে দেরী
কপালেরি লেখা মাগো কি করিবে হরি
পতি পতি করে কাঁদে বেহুলা সুন্দরী
ও বিষ নামিলোরে গড়ুর অহংকারে কি পাতালে॥[১৬]

৬
ঝাড়া বিষ ঝাড় নিজ ঝরে ঝরে গোড়ুল
হুংকারে বিশ হেড় মুখে ছাড় হেড় ছেড়ে বিষ
উজান ধাই দোহাই লাগে গড়ুল পার্বতীর মাথা খাই।[১৭]

৭
এক মুঠা সরিষা এক মুঠা রায়
ওরে ওরে সরিষা আকাশে উড়ায়
আকাশে ফেলিয়া তবে পাতালে পড়িল
তেত্রিশ কোটি দেবতা সবাই কাঁপিল

www.pathagar.com

ডাহিন যুগিল মড়া শ্মশান কালি রূপালিনী
তেলেতে পড়িয়া বেটি কাঁদিছে আপনি
ঝড় বেটি ঝড় বেটি পক্ষগুরের দোহায় লাগে
পাতাল স্মরণ কর
দোহায় কাউরে কামাক্ষৎ মা হাড়িজির আজ্ঞায়।[১৮]
৮
একখানি পুস্কুনি চারখানি ঘাট্
তাহাতে জন্মিল পদ্মপাত
পদ্মের পাতে জন্মিল পদ্মকুমারী
মাতা-পিতা নাম রাখিল বিশ্বহরি
কান্দে গঙ্গা কান্দে দুর্গা
কান্দে ঝিরি ঝিরি রায়
অমুকের অঙ্গে বিষ নাই নাই
দোহাই মা মনসার[১৯]
৯
কালো কালো বিষ রে
কালো মাথার কেশ রে
উজানে ছাড়িয়া বিষ
ভা'ঠ্যালে (ভাটি) নামিবি গে
দোহায় গোড়লের বিষ
কালো কালো বিষ রে
ভা'ঠ্যালে নামিবি গে
কালো কালীর গাও রে
উজানে ছাড়িয়া বিষ
ভা'ঠ্যালে নামিবি গে।[২০]
১০
পদ্মাবতী হ'তে মা গো সুরমা লদ্দীর কূলে
কোন সাপে ডংশিল হামার বালা লক্ষীন্দরে
দশলাবড়া নাগ তুই রে দয়া নাই তো ধড়ে (দেহে)
কোন সাপে ডংশিল হামার বেহুলা আঁড়ি হ'বে রে
সাপা না'ম্যা আ'সো আ'জক্যার এ পৈখোরে।
ও তুই চৈল্যা আয় চৈল্যা আয় গে সাপা ডাকিনির মা
ও তোর কেশ ভরি ভরি জলে গে সাপা মা
সেও সামসুধন (শুদ্ধ) করিনু গে সাপা ডাকিনির মা
ও তোর কপাল ভরি ভরি জলে গে দেবী মা
সেও সামসুধন করিনু গে সাপা ডাকিনির মা
তোর চোখ ভরি ভরি জলে গে দেবী মা

www.pathagar.com

সেও সামসুধন করিনু গে সাপা ডাকিনির মা।[২১]

(এভাবে নাখ, মুখ, গলা, বুক ছাতি, ভাণ্ডার, মাজা, জাঙ, হেঁটু, পা, আঙুল, কুনি, পাতাল ইত্যাদি প্রসঙ্গ আসবে।)

ওঝাগণ কখনো নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির ও অন্য ওঝাকে হেয় করার জন্য বিষ নামার পথ বন্ধ করে দেয়। অন্য ওঝা বিষের হদিস পেলেও তা আর নামাতে পারে না। তখন সেই ওঝা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করে বিষ নামাই।

বিষ বন্ধ করা মন্ত্র–

মেহান ধপম কাপড় খাচম কেওড়া তলার ঘাটে
তুমি হও গুরু আমি হইলাম শিষ্য
অঞ্চলে বান্ধিয়া রাখি অমুকের অঙ্গের বিষ থাক
তুই থাক সাত দিন সাত রাত্র থাক
আমি এলে ছাড়িস কিনবা আমার–
আমার ওস্তাদ এলে ছাড়িস আন্ন আন্ন ওস্তাদ
এলে শুনেতে উড়িশ আমার মন্ত্র লড়ে যায়
দোহাই লাগে গড়ুর পার্বতীর মাথা খাস
কার দোহাই মা মনসার দোহাই।[২২]

বাড়ি বন্ধ করা: কোন কোন পরিবারে অসুখ বিসুখ আপদ বিপদ লেগেই থাকে। সে ক্ষেত্রে মনে করা হয়, বাড়িটিতে দুষ্টের প্রভাব আছে। তখন ডাক্তার-কবিরাজ কোন কাজ করেনা বলে বিশ্বাস। সে ক্ষত্রে বাড়ির দোষ কাটিয়ে নেয়ার জন্য ওঝাদের স্মরণপন্ন হয়। শুধু তাই নয়, শনির দশা যাতে বাড়িতে আর ভর না করে সে জন্য ওঝাগণ মন্ত্রপুত ভাবে বাড়ি বন্ধ করে দেয়।

বাড়ি বন্ধ করা মন্ত্র :

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিনে মিলে দিলো বর
তিনের আজ্ঞা উমুকের অঙ্গে পুড়া যায়া হলো জলজমা
হযরত মহাম্মদ আলি এমাম হুছেন
হাতের তিন তিন আলি করিনু আলি স্বর্গে ছিল
ভগবতি মর্তে ছিলো পায়া কাল রূপে
জমিনে আছে কালিমা ফান্নার
বাড়ি দোষ দুষি আটক করিস
এমনু হেলা ফেলাইস ঈশ্বর মহাদেবের
পূজা বাঁকোড়ে ঠেলিস।[২৩]

মা ও শিশু রোগ : মা ও নবজাতক সন্তানের হাওয়া-বাতাস (জিন-ভূত) এর দোষ হয় ফলে শিশু মুখে মাই নিতে চায়না, শুধু ঘ্যানর ঘ্যানর করে কাঁদে। নিম্নের সাঁওতালী মন্ত্রটি এক নিশ্বাসে বেজোড় সংখ্যক বার পাঠ করে মা ও শিশুর গায়ে ফুঁ দিলে অসুখ সেরে যায় বলে ওঝার বিশ্বাস।

হাট যেতে হাট বান্ধন

www.pathagar.com

হাটের দুধে বাট বান্ধন
কে বান্ধে গুরু বান্ধে
গুরু জ্ঞানে মাই বান্ধে
তার জ্ঞান কামরুপের দোহায় লাগে।[২৪]
অনেক সময় বাচ্চ দুধ খেতে চায় না। সেক্ষেত্রে অন্য একটি মন্ত্র হলো–
কেন্দনা কেন্দনা ঝি
পন্থে ব'স্যা করো কি
ছেলের মুখে দিয়্যা মাই
কান্দন কাটন কিছু নাই–
(এটুকু বলার পর অবশ্য কালেমা পাঠ করা হয়।)।[২৫]

ভয় পাওয়া : অনেক সময় বিভিন্ন কারণে মানুষ ভয় পায়। একা বাড়িতে, অচেনা পথে, জঙ্গলে বা নদীতে মানুষ গা ছম ছম করা ভয় পায়। সেক্ষেত্রে ঝাড় ফুঁক দিয়ে ভয় পাওয়া রোগ দূর করার প্রচলন রয়েছে।

রাতে রাস্তা চলতে চমকে ভয় পেয়ে গেলে নিম্নের মন্ত্রটি পাঠ করলে রোগী সুস্থ হয় বলে বিশ্বাস রয়েছে।

১
জ্বর জ্বর
দিন জ্বর
রাত জ্বর
বাত জ্বর
সরপ জ্বর
গরম জ্বর
বিষম জ্বর
কে বান্ধে
গুরু বান্ধে
গুরু গিয়া মায় বান্ধে
তার জ্ঞান কামরূপের দোহায় লাগে।[২৬]
২
বাবু বলে লরশিং করহে গমন
আগে যায় লরশিং, পাছে যায় কালী
চল্ চল্ কালী আকাশ পাতাল
যে চালনে চালি আমি বাওয়ান্ন বাহিনি
সে চালনে যদি না যাস, তেত্রিশকোটি দেবতার পূজা
বাঁ পায়ে ঠেলিস
দোহায় নাড়া নরসিংহের দোহায়॥[২৭]
শিশু-কিশোর ভয় পেলে নিম্নোক্ত মন্ত্রটি পাঠ করা হয় :

www.pathagar.com

ধুলা লাড়ি ধুলা চাড়ি
ধুলা করলাম গোটা
ফান্নার শরীরের রক্তমাংস চুষে
আমার শরীর হয়ে যাক মোটা
লাগ ভেলকি, লাগ দূর্গার হুংকারে লাগ
নয় লাখ বত্রিশ হাজার পাইকাম্বার এর রক্তমাংস চুষে
আমার শরীর মোটা কর
দোহায় রাব্বিল আলামিন।[২৮]

মহিলাদের থনকো নামা : অনেক সময় মহিলাদের থনকো নামা (স্তনের অসুখ) রোগ হয়। সেক্ষেত্রে তারা ওঝার আশ্রায় নিয়ে থাকে। ওঝারা মন্ত্র পড়ে সে অসুখ ভালো করে বলে লোক বিশ্বাস।

স্তনের থনকো সারানো পানি পড়া মন্ত্র :
করাত করাত মহা করাত, আসতে কাটি যেতে কাটি
ভূত কাটি, পেরত কাটি, মড়া কাটি, মাসান কাটি
কে কাটে
গুরু কাটে
গুরুর আজ্ঞায় আমি কাটি
এই জল পড়া যদি না মানিস
দোহায় লাগে কামাক্ষা গুরুর মাথা খাস ॥[২৯]

ভূত তাড়ানো মন্ত্র : চাঁপাইনবাবগঞ্জের ওঝাগণ বিভিন্ন ভাষা, সুর ও ভাবের সংগীত দিয়ে ভূতে পাওয়া রোগীর দেহ-মন থেকে ভূত তাড়ানোর চেষ্টা করে থাকে। স্থানীয় ভাষায় এই লোকসংগীত গুলোকে ড্যাহারা,গাওনা,জাঁওলি ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। এই লোকসংগীতগুলো ভূত ভাগানো মন্ত্র। এসব মন্ত্রপূত সংগীতে রোগী কখনো কখনো বিমোহিত (হিপনোটাইজড) হয়ে যায়। তখন তারা নিজস্ব খেয়ালে নানা রকম অঙ্গভঙ্গিতে নাচে এবং মনের দুঃখ-কষ্টের কথা বলে। যাহোক এই লোকসংগীতগুলো সর্বোপরি মন্ত্রের কাজ করে বলে বিশ্বাস রয়েছে। মন্ত্রগুলোর নিম্নরূপ :

১
বাউল বাহে ইরানি ধীরানি
তোমার নাম জানি আমি জমসেদ ডাকিনি
আসবে আমার সাবাসো ডাকিনি (২)
কাওশো ডাকিনি।
ফুলে আয় ফুলে যায়
গ্যান্দার ফুলে আসবে আমার
সন্ধ্যামনি ডাকিনি
ফুলে আয় ফুলে যায়
কাওশো ডাকিনী

www.pathagar.com

হাঁটিতে ভাঙ্গিল ফুলের নূপুর
গাহিতে ভাঙ্গিল গলা
মানাতে শুনাতে গগনে উঠিল বেলা
হাঁটিতে ভাঙ্গিল পায়ের নূপুর
গাহিতে ভাঙ্গিল গলা
মানাতে শুনাতে গগনে উঠিল বেলা।[৩০]

২
রাবণ শুনরে–
লঙ্কা বেহিলে হনুমান
মাথার উপর কাঠের আনার
তাতে ধনুক বান্ধ
রাবণ শুনরে–[৩১]

৩
এই বিলেতে চরে পাখি
ঐ বিলেতে যায়
উড়ে যা'বার কালে পাখি
ফাঁন্দ লাগাল পায়
যেমন তেমন ফাঁন্দ নয় রে
লোহার চাহিতে দঢ়
কোথায় আছিস আঁতুড়্যা ডাক্‌নি
টা'ন্যা করব জড়ো
এই বিলেতে চরে পাখি
ঐ বিলেতে যায়
উড়ে যাবার কালে পাখি
ফাঁন্দ লাগাল পায়
যেমন তেমন ফাঁন্দ নয় রে
পিতলের চাহিতে দঢ়
কোথায় আছিস শ্মশা'ন্যা ডাক্‌নি
আসরে করব জড়ো।[৩২]

৪
ও কি রে বাঁশবা'ড়্যার থানে বন্দি মা
আগে মা তোর বন্দী দু'খান চরণে, মোর দেবী গে
আয় মা ডাকিনি গে
তোর রসুলের দোহায় গে
আয় মা ডাকিনি গে
তোর আল্লাহজির দোহায় গে
আয় মা ডাকিনি গে।[৩৩]

www.pathagar.com

৫
দয়া করো সোনার মুর্শিদ হে, ময়া করো সোনার মুর্সিদ হে
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে ময়া
দয়া করো সোনার মুর্শিদ হে
এতই ক্যানে জুলুম করো কিসের লাগিয়া হে
দয়া কর সোনার মুর্শিদ হে
এ কোন্ বা জিনের ছা'ল্যা যাদু, দ্যাওন্যা পরিচয় হে
দয়া করো সোনার মুর্শিদ হে
কিবা লিব্যা কিবা খা'ব্যা জবান খু'ল্যা বল গো
দয়া করো সোনার মুর্শিদ হে
চিনি চম্পার ক্যালা দিব, দিব গাভীর দুধ গে
দয়া করো সোনার মুর্শিদ হে।[৩৪]
৬
সোনার শঙ্খিনী গড়ল্ সন্তিনি
জিন্দা বিষ পাতালে নামাব
সোনার শঙ্খিনী গড়ল্ সন্তিনি
জিন্দা বিষ পাতালে নামাব
ওরে কেশের মধ্যে ছিলি বিষ মা
মস্তকে নামিলি গে
সোনার সঙ্খিনী গড়ল্ সন্তিনি
জিন্দা বিষ পাতালে নামাব
মস্তকে না ছিলি গে বিষ মা
কপালে নামিলি গে
সোনার শঙ্খিনী গড়ল্ সন্তিনি
জিন্দা বিষ পাতালে নামাব
কপালে না ছিলি রে বিষ মা
জিন্দা বিষ পাতালে নামাব
সোনার শঙ্খিনী গড়ল্ সন্তিনি
জিন্দা বিষ পাতালে নামাব।[৩৫]
৭
কালো কালো বিষ রে
কালো মাথার কেশ রে
উজানে ছাড়িয়া বিষ
ভা'ঠ্যালে (ভাটি) নামিবি গে
দোহায় গোড়লের বিষ
কালো কালো বিষ রে
ভা'ঠ্যালে নামিবি গে

www.pathagar.com

কালো কালীর গাও রে
উজানে ছাড়িয়া বিষ
ভা'ঠ্যালে নামিবি গে।[৩৬]

মন্ত্র অজ্ঞ ও অসহায় মানুষের বাঁচার উপায় মাত্র। বিজ্ঞানের সূত্র ধরে তা রচিত হয়নি, বরং তা বিজ্ঞানের পরিপন্থি। মন্ত্রগুণে বিশ্বাস, দৈব নির্ভর ও অদৃষ্টবাদে ভরসা বাড়িয়েছে, প্রকৃত মুক্তি দেয়নি কোন কোন মন্ত্রচারে রোগী সেবাজনিত উপকার পায়, এতে কিছুটা মনস্তাত্ত্বিক উপকারও আছে। অন্যথায় মন্ত্র সম্পর্কিত আর যা কিছু সবই 'ব্যর্থ পরিহাসে' পরিণত হয়।

তথ্যনির্দেশ

১. মো. সালাহউদ্দিন, পিতা-আবদুর রহিম মণ্ডল, গ্রাম-আলীসাহাসপুর, পোস্ট-গোহালবাড়ি, উপজেলা-ভোলাহাট, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৫০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ-১৫/০৫/২০১০ খ্রি., সময় সকাল ১০:০০ টা
২. তরিকুল ইসলাম, পিতা-হুমায়ুন কবির, মাতা-রাজিয়া বেগম, গ্রাম-সাগরইল, পোস্ট-আক্কেলপুর, উপজেলা-গোমস্তাপুর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৪৬ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতকোত্তর, সংগ্রহের তারিখ-২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় সকাল ১১:০০ টা
৩. মহবুব ইলিয়াস, পিতা-মরহুম মোহাম্মদ আলী, মাতা-মরহুম আলিফ বেগম, গ্রাম-নতুন ইসলামপুর, পোস্ট-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৭৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-প্রাথমিক, সংগ্রহের তারিখ-০৫/০৩/২০০৪ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৪. খালেসুর রহমান, পিতা-খাদেমুল ইসলাম, মাতা-মোমেনা বেগম, গ্রাম-বিশালপুর, পোস্ট-নাচোল, উপজেলা-নাচোল, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৬৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-চতুর্থ শ্রেণী, সংগ্রহের তারিখ-১০/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা
৫. শান্তি বিবি, স্বামী-মরহুম আমির হোসেন মিয়া, গ্রাম-বারোঘরিয়া, পোস্ট-বারোঘরিয়া, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৭০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-তৃতীয় শ্রেণী, সংগ্রহের তারিখ-০৫/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা
৬. সাক্ষাৎকারঃ হাবিব বাসার (বিশু মিস্ত্রী) (বয়স-৫৬), পিতা- ওয়াজেদ আলী মণ্ডল, গ্রাম-নয়া গাঁ চামাগ্রাম,ডাক-বারঘরিয়া, উপজেলা-জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। তারিখ-০৫.০৬.২০১২
৭. সাক্ষাৎকারঃ জোব্দুল আলী (বয়স আনু-৬৫), পিতা- রাইস উদ্দীন, গ্রাম- বাটাগ্রাম, ডাক-আড়গাড়া হাট, উপজেলা- শিবগঞ্জ, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ। সাক্ষাতের তারিখ-১০.১০.২০১১
৮. তদেব
৯. তদেব
১০. সাক্ষাৎকারঃ মিনু সরেন (বয়স আনু-৫০), পিতা- জগো সরেন, গ্রাম- বরান্দা, ডাক-হাটবাকইল, উপজেলা-নাচোল, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ। সাক্ষাতের তারিখ-১২.০৫.২০১২

www.pathagar.com

১১. সাক্ষাৎকার: প্রহলাদ মাহালী (বয়স -৪০), পিতা- চন্দ্র মাহালী,গ্রাম-দুলাহার, ডাক ও উপজেলা- নাচোল, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ। সাক্ষাতের তারিখ-০৯.০২.২০১২।
১২. সাক্ষাৎকার: মিনু সরেন, প্রাগুক্ত।
১৩. সাক্ষাৎকার: শ্রীমতি সংকরী বালা (বয়স -২২), পিতা- শ্রী ভিখু মাহালী, গ্রাম-দুলাহার, ডাক ও উপজেলা-নাচোল, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ। সাক্ষাতের তারিখ-০২.০২.২০১২।
১৪. তদেব
১৫. তদেব
১৬. সাক্ষাৎকার: জোব্দুল আলী, প্রাগুক্ত
১৭. সাক্ষাৎকার: প্রহলাদ মাহালী, প্রাগুক্ত
১৮. তদেব
১৯. তদেব
২০. সাক্ষাৎকার: শ্রী দয়াল কবিরাজ,বয়স আনু-৪৪, পিতা- মৃত ঝড়ু সিংহ, গ্রাম- বারঘরিয়া চুনারি পাড়া, ডাক- বারঘরিয়া, উপজেলা,জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। সাক্ষাতের তারিখ-০২.০৪.১২
২১. সাক্ষাৎকার: নওসেদ আলী (বয়স– ৪৫), পিতা– মৃত দেলসাদ আলী, গ্রাম– ঈদগা পাড়া (জামাদার পাড়া), ডাক– বারঘরিয়া, জেলা– চাঁপাই নবাবগঞ্জ। সংগ্রহের তারিখ–০৮.০৭.২০০৪
২২. সাক্ষাৎকার: মোসলেম উদ্দীন (বয়স আনু-৫৮), পিতা- আমান উদ্দীন, গ্রাম- মুরগিডাঙা, ডাক-হাটবাকইল, উপজেলা-নাচোল, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ। সাক্ষাতের তারিখ-১২.০৫.২০১২
২৩. সাক্ষাৎকার: প্রহলাদ মাহালী, প্রাগুক্ত
২৪. সাক্ষাৎকার: বৈদ্যনাথ সরেন (বয়স আনু-৯০), পিতা-সুফল সরেন, গ্রাম- বহরইল, ডাক-হাটবাকইল, উপজেলা-নাচোল, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ। সাক্ষাতের তারিখ-১২.০৫.২০১২
২৫. সাক্ষাৎকার: শওকতারা বেগম (বয়স আনু-৬৫), স্বামী-ফজলে বারী মাস্টার, গ্রাম-চামাগ্রাম,ডাক- বারঘরিয়া, উপজেলা ও জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। সাক্ষতের তারিখ- ২০১২ এর বিভিন্ন সময়
২৬. সাক্ষাৎকার: বৈদ্যনাথ সরেন, প্রাগুক্ত
২৭. সাক্ষাৎকার: প্রহলাদ মাহালী, প্রাগুক্ত
২৮. তদেব
২৯. তদেব
৩০. সাক্ষাৎকার: মোসলেম উদ্দীন, প্রাগুক্ত
৩১. সাক্ষাৎকার: জোব্দুল আলী, প্রাগুক্ত
৩২. শ্রী দয়াল কবিরাজ, প্রাগুক্ত
৩৩. তদেব
৩৪. সাক্ষাৎকার: নজরুল কবিরাজ, বয়স আনু-৫৭, পিতা- রমজান মিস্ত্রি, গ্রাম-চামাগ্রাম,ডাক-বারঘরিয়া, উপজেলা, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। সাক্ষাতের তারিখ-০৩.০৪.১২
৩৫. সাক্ষাৎকার: নওসেদ আলী, প্রাগুক্ত
৩৬. সাক্ষাৎকার: শ্রী দয়াল কবিরাজ, প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

ধাঁধা

ধাঁধা লোকসাহিত্যের একটি প্রাচীন শাখা। 'ধন্দ' শব্দ থেকে ধাঁধা শব্দের উৎপত্তি। অর্থ দৃষ্টিবিভ্রম, দিশেহারা ভাব, সংশয়, ধোঁকা, কৌতূহল সৃষ্টিকারী বিভ্রান্তিকর অথচ বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন।[১] ধাঁধার প্রতিশব্দ 'হেঁয়ালী' যা সংস্কৃত 'প্রহেলিকা' শব্দ থেকে নিষ্পন্ন। ধাঁধা রহস্যপূর্ণ ভাষায় রচিত হয়। এটি মূলত একটি জিজ্ঞাসা। আর জিজ্ঞাসা বলে এর একটি উত্তরও আছে। উত্তরটি ধাঁধার ভাষায় পরোক্ষভাবে বিরাজ করে। মূল বিষয়টিকে আড়াল করে শব্দের জাল বুনে তা করা হয়। উত্তরদাতাকে এই উপমা-রূপক প্রতীকের রহস্য ভেদ করে উত্তর দিতে হয়। ধাঁধা চর্চায় কমপক্ষে দুজনের উপস্থিতির প্রয়োজন হয়- একজন ধাঁধা ধরে, অন্যজন উত্তর দেয়।

ধাঁধা সম্পর্কে বিশ্বের ফোকলোরবিদগণ বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন। বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী Friedreich তাঁর 'Geschte des Rathsels' গ্রন্থে ধাঁধাকে 'An indirect presentation of an unknown object in order that the ingenunty of the hearer or reader may be excercised in finding it out' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। একে কেউ কেউ বলেছেন- 'A sort of verbal puzzle.[২]

ধাঁধা সম্পর্কে সি. এফ. পটার বলেন, Contrary to assumption that they are mere word puzzle proposed by punsters at evening parties, riddles rank with myth fables, folktales and proverbs as one of the earliest and most widespread types formulated thou.[৩]

পটারের উক্তিতে একাধিক বক্তব্য আছে-

১. সাধারণ ধারণা অনুসারে ধাঁধা হলো বুদ্ধি বিহ্বলকর শব্দমালা।
২. সান্ধ্যকালীন ভোজে কথক ধাঁধা বলে থাকে।
৩. ধাঁধা পুরাকাহিনী, রূপকথা, লোককাহিনী ও প্রবাদের মতো আদিকাল থেকেই বহুল প্রচলিত নিগূঢ় চিন্তার ফল।

ধাঁধা একটি অজানা বিষয়ের পরোক্ষ উক্তি। এটি এমনভাবে বিবৃত করা হয় যাতে শ্রোতা বা পাঠক খুঁজে বের করতে পারেন। এতে চিন্তার অবকাশ থাকে। শব্দ জাল সূত্র ধরে উত্তরটি বের করতে হয়।

পূর্বে ও বর্তমানে আমাদের দেশে ধাঁধা চর্চা হয়েছে মূলত বিবাহোপলক্ষে বর ও কনে নির্বাচনের বুদ্ধি পরীক্ষায়, বিবাহ বাসরে বর পক্ষ ও কনে পক্ষের মধ্যে আমাদ-প্রমোদের প্রতিযোগিতায়, কিশোর ও তরুণদের মধ্যে অবসর যাপনে এবং অঙ্ক-অক্ষর জ্ঞান রীতি শিক্ষার খেলায় এবং কখন কখন গৃহস্থালি কাজ-কর্মের ফাঁকে চিত্ত বিনোদনের অঙ্গ হিসেবে।

www.pathagar.com

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্থানেও বর কনে নির্বাচন, বিবাহ বাসর, কিশোর ও তরুণদের অবসর যাপন এবং গৃহস্থালী কাজ কর্মের ফাঁকে ফাঁকে ধাঁধার চর্চা হয়ে থাকে। চাঁপাইনবাবগঞ্জে বিভিন্ন শ্রেণির ধাঁধা প্রচলিত রয়েছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় প্রচলিত ধাঁধাগুলো বিশ্লেষণ করে আমরা নিম্নোক্ত আট শ্রেণিতে বিভক্ত করতে পারি–

১. মানুষ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ
২. প্রাণী ও প্রাণী প্রত্যঙ্গ
৩. উদ্ভিদ ও ফলমুলাদি
৪. প্রকৃতি ও নিসর্গ
৫. খাদ্যদ্রব্য ও তৈজসপত্র
৬. অক্ষর ও সংখ্যা
৭. পারিবারিক আত্মীয়তামূলক
৮. সাধারণ জ্ঞান বিষয়ক।

১. মানুষ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ : চাঁপাইনবাবগঞ্জের মানুষ এবং মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে অসংখ্য ধাঁধা প্রচলিত রয়েছে। এগুলো হচ্ছে-মানুষ, মানুষের দেহ, মানুষের ছায়া, আত্মা, জীবন, প্রাণ, মৃত্যু, শব, মুখমণ্ডল, মাথা, চুল, কপাল, চোখ, চোখের মণি, চোখের পাতা, ভুরু, অশ্রু, দৃষ্টি, কান, নাক, মুখগহ্বর, দাঁত, জিহ্বা, হাত, আঙ্গুল, কুনই, পেট, পাকস্থলি, নাভি, নাড়ী, লোম, স্তন, হাঁটু, পা, পদচিহ্ন ইত্যাদি। দৃষ্টান্ত–

এক মায়ের দুই ছেলে
কেহ্ কাহুকে দেখতে নারে? উত্তর–চোখ।[৪]

২. প্রাণী ও প্রাণীর অঙ্গ : চাঁপাইনবাবগঞ্জে বিভিন্ন প্রাণী ও প্রাণীর অঙ্গ সম্পর্কিত ধাঁধা প্রচলিত রয়েছে। প্রাণী ও প্রাণীর অঙ্গগুলো হচ্ছে গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া, শুকর, কচ্ছপ, কাঁকড়া, কুমির, ব্যাঙ, শামুক, শুশুক, বাঘ, বানর, বেজি, শিয়াল, হাতি, হরিণ, কাক, কোকিল, ঘুঘু, চড়ুই, শালিক, হাস, পিঁপড়া, আরশোলা, ইঁদুর, উইপোকা, উকুন, কাঠবিড়ালী, চামচিকা, ছারপোকা, জোঁক, মাছি, মশা, বিছা, বোলতা, মাকড়সা, সাপ, কেঁচো, জোনাকি, টিকটিকি, ফড়িং ইত্যাদি। দৃষ্টান্ত–

দাম গুড়গুড় দাম গুড়গুড়
দামের তলায় বাসা
হাড্ডি নাই হুড্ডি নাই
মানুষ খাইবার আশা। উত্তর–জোঁক।[৫]
পাখির মতো দেখতে পাখিও তো নয়
জন্তুর মতো দেখতে জন্তু তো নয়? উত্তর– বাদুড়।[৬]

উদ্ভিদ ও ফলমূলাদি : চাঁপাইনবাবগঞ্জে উদ্ভিদ ও ফলমূলাদি বিষয়ক ধাঁধা প্রচলিত রয়েছে। এসব উদ্ভিদ ও ফলমুলাদি হচ্ছে-বীজ, গাছ, পাতা, কলাপাতা, কলাইগাছ, অশ্বত্থ, আদা, আনারস, আলোকলতা, আলকুপি, ইক্ষু, গুলগাছ, ওষধিগাছ, কদম গাছ,

www.pathagar.com

কচুগাছ, কচুরিপানা, কার্পাস, কুমড়া, খেজুর গাছ, গম, আলু, গোলমরিচ, ঘাস, চা-পাতা, চোরাকাটা, জলপাই, নারকেল, পলাশ, পানিফল, পাট, পান, পাথরকুচি, পুঁই, পেয়াজ, পেঁপে, ফনিমনসা, বটগাছ, বটপাতা, বকুল, বাঁশ, বিচুটিগাছ, বেগুন, বেত, বেল, ব্যাঙের ছাতা, ভুট্টা, মহুয়া, মানকচু, মূলা, রসুন, লাউ, শশা, শাপলা, শিম, শ্যাওলা, সজনে গাছ, সরিষা, সুপারি, হলুদ ইত্যাদি। দৃষ্টান্ত-

কাঁচাতে কাঁচবরণ সর্বলোকে খায়
পাকাতে সোনারবরণ গড়াগড়ি যায়। উত্তর- বেগুন।[৭]
একটুখানি গাছে
লাল বউটি নাচে। উত্তর-মরিচ।[৮]
কাঠের বেড়া ছনের চাউনি
তার মধ্যে পুস্করিণী। উত্তর- নারিকেল।[৯]
বন থেকে বেরোলো টিয়া
লাল টোপর মাথায় দিয়্যা। উত্তর- কলার থোড়।[১০]
খায় না দায় না প্যাটে আছে লাদি
চালের ওপর বস্যা আছে হযরতের দাদি। উত্তর- চালকুমড়া।[১১]
বাড়িতে আছে কাঠের গাই
বছর বছর দুধ খাই? উত্তর- খেজুর গাছ।[১২]

নিসর্গ ও প্রকৃতি : চাঁপাইনবাবগঞ্জে আকাশ, তারা, চন্দ্র, সূর্য, আগুন, আঁধার, আলো, কুয়াশা, ছায়া, জল, ঝড়, দিন, রাত, দিনমণি, ধোঁয়া, নদী, প্রাতঃসূর্য, বরফ, বসন্ত, মেঘ, বাতাস, বিদ্যুৎ, ভূমিকম্প, রামধনু প্রভৃতি বিষয়ক ধাঁধা প্রচলিত রয়েছে। যেমন-

কালো মেয়ে আকাশে চলে
হাত দিয়্যা পানি ফ্যালে। উত্তর- মেঘ।[১৩]
আলার কি কাম
আজব রকম পুল বানিয়্যাছে
সাত রঙ-এর ঝালর দিয়্যাছে
তাতে না দিয়্যাছে থাম। উত্তর- রংধনু।[১৪]
এই দেখনু এই নাই
কি কইমু রাজার ঠাঁই। উত্তর- বিদ্যুৎ।[১৫]
থাল ঝন্ঝন্ থাল ঝন্ঝন্
থাল লিলো চোরে
বৃন্দাবনে আগুন লাগ্যাছে
কে নিভ্যাতে পারে? উত্তর- রৌদ্র।[১৬]
জ্বলন্ত জিহ্বা সর্বদিকে ধায়
যা কিছু পায় গিল্যা খায়। উত্তর- আগুন।[১৭]
এক থালা সুপারী
যে না গোনতে পারে
তার বাপ ব্যাপারী। উত্তর- তারা।[১৮]

৭—

www.pathagar.com

খাদ্যদ্রব্য ও তৈজসপত্র : চাঁপাইনবাবগঞ্জে খাদ্যদ্রব্য এবং তৈজসপত্র সম্পর্কিত বেশ কিছু ধাঁধা প্রচলিত আছে। এগুলো হচ্ছে– খই, খিচুড়ি, ডিম, দুধ, ভাত, রুটি, কলা, তরমুজ, তাল, কাপড়, উনুন, ঢেঁকি, চরকা, চুরি, মানচিত্র, লাটিম, মশাল, মাচা, নৌকা, লাঙ্গল, গাড়ি, ঘোমটা, সিগারেট, হুক্কা, কবর, কলুর ঘানি, শিলপাটা, কলসি, কামারশালা, কাঁথা, খড়ের গাদা, গরুর খুটা, ঘোড়ার গাড়ি, তাস, হাঁড়ি, দেশলাই, দোকান ইত্যাদি। যেমন–

একটু খানি ঘরে
চুনকাম করে। উত্তর–ডিম।[১৯]
ঘর আছে দরজা নাই
মানুষ আছে কথা নাই? উত্তর– কবর।[২০]
দ্যাশ আছে, মানুষ নাই
সমুদ্রতে জল নাই
পাহাড়েতে পাথর নাই
রেল লাইনে গাড়ি নাই
বন্দরেতে জিনিস নাই। উত্তর– মানচিত্র।[২১]
খুললে ঘর
বন্ধ করলে লাঠি। উত্তর– ছাতা।[২২]
ভোলাহাটে আগুন লাগ্যাছে
শিবগঞ্জে ধুমা বাইর হৈছে। উত্তর– হুক্কা।[২৩]

অক্ষর ও সংখ্যা : বিভিন্ন সংখ্যা, সন–তারিখ ও একাধিক অক্ষরের শব্দ অবলম্বনে রচিত ধাঁধা চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রচলিত রয়েছে। দৃষ্টান্ত–

আকাশেতে আছি আমি
গগণেতে নাই
কাননেতে আছি আমি
অরণ্যেতে নাই। উত্তর– 'ক' অক্ষর।[২৪]
গাছে নাই, পাতায় নাই
ফুলে আছে, ফলে আছে
আর ডালে আছে। উত্তর– 'ল' অক্ষর।[২৫]
এপারে শোয়া শিয়াল
ওপারে শোয়া শিয়াল
কয় শিয়াল? উত্তর– দুইটি শিয়াল শুয়ে আছে।[২৬]
তিন অক্ষরে নাম তার
সর্বলোকে খায়
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে
জেলে নিয়ে যায়। উত্তর– খিচুরি।[২৭]

পারিবারিক আত্মীয়তামূলক : চাঁপাইনবাবগঞ্জে পারিবারিক আত্মীয়তা নির্ণয় সম্পর্কিত ধাঁধা প্রচলিত রয়েছে। বাকচাতুর্যের মাধ্যমে সহজ বিষয়কে অত্যন্ত জটিল করে তোলা হয় বলেই উত্তর নির্ণয় করতে বেশ মাথা ঘামাতে হয়। দৃষ্টান্ত–

www.pathagar.com

আমার বাবার ভাইয়ের একটি মাত্র ভাই আছে। কিন্তু সে আমার চাচা নয়। উত্তর– নিজের বাবা।[২৮]

আগে যায় ফিরে চায়। ওটি তোমার কে? ওর শ্বশুর আমার শ্বশুরকে বাপ ডেকেছে। উত্তর– শাশুড়ী ও পুত্রবধূ।[২৯]

সাধারণ জ্ঞান বিষয়ক : সাধারণ জ্ঞান বিষয়ক বেশ কিছু ধাঁধা চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রচলিত রয়েছে। দৃষ্টান্ত–

এক গাছে একশটি পাখি বসে ছিল। এক শিকারী গুলি করে পাঁচটি ফেলে দিল। বাকি রইলো কয়টি?

উত্তর– বন্দুকের শব্দে বাকিগুলো উড়ে গেল।[৩০]

আকাশে কয়টি তারা আছে? উত্তর– ৯,৯৯,৯৯৯টি (বিশ্বাস না হলে গুণে দেখতে পারেন)

একমণ তুলা এবং একমণ লোহা কোনটির ওজন বেশি? উত্তর– সমান।[৩১]

কোন তিন জন মিত্র নয়? উত্তর– যম, জামাই ও ভাগনে।[৩২]

আত্মীয়তা নষ্ট হয় কিসে? উত্তর– ঘন ঘন গমনে।[৩৩]

তথ্যনির্দেশ

১. ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-২০০০, পৃ. ৬৪২
২. ড. আশরাফ সিদ্দিকী, লোকসাহিত্য, ঢাকা- ১৯৬৩, পৃ. ১০২
৩. ড. ওয়াকিল আহমেদ, লোকসাহিত্য, বাংলাদেশের ইতিহাস, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৫৯৭
৪. মাহবুবুল আলম, পিতা- সাদাতুল ইসলাম, মাতা- বিলকিস বানু, গ্রাম- চাঁপাই-দূর্গাপুর, পোস্ট- উপররাজারামপুর, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৬০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২১/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা
৫. শফিকুল ইসলাম মিন্টু, পিতা- মোঃ হোসেন আলী, গ্রাম- চরজোতপ্রতাপ, টি.বি. রোড, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- উচ্চ মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ২১/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৬. শরিফা খাতুন, পিতা- মরহুম আমিনুল ইসলাম, গ্রাম ও ডাক- বারোঘরিয়া, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৫২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- প্রাথমিক শিক্ষা, সংগ্রহের তারিখ- ২২/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৭. শরিফা খাতুন, পিতা- মরহুম আমিনুল ইসলাম, গ্রাম ও ডাক- বারোঘরিয়া, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৫২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- প্রাথমিক শিক্ষা, সংগ্রহের তারিখ- ২২/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:২০ টা
৮. মো. গোলাম জাকারিয়া, পিতা- আলহাজ আবুল কাসেম বিশ্বাস, মাতা- জমিলা বেগম, গ্রাম ও ডাক- চৈতন্যপুর, উপজেলা- শিবগঞ্জ, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২৩/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৩:০০ টা

www.pathagar.com

৯. মো. শহীদুল ইসলাম, পিতা- আবদুল হক, গ্রাম- আজাইপুর, ডাকঘর- বটতলাহাট, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৬৩ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- প্রাথমিক শিক্ষা, সংগ্রহের তারিখ- ২৩/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা
১০. আমিনুল ইসলাম জনি, পিতা- মরহুম আনিসুর রহমান, মাতা- নুরান নেসা, গ্রাম- মসজিদপাড়া, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৬ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- উচ্চ মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ২৩/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
১১. সাজেনুর, স্বামী- মো. আবদুর রহমান, গ্রাম- কাদিতলা, ডাকঘর- নাচোল, উপজেলা- নাচোল, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৫৪ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- ষষ্ঠ শ্রেণী, সংগ্রহের তারিখ- ২৪/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা
১২. শফিকুল ইসলাম মিন্টু, পিতা- মোঃ হোসেন আলী, গ্রাম- চরজোতপ্রতাপ, টি.বি. রোড, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- উচ্চ মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ২১/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:১০ টা
১৩. সুলতানা ফেরদৌসী স্বাতী, স্বামী- ওয়াইল হক চৌধুরী, মাতা- তাহেরা বেগম, গ্রাম- বেলেপুকুর, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতকোত্তর, সংগ্রহের তারিখ- ২৫/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
১৪. মো. গোলাম জাকারিয়া, পিতা- আলহাজ আবুল কাসেম বিশ্বাস, মাতা- জমিলা বেগম, গ্রাম ও ডাক- চৈতন্যপুর, উপজেলা- শিবগঞ্জ, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২৩/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৩:০০ টা
১৫. মেহবুব রাজা, পিতা- মহবুব ইলিয়াস, মাতা- সুরাইয়া বেগম, গ্রাম- নতুন ইসলামপুর, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৬৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- উচ্চ মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
১৬. শাহ্জাহান প্রামাণিক, পিতা- মরহুম রুস্তম প্রামাণিক, মাতা- দুলু বিবি, গ্রাম- মসজিদপাড়া, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৫৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
১৭. নাজমা বেগম, পিতা- মহবুব ইলিয়াস, মাতা- সুরাইয়া বেগম, গ্রাম- নতুন ইসলামপুর, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
১৮. শরিফা খাতুন, পিতা- মরহুম আমিনুল ইসলাম, গ্রাম ও ডাক- বারোঘরিয়া, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৫২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- প্রাথমিক শিক্ষা, সংগ্রহের তারিখ- ২২/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
১৯. মো. গোলাম জাকারিয়া, পিতা- আলহাজ আবুল কাসেম বিশ্বাস, মাতা- জমিলা বে গ্রাম ও ডাক- চৈতন্যপুর, উপজেলা- শিবগঞ্জ, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৫

www.pathagar.com

শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২৩/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৩:০০ টা

২০. মো. শহীদুল ইসলাম, পিতা- আবদুল হক, গ্রাম- আজাইপুর, ডাকঘর- বটতলাহাট, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৬৩ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- প্রাথমিক শিক্ষা, সংগ্রহের তারিখ- ২৩/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা

২১. আমিনুল ইসলাম জনি, পিতা- মরহুম আনিসুর রহমান, মাতা- নুরান নেসা, গ্রাম- মসজিদপাড়া, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৬ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- উচ্চ মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ২২/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:২০ টা

২২. সাজেনুর, স্বামী- মো. আবদুর রহমান, গ্রাম- কাদিতলা, ডাকঘর- নাচোল, উপজেলা- নাচোল, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৫৪ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- ষষ্ঠ শ্রেণী, সংগ্রহের তারিখ- ২৪/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা

২৩. শফিকুল ইসলাম মিন্টু, পিতা- মোঃ হোসেন আলী, গ্রাম- চরজোতপ্রতাপ, টি.বি. রোড, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- উচ্চ মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ২১/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

২৪. মাহবুবুল আলম, পিতা- সাদাতুল ইসলাম, মাতা- বিলকিস বানু, গ্রাম- চাঁপাই- দূর্গাপুর, পোস্ট- উপররাজারামপুর, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৬০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২১/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা

২৫. মো. গোলাম জাকারিয়া, পিতা- আলহাজ আবুল কাসেম বিশ্বাস, মাতা- জমিলা বেগম, গ্রাম ও ডাক- চৈতন্যপুর, উপজেলা- শিবগঞ্জ, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২৩/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৩:০০ টা

২৬. মেহবুব রাজা, পিতা- মহবুব ইলিয়াস, মাতা- সুরাইয়া বেগম, গ্রাম- নতুন ইসলামপুর, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৬৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- উচ্চ মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

২৭. শাহ্‌জাহান প্রামাণিক, পিতা- মরহুম রুস্তম প্রামাণিক, মাতা- দুলু বিবি, গ্রাম- মসজিদপাড়া, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৫৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

২৮. নাজমা বেগম, পিতা- মহবুব ইলিয়াস, মাতা- সুরাইয়া বেগম, গ্রাম- নতুন ইসলামপুর, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:৩০ টা

২৯. শফিকুল ইসলাম মিন্টু, পিতা- মোঃ হোসেন আলী, গ্রাম- চরজোতপ্রতাপ, টি.বি. রোড, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-

www.pathagar.com

৪০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- উচ্চ মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ২১/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

৩০. শরিফা খাতুন, পিতা- মরহুম আমিনুল ইসলাম, গ্রাম ও ডাক- বারোঘরিয়া, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৫২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- প্রাথমিক শিক্ষা, সংগ্রহের তারিখ- ২২/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

৩১. সুলতানা ফেরদৌসী স্বাতী, স্বামী- ওয়াইল হক চৌধুরী, মাতা- তাহেরা বেগম, গ্রাম- বেলেপুকুর, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতকোত্তর, সংগ্রহের তারিখ- ২৫/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

৩২. লেনিন প্রামানিক, পিতা- শাহ্জাহান প্রামাণিক, মাতা- বেগম শবনম প্রামাণিক, গ্রাম- মসজিদপাড়া, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ২৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

৩৩. সুমাইয়া চৌধুরী ওরিন, পিতা- ওয়াইল হক চৌধুরী, মাতা- তাহেরা বেগম, গ্রাম- বেলেপুকুর, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ২৬ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২৫/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:৪০ টা

www.pathagar.com

প্রবাদ-প্রবচন

প্রবাদ-প্রবচনগুলো লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান অঙ্গ। একটি জাতির বুদ্ধিমত্তা, কর্মকুশলতা ও চিন্তাধারার পরিচয় মেলে তাদের প্রবাদ সাহিত্যে।[১] এগুলোর প্রথম উৎপত্তি ঘটে নিরক্ষর ও অশিক্ষিত মানুষের মুখে মুখে। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন মানুষের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। তবে প্রবাদ-প্রবচনগুলোর আদি স্রষ্টা কে এবং কোন সময়কার রচনা, তার কোন দিনক্ষণ ব্যক্তি বিশেষের বেড়াজালে আবদ্ধ করা সম্ভব নয়।[২] মানুষ যখন প্রথম জ্ঞান সম্পন্ন হতে চলেছে তখনই তার মনের দীপ্ত মনন-মনীষা, মনস্বিত ভাবটিকে ধারণ করে রেখেছে প্রবাদ-প্রবচনের মাধ্যমে। প্রবাদ-প্রবচনসমূহ যে মানব সভ্যতার প্রথম স্তরের সৃষ্টি এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। বিভিন্ন দেশে প্রচলিত প্রবাদ সম্পর্কিত ধারণা থেকে আমরা প্রবাদের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারি। স্পেন দেশীয় সংজ্ঞায় প্রবাদের সৃষ্টিতে জাতির দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ওপর জোর দেয়া হয়েছে– "Proverb is a short sentence based on long experience". প্রবাদ দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত প্রকাশ। ফ্রান্সে প্রবাদ সম্পর্কে ধারণা– Proverb are crystalized from human experience. প্রবাদ হলো মানুষের অভিজ্ঞতার স্ফুটিকীকৃত রূপায়ন। এ্যারিস্টোটল জাতির জ্ঞান বা বুদ্ধিমত্তার ওপর জোর দেন। তাঁর মতে প্রবাদ হলো Fragments of an elder wisdom.[৩]

চাঁপাইনবাবগঞ্জে বিভিন্ন বিষয়ক প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে। যেমন :

১. নারী বিষয়ক ২. প্রেমপ্রীতি বিষয়ক ৩. অহংকার বিষয়ক ৪. স্বাস্থ্য বিষয়ক ৫. ধনি-দরিদ্র বিষয়ক ৬. অধ্যবসায় বিষয়ক ৭. অভিজ্ঞ-অনভিজ্ঞ বিষয়ক ৮. উত্তম-মধ্যম বিষয়ক ৯. ক্রোধ বিষয়ক ১০. প্রতিজ্ঞা বিষয়ক ১১. হিংসা-দ্বেষ বিষয়ক ১২. পরিহাস বিষয়ক ১৩. স্থান-কাল-পাত্র বিষয়ক ১৪. আশা-নৈরাশ্য বিষয়ক ১৫. বিপদ সংকট বিষয়ক ১৬. হুজুগ বিষয়ক ১৭. জনমত বিষয়ক ১৮. বিচার বিভ্রাট বিষয়ক ১৯. অভাব বিষয়ক ২০. সুদিন-দুর্দিন বিষয়ক ২১. প্রতিবেশী বিষয়ক ২২. নিষ্কর্মা বিষয়ক ২৩. শত্রু-মিত্র, চোর-বাটপার বিষয়ক ২৪. গোপনীয়তা বিষয়ক ২৫. পাপ ভীতি বিষয়ক ২৬. বিবিধ।

এবারে চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রচলিত কতিপয় প্রবাদ তুলে ধরা হলো।

নারীকে নিয়ে আমাদের সমাজে জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। চাঁপাইনবাবগঞ্জের প্রবাদগুলোতে নারীকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। নিম্নে নারী বিষয়ক কয়েকটি প্রবাদ উদ্ধৃত করা হলো :

রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট
লক্ষ্মী পালায় ডরে

www.pathagar.com

স্ত্রীর দোষে পুরুষ নষ্ট
ভাত নাই যার ঘরে।[৪]

অর্থাৎ রাজার দোষে যেমন রাজ্যে বিশৃঙ্খলা এবং অব্যবস্থা দেখা দেয়, তেমনি স্ত্রীর দোষেও অভাবগ্রস্থ স্বামীর পতন ঘটে থাকে।

অসতী নারীকে নিয়ে প্রচলিত প্রবাদ

নষ্ট নারীর বড় গলা
শুনতে কান ঝালা ফালা।[৫]

অর্থাৎ অসৎ নারীরা সাধারণত বড় গলায় কথা বলে থাকে। তাদের সাথে কথা বলে পারা যায় না, শুনতেই হয় বেশি।

নারী বিষয়ক বিভিন্ন প্রবাদ

১. বহু (বউ) টি ভাল বটে
ঠুকনা খায়্যা বাটনা বাটে।

২. ডালে মধ্যে মুসরী
মানুষের মধ্যে শাশুড়ি।

৩. শাশুড়ি নাই, ননদ নাই
করবো কাকে ডর,
আগে খাই পান্তা ভাত
পরে লেপি ঘর।

৪. রূপা নষ্ট বাইন্যার বাড়ি
কন্যা নষ্ট বাপের বাড়ি।[৬]

স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রবাদ

১. দক্ষিণ দুয়ারী ঘরের রাজা
পূর্ব দুয়ারী তাহার প্রজা
পশ্চিম দুয়ারীর মুখে ছাই
উত্তর দুয়ারীর খাজনা নাই।৭

২. ফল খেয়ে জল খায়
যম বলে আয় আয়।

৩. আগে তিতা
পাছে মিঠা।

৪. হাগ্যা খায়, খায়্যা মুতে
তাকে না ছোঁয় যমদূতে।
খায়্যা হাগে, রাতে জাগে
সেই মানুষ কুন কাজে লাগে?[৮]

পুরাতনের গুরুত্ব সম্পর্কিত

পুরাতন চাউল ভাতে বাড়ে,
পুরাতন ঘিয়ে মাথা ছাড়ে।[৯]

প্রত্যুষে ভ্রমণ করা যে উত্তম সে সম্পর্কে প্রচলিত প্রবাদ

বেড়াও যদি ভোরের ব্যালা
থাকবে না আর রোগের জ্বালা।[১০]

ধনী-দরিদ্র সম্পর্কিত প্রবাদ

তেলা মাথায় ঢালো তেল
শুকনা মাথায় ভাঙো বেল।

ধনী চাল ভাজা খায় সখে
গরীব খায় প্যাটের ভোকে।

বড় গাছের তলে বাস
ডাল ভাঙলেই সর্বনাশা।[১১]

পরিহাস সম্পর্কিত প্রবাদ

চাইহ্যা আন্যা খাই
হামি কি কারো দুয়ারে যাই।[১২]

আশা-নৈরাশ্য

আশায় পরম সুখ

নিরাশায় পরম দুখ।
যতক্ষণ শ্বাস
ততক্ষণ আশ।[১৩]

প্রেম-প্রীতি বিষয়ক প্রবাদ

পীরিতে মজিলে মন
কিবা হাঁড়ি কিবা ডোম।
কম পীরিতে লাগে ভালা
বেশি পীরিতে বড় জ্বালা।

পীরিতের এমুন গুণ
পানে লাগে য্যামুন চুন
বেশি হৈলে পুড়ে গাল
কম হৈলে লাগে ঝাল।[১৪]

অতিরিক্ত ভোজন সম্পর্কিত প্রবাদ

উনা ভাতে দুনা বল
বেশি ভাতে রসাতল।[১৫]

www.pathagar.com

পুষ্টিকর খাদ্য সম্পর্কিত প্রবাদ

মাছের মধ্যে রুই
শাকের মধ্যে পুঁই।[১৬]

জনমত সম্পর্কিত প্রবাদ

দশ যেখানে
ধর্ম সেখানে।

দশ জন রাজি যেখানে
খোদাও রাজি সেখানে।[১৭]

বিচার বিভ্রাট সম্পর্কিত প্রবাদ

দোষ করে মুখ
চড় খায় গাল।[১৮]

মনের দুঃখে ছাড়নু বাড়ি
মানুষ কহে ভাতার ছাড়ি।

নিষ্কর্মা সম্পর্কিত প্রবাদ

কাজের মধ্যে দুই
খাই আর সুই।

খাবার ব্যালায় আগে
কাজের ব্যালায় ভাগে।[১৯]

চোর সম্পর্কিত প্রবাদ

চোরের দশ দিন
গেহস্তের এক দিন।[২০]

উপর্যুক্ত বিষয় ছাড়াও আরো, বিভিন্ন বিষয়ক প্রবাদ চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রচলিত রয়েছে। নিম্নে বিভিন্ন উপজেলা থেকে সংগৃহীত প্রবাদ-প্রবচন উল্লেখ করা হলো :

* অতি সুন্দরী না পায় বর, অতি গুণবতী না পায় ঘর।
* অভাগার গরু মরে, ভাগ্যবানের বহু (বউ) মরে।
* অভাবে স্বভাব নষ্ট।
* অভাবে স্বভাব নষ্ট মুখ নষ্ট বরণে, আগাছায় ক্ষেত নষ্ট, স্ত্রী নষ্ট মারণে।
* অল্প বয়সে প্রেম করা, কাঁচা বাঁশে ঘুণে ধরা।
* আঁঠা বাঁঠা দুনিয়ার ঠ্যাঁটা।
* আখার পাটালে ছাই, মরুক বহুর ভাই
  জ্বালার উপরে জ্বালা, মরুক শ্বশুরের শালা।

www.pathagar.com

* আঠারো লাঙ্গের ঘর করে, সতী বইল্যা হাঁক মারে।
* আপন চেয়ে পর ভালো, পরের চেয়ে জঙ্গল ভালো।
* আম খাইও জাম খাইও, তেঁ্যাতুল খাইও না
  জানলা দিয়্যা বউ পালাবে, দেখতে পাইবা না।
* আমি খাই ভাতারের ভাত
  তোর কেনে গালে হাত?
* অন্ধের দিনই বা কি? আর রাতই বা কি?
* ইল্লত যায় না ধুলে, খাসলত যায় না মলে।
* ইশারায় পণ্ডিত বুঝে, মূর্খ বুঝে কিলে
  পাড়া পড়শি বুঝে তখন চোখে আঙ্গুল দিলে।
* উদর মোটা রোগী ক্ষীণ, সেই হচ্ছে মৃত্যুর চীন।
* উনা ভাতে দুনা বল, অনেক ভাতে রসাতল।
* এক চোখ কানা যার, বেরাশি বুদ্ধি তার।
* এক ঠোকরে মাছ বিঁধে না, সেই বা ক্যামুন বড়শি
  এক ডাকে সাড়া দ্যায় না, সেই বা ক্যামুন পড়শি।
* এক লক্ষ পুত্র তার সোয়া লক্ষ লাতি
  একজনাও না রহিল বংশে দিতে বাতি।
* এমনি কাটা ঘা, তার উপরে নুনের ছিট্যা।
* কচি পাঁঠা বুড়া মেষ, দৈ এর আগা ঘোলের শেষ।
* কথায় কথা বাড়ে, জলেতে বাড়ে ধান
  বাপের বাড়িতে থাকলে, মেয়ের অপমান।
* কহিতে কহিতে সুখ বাড়ে খাইতে খাইতে পেট বাড়ে।
* কাজ থুয়ে মারে মাছ, বিধি লাগে তার পাছ।
* কাজের মধে দুই, খাই আর শুই।
* কান টানলে মাথা আসে।
* কানার রাতই বা কি? দিনই বা কি?
* কিবা দ্যাশের গুণ
  একই গাছে পান সুপারি, একই গাছে চুন।
* ক্রোধ হিংসা যেবা করে, আপনা আপনি কেঁদে মরে।
* খাবার ব্যালায় আগে, কাজের ব্যালায় ভাগে।
* খায়, না খায় সকালে নায়, তার কড়ি না বৈদ্যে খায়।
* গরিব খায় প্যাটের ভোকে।
* গাইতে গাইতে গায়েন, বাজাতে বাজাতে বায়েন।
* গাঁয়ে ধান তিন মন, চোদাতে যায় বহরম।
* গাঁয়ের বেটি পোঁটাপরি।
* গাঁয়ের মোড়ল বিহ্যায় যায়, ফুকুর ফুকুর পান চিব্যায়।

www.pathagar.com

* গু দিয়্যা হাঁটো, কিন্তু দরবার দিয়্যা হাঁটিও না।
* ঘরের কাছে ঘর, হামি কি তোমার পর।
* চাইহ্যা আনা খাই, হামি কি কারো দুয়ারে যাই।
* চালুন কহে সুঁইরে, তোর পাছায় ফুটা।
* চিড়্যা কহো মুড়হি কহো ভাতের সমান না
খালা কহো চাচি কহো মায়ের সমান না।
* চোরের দশ দিন, গৃহস্থের একদিন।
* ছাইল্যা নষ্ট হাটে, বহু (বউ) নষ্ট ঘাটে।
* ছাইল্যা না কাঁদলে মা দুধ দ্যায় না।
* ছাইহ্যাকে (ছায়া) লাত মারলে, ছাইহ্যাও লাত মারে।
* ছোট লোক বড় হইলে, খাসলত যায় না মলে
ছুঁচার গায়ে আতর মাখালে, গন্ধ যায় কি ধুলে?
* জমি কিনো কান্দর, বহু (বউ) করো বান্দর।
* জানলেই ভয়, না জানলে নয়।
* জানে কম তাঁহিশে বেশি।
* টকের ভয়ে পালিয়ে এসে, তেঁতুল তলায় বাস।
* ডালের মধ্যে মুসুরি, মানুষের মধ্যে শাশুড়ী।
* তেলা মাথায় ঢালো তেল, শুকনা মাথায় ভাঙ্গো বেল।
* দশজন রাজি যেখ্যানে, খোদাও রাজি সেখ্যানে।
* দিনে বর্ষা, রাতে তারা, এই হলো দুঃখের ধারা।
* দুই দিনের বৈরাগী হয়ে ভাতকে বলে অন্ন।
* দুই বহু (বউ) যার, নিত্য ক্যাচাল তার
এক বহু (বউ) যার দুধ-ভাত তার।
* দুধ নষ্ট গো-চ্যানায় ছেলে নষ্ট হাটে
বহু (বউ) নষ্ট নাইওরে মেয়ে নষ্ট ঘাটে।
* দেখতে দেখতে পাকলো কেশ
আর তুই দ্যাখাছিস জলে ভাসা সন্দেস।
* দোদিল বান্দা কমলা চোর, না পায় স্বর্গ না পায় গোর।
* দোষ করে মুখ, চড় খায় গাল।
* ধনী চাল ভাজা খায় সখে।
* ধান কাট্যা পালায়, তিল কাট্যা ছালায়।
* ধান নষ্ট গাদায়, তিল নষ্ট কাদায়।
* ধীরে রান্ধো ধীরে খাও, তবে তো তার আস্বাদ পাও।
* নদীকে মনে কইরো না খাটো
নারীকে মনে কইরো না ছোট।
* নষ্ট নারীর পরিচয়, বুদ্ধি বলে সতী হয়।

www.pathagar.com

* নাই কাজ তো, খই ভাজ।
* নিজের দেশের ঠাকুর, পরের দেশের কুকুর।
* নিম তিতা, নিশিন্দা তিতা, তিতা মহাকাল ফল
তার চাইতে অধিক তিতা, বোন সতীনের ঘর।
* ন্যাংটার ব্যাটা কম্বলে বসে
নাড়হ্যা কুট কুট মনে মনে হাসে।
* ন্যাংড়া খোঁড়া বদের গোঁড়া।
* ন্যাড়হাতে নাই চামড়া, দুধ দিয়্যা খায় আমড়া।
* পতিহারা নারী, মাঝি ছাড়া তরী।
* পরের ধনে পোদ্দারী, লোকে বলে গাদ্দারী।
* পরের ভাতে কাপড় নষ্ট, পরের ত্যালে মাথা নষ্ট।
* পাতলা গাছ ফসল ভালো, ঘন গাছ দেখতে ভালো।
* পাতা লাড়ি, হাতা লাড়ি, ইতো চোরের হাতে খড়ি।
* পিড়হ্যা পেতে করনু ঠাঁই, বাড়হা ভাতে পড়লো ছাই।
* পীরিতির এমুন গুণ, পানে লাগে যেমন চুন
বেশি হৈলে লাগে ঝাল, কম হলে পুড়ে গাল।
* পীরের মাইর ধীরে ধীরে।
* ওস্তাদের মার ভোর রাতে।
* পুকুর নষ্ট করে পানা, গাঁ নষ্ট করে কানা।
* পুরানা চাল ভাতে বাড়ে, পুরানা ঘিয়ে মাথা ছাড়ে।
* ফল খেয়ে জল খায়, যম বলে আয় আয়।
* বড় গাছের তলে বাস, ডাল ভাঙলেই সর্বনাশ।
* বহু নয়তো হীর‍্যা
* কাইল দিয়্যাছি পাটের ঠেঁঠি, আইজ দিয়্যাছে ছিঁড়া।
* বহু (বউ) টি ভাল বটে, টুকনা খায়্যা বাটনা বাটে।
* বাইরে ধুতির ফরকান, ভিতরে ছুঁচার কীর্ত্তণ।
* বাওনের বুদ্ধি নাড়ে
নাড়ের বুদ্ধি হাড়ে, চাঁড়ালের বুদ্ধি ঘাড়ে।
* বাপ ভালো তার ব্যাটা ভালো, মায়ের গুণে ঝি
গাই ভালো তার বাছুর ভালো, দুধ ভালো তার ঘি।
* বাপে না পুছে, চোঙ্গা ভর‍্যা মুতে।
* বারো বাড়ি, তের খামার
যেই বাড়ি যাই, সেই বাড়ি হামার।
* বিহ্যার মজা বাজনায়, জমির মজা খাজনায়।
* বেড়াও যদি ভোরের বেলা
থাকবে না আর রোগের জ্বালা।
* বৈরাগীর পাছার মারাণ, চোর ধরতে যায়।

www.pathagar.com

* ভাত কুরকুরায়, নো যৌবন কুরকুরায়।
* ভাত খায় ভাতারের, গান গাহে ভাসুরের।
* ভাত দেয়ার মুরাদ নাই, কিল মারার যম।
* ভাত দ্যাওয়ার ভাতার না, কিল মারার গোসাই।
* ভাত দ্যায় না ভাতারে, ভাত দ্যায় গতরে।
* ভাত নাই যার মান নাই তার।
* ভাব্যা কাম করিও না, ভাব্যা করিও না।
* মনের দুখে ছাড়নু বাড়ি, মানুষে কহে ভাতার ছাড়ি।
* মাইর বিদ্যা বড় বিদ্যা, ভূত পালায় তার ডরে (ভয়ে)।
* মাংসে মাংস বৃদ্ধি, ঘৃতে বৃদ্ধি বল
  দুধে হয় বীর্য বৃদ্ধি, শাঁকে বৃদ্ধি মল।
* মাগী মদে খাটে, কিছুনা কিছু আঁটে।
* মাগে মা কুন দ্যাশে বিহ্যা দিলি, কাইয়্যা উড়ে না।
* মাছ খাবাতো ইলশে, ভাতার ধরবো তো মিনশে।
* মিনিট দশেক স্নানের পরে, থাকা উচিত অনাহারে।
* মুখের অভিমান, আমি বড় বুদ্ধিমান।
* মেয়ে মানুষ আর কলা গাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে।
* যখন কপাল মন্দ হয়, বন্ধু লোকেও মন্দ কয়।
* যতকের জান লয় ততকের বাঁক।
* যদি থাকে বন্ধুর মন, গাং পার হতে কতক্ষণ?
* যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজার পূণ্য দেশ।
* যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতায় নয়জন।
* যার বিহ্যা তার খোঁজ নাই, পাড়া পড়শীর ঘুম নাই।
* যার মনে যা, ফাল দিয়ে উঠে তা।
* যে করে পরের আশ, তার হয় সর্বনাশ।
* যে হবে দড়ো, তার কাছে টাকা হবে জড়ো।
* রোইদের ব্যালায় হ্যালায় যায়
  বরষ্যার ব্যালায় ঘর ছায়।
* শাকের মধ্যে পুঁই, মাছের মধ্যে কৈ, আর পাখির মধ্যে বৈ।
* শাশুড়ী নাই, ননদ নাই, করবো কারে ডর
  আগে খাই পান্তাভাত, পরে লেপি ঘর।
* সাতটা ছুঁড়ি, একটা বুড়ি।
* সাদা কাপড়ে কাদা লাগে বেশি।
* হলুদ জব্দ শিলে, মাগী জব্দ কিলে
  ধাত্যালা মেয়ে জব্দ হয়, শ্বশুর বাড়ি গেলে।
* হাইগ্যা খায়, খাইয়্যা মুতে, তারে না ছোঁয় যমদূতে।
* হাগ্যা ছুঁচে না, পাদ্যা গোসল।

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

১. মোহাম্মদ হানিফ পাঠান, বাংলা প্রবাদ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ৭
২. মানিক শামস, 'বাংলাদেশের প্রবাদ-প্রবচন' লোকসংস্কৃতি, ১ম বর্ষঃ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৪০২, রাজশাহী, পৃ. ৩৬
৩. ড. ওয়াকিল আহমদ, 'লোকসাহিত্য', বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, সম্পাদনা, প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা- ১৯৯৩, পৃষ্ঠা- ৬০৭
৪. রহিমা বেগম, স্বামী- মো. আব্দুর রহমান, মাতা- রওনোকআরা বেগম, গ্রাম- দলদলি, পোস্ট- ভোলাহাট, উপজেলা- ভোলাহাট, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- পঞ্চম শ্রেণী, সংগ্রহের তারিখ- ২৭/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৫. নাজমা বেগম, পিতা- মহবুব ইলিয়াস, মাতা- সুরাইয়া বেগম, গ্রাম- নতুন ইসলামপুর, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৬. মাহবুবুল আলম, পিতা- সাদাতুল ইসলাম, মাতা- বিলকিস বানু, গ্রাম- চাঁপাই- দূর্গাপুর, পোস্ট- উপররাজারামপুর, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৬০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২১/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা
৭. মো. মোসফিকুর রহমান, পিতা- মরহুম রেজাউর রহমান, মাতা- মরহুম ফাতেমা বেগম, গ্রাম- পাঠানপাড়া, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৫৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতকোত্তর, সংগ্রহের তারিখ- ২২/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা
৮. মো. জুয়েল আখতার মানিক, পিতা- মো. আবেদ আলী, মাতা- আকতারী বেগম, গ্রাম- ফকিরপাড়া, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ২৬ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ২২/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা
৯. সেলিম, পিতা- মো. লোকমান হোসেন, গ্রাম- বটতলাহাট, পোস্ট- বটতলাহাট, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৬ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- উচ্চ মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ২৩/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা
১০. শাহ্‌জাহান প্রামাণিক, পিতা- মরহুম রুস্তম প্রামাণিক, মাতা- দুলু বিবি, গ্রাম- মসজিদপাড়া, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৫৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:৪০ টা
১১. শান্তি বিবি, স্বামী- মরহুম আমির হোসেন মিয়া, গ্রাম- বারোঘরিয়া, পোস্ট- বারোঘরিয়া, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৭০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- তৃতীয় শ্রেণী, সংগ্রহের তারিখ- ০৫/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা
১২. তরিকুল ইসলাম, পিতা- হুমায়ুন কবির, মাতা- রাজিয়া বেগম, গ্রাম- সাগরইল, পোস্ট- আক্কেলপুর, উপজেলা- গোমস্তাপুর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৬ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতকোত্তর, সংগ্রহের তারিখ- ২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় সকাল ১০:০০ টা

www.pathagar.com

১৩. রহিমা বেগম, স্বামী- মো. আব্দুর রহমান, মাতা- রওনোকআরা বেগম, গ্রাম- দলদলি, পোস্ট- ভোলাহাট, উপজেলা- ভোলাহাট, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- পঞ্চম শ্রেণী, সংগ্রহের তারিখ- ২৭/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

১৪. নইমুল বারী, পিতা- মরহুম আলহাজ আজিজুর রহমান, মাতা- মরহুম জরিনা বেগম, গ্রাম- চাতরা, পোস্ট- কানসাট, উপজেলা- শিবগঞ্জ, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৬৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ১৫/১১/২০১৩ খ্রি., সময় সকাল ১০:০০ টা

১৫. মেহবুব রাজা, পিতা- মহবুব ইলিয়াস, মাতা- সুরাইয়া বেগম, গ্রাম- নতুন ইসলামপুর, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৬৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- উচ্চ মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

১৬. সিরাজুল ইসলাম, পিতা- মরহুম মোজাফ্‌ফর হোসেন মিয়া, মাতা- মরহুম মালেকা বেগম, গ্রাম- বারোঘরিয়া, পোস্ট- বারোঘরিয়া, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৭২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতকোত্তর, সংগ্রহের তারিখ- ২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

১৭. তাহেরা ইসলাম, স্বামী- সিরাজুল ইসলাম, মাতা- মরহুম জায়েদা বেগম, গ্রাম- বারোঘরিয়া, পোস্ট- বারোঘরিয়া, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৬২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- উচ্চ মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ২৭/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

১৮. মো. জুয়েল আখতার মানিক, পিতা- মো. আবেদ আলী, মাতা- আকতারী বেগম, গ্রাম- ফকিরপাড়া, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ২৬ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ২২/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা

১৯. মো. মুরাদ আলী, পিতা- মো. নজরুল ইসলাম, মাতা- মরহুম মেটকী বেগম, গ্রাম- আরামবাগ, পোস্ট- বটতলাহাট, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ২০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- উচ্চ মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ- ২৪/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা

২০. মো. দুরুল হোদা, পিতা- জোবদুল হক, মাতা- মোসাঃ আমেনা খাতুন, গ্রাম- কিচনীদহ, পোস্ট- সুন্দরপুর, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৫০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতকোত্তর, সংগ্রহের তারিখ- ২২/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:৫০ টা

২১. মাযহারুল ইসলাম তরু, পিতা- অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, মাতা- তাহেরা বেগম, গ্রাম- বেলেপুকুর, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতকোত্তর, সংগ্রহের তারিখ- ২২/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

www.pathagar.com

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারকে একই ধরনের বিষয় মনে হলেও ব্যবহারিক জীবনে এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী চমৎকারভাবে এই দুটি বিষয়ের পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। তাঁর মতে, সংহত এক জনসমষ্টি যে বিশেষ আচার, আচরণ এবং ক্রিয়াদিকে কর্তব্য অকর্তব্য বলে বিবেচনা করে যেগুলির সঙ্গে শুভাস্যভবোধ জড়িত তাই হলো লোকবিশ্বাস।[১] আর লোকসংস্কার হলো সেইসব আচার-আচরণ এবং ক্রিয়াকলাপ যেগুলি পালনীয় কিংবা বর্জনীয় বলে সংহত জনসমষ্টি শুধু বিশ্বাস করে না, ব্যবহারিক জীবনেও তা মেনে চলে। ঐতিহ্যের সঙ্গে লোক বিশ্বাসের সম্পর্ক খুব একটা নেই তবে লোকসংস্কার ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত যা পুরুষানুক্রমে অনুসৃত।

জন্ম সংক্রান্ত লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

বিবাহের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সন্তান। সন্তান কেবলমাত্র বংশ রক্ষা করে না, সামাজিক দায়িত্বও পালন করে। একটি বিবাহ সার্থকতায় মণ্ডিত হয় সন্তান জন্মের ভিতর দিয়েই। তাই জন্মের ব্যাপারে গ্রামীণ সমাজে বিভিন্ন রীতি-নীতি ও সতর্কতা অবলম্বন করা হয়ে থাকে।

কারণ কেবলমাত্র নর-নারীর দেহাভ্যন্তরের ত্রুটিই শুধু নয়, বহিরাগত প্রভাব যেমন দুষ্ট অশরীরী শক্তির অশুভ তৎপরতা, যাদু টোনা, দৈব শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ও দেব-দেবীর রোষ, আদ্যরীতি ও বিবাহের বার, মাস, তিথি ইত্যাদি এবং সকৃত ত্রুটি ও কর্মফল[২] সন্তান জন্মের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে বলে বাঙালি সমাজে ব্যাপক বিশ্বাস রয়েছে। আর এই বিশ্বাস থেকেই সূচিত হয়েছে বিভিন্ন সংস্কারের।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের মানুষও এই বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের বেড়াজালে আবদ্ধ। এবারে চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রচলিত জন্ম সম্পর্কিত বিশ্বাস ও সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।

দুষ্ট অশরীরীশক্তি : চাঁপাইনবাবগঞ্জের লোকায়ত সমাজে সাধারণ বিশ্বাস হাওয়া-বাতাস, উপরি-দোষ অর্থাৎ ভূত-প্রেত ও জ্বীন-পরির অশুভ তৎপরতা, প্রভাব এবং কুদৃষ্টি নারীর গর্ভ বিপর্যয় ঘটায়। এদের যাতায়াত এবং আশ্রয়স্থল হলো কোন রাস্তা বা নদীর সঙ্গমস্থল, নির্জন স্থান, বৃক্ষ, পতিত বাড়ি, শ্মশান ইত্যাদি। সন্ধ্যা, দিন ও রাতের মধ্যাহ্নকাল এবং অমাবশ্যা ও পূর্ণিমা রাতে এরা তৎপর থাকে। তাই এই সকল স্থান ও কাল সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে অথবা পরিহার করে চলতে পারলে প্রসূতি ও গর্ভস্থ সন্তান উভয়ে নিরাপদ ও সুস্থ থাকে।[৩]

www.pathagar.com

জাদু টোনা : চাঁপাইনবাবগঞ্জের লোকায়ত সমাজের বিশ্বাস গর্ভপাত, মৃত সন্তান প্রসব, গর্ভরোধ ইত্যাদির মূলে জাদুটোনার সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। জাদুটোনার দ্বারা একজনের রোগ অন্যজনের দেহে স্থানান্তরিত করা হয়। এভাবেই একজন সন্তানবর্তী স্ত্রীলোক মৃতবৎসা রোগে আক্রান্ত হয় এবং মৃতবৎসা স্ত্রীলোক জীবিত সন্তানের জননী হয়।[৪]

বার মাস ও তিথির প্রভাব : জ্যোতিষ শাস্ত্রমতে বার, মাস ও তিথি প্রভৃতি আদ্যরীতি এবং বিবাহে কন্যার ভাগ্য, স্বভাবও প্রজননকে প্রভাবিত করে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের প্রায় সকল শ্রেণির মানুষ এই ব্যাপারে সচেতন; তাই তারা পঞ্জিকার শাসন কড়াকড়িভাবে মেনে চলে। এখানে পঞ্জিকার উদ্ধৃতি দিয়ে আদ্যঋতু ও বিবাহের বার, মাস এবং তিথি ইত্যাদির প্রজনন বিষয়ক ফলাফল নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো–

আদ্যঋতু

ক. বারফল

রবিবারে আদ্যঋতু হলে কন্যা বিধবা।
বৃহস্পতিবারে আদ্যঋতু হলে পুত্রবতী হয়।
শুক্রবারে আদ্যঋতু হলে পুত্রবতী হয়।
শনিবারে আদ্যঋতু হলে বন্ধ্যা হয়।[৫]

খ. মাসফল

জ্যৈষ্ঠ মাসে আদ্যঋতু হলে বিধবা হয়।
শ্রাবণ ও আশ্বিনে আদ্যঋতু হলে মৃতবৎসা হয়।
ফাল্গুনে আদ্যঋতু হলে বহুপুত্রা হয়।

গ. তিথিফল

একাদশীতে আদ্যঋতু হলে মৃতবৎসা হয়।
নবমীতে আদ্যঋতু হলে বিধবা হয়।
দশমী ও ত্রয়োদশীতে আদ্যঋতু হলে সুপুত্রা হয়।

ঘ. লগ্নফল

কুম্ভে আদ্যঋতু হলে বন্ধ্যা হয়।
সিংহে আদ্যঋতু হলে পুত্রবতী হয়।

ঙ. যোগফল

অতিগণ্ডযোগে আদ্যঋতু হলে বন্ধ্যা হয়।
পরিঘযোগে আদ্যঋতু হলে মৃতবৎসা হয়।

চ. কারণফল

বণিজে আদ্যঋতু হলে কন্যা পুত্রহীনা হয়।
ববকরণে আদ্যঋতু হলে বন্ধ্যা হয়।
বালবে আদ্যঋতু হলে পুত্রলাভ হয়।
বিষ্টিতে আদ্যঋতু হলে মৃতবৎস্য হয়।

ছ. নক্ষত্রফল

পূর্বফাল্গুণী, পূর্বাষাঢ়া,

www.pathagar.com

পূর্বভাদ্রপদ, ভরণী, অশেস্নষা
ও আর্দ্রানক্ষত্রে বিধবা হয়।[৬]

ক. বর্ষফল

গর্ভ থেকে গণনা করে যুগ্ম বর্ষে কন্যার বিবাহ দিলে কন্যা পতিব্রতা হয়। জন্ম মাসবধি অযুগ্ম বর্ষে তিন মাসের উর্ধ্বে নয় মাস পর্যন্ত যুগ্ম এং যুগ্ম বর্ষে তিন মাস পর্যন্ত যুগ্ম। এই সময়ে বিবাহ দিলে কন্যা সাধ্বী ও পুত্রবতী হয়।

খ. বারফল

সোম, বুধ, বৃহস্পপতি ও শুক্র এই চারিবারে বিবাহ হলে কন্যা সৌভাগ্যমালিনী হয় ও শনিবারে বিবাহ হলে কন্যা কুলটা হয়। রাত্রিতে বার দোষ হয় না, রবি, মঙ্গল ও শনিবারে একেবারেই দোষ হয় না।

গ. মাসফল

শ্রাবণ মাসে বিবাহ হলে কন্যা মৃতবৎসা হয়।
কার্তিক মাসে বিবাহ হলে আচার ভ্রষ্টা ও বিধবা হয়।
পৌষ মাসে বিবাহ হলে বিধবা হয়।

ঘ. গোধূলি-মাসাদি ফল

অগ্রহায়ণ মাসে গোধূলিতে বিবাহ হলে কন্যা বিধবা হয়।
ফাল্গুণ মাসে গোধূলিতে পুত্র, আয়ু ও ধনাদি বৃদ্ধি হয়।
বৈশাখ মাসের গোধূলিতে সুখ বর্ধিনী হয়।
আষাঢ় মাসের গোধূলিতে বহু পুত্রাণী ও ধনমানযুক্ত হয়।

ঙ. গোধূলি বার ফল

শনিবার ও বৃহস্পতিবারের দিবাদণ্ডে গোধূলি নিষিদ্ধ।
দিবাভাগে বিবাহ হলে কন্যা পুত্রবর্জিতা ও বিরহানলদগ্ধা ও স্বামীঘাতিনী হয়।[৭]

চাঁপাইনবাবগঞ্জের হিন্দু সমাজ উপর্যুক্ত বিষয়গুলো অত্যন্ত কড়াকড়ির সঙ্গে মেনে চলে।

স্বকৃত ত্রুটি ও কর্মফল

চাঁপাইনবাবগঞ্জের লোকায়ত সমাজের বিশ্বাস গর্ভদোষ ও বন্ধ্যাত্বের মূলে রয়েছে ব্যক্তির সতর্কতার অভাব এবং সামাজিক বিধি-নিষেধ ও প্রচলিত রীতি-নীতি লঙ্ঘন। গর্ভদোষ ও বন্ধ্যাত্ব সম্পর্কিত স্থানীয় লোকবিশ্বাস সমূহ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো–

১. যে মায়্যা লোক প্যাটে ছেল্যা মরা মানুষ দেখবার যায়, তার প্যাটের ছাইল্যা মরা হয়।

২. কোনো প্যাটআলা মায়্যালোক যুতি রাইতের বেল্যা গাছ থেক্যা ফল ছিড়্যা খায় তাইলে তার ছাইল্যা মরা হয়।

৩. প্যাটআলা মায়্যালোক দুপ্পহরে ও সন্ধ্যাব্যালায় একলা তেঁতুল গাছের তলে, বাঁশ ঝাড়ের তলে বা পুকুর ঘাটে গেলে মরা ছাইল্যা হয়।

www.pathagar.com

৪. প্রথম তৈরি পিঠা ও প্রথম খোলার খই খাইলে গর্ভজাত সন্তান মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়।[৮]

খ. বন্ধ্যাত্ব

১. কাউয়া যেখানে ঝগড়া করে সেখানে পানি না ছিটিয়ে মায়্যা লোকে পাড়া দিলে সে বন্ধ্যা হয়।

২. মায়্যালোকে বিড়ালের হাড় পাড়া দিলে সে বাঁঝা হয়।[৯]

গর্ভোৎপাদন : রতিক্রিয়া ব্যতীত গর্ভোৎপাদন সম্ভব নয়। রতিক্রিয়া অংশগ্রহণের পর নারীর ঋতুস্রাব পরপর দুই বা তিনবার বন্ধ থাকলে সাধারণত গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পায় এবং প্রসূতির দৈহিক পরিবর্তন সূচিত হয়। যেমন–স্তন ও উদরের স্ফীতি, দেহের কৃশতা বা স্বাস্থ্যোন্নতি, স্তনবৃন্তের রঙ পরিবর্তন ইত্যাদি। এ সময় তার কিছু উপসর্গও দেখা যায়। যেমন– বমি বমি ভাব, আলস্য, মাথা ঘোরা, খাদ্যে অরুচি, বিশেষ খাদ্যের প্রতি আকর্ষণ ইত্যাদি।

প্রসবের প্রস্তুতি : আঁতুড় ঘর

প্রসবের জন্য চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় আঁতুর ঘর নিমার্ণের নিয়ম প্রচিলত রয়েছে। যদিও সাম্প্রতিককালে বাড়ির যে কোনো একটি ঘরকেই আঁতুড় ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আঁতুড় ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে এখানকার লোকায়ত সমাজ বিভিন্ন বিধি-নিষেধ অত্যন্ত কড়াকড়ির সঙ্গে মেনে চলে। এ সম্পর্কিত তাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নে প্রদত্ত হলো–

১. শনিবারে আঁতুড় ঘর তোলা অশুভ, শনি পড়ে।

২. প্রসূতির দাদা আঁতুড় ঘর বাঁধলে তার সন্তান ভাগ্যবান হয়।

৩. মাথায় লাল গামছা বেঁধে আঁতুড় ঘর তৈরি করলে জ্বীনের ভয় থাকে না।

৪. আঁতুড় ঘরের চৌকাঠের সামনে লোহা রেখে দিলে নজর লাগে না।

৫. দরজার কাছে তুষ ও ঘুটের আগুন জ্বালিয়ে রাখা দরকার। এতে জ্বীন-ভূতের আছর হয় না।

৬. আঁতুড় ঘরের বাতি নিভে যাওয়া অমঙ্গলজনক। তাই এ ঘরের দরজা-জানালা যতটা সম্ভব বন্ধ রাখা দরকার।

প্রসব পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতি ও লোকবিশ্বাস

চাঁপাইনবাবগঞ্জের লোকায়ত সমাজের বিশ্বাস ভূমিষ্ট হওয়ার প্রাক্কালে এবং অব্যবহতি পরে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেসব লক্ষণ শিশুর স্বভাব চরিত্রের ওপর প্রভাব ফেলে। যেমন–

১. ছেলে হওয়ার সময় ভ্যাড়ার ডাক শুনলে বুদ্ধি কম হয়।

২. জন্মের সময় কাকের ডাক শুনলে মেয়ে ঝগড়াটে হয়।

৩. জন্মের পরপরই যদি সন্তান বাম পা আগে নাড়ায় তাহলে সে খুব খারাপ মানুষ হবে, আর ডান পা যদি নাড়ায় তাহলে তার ব্যবহার খুব ভাল হবে।

www.pathagar.com

৪. ছেলে হওয়ার সময় যদি কেউ ঢেঁকি পাড় দেয় তাহলে ছেলে মাথা খারাপ হয়।
৫. জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যে ছেলে কাঁদে না, তার হৃদয় খুব পাষাণ হয়।
৬. জন্মের পরেই যে শিশু চোখ মেলে চারিদিকে চোয়ে দেখে, সে শিশু চালাক হয়।

সন্তান জন্মের পর কিছু পদক্ষেপ বা কার্যাদি সম্পন্ন করলে তারা সদ্‌গুণাবলির অধিকারী হয় বলে চাঁপাইনবাবগঞ্জের গ্রামীণ মানুষের বিশ্বাস। যেমন–

১. মেয়ে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার গায়ে সোনার গয়না স্পর্শ করালে সে সৌভাগ্যবতী হয়।
২. মেয়ের জন্মের পর তার মায়ের চুড়ি ধোয়া পানি মাথায় ছিটালে মেয়ের বুদ্ধি বেশি হয়।
৩. ছেলে হওয়ার পর তার গলায় বানরের পায়ের নখ বেঁধে দিলে ছেলে খুব চালাক চতুর হয়।
৪. তিন দিনের ছেলেকে মাছ ধরার জাল দেখালে তার বুদ্ধি বেশি হয়।[১১]

প্রসূতি ও নবজাত শিশুর পরিচর্যা

সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর আঁতুড়ে ঘর বন্ধন করা চাঁপাইনবাবগঞ্জের গ্রামীণ সমাজের একটি প্রচিলত রীতি। শিশুর বিছানার নিচে কাদা ও গোবর রাখা হয়। কারণ, এতে শিশু ঠাণ্ডা থাকবে এবং কুদৃষ্টি মুক্ত থাকবে বলে স্থানীয় মানুষ মনে করে। সাধারণত শিশুর জন্মের তিনদিন পর মাতৃদুগ্ধ পান করতে দেয়া হয়ে থাকে।

প্রসবের পর থেকে প্রসূতির আহার সম্পর্কে এখানে বিশেষ বিধি-নিষধ মেনে চলার ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপিত হয়। প্রসূতিকে তিনদিন ভাত দেয়া হয় না, রুটি দেয়া হয়। তিনদিন পর কাঁচকলা, কালো জিরার ভর্তা এবং মসুরীর ডাল দিয়ে ভাত দেয়া হয়। একুশ দিন পর্যন্ত মাছ খাওয়া নিষেধ থাকে। চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাকে এভাবেই খাদ্য পরিবেশন করা এখানকার নিয়ম। কেউ কেউ বলেছেন এ সময় প্রসূতিকে মূলত আতপ চালের ভাতই খাওয়ানো হয়ে থাকে। জন্মের পর শিশুকে যে কয়দিন মাতৃস্তন্য দেয়া হয় না, সে কয়দিন তাকে ছাগল বা গরুর দুধ খাওয়ানো হয়।

নবজাতকের রোগ ব্যাধি ও তার প্রতিকার

চাঁপাইনবাবগঞ্জের লোকসমাজের বিশ্বাস নবজাত শিশুর ওপর কুদৃষ্টি পড়লে, নানা প্রকার ভূ-প্রেত এবং জ্বীন-পরীর 'আছর' হলে সে রোগাক্রান্ত হয়। সুতরাং রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসার জন্য কবিরাজ/ওঝার দ্বারস্থ হতে দেখা যায়। শিশুর ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ার পশ্চাতে মায়েদের অসতর্কতা অনেকাংশে দায়ী বলে মনে করা হয়। শিশুদের রোগ ব্যাধি এবং তার নিরাময় সম্পর্কিত স্থানীয় লোকসমাজের বিশ্বাস সম্পর্কে কিছু দৃষ্টান্ত দেয়া হলো–

১. সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সময় বা পরে বাড়ির চালে বা আশে পাশে চোরাচুন্নি ডাকতে থাকে তাহলে চরম অমঙ্গল বলে গণ্য করা হয়। একে নবজাতকের মৃত্যুদূত বলেও আখ্যায়িত করা হয়। সেই সময় যদি শিশুর ধনুষ্টংকার হয়, তাহলে তাকে 'চোরাচুন্নি' ধরেছে বলে ধারণা করে ঝাড় ফুঁক করা হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

২. উপরিদোষের জন্য অনেক সময় শিশু দুধ বমি করে অথবা পায়খানা করে। এই দোষ কাটাতে এক নিঃশ্বাসে ভেরেণ্ডা গাছের ছাল তুলে এনে রশি পাকানো যন্ত্র থেকে একটু রশি কেটে তার সঙ্গে এক কোয়া রসুন ও পুরানো ছালের রশি একত্রে করে ছেলের গলায় পড়িয়ে দিতে হয়।
৩. ছোট শিশুর বেশি লালা ঝরলে নাড়ু কিংবা গুড়ে সেই লালা মাখিয়ে কাককে খেতে দিলে লালা ঝরা বন্ধ হয়।
৪. শিশুর হাম উঠলে ডুবানো নৌকার ভিতরকার পানিতে ডুব দেয়ালে হাম উঠা সেরে যায়।[১২]

শিশুর দন্তোদগম

দন্তোগমন সম্পর্কে চাঁপাইনবাবগঞ্জের গ্রামীণ জীবনে নানান সংস্কার রয়েছে। যেমন–দন্তোদগমের পূর্বে শিশুকে আয়না দেখানো যাবে না, কারণ আয়না দেখালে দাঁত ওঠে না। শিশুর ভাল দাঁতের জন্য তার দন্তোদগমের সময় ইঁদুরের মাটি তাবিজে ভরে শিশুর গলায় পরানোর নিয়মও এখানে প্রচলিত রয়েছে। দুধের দাঁত পড়ে গেলে তা চোখ বুজে ঘরের চালে ফেলে দিতে হয়। ইঁদুরের গর্তে ফেললেও ভাল হয়।

শিশুর হাঁটতে শেখা

শিশু হাঁটতে যদি দেরি করে চাঁপাইনবাবগঞ্জের গ্রামীণ মানুষ তার প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যেমন–গড়গড়া পিঠা তৈরি করে শিশুর মাথায় ঢেলে দিলে সে তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করবে বলে বিশ্বাস রয়েছে। এছাড়া শিশু জন্মের পরপরই যদি তাকে কোলে নিয়ে হাঁটা যায় তাহলে শিশু তাড়াতাড়ি হাঁটতে শিখবে বলে মানুষ বিশ্বাস করে।[১৩]

শিশু বাক্‌শক্তি

শিশুর মুখে যদি রা না ফোটে তাহলে এখানকার গ্রামীণ মানুষ বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে। যেমন–ধান উঠার পর প্রথম খই ভেজে শিশুকে খাওয়ালে শিশুর মুখে কথা ফোটে।

বিবাহ সংক্রান্ত লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

দুইটি নর-নারীর একত্র বসবাস, যৌনাচরণ এবং সন্তানের জন্মদানের সামাজিক স্বীকৃতিই বিবাহ। এই জন্য বিবাহ একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। সমাজভেদে রীতি-নীতির পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও সাধারণ কয়েকটি বিষয় অভিন্নতা দৃষ্ট হয়। বিবাহের প্রচার, সামাজিক ও পারিবারিক স্বীকৃতি কন্যার অবস্থান্তর এবং পারিবারিক পরিচিতি পরিবর্তন প্রায় সকল সমাজেই বিদ্যমান। চাঁপাইনবাবগঞ্জে হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজের বিবাহকে সামাজিকীকরণের জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

১. প্রচার : বিবাহ একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। তাই সমাজের মানুষের এতে উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদান করে নব দম্পত্তির শুভ কামনা করতে পাত্র-পাত্রী উভয়পক্ষ তাদের স্ব-স্ব আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং পাড়া-

www.pathagar.com

প্রতিবেশীদের নিকট নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে অথবা লবঙ্গ সুপারি সহযোগে আমন্ত্রণ জানানোর রীতি চাঁপাইনবাবগঞ্জের সর্বত্রই প্রচলিত রয়েছে। এই উপলক্ষে উভয়পক্ষই স্ব স্ব গৃহে ভোজের আয়োজন করে।

২. স্বীকৃতি : উভয় পরিবারে সম্মতিক্রমে বিবাহ হয়ে থাকে। অনেক সময় পাকা কথা হয়ে যাবার পরও বিবাহ ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তাই পাকা কথার পরপরই গায়ে হলুদ দিয়েই প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠান শুরু হয়। পাত্র পক্ষ থেকেই প্রথম কনের বাড়িতে হলুদের ডালা যায়। কন্যাপক্ষ তা গ্রহণ করলেই বরের গায়ে হলুদ হয়। বিবাহের পর শ্বশুর বাড়ি এসে বধূ কর্তৃক পরিবেশিত অন্ন স্বামীর আত্মীয়-স্বজনেরা গ্রহণ করলেই সে (নববধূ) স্বামীর পরিবারে অন্ন গ্রহণের অধিকার পায়। স্বামী ফুলশয্যার রাত্রে বাসর ঘরে নববধূকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'ভাত-কাপড়ের' প্রতিশ্রুতি দেয়।

৩. অবস্থান : একক জীবনের অবসান এবং বিবাহিত জীবনের সূচনা, এই দুইয়ের মধ্যবর্তীকাল হলো সন্ধিক্ষণ। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সর্বত্রই থুবড়া খাওয়ানোর মধ্যদিয়েই একক জীবনের অবসান সূচিত হয়। ছেলে যখন বিবাহ করতে যায় তখন মা তাকে দুধের ধার শোধ দিয়ে যেতে বলেন। এ রীতি চাঁপাইনবাবগঞ্জের সর্বত্রই প্রচলিত নয়। শুধুমাত্র ভোলাহাট থানার গ্রামগুলোতে এ রীতির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। বস্তুত এভাবেই তার একক জীবনের অবসান ঘটে।

৪. মাটি স্পর্শ : গায়ে হলুদ হয়ে যাওয়ার পর চাঁপাইনবাগঞ্জের বর কনেকে মাটি স্পর্শ করতে দেয়া হয় না। কেননা, হলুদের গন্ধে ভূত-প্রেত এবং জ্বিন-পরি প্রলুব্ধ হয়ে থাকে বলে এখানকার অধিবাসীদের বিশ্বাস। গায়ে হলুদের পর মাটি স্পর্শ করলে ভূ-মধ্যস্থ এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী ভূত-প্রেত বর কনের ক্ষতিসাধন করবে বলে এ রীতি প্রচলিত রয়েছে।[১৪]

বিবাহ সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস

জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ বিধাতার হাতে। বিশ্বাসটি বাঙালির সর্বজনীন। এতদসত্ত্বেও লোকায়ত সমাজে সকৃত ত্রুটি এবং বিভিন্ন বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন ব্যক্তির বিবাহে প্রতিবন্ধকতা, দূরান্তে বিবাহ হওয়া অথবা অন্য কোনো দুর্ঘনার সৃষ্টি করতে পারে বলে বিশ্বাস আছে। আরো বিশ্বাস আছে, কোন লক্ষণ বিবাহের ইঙ্গিত দেয়। যাদের বিবাহ হয় না অথবা বিবাহ হতে দেরি হয় তাদের জন্য প্রতিষেধক ব্যবস্থাও আছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের হিন্দু ও মুসলিম উভয় সমাজেই এ ধরনের লৌকিক বিশ্বাস বিদ্যমান। এখানে সেসব লৌকিক বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. বিবাহ পূর্ব নির্ধারিত: চাঁপাইনবাবগঞ্জের হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের বিশ্বাস বিধাতা প্রতিটি মানুষের জোড়া সৃষ্টি করেছে। সুতরাং যার সঙ্গে যার জোড়া বাধা হয়েছে তার সঙ্গেই তার বিবাহ হবে।

২. চল্লিশ দিন পূর্বে জোড় নির্ধারণের ঘোষণা: চাঁপাইনবাবগঞ্জের মানুষ বিশ্বাস করে যে শিশুর দেহ গঠিত হওয়ার চল্লিশ দিন পূর্বে তার সঙ্গে কার বিবাহ হবে স্বর্গে তার ঘোষণা দেয়া হয়।

www.pathagar.com

৩. যে মেয়ের সিঁথি চিকন ও লম্বা তার বিবাহ দূরে হয় বলে স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস।

৪. যে অবিবাহিতা মেয়ে পা লম্বা করে বসে তার শ্বশুর বাড়ি দূরে হবে বলে সবার বিশ্বাস।

৫. কোনো অবিবাহিত যুবক বা অবিবাহিতা যুবতীর শরীরে প্রজাপতি বসলে তার খুব তাড়াতাড়ি বিবাহ হবে বলে চাঁপাইনবাবগঞ্জবাসীর ধারণা।

৬. প্রজাপতি মারলে অবিবাহিত যুবক-যুবতীর বিবাহ হয় না।

৭. অবিবাহিত যুবক-যুবতীর শরীরে জালের পানি পড়লে বিবাহ না হওয়ার সম্ভাবনা।

৮. কোনো অবিবাহিতা মেয়ে যদি পা দিয়ে ফটকা মাছ ফুটায় তাহলে তার ভাল ঘরে বিবাহ হয় না বলে সবার বিশ্বাস।

৯. বিবাহ অনুষ্ঠানে বিধবা ও বন্ধ্যা মহিলার উপস্থিতি অমঙ্গলজনক বলে চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিবাহ-অনুষ্ঠানে তাদের উপস্থিতি দেখা যায় না।

১০. যে মেয়ের বিবাহ হয় না সে যদি একটি জামের ফুল খোঁপায় গুঁজে সন্ধ্যেবেলা পুকুর থেকে পানি আনে তবে তার বিবাহ হয় বলে চাঁপাইনবাবগঞ্জের মানুষ বিশ্বাস করে।

১১. যে মেয়ের বিবাহ হতে দেরি হয় সে যদি সকালে উঠে বাসি মুখে একটি গন্ধরাজ ফুলের কলি এনে গেলাসের মধ্যে ডুবিয়ে রাখে তবে তার তাড়াতাড়ি বিবাহ হয়ে যায়।

১২. স্বপ্নে যদি মেহেদি, আলতা নতুন কাপড় ইত্যাদি দৃষ্ট হয় তবে তার আসন্ন বিবাহের ইঙ্গিত বহন করে।

১৩. বিবাহ উপলক্ষে মা-বাবার কার্যকলাপ সন্তানের জীবনকে প্রভাবিত করে বলে চাঁপাইনবাবঞ্জের মানুষ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। তাই সন্তানের বিবাহের রাতে মাকে কাঁদতে নেই। এখানকার মানুষের বিশ্বাস রয়েছে যে ছেলের বাবা যদি বরযাত্রী হিসেবে যায় তাহলে তার পুত্রবধূর লজ্জা-শরম কম হয়।[১৫]

চাঁপাইনবাবগঞ্জে বিয়ের পর কন্যাকে আনা-নেয়ার ব্যাপারে নানাপ্রকার বিধি-নিষেধ মেনে চলা হয়। যেমন–শনিবার সকাল বা মঙ্গলবার বিকেলে কন্যা পিতৃগৃহে রওনা হলে পথিমধ্যে বিপদ হয়। নতুন বউ ভাদ্র মাসে নাইওর অমঙ্গলজনক। নতুন বউ বিয়ের বছর চৈত্রমাসে শ্বশুরবাড়িতে থাকলে সংসারে অভাব আসে ইত্যাদি।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের মানুষের হৃদয়ে বদ্ধমূল কিছু বিশ্বাস ও সংস্কার নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের হিন্দু কৃষকের অম্ববাচীর দিনে জমিতে লাঙ্গল দেয় না। কারণ তাদের ধারণা বা বিশ্বাস ঐ দিনে ধরিত্রী রজঃস্বলা হয়। হিন্দু মেয়েরাও সেদিন উপবাস ও অন্যান্য আচার পালন করে। অন্যদিকে মুসলিম কৃষকেরা জমিতে প্রথম রোয়া লাগানোর সময় এক ধরনের ক্রিয়া পালন করে। তারা ক্ষেতে কচুর মোথা লাগিয়ে নেয় যাতে ধানের চারা ঐ রকম পুষ্ট হয়।

www.pathagar.com

প্রসব পরবর্তী ক্রিয়ানুষ্ঠান

চাঁপাইনবাবগঞ্জের লোকসমাজ সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর বেশ কিছু ক্রিয়ানুষ্ঠান পালন করে থাকে। হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মাবলম্বিরা এইসব ক্রিয়ানুষ্ঠান পালন করে। যেমন–সন্তান ভূমিষ্টের পরপরই মুসলিম পরিবারে আজান দেয়া হয়। হিন্দু পরিবারে উলুধ্বনি দেয়ার রীতি রয়েছে। মুসলিম পরিবারে পুত্রসন্তান হলে আজান দেয়। হিন্দু পরিবারে পুত্র সন্তান হলে পাঁচ ঝাঁক আর মেয়ে হলে তিন ঝাঁক উলুধ্বনি দেয়া হয়।

নাভিরজ্জু কর্তন

সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পরপরই নাভিরজ্জু কর্তন করা হয়ে থাকে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষায় একে 'নাভি কাটা' বলা হয়ে থাকে। গ্রাম্য ধাত্রী দিয়েই এখানে সাধারণত নাভি কর্তন করা হয়। নাভি কর্তনকারিণী চল্লিশ দিন পর্যন্ত অশুচিতার কারণে নামাজ পড়তে পারে না।[১৬]

গর্ভফুল

গর্ভফুলকে জন্মকোষ বলা হয়; ফুলও বলা হয়ে থাকে। এর সঙ্গে প্রসূতি এবং শিশুর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে বলে বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে ব্যাপক বিশ্বাস বিদ্যমান। গর্ভফুলের ভাল-মন্দের ওপর শিশুর এবং মাতার স্বাস্থ্যগত শুভাশুভ নির্ভর করে। এছাড়াও গর্ভফুল শিশুর জীবন-মৃত্যুর কারণ হয়, তার স্বভাব চরিত্রের ওপর প্রভাব ফেলে। লোক বিশ্বাস, গর্ভফুল জন্ম নিয়ন্ত্রক, উর্বরতা সূচকও।

উপরিউক্ত বিশ্বাসসমূহ চাঁপাইনবাবগঞ্জের গ্রামীণ সমাজে পুরোমাত্রায় ক্রিয়াশীল। সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর গর্ভফুল অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নিরাপদ স্থানে প্রোথিত করা হয়ে থাকে। গর্ভফুল সতর্কতার সঙ্গে মনুষ্য ও জীব-জন্তুর নাগালের বাইরে প্রোথিত করা হয় এই আশংকায় যে, কোনো দুষ্ট ব্যক্তির হাতে পড়লে অথবা কোনো মানবেতর প্রাণী খেয়ে ফেললে প্রসূতি ও নবজাত শিশুর ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। কোনো মানবেতর প্রাণী গর্ভফুল খেয়ে ফেললে সেই প্রাণীর বৈশিষ্ট্যসমূহ নবজাত সন্তানের স্বভাব-চরিত্রে প্রকাশ পায়। লোকবিশ্বাস, কোনো পাখি গর্ভফুল খেয়ে ফেললে ছেলের মতিগতি ভাল হয় না। আবার যদি গর্ভফুল কোনো শৃগাল কিংবা কুকুরে ভক্ষণ করে তাহলে প্রসূতি পাগল হয়ে যায় এবং তার সন্তানটি মারা যায়।[১৭]

শুধু জন্ম ও বিবাহের ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই চাঁপাইনাববগঞ্জের মানুষ বিভিন্ন সংস্কারে আবদ্ধ। বিশেষ করে নারী সমাজে দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে এসব বেশি বিদ্যমান।

সাধারণ যাত্রাকালো এবং কোনো শুভ কাজ করার সময় এখানকার মানুষ শুভাশুভ বিচার করে থাকে। কতকগুলো বস্তু ও ঘটনার কুলক্ষণাক্রান্ত সে সব দেখা এবং শোনা অত্যন্ত অশুভ সূচক। পথে বাধা বিঘ্ন অনেক। ডাকাতের আক্রমণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আকস্মিত দুর্ঘটনা, দৈব-দুর্বিপাক ইত্যাদি কারণে যাত্রার ক্ষেত্রে নানা বিপদ উপস্থিত হতে পারে। সংসার যাত্রার পথে মানুষের এ নিত্য অভিজ্ঞতার ফল। এ সমস্ত মানুষ যাত্রাকালীন শুভাশুভ বিচার এবং আচার পালন করে থাকে।

www.pathagar.com

বন্ধ্যা নারী কিংবা আটকুড়া পুরুষের সংস্পর্শ পরিত্যজ্য। এ সমস্ত ধারণাগুলো এখানকার নারী সমাজকে এতো বেশি প্রভাবিত করে যে, দেখা যায় ভাগ্যের নির্মম শিকার বন্ধ্যা নারী বা বিধবা রমণীরা নিজেরাই নিজেদের অশুভ লক্ষণের কারণ বলে মেনে নিয়েছে। নারীর এই সমস্ত বিশ্বাস কখনো এসেছে নিজের মনের গভীর ধারণা থেকে আবার কখনো সামাজিক চাপে পড়ে তাকে মেনে নিতে হয়েছে। ধীরে ধীরে সেটাই তার কাছে স্বাভাবিক নিয়ম বা বিধি হয়ে উঠেছে।

হাঁচি মঙ্গলজনক ও অমঙ্গলজনক উভয়ই হতে পারে। সকালে শয্যাত্যাগের আগে হাঁচি পড়া অমঙ্গলজনক। অন্যদিকে খেতে বসে হাঁচি পড়লে কেউ তাকে স্মরণ করছে বলে মনে করা হয়।

বাড়ি থেকে যখন কেউ বাইরে যাত্রা করে পেছন থেকে তাকে ডাকা অঙ্গলজনক। তবে মায়ের পিছু ডাক শুভ। মায়ের পিছু ডাক সন্তানকে গৃহে ফিরিয়ে আনে বলে সাধারণ বিশ্বাস।

শূন্য সংখ্যা বা গোল চিহ্ন অশুভ সূচক। বিয়ের বাড়িতে শূন্য কলসী রাখা হয় না। শূন্য কলসী অমঙ্গলজনক। যাত্রার সময় দরজায় মাথা ঠেকলে যাত্রা অশুভ হয়।

শুকনো ডালে বসে কাক ডাকা, দাড়ি গোঁফহীন ধোপা-তেলী এদের দেখা যাত্রাকালে অশুভ।

খাঁদা-বোঁচা লোক সাপ-মাকড়সা, গোসাপ ইত্যাদি দেখা যাত্রার পক্ষে অশুভ।

এক শালিক দেখে যাত্রা অশুভ, অন্যদিকে দুই দেখা শুভ।

পেঁচা লক্ষ্মীর বাহন হলেও চাঁপাইনবাবগঞ্জের মানুষ ঘরে পেঁচার প্রবেশ ও পেঁচার ডাককে অমঙ্গলজনক মনে করে।

কাকের কোন কোন ডাক অমঙ্গলজনক, আবার কোনটা মঙ্গলজনক। কাকের এক ধরনের ডাকে গৃহে অতিথি আসে। কর্কশ ডাক অমঙ্গল সূচক। রাতে কাকের দল ঘুরাফিয়া করা অমঙ্গল চিহ্ন বলে মনে করা হয়।[১৮]

যেসব মায়ের সন্তান আঁতুড়ে মারা যায় তাদের সন্তানদের বিশ্রি বিদঘুটে নাম রাখলে তাকে আর যমে ছোঁয় না বলে এখানকার মানুষের বিশ্বাস। এ ধরনের বিশ্বাস থেকে তাদের সন্তানদের নাম রাখে পচা, দুখু, মরণচাঁদ ইত্যাদি। অকল্যাণকর কতকগুলো বস্তু বা প্রাণি আছে যাদের নাম সরাসরি উচ্চারণ করা হয় না, অন্য কোনো শব্দ দ্বারা পরোক্ষভাবে ব্যক্ত করা হয়। যেমন–সাপ দেখলে তার নাম উচ্চারণ করা বারণ, প্রতীক দিয়ে বুঝানো হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জে সাপকে সাধারণত 'লতা' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। নাম ধরে ডাকলে অপমানবোধ করে ভয়াবহরূপে আবির্ভূত হতে পারে বলে সাপকে যেমন লতা বলা হয়ে থাকে, তেমনি কুষ্ঠব্যাধিকে 'বড়রোগ' বা 'মহারোগ', 'বসন্ত' রোগকে 'মায়ের দয়া' এবং হামকে 'মাসিপিসী' বলা হয়ে থাকে।[১৯]

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল শ্রেণির মানুষের বিশ্বাস কোন খাদ্য দ্রব্য, ফসল বা শিশু সন্তানের ওপর মন্দ লোকের কুনজর পড়লে ক্ষতি হয়। ডাইনি শ্রেণির নারী শিশুদের ওপর নজর দিয়ে রক্ত শোষণ করে, ফলে শিশু শুকিয়ে যায়। ডাইনির নজর থেকে সন্তানকে রক্ষা করার জন্য মা তাকে তেল কাজল দেয়ার সময়

www.pathagar.com

কপালের একপাশে কাজলের ফোটা দিয়ে থাকেন। এতে আর ডাইনির প্রভাব পড়ে না। একই উদ্দেশ্যে শিশুর হাতে পায়ে লোহার মালা বা মল পড়ানো হয়। জন্মের পর শিশুর কান ছিদ্র করা হয়, তাদের বিশ্বাস খুঁত থাকলে অশুভ শক্তি শিশুকে স্পর্শ করবে না। লোকসংস্কার হিসেবে চাঁপাইনবাবগঞ্জের সর্বস্তরের মানুষ উপরিউক্ত বিধি-নিষেধ ছাড়াও আরো কিছু নিয়ম কানুন মেনে চলেন, যেমন– কোনো শুভ কাজের সময় বিশেষ করে পরীক্ষা দিতে যাবার সময় ডিম, আলু ও কলা খাওয়া নিষেধ। বিশ্বাস এসব খেলে পরীক্ষার ফল খারাপ হয়। গর্ভবতীকে মাছের জোড়া ডিম খেতে নেই, খেলে তার জোড়া লাগা সন্তান হবে। এছাড়া গর্ভবতীকে যমজ কলা খাওয়া নিষেধ। কারণ যমজ কলা খেলে যমজ সন্তান হবে বলে এলাকাবাসী বিশ্বাস করে। গর্ভবতী পান ছিঁড়ে খেতে নেই, খেলে সন্তান নেংড়া হয়। এ ধরনের অসংখ্যা বিধি-নিষেধ চাঁপাইনবাবগঞ্জের মানুষের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে।

এভাবে আমরা স্পষ্টতই বুঝতে পারি যে, চাঁপাইনবাবগঞ্জবাসীর জীবনের সঙ্গে সংস্কার এমনভাবে মিশে গেছে যে, জীবন-সংস্কার-বিশ্বাস এই ত্রয়ী যেন একই সূত্রে গাঁথা। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নারী সমাজই বিশেষভাবে এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। একথা স্বীকার করতে হয় যে, নারী তার জীবনের সবকিছুই তার পরিবার ও প্রিয়জনদের জন্য এমনভাবে লীন করতে চায় যে, সে এদরেই মঙ্গল কামনায় যে কোনো বিষয়কে নিজের জীবনের অঙ্গ বলে মনে করে। তাই লৌকিক সংস্কার হোক বা যে কোনো সংস্কার বা ঘটনাই হোক তা বিশ্বাসের জন্য হৃদয় উন্মুখ হয় বিশ্বাস করেও, যুক্তিতর্ক দিয়ে নয় হৃদয়ের আবেগ ও ভালবাসা দিয়ে।

তথ্যনির্দেশ

১. ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী, লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, পৃ. ৮

২. অরবিন্দ ঘোষ, পিতা-সুরেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ, মাতা-অর্পনা বালা ঘোষ, গ্রাম-কালিগঞ্জ বাবুপাড়া, পোস্ট-বটতলাহাট, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৭৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতকোত্তর, সংগ্রহের তারিখ-০৫/০৩/২০০৮ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

৩. মহবুব ইলিয়াস, পিতা-মরহুম মোহাম্মদ আলী, মাতা-মরহুম আলিফ বেগম, গ্রাম-নতুন ইসলামপুর, পোস্ট-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৭৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-প্রাথমিক, সংগ্রহের তারিখ-০৫/০৩/২০০৪ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

৪. অরবিন্দ ঘোষ, পিতা-সুরেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ, মাতা-অপর্না বালা ঘোষ, গ্রাম-কালিগঞ্জ বাবুপাড়া, পোস্ট-বটতলাহাট, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৭৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতকোত্তর, সংগ্রহের তারিখ-০৫/০৩/২০০৮ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

৫. মো. শামশুদ্দিন, পিতা-মরহুম লোকমান বিশ্বাস, মাতা-মরহুম হাসিনা বেগম, গ্রাম-মহারাজপুর, পোস্ট-মহারাজপুর, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৪৭ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতকোত্তর, সংগ্রহের তারিখ-২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

www.pathagar.com

৬. মো. গোলাম জাকারিয়া, পিতা-আলহাজ আবুল কাসেম বিশ্বাস, মাতা-জমিলা বেগম, গ্রাম ও ডাক-চৈতন্যপুর, উপজেলা-শিবগঞ্জ, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৪৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ-২৩/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৩:০০ টা
৭. আমিনুল ইসলাম জনি, পিতা-মরহুম আনিসুর রহমান, মাতা-নুরান নেসা, গ্রাম-মসজিদপাড়া, পোস্ট-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৪৬ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-উচ্চ মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ-২২/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৮. মতি বিবি, স্বামী-আব্দুল জাব্বার, গ্রাম-রেহাইচর, পোস্ট-টিকরামপুর, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৬০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-পঞ্চম শ্রেণী, সংগ্রহের তারিখ-২২/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৯. রহিমা বেগম, স্বামী-মোঃ আব্দুর রহমান, মাতা-রওনোকআরা বেগম, গ্রাম-দলদলি, পোস্ট-ভোলাহাট, উপজেলা-ভোলাহাট, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৪৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-পঞ্চম শ্রেণী, সংগ্রহের তারিখ-২৭/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
১০. মহবুব ইলিয়াস, পিতা-মরহুম মোহাম্মদ আলী, মাতা-মরহুম আলিফ বেগম, গ্রাম-নতুন ইসলামপুর, পোস্ট-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৭৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-প্রাথমিক, সংগ্রহের তারিখ-০৫/০৩/২০০৪ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
১১. মাহবুবুল আলম, পিতা-সাদাতুল ইসলাম, মাতা-বিলকিস বানু, গ্রাম-চাঁপাই-দূর্গাপুর, পোস্ট-উপররাজারামপুর, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৬০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ-২১/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা
১২. সখিনা বানু, স্বামী-কোরবান আলী, মাতা-আলহামরা বেগম, গ্রাম-রাধাকান্তপুর, পোস্ট-রাধাকান্তপুর, উপজেলা-শিবগঞ্জ, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৫৩ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-সপ্তম শ্রেণী, সংগ্রহের তারিখ-২৭/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
১৩. শাহ্জাহান প্রামাণিক, পিতা-মরহুম রুস্তম প্রামাণিক, মাতা-দুলু বিবি, গ্রাম-মসজিদপাড়া, পোস্ট-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৫৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-মাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ-২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
১৪. শান্তি বিবি, স্বামী-মরহুম আমির হোসেন মিয়া, গ্রাম-বারোঘরিয়া, পোস্ট-বারোঘরিয়া, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৭০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-তৃতীয় শ্রেণী, সংগ্রহের তারিখ-০৫/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা
১৫. তরিকুল ইসলাম, পিতা-হুমায়ুন কবির, মাতা-রাজিয়া বেগম, গ্রাম-সাগরইল, পোস্ট-আক্কেলপুর, উপজেলা-গোমস্তাপুর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৪৬ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতকোত্তর, সংগ্রহের তারিখ-২৬/১১/২০১৩ খ্রি., সময় সকাল ১০:০০ টা
১৬. রহিমা বেগম, স্বামী-মোঃ আব্দুর রহমান, মাতা-রওনোকআরা বেগম, গ্রাম-দলদলি, পোস্ট-ভোলাহাট, উপজেলা-ভোলাহাট, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৪৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-পঞ্চম শ্রেণী, সংগ্রহের তারিখ-২৭/১১/২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

www.pathagar.com

লোকপ্রযুক্তি

মানুষ জ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে মানব সভ্যতার বিকাশ সাধন করেছে। এসব কিছুর মূলে রয়েছে মানবজীবনকে প্রতিনিয়ত সুখকর, সমৃদ্ধ, উন্নত ও নিরাপদ করে গড়ে তোলার প্রয়াস। অভাব থেকে সৃষ্টি হয় চাহিদা, আর চাহিদা থেকে আবিষ্কার। মানুষ অভাব ও চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে যুগ যুগ ধরে তাদের জৈবিক জ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে জীবন যাপনের উপযোগী নানা বস্তু, যন্ত্র ও হাতিয়ার তৈরি করে আসছে। এর জন্য কোন গবেষণাগারে বসতে হয়নি। সাধারণ মানুষ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েই এসব প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উদ্ভাবন ও উৎপাদন করেছে। এক কথায় বলা যায়, সাধারণ মানুষ তার জীবন যাপনকে সহজসাধ্য করার জন্য নানা কৌশল প্রয়োগ করেছে, উদ্ভাবন করেছে নানা সামগ্রী তা-ই লোকপ্রযুক্তি হিসেবে বিবেচিত। কৃষিক্ষেত্রে লাঙ্গলের ফাল, মই, নিড়ানি, মাছ ধরার বাঁশের তৈরি বিভিন্ন যন্ত্রপাতি পাশাপাশি মৃৎশিল্প আবিষ্কারেও লোকপ্রযুক্তি ক্রিয়াশীল। ধানভানার জন্য ঢেঁকি, যাঁতা, ছ্যাওয়া তৈরি এবং কাঠ কাটার জন্য করাত, বাটালি এমনকি ঘানি তৈরিও স্থাপন লোকপ্রযুক্তিগত দক্ষতারই পরিচায়ক।[১]

১. লাঙল : জমি উত্তম রূপে চাষ করার জন্য যে উপকরণটি ব্যবহার করে থাকে তা হলো লাঙল। সুদূর অতীতকাল থেকে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো চাঁপাইনবাবগঞ্জে লাঙলের ব্যবহার চলে আসছে।[২]

লাঙল অতিপ্রাচীন কৃষি প্রযুক্তি। পাহাড়পুরেপ্রাপ্ত পাল আমলের অর্থাৎ ৮ম-১১শতকের একটি পোড়ামাটির ফলকচিত্রে লাঙল কাঁধে চাষীর প্রতিকৃতি থেকে বোঝা যায় যে, লাঙল অতি প্রাচীন প্রযুক্তি। একজোড়া গরু বা মহিষ দ্বারা লাঙল টানা হয়। লাঙল মূলত কাঠ ও লোহার তৈরি একটি কাঠামো। পেশাজীবী ছুতার (স্থানীয় ভাষায় ছুতার) লাঙল তৈরি করেন। লাঙলের ছটি অংশ থাকে যথা- হাতল, বাঁট বা মুঠা, গাদা, খিল,ঈষ ও ফাল।

নির্মাণ পদ্ধতি: প্রধানত বাবলা গাছের কাঠ লাঙল তৈরিতে ব্যহৃত হয়ে থাকে। মোটা আকৃতির চওড়া কাঠ কেটে 'গাদা' তৈরি করা হয়। গাদা ঈষৎ বাঁকা হয়ে থাকে। বাবলা কাঠ খুব শক্ত এবং বাঁকা আকারের কাঠও পাওয়া যায়। গাদা লাঙলের মূল কাঠমো এর নিচের অংশে লোহার ধারালো ফলা লাগানো হয়। গাদার মাঝামাঝি জায়গা থেকে ঈষ লাগানো হয়। কাঠের তৈরি ঈষ 'খিল' দিয়ে গাদার সঙ্গে মজবুত করে লাগানো হয়। গাদার উপরের অংশ হাতল হিসেবে ব্যবহত হয়।[৩]

২. জোয়াল : লাঙলের অত্যাবশ্যক সহায়ক অংশ জোয়াল। ঈষ এর সংগে জোয়াল বেঁধে গরু দিয়ে লাঙল টানা হয়। এজন্য জোয়াল লাঙলের অভিন্ন অংশ না হলেও অবিচ্ছেদ্য অংশ বলা যেতে পারে।

www.pathagar.com

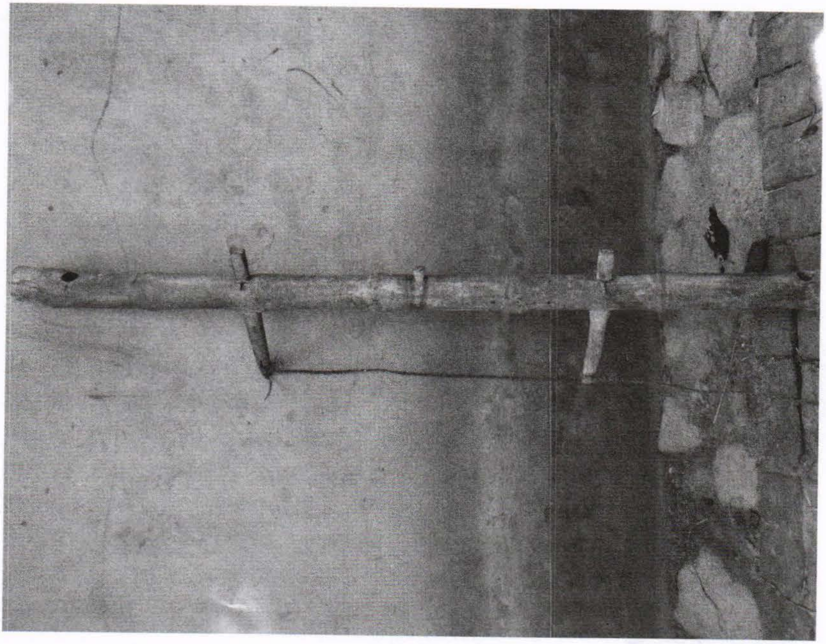

জোয়াল

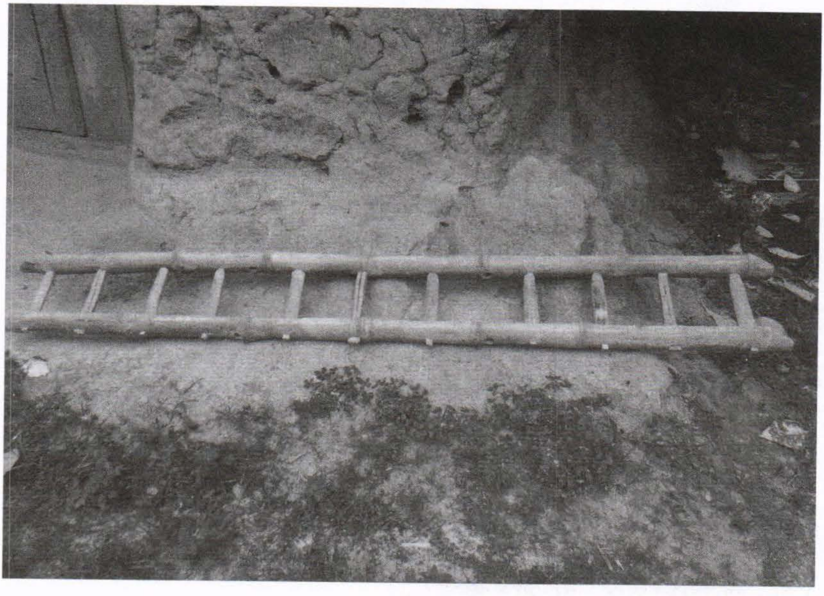

মই

www.pathagar.com

জোয়াল তৈরি হয় কাঠ অথবা বাঁশ দিয়ে। জোয়াল সর্বদাই বিশেষ মাপের হয়ে থাকে। চাঁপাইনবাবগঞ্জে ৪ ফিট দৈর্ঘ্যের জোয়াল ব্যবহৃত হয়। জোয়ালের দুপার্শ্বে দুটি লম্বাকৃতির খিল থাকে। এই খিলের সংগে গরুর গলার রশি সংযোজিত করা হয়। এই খিল গরু দুটিকে পরস্পর থেকে নির্দিষ্ট দূরে রাখতে সাহায্য করে। কৃষক জোয়ালের সঙ্গে লাঙলটি সংযুক্ত করার পর ফলা মাটির ওপর চেপে ধরে গরুকে সামনের দিকে চালাতে থাকে। চলতে থাকে জমির চাষ প্রক্রিয়া।[৪]

৩. ছোট সেঁউতি : ত্রিকোণাকৃতি একটি টিনের কাঠামোর দুই প্রান্তে দড়ি বেঁধে সেঁউতি তৈরি করা হয় এবং দুই জনের সাহায্যে সেচ কাজ চালাতে হয়। দুই জন কৃষক পানির কিনারায় দাঁড়িয়ে সেঁউতিটি জলাধারে ডুবিয়ে পানি পূর্ণ করে উপরে তুলে জমিতে নিক্ষেপ করেন। এভাবে পানি ক্রমে চলতে থাকে সেচ কাজ। আকারে ছোট বলে এলাকাবাসী একে ছোট সেঁউতি বলে থাকে।

৪. বড় সেঁউতি : পানি সেচের জন্য এই প্রযুক্তি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত রয়েছে। বড় সেঁউতি নামে একে অভিহিত করা হলেও এর আঞ্চলিক নাম 'ডবকা'। সাধারণত তাল বা নারকেল গাছের গুঁড়ির উপরের অংশ গর্ত করে গোল তৈরি করা হয়। গোলের এক মাথা দড়ি দিয়ে বেঁধে একটি আড়াআড়ি দুটি বাঁশের খুঁটি পুতে তার উপরে স্থাপনাকৃত সরু বাঁশের সংগে সংযুক্ত করা হয়। বাঁশের অপরপ্রান্তে ভারি পাথর বা ভরি কোন বস্তা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। কাঠের গোলটি দুটি গুটির মাঝে এমনকরে স্থপতি হয় যাতে অধিক পানির দিয়ে ও অর্ধেক ডাঙার দিকে থাকে। বাঁশের দণ্ডের যেদিকে ভর আছে সেদিক ধরে উপরে তুললে খোলের মাথা পানির নিচে যায় এবং খোলে পানি প্রবেশ করে। আবার দণ্ডটি নিচের দিকে নামালে খোলের মাথা উপরের দিকে উঠে আসে এবং পানি খোলের ভেতর দিয়ে ক্ষেতে প্রবেশ করে।[৫]

৫. মই : পারস্পারিক ব্যবধান তৈরি করে দুইটি বাঁশের মাঝে কৃষি কাজে ব্যবহৃত অন্যান্য লোক প্রযুক্তি ৮/১০টি খিল দিয়ে মই তৈরি হয়। হাল দেয়ার পর মাটিকে সমান করার জন্য দুইটি গরুর সাহায্যে জমিতে মই দেয়া হয়।

৬. বিদা : জমির আগাছা পরিষ্কারের জন্য এবং মাটির স্তর উলট পালট করার জন্য বিদা ব্যবহৃত হয়। একটি গাদা তৈরি করে তাতে ১৮/২০টি লোহার খিল দিয়ে বিদা তৈরি হয়।

৭. মুগুর : মাটির ঢেলা চূর্ণ করার জন্য মোটা আকৃতির কাঠের খণ্ডের সঙ্গে ৩ফিট লম্বাকৃতির একটি বাঁশের খণ্ড প্রবিষ্ট করে মুগুর তৈরি হয়।

৮. নিরানি : জমির আগাছা পরিষ্কার করার জন্য নিরানি ব্যবহৃত হয়। একটি লোহার প্লেটের সঙ্গে ঈষৎ বাঁকানো একটি লোহার অংশ লাগানো থাকে। এই অংশের সঙ্গে কাঠের বাট লাগানো হয়।

৯. কোদাল : শক্ত মাটিকে আলগা করার জন্য কোদালের ব্যবহার অপরিহার্য। এছাড়া জমির আইল পরিষ্কার, ছোট ছোট আগাছা উৎপাটনেও কোদাল ব্যবহৃত হয়। কোদালের দুটো অংশ–একটি লোহার চওড়া প্লেট, অপরটি বাঁশের হাতল। লোহার প্লেটের সঙ্গে ৩ফিট লম্বাকৃতির একটি বাঁশের খণ্ড সংযোজন করে কোদাল তৈরি করা হয়।[৬]

www.pathagar.com

১০. মাথাল : সাধারণত কৃষক ও শ্রমিক কৃষিকাজে রোদ-বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাথল আবরণ হিসেবে ব্যবহার করে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষায় মাথলকে মাথৈল বলা হয়। বাঁশের সরু বাতি দিয়ে বুনন প্রক্রিয়ায় গোলাকার মাথল তৈরি করা হয়।

১১. কাস্তে : ফসল কাটার জন্য কাস্তের ব্যবহার সর্বাধিক। কাস্তে তৈরির জন্য একটি লোহা ও কাঠের টুকরোর দরকার হয়। একদিকে ধারালো কিছুতা দাঁতালো প্লেটের নিম্নপ্রান্তে কাঠের বাট বা হাতল লাগিয়ে কাস্তে তৈরি করা হয়।

১২. হাসুয়া : হাসুয়া চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভাষায় 'হাঁস্যা' বলা হয়। হাসার গঠন প্রণালি অনেকটাই কাস্তের মতো। তবে হাসুয়ার সামনের দিক ধারলো হলেও কাস্তের মতো দাঁতালো নয়।

১৩. দা : গাছের ডাল, বাঁশ কাটা এবং জমির আইলের আশে-পাশের যে সব আগাছা জন্মে সেগুলো পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে দা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দা নির্মিত হয়ে থাকে কাস্তের অনুরূপ লোহা ও কাঠ দিয়ে। কাস্তের সঙ্গে দায়ের গঠন ও ওজনগত পার্থক্য থাকলেও নির্মাণ প্রক্রিয়া প্রায় অভিন্ন।

১৪. কাড়ৈল : শুষ্ক খড় একটি ওপিট করার জন্য প্রায় ৪ ফিট লম্বা বাঁশের তৈরি একটি হাতিয়ার চাঁপাইনবাবগঞ্জের কৃষকরা ব্যবহার করে থাকেন এটি 'কাড়ৈল' নামে পরিচিত। লম্বা বাঁশের অগ্রভাগে হারপাট ও একটি চিকন কঞ্চি যুক্ত থাকে। সেটিই মূলত খড় ওলট পালট করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে থাকে।[৭]

১৫. বাড়হুন : রোদে শুকাতে দেয়া ধান দিনে শেষে একত্রিত করার জন্য দুটো হাতিয়ার ব্যবহার করা হয় ১. হারপাট ২. বাড়হুন। বাড়হুনকে ঝাঁটা নামেও অভিহিত করা হয়। হারপাট নির্মিত হয় চন্দ্রকৃতির একখণ্ড কাঠের সঙ্গে ৩ ফিট লম্বা একটি বাঁশের খণ্ড প্রবৃষ্ট করে।

১৬. ঢেঁকি : ঢেঁকি গৃহস্থালি কাজের অত্যাবশ্যক একটি যন্ত্র, যার সাহায্যে ধানের খোসা বা তুষ ছাড়িয়ে চাল তৈরি করা হয়। প্রায় ৫ ফুট লম্বা বাবলা, বরই গাছের গুড়ির সামনের অংশ সামান্য ছুঁচালো এবং পেছনের অংশ উপর-নিচে চ্যাপ্টা করে কাটা হয়। এই চ্যাপ্টা অংশে পাড়া-দিয়ে ধান ভানা হয়। সামনের দিক থেকে প্রায় এক দুটি ছেড়ে ভেতরে ছিদ্র করে গোলাকার কাঠের একটা দণ্ড নিচের দিকে সংযুক্ত করা হয়। একে চাঁপাইনবাবগঞ্জে মোছনা বলা হয়। পেছনের অংশের কিছুটা ভেতরে ছিদ্র করে একটি দণ্ড এপাশ-ওপাশ বর্ধিত রেখে সংযুক্ত করা হয়। এর পর খাঁজ কাটা খুঁটির ওপর মূল অংশটি স্থাপন করা হয়। ঢেঁকির মুখ বরাবর মাটিতে গর্ত করে গোলাকার একটি কাঠের গোল বসানো হয়, একে 'গড়' বলে। এখানেই ধান রেখে ঢেঁকিতে পাড়া দিতে হয়। পেছনের প্রান্তে সামান্য গর্ত থাকে, ঢেঁকির চ্যাপ্টা অংশে পায়ের চাপ দিলে সেই অংশ গর্তে নেমে আসে এতে ঢেঁকির সামনের অংশ উপরে ওঠে। পেছনের অংশ ছেড়ে দিলে সামনের বর্ধিত অংশ গড়ের উপর দিয়ে পড়ে। এতে ধানের খোসা দুর্বল হয়ে ঝরে পড়ে। এভাবে সাধারণত ঢেঁকিতে ধান ভেঙে চাল তৈরি করা হয়।[৮]

www.pathagar.com

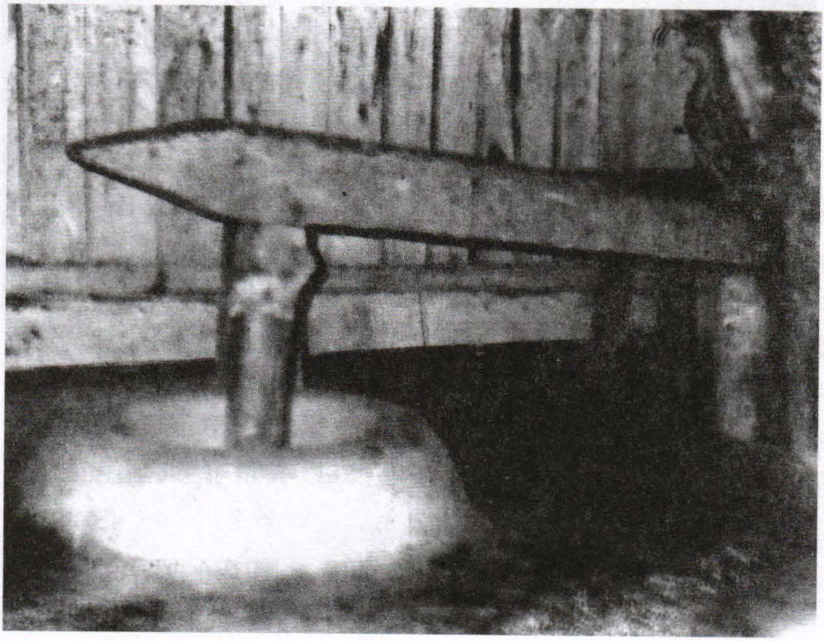

ঢেঁকি

ঢেঁকিতে ধান ভাঙতে কমপক্ষে দুই জনের প্রয়োজন হয়। একজন ঢেঁকি পাড়া দেয় অন্যজন গড়ে ধান উসকে দেয় এবং সেই মাঝে মাঝে কুলায় ঝেড়ে তুষ আলাদা করে থাকে।

ঢেঁকির ব্যবহার সুপ্রাচীন কাল থেকে চলে আসলেও বর্তমানে বৈদ্যুতিক কলে ধান ছাটাই ব্যবস্থার প্রচলন হওয়াতে গ্রাম থেকে ঢেঁকি প্রায় উঠেই গিয়েছে। তবে যে সব অঞ্চলে এখানও বিদ্যুতের ব্যবহার তেমন শুরু হয়নি সে সব স্থানে ঢেঁকি এখনও স্বমহিমায় বিদ্যমান রয়েছে।

১৭. ছ্যাওয়া : ধানভানা ও চালের গুঁড়ি তৈরি করার উপযোগী কাঠের একটি কাঠামো। দুই-আড়াই ফুট লম্বা একটি কাষ্ঠখণ্ডের উপরের অর্ধাংশ হাতুড়ি বাটাল দিয়ে খোদাই করে গর্ত করা হয়, নিচের অংশ অক্ষত থাকে। ৪-৫ ইঞ্চি পরিধি এবং তিন-সাড়ে তিন হাত একটি দণ্ড হলো মুষল। মুষলের মাথায় একটি লোহার বলয় থাকে যাকে আঞ্চলিক ভাষায় 'শামা' বলা হয়। বাড়ির উঠানে বা বারান্দায় ছ্যাওয়া পেতে মুষল দিয়ে উঠানামার মাধ্যমে ধান ভানার কাজ করে। বস্তুত একটি ঢেঁকির একটি বিকল্প ও ক্ষুদ্র সংস্করণ।[৯]

www.pathagar.com

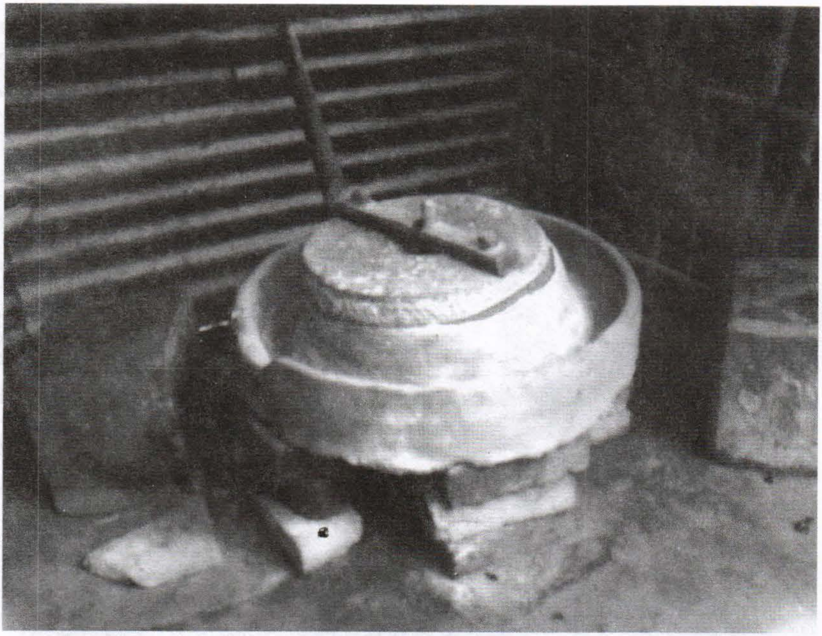

যাঁতা

১৮. যাঁতা : গৃহস্থ ঘরের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে যাঁতা একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার, যা শস্যদানা ভেঙে বা গুঁড়ো করে ডাল, আটা, ছাতু ইত্যাদি তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। পেষণের কাজে এরূপ যন্ত্রের উদ্ভাবন ও ব্যবহার নিঃসন্দেহে লোকবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চিহ্ন বহন করে।

প্রায় তিন হাজ ব্যাসার্ধের সমান দুটি পুরু ও ভারি গোলাকার প্রস্তুত খণ্ড দিয়ে যাঁতা তৈরি করা হয়। খণ্ড দুটি একটির উপরে আরেকটি মাটির কাঠামোর উপর বসানো হয়। মাটির কাঠামোটি প্রস্তরখণ্ড অপেক্ষা প্রশস্ত ও গোলাকার হয়, এর চারিদিকে ফাঁকা থাকে। কারণ যাঁতা ঘুরানোর ফলে শস্যদানাগুলো ভেঙে সেই মাটির কাঠামোর ফাঁকা স্থানে জমা হয়। মাটির কাঠামোর ঠিক মাঝখানে একটি শক্ত খুঁটি পুতে তার উপর ছিদ্র বিশিষ্ট প্রস্তর খণ্ড দুটি বসানো হয়। উপরের প্রস্তর খণ্ডের প্রান্তভাগে একটি ছিদ্র থাকে, এতে কঠের একটি সরু কিলক বা মুঠা সংযুক্ত করা হয়। এর সাহায্যে ঢেঁকি ঘুরোনো হয়। উপরের ছিদ্রাংশ দিয়ে ডাল জাতীয় জিনিস ঢুকিয়ে মুঠার সাহায্যে যাঁতা ঘুরানো হলে ভেঙে ভেঙে খোসা বিচ্ছিন্ন হয়ে নিচে জমা হতে থাকে। চাঁপাইনবাবগঞ্জে যাঁতার ব্যবহার ক্রমাগতভাবে কমছে।[১০]

www.pathagar.com

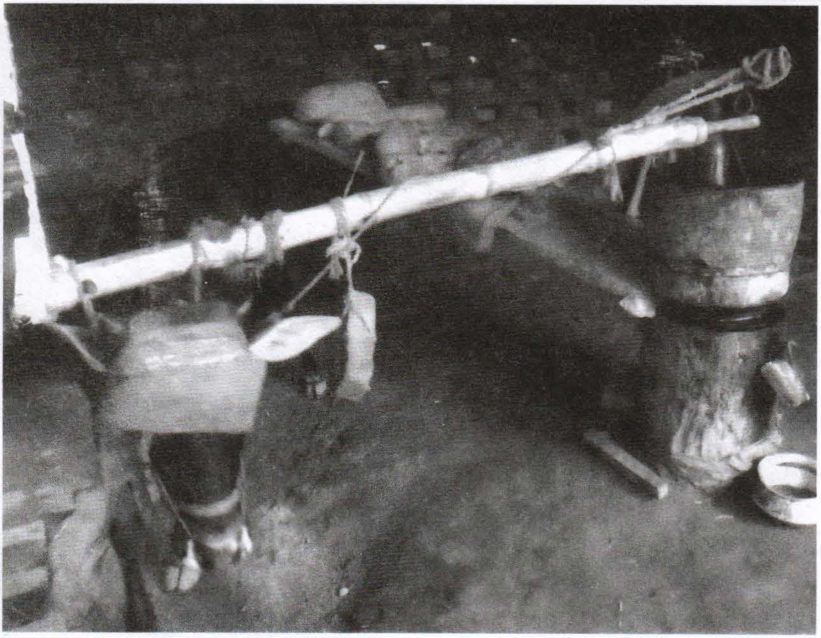

ঘানি

১৯. ঘানি : ঘানি সরিষা, তিল, তিসি ইত্যাদি শস্যবীজ থেকে তেল তৈরির এক প্রকার কাঠের যন্ত্র। আধুনিক যন্ত্র আমদানির আগে এদেশে ঘানিই ছিল একমাত্র লোকপ্রযুক্তি, যা যুগ যুগধরে তেল প্রস্তুত করে মানুষের চাহিদা মিটিয়েছে।

ঘানি তৈরির জন্য ৮-৯ ফুট লম্বা এবং ৪-৫ ফুট ব্যাসের কড়াই গাছ, বেলগাছের কাঠ ব্যবহৃত হয়। গাছের গুড়ি পাঁচ ফুট মতো মাটির নিচে মজবুত করে পোঁতা হয়। তরির উপর ছ্যাওয়ার আকার বিশিষ্ট কাঠের একটি কাঠামো বসানো হয়। আঞ্চলিক ভাষায় একে ডালা বলা হয়। এতে পেষণের জন্য সরিষা দানা রাখা হয়। এর মাঝামাঝি ঢেঁকির ওচার মতো আড়াই ফুট লম্বা একটি শক্ত কাঠের দণ্ড যুক্ত করা হয় একে বলে 'জাইট'। জাইট সরিষা থেকে তেল নিষ্কাশনের প্রধান ভূমিকা পালন করে। জাইটের সাথে প্রায় সাত ফুট লম্বা দেড় দুই চওড়া ও ৩/৪ ইঞ্চি পুরু কাঠের যে মোটা তক্তা সংযুক্ত করা হয় তাকে 'কাতারি' বলে। কাতারির উপরে দেড় থেকে দুই মন ওজনের পাথর বা ভারি কিছু ঝুলিয়ে দেয়া হয়। ঘানির কাণ্ড থেকে প্রায় ৩ ফুট দূরে কাতারির মাঝখানে পরিমাণ মতো ছিদ্র করে দুই ফুট লম্বা একটি কাঠের দণ্ড থাকে পাথা দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়। এটি জাইটের সাথে কাতারিকে টেনে ধরে রাখে। জাইটের রিং এর রশির সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় 'জোয়াল'। চোখ বাঁধা একটি গরুর গলায় তা জুড়ে ঘানি টানা হয়।

www.pathagar.com

কুমারের চাক

২০. কুমারের চাক : চাকের ব্যবহার সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী। চাক হচ্ছে আড়াই থেকে তিন ফিট ব্যাসার্ধের একটি গোলাকার চাকা। এর নির্মাণ কৌশল প্রসঙ্গে মোহাম্মদ শাহজালাল তাঁর 'বাংলাদেশের মৃৎশিল্প' গ্রন্থে নিখুঁত বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। বর্ণনাটি এরূপ: "প্রথমেই বাঁশ কেটে তিনটি গোল রিং তৈরি করা হয়। রিংগুলো আকারে এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে একটির পর একটি সাজানো যায়। বাঁশের তৈরি এই তিনটি রিং ভালভাবে আংটির সাহায্যে আটকানো হয়। নারকেলের ছোবড়া, চুন, আঁশ ও চুল মাটির সঙ্গে মিশিয়ে বাঁশের তৈরি গোলাকার চাকার চারিপাশে পুরু প্রলেপ দিয়ে পনেরো থেকে থেকে ত্রিরিশ দিন অল্প রৌদ্রে শুকানো হয়। এরপর চাকাটির ভিতরদিক থেকে চারটি কাঠের পাটি তার দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হয়। এই চাকপাটিগুলোতে সাধারণত গজারি কাঠ ব্যবহার করা হয়। তারপর এই চাকপাটি ও চাকার মাঝখানে অপর একটি মাঝারি আকারের তীক্ষ্ণ কাঠের টুকরা লাগিয়ে দেওয়া হয়– এটি তেঁতুল কাঠের তৈরি। অপর একটি কাঠের টুকরার মধ্যাংশ ছিদ্র করে একটি পাথর বসানো হয় এবং কাঠটির চার ভাগের তিন ভাগ মাটি খুঁড়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। যাতে এটি শক্তভাবে মাটিতে আটকে থাকতে পারে এবং এই মাটিতে বসানো কাঠের খণ্ডটির মধ্যাংশের পাথরের ওপর বাঁশের চাকাটি বসিয়ে দেওয়া হয় এবং এতে চাকাটি সহজেই পাথরের ওপর ঘুরতে পারে।"[১১]

www.pathagar.com

২১. পাইন : সমগ্র বাংলাদেশের পাল সম্প্রদায় প্রায় একই পদ্ধতিতে মৃৎপাত্র পুড়িয়ে থাকে। যে চুলায় পাত্র পোড়ানো হয় তাকে বলা হয় 'পইন'। পইন নানা আকৃতির হতে পারে। পইন তৈরির উপকরণ ও পদ্ধতি প্রায় অভিন্ন। পইন তৈরির ক্ষেত্রে সাধারণত সমতল ভূমির ওপর মাটি ফেলে স্থানটি টিবির মত করে উঁচু করা হয়। টিবির মাঝখানে গর্ত থাকে। গর্তের চারপাশে উঁচু করে মাটির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাঁশের ঘন ছাউনি দিয়ে তার ওপর মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়। মাঝখানে রাখা হয় সামান্য একটি ফাঁকা স্থান, যেখান দিয়ে জ্বালানি প্রবিষ্ট করানো হয়। পইনের গর্তের সামনে কয়েকটি কাঠ দিয়ে ঠেকনা দেওয়া হয় এবং মাটির দেয়াল তৈরি করা হয়। অধিকাংশ পইনের ওপর কোনো চালা থাকেনা। মৃৎপাত্র পোড়ানোর পূর্বে পইনের ওপর পাত্রগুলো সারিবদ্ধভাবে সাজানো হয় এবং পাত্রের ফাঁকে ফাঁকে খরকুটো অথবা গাছের ডালের সাহায্যে ভরাট করা হয়।

সাজানো পাত্রগুলোর চারদিকে পুনরায় নিম্নমানের কিছু হাড়িপাতিল দিয়ে ঠেকনা দেওয়া হয়। যাতে আগুনের তাপে কাঁচা পাত্রগুলো ফেটে না পড়ে। সাজানো পাত্রগুলো চারপাশে এলাকা বিশেষ খড়, আখের পাতা দিয়ে উচাল তৈরি করা হয় এবং সবশেষে পাত্রগুলো মাটির পুরু প্রলেপ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। তবে প্রলেপ দিলেও চারদিকে ছোট ছোট ছিদ্র রাখা হয় যাতে ধোঁয়া বের হতে পারে।[১২]

চুলায় আগুন দেবার পূর্বে পালেরা কিছু মাঙ্গলিক কর্ম সম্পাদন করে থাকে। এলাকা বিশেষে কেউ ধুপ দেয়, কেউ সোনা-রূপা ভিজিয়ে রাখা জল পইনের ওপর ছিটিয়ে দেয়। অশুভ দৃষ্টি থেকে পইন রক্ষার জন্য কেউ কেউ চুলার এক কোণে ঝাড়ুর পিছা রেখে দেয়। কেউ কেউ মন্ত্রের শরণাপন্ন হয়, যেমন–

করাত করাত করাত
ব্রহ্মা করাত
আসতে কাটে
যাতে কাটে
উজান কাটি
ভাটালি কাটি
দেও- দেবতার কালাফি কাটি
বাণ-কুজ্ঞান কাটি
মানুষের কালাফি কাটি
অমুকের দোষ কাটি
দোহাই কামাক্ষার গুরু
গোসাইয়ের চরণের দোহাই।[১৩]

অতঃপর পইনে অগ্নিসংযোগ করা হয়। পইনে ব্যবহৃত জ্বালানিতে স্থানভেদে কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। পইনে সাধারণত গোবর, বাবলা কাঠ, সরিষার খড়, লোকজ জ্বালানি ঘুটা বা নুন্দা এবং শুকনো বাঁশের মোথা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পইনের জাল সর্বদা একই মাত্রায় দেওয়া হয় না। স্বল্প উত্তাপের মধ্য দিয়ে জাল দেওয়া শুরু হয়।

www.pathagar.com

অতঃপর তার তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সমগ্র পইনে আগুন ধরে গেলে নীচ থেকে জাল বন্ধ করে দেওয়া হয়। যখন পাত্রের চারদিকে মাটির প্রলেপের ভেতরে স্থাপিত খড়কুটোগুলো আগুনের উত্তাপে তীব্রতর রূপ পরিগ্রহ করে তখন পইনের রং লাল বর্ণ ধারণ করে। ধোঁয়ার রং দেখে আগুনের মান নির্ণীত হয়। অনেক সময় স্থায়ী কালো রংয়ের পাত্র তৈরির জন্য পালেরা চুলার মাটির প্রলেপের ছিদ্র বন্ধ করে দেয়। এতে ধোয়া নির্গমণ বন্ধ হয়ে যায়। পাত্র গাঢ় কালো রং ধারণ করে।

এভাবে ৪ থেকে ৮ ঘণ্টা পইনে জ্বালানি চলতে থাকে। সাধারণত পইনে আগুন দেওয়া হয় রাতের পূর্বভাগে। সূর্যোদয়ের পূর্বেই জ্বালানি বন্ধ করে পইন ঠাণ্ডা করা হয়। উল্লেখ্য যে, অনেক সময় পাতিল সাজানোর ত্রুটির কারণে অথবা পইনের মাঝখানের কোনো একসারি পাতিল ভেঙে পড়লে সমগ্র পইনই ধ্বসে পড়ে। এমন ঘটনা প্রতি বছর দু-একবার প্রায়শই ঘটে থাকে। পইন ঠাণ্ডা হলে মৃৎপাত্রের ওপরের মাটির প্রলেপ সরিয়ে স্তরে স্তরে পাত্রগুলো নামানো হয়।

অতঃপর সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এমনিভাবে মৃৎপাত্র লোকসমাজের ব্যবহার উপযোগিতা লাভ করে; পরিণত হয় কুমারের বাণিজ্য সম্ভারে।

২২. করাত : বিশাল আকৃতির বৃক্ষ কর্তনের ক্ষেত্রে কুঠারের বিকল্পে করাত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়া আসবাবপত্র তৈরি করার সময় কাঠকে গঠন উপযোগী করার ক্ষেত্রেও করাতের আবশ্যকতা দেখা দেয়।

করাত দু প্রকার : যথা– ক. বড় করাত ও খ. ছোট করাত। যান্ত্রিক করাত সে অঞ্চলে এখনও প্রচলিত হয়নি সে অঞ্চলের মানুষ বড় করাতের সাহায্যেই কাঠ চেরাই করে থাকে। বড় আকৃতির একটি করাত টানার জন্য ৩ জন শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। লোকসমাজে এরা করাতি নামে পরিচিত। করাতিরা কিন্তু সূত্রধর শ্রেণির অন্তর্গত নয়। অনেক অঞ্চলেই এরা ধর্মের দিক থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। করাতিরা বড় করাতের সাহায্যে বিশাল আকৃতির কাঠের গুড়ি চেরাই করার ভূমিকা পালন করে থাকে।

২৩. বাটালি : কাঠের খণ্ডকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করার ক্ষেত্রে করাতের পরিবর্তে বাটালি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এছাড়া কাঠের অংশবিশেষ গর্ত বা ছিদ্র করা বা বিশেষ কোনো আকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রেও বাটালির ব্যবহার আবশ্যক হয়ে পড়ে।[১৪]

বাটালি তিন প্রকারের। চেপ্টা ও গোলাকৃতির। গোলাকৃতির বাটালি আবার দু'প্রকারের: যথা– গোল বাটালি ও বিম বাটালি। চেপ্টা বাটালি ব্যবহৃত হয়ে থাকে কাঠ ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত করা, আংশিক খণ্ডিত অংশকে মসৃণ অথবা সমতা বিধানের এবং প্রাথমিক পর্যায়ে কাঠকে ব্যবহার উপযোগী রূপ দেওয়ার জন্য। অপরদিকে গোলাকৃতি বাটালি ব্যবহৃত হয়ে থাকে কাঠকে ছিদ্র করার জন্য।

বাটালির প্রস্তুত হয় লোহার প্লেটের সাহায্যে। এটি দৈর্ঘ্যে অর্ধ ফিট অথবা তারও কম, প্রস্থে এই ইঞ্চি পরিমিত। নিচের দিক প্রচণ্ড ধারালো। ওপরের দিকে থাকে কাঠের বাট। গোলাকৃতি বাটালির নিচের দিকের লোহা কিছুটা চারকোণা বিশিষ্ট।

www.pathagar.com

২৪. হাতুরি : বাটালির কার্যকারিতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে হাতুরির ওপর। হাতুরিকে এদিক থেকে বলা যেতে পারে ছুতারের হাতের প্রধান হাতিয়ার। বাটালির ওপর হাতুরির আঘাত না পড়া পর্যন্ত কাঠ খণ্ডন করা সম্ভব হয় না। এদিক থেকে হাতুরি ও বাটালির সম্পর্ক পরস্পর নির্ভর। হাতুরি প্রস্তুত করা হয়ে থাকে লোহার সাহায্যে। হাতুরির সম্মুখ ভাগ গোলাকৃতির। পেছনের দিক কিছুটা সরু। মাঝখানে থাকে ফাঁকা অংশ। এর মধ্যে একটি গোলাকৃতির কাষ্ঠ খণ্ড ঢুকিয়ে হাতল তৈরি করা হয়। এলাকা বিশেষে হাতুরির আকৃতির হেরফের দেখা যায়।

২৫. মৎস্য শিকার সরঞ্জাম : প্রবাদ রয়েছে 'মাছে ভাতে বাঙালি'। বাঙালির মৎস্য প্রীতির কথা সবার জানা। মৎস্যকেন্দ্রিক শিল্প বাঙালির দীর্ঘ ঐতিহ্যাশ্রিত এবং অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। তবে মৎস্যকেন্দ্রিক শিল্পরূপের বিকাশ মূলত মাছ ধরার সরঞ্জামের মধ্যে।

নদীমাতৃক আমাদের এই বাংলাদেশ। দেশের সর্বত্রই রয়েছে নদী-নালা-খাল-বিল, হাওড়-বাওড়। তাই এদেশের প্রতিটি গৃহস্থ বাড়িতে স্বল্প বিস্তর মাছ ধরার সরঞ্জাম থাকে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা মহানন্দা নদীর স্রোতধারা বিধৌত অঞ্চল। এ জেলার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে পদ্মা নদী। এছাড়া জেলার বিভিন্ন থানায় ছড়িয়ে রয়েছে পাগলা, পূণর্ভবাসহ মহানন্দার শাখা ও উপনদীসমূহ। আর রয়েছে অসংখ্য বিল। বিলগুলোর মধ্যে মরিচাদাঁড়া, কুমিড়াদহ, বিলসিংড়া, পুঠিমারী, চাংমারী, বিলভাতিয়া, বিল চোড়ল, হোগলা, দামস, শুক্রবাড়ি দামস ও আনল উল্লেখযোগ্য।

জেলার নদ-নদী, খাল-বিল আর জেলায় প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। নদীতে ইলিশ, রুই কাতলা, মৃগেল, চিতল, বোয়াল, কালবাউস, চিংড়ি, প্রভৃতি, আর খাল-বিলে সিং, মাগুর, কই, শোল, পুঠি, টেংড়া, খলিশা, ট্যাপা, চাঁন্দা, গড়ই প্রভৃতি মাছ পাওয়া যায়। এছাড়া স্থান বিশেষ গলদা চিংড়ি, পাবদা, আইড় ইত্যাদি মাছও পাওয়া যায়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের সর্বত্রই নদী-নালা থাকায় এখানকার প্রতিটি গৃহস্থ বাড়িতেই কমবেশি মাছ শিকারের সরঞ্জাম থাকে। তা সত্ত্বেও মাছ ধরা এবং মৎস্য ব্যবসা, জেলে, কৈবর্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বৃত্তি। চাঁপাইনবাবগঞ্জের সর্বত্র বিশেষত খাল-বিল, হাওড়-বাওড়, নদী-নালার তীরেই এদের বাস। মাছ ধরার সরঞ্জামাদির মধ্যে জাল তৈরির মধ্যে এক অপরূপ শিল্পরূপ বিন্যস্ত। বলতে গেলে সুতাই জালের একমাত্র উপকরণ। দু'দিকে ক্রমশ জীর্ণ এক টুকরো বাঁশের ফালিতে প্রথমে সুতা গুটিয়ে নিয়ে তার সাহায্যে জেলে রমণীদের দক্ষ হাতের আশ্চর্য কৌশলে তৈরি হয় বিভিন্নতর আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের জাল। বিচিত্র আকৃতি-প্রকৃতির জালের বিস্তৃত পরিচয় না দিয়ে শুধুমাত্র নামের একটি তালিকা এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে–

১. ভাটা জাল, ২. ভরা জাল, ৩. কার্তিক জাল, ৪. উথাল জাল, ৫. সঙ্গা জাল, ৬. হুরা জাল, ৭. খরা জাল, ৮. খেঁও জাল, ৯. হেকা জাল, ১০. হাট জাল, ১১. তৌরা জাল, ১২. শিব জাল, ১৩. পুটা জাল, ১৪. উড়া জাল, ১৫. কাইয়া জাল, ১৬. কনুই জাল, ১৭. কুড়া জাল, ১৮. কোণা জাল, ১৯. খড়কি জাল, ২০. পোণার জাল, ২১. বেড়া জাল, ২২. পাঁতি জাল, ২৩. চণ্ডি জাল, ২৪. ঢাঁকাল জাল, ২৫. ফেটা জাল, ২৬. ঝাঁকি জাল, ২৭. দাঁড়া জাল, ২৮. ফাঁসি জাল, ২৯. বাতার জাল, ৩০. সাবুণি জাল ইত্যাদি।[১৫]

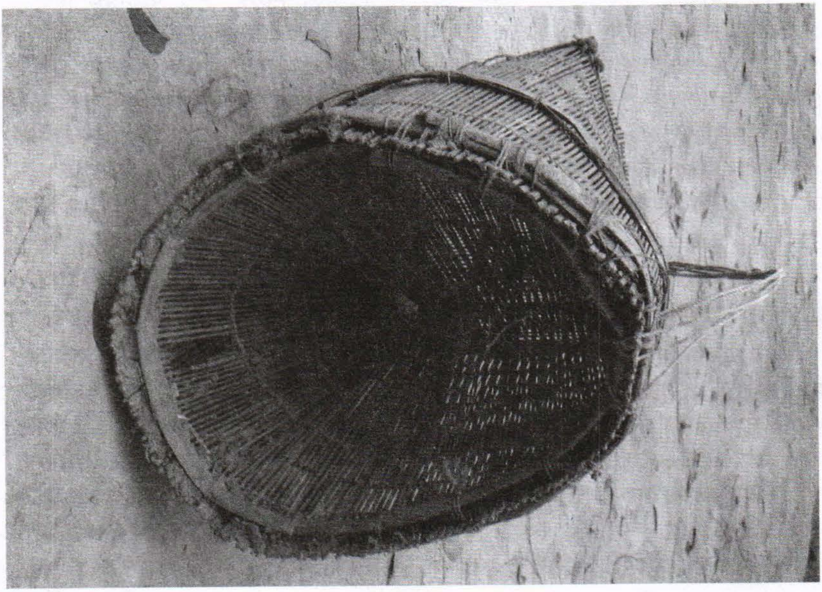

মাছ ধরার যন্ত্র

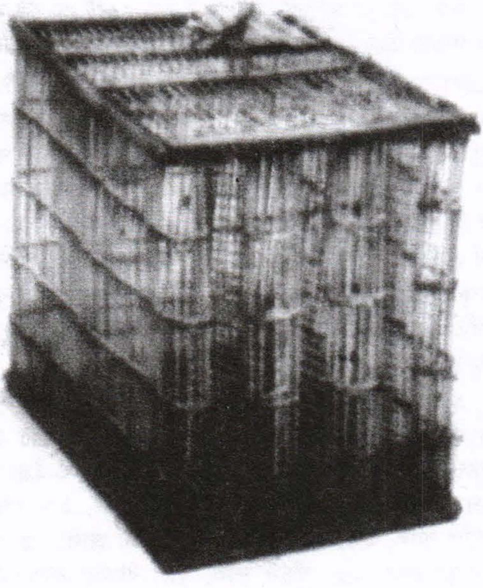

মাছ ধরার যন্ত্র

www.pathagar.com

বাঁশ ও বেত দ্বারা মাছ ধরার নানা সরঞ্জাম চাঁপাইনবাবগঞ্জে তৈরি হয়ে থাকে। যেমন– কোঁচ, হোচ বিভিন্ন ধরনের ডারক ইত্যাদি। এছাড়াও বাঁশ ও বেতে নানাবিধ নিত্য প্রয়োজনীয় গৃহস্থালী সরঞ্জাম তৈরি করে এখানকার লোকায়ত শিল্পীরা বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় ডোম চাড়াল ইত্যাদি অন্ত্যজ বর্ণের বৃত্তি। বাঁশ ও বেতের কাজে চাঁপাইনবাবগঞ্জে বিস্তীর্ণ বরেন্দ্র ভূমিতে বসবাসকারী সাঁওতালদের কৃতিত্বও নৈপুণ্য কম নয়। বাঁশ ও বেত দিয়ে তারা তৈরি করে খরপোষ ও লোকায়ত শিল্পকলার অপরূপ নিদর্শন। এখানে কয়েকটি মাছ ধরার সরঞ্জামের পরিচয় তুলে ধরার প্রয়াস পাবো।

খেয়াজাল বা ঝাঁকিজাল: এই জালের নিম্নভাগে যুক্ত থাকে লোহার ছোট ছোট অনেকগুলো লোহার গুটি বা বল। মৎস্য শিকারি যখন জালটি জলাশয়ের দিকে নিক্ষেপ করে তখন সেটি গোলাকৃত হয়ে পানির ওপর পড়ে তলিয়ে যেতে থাকে এবং অতি দ্রন্নত মাটির স্পর্শ লাভ করে। এর ফলে মাছের পক্ষে জালের আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। মাছগুলো জালের ঘাইয়ের মধ্যে আটকে পড়ে। সাধারণত ক্ষুদ্রাকৃতির মৎস্য, যথা–টেংরা, পুটি, পাবদা মাছই খেয়াজালে ধরা পড়ে।

কটিখড়া বা ধর্মজাল : এটি খেয়াজাল অপেক্ষা কিছুটা ভিন্নাকৃতির। এর গঠন-প্রকৃতি অনেকটা ছাতার অনুরূপ। ছত্রাকৃতির চারটি বংশখণ্ডের অগ্রভাগে জালটি বেঁধে দেওয়া হয়। এই বংশখণ্ড চারটির গোড়ালির দিক একটি জায়গায় যুক্ত থাকে, যেমনটি যুক্ত থাকে ছাতার শলাকাগুলো। এর সঙ্গে আরেকটি লম্বাকৃতির বংশ খণ্ড বাঁধা হয় যেটি থাকে মৎস্য শিকারির হাতে ধরা। মৎস্য শিকারি ইচ্ছা মতো তার হাতে ধরা বংশখণ্ডের সাহায্যে জালটিকে পানিতে ডুবিয়ে রাখতে এবং কিছু সময় পর পানির ওপরে টেনে উঠিয়ে থাকে। এর ফলে অনেক সময় চলমান মাছের ঝাঁক জালে আটকা পড়ে।

ফাঁসজাল : এটি সাধারণত ১০/১২ ফিট লম্বা এবং ৩ ফিটের মতো প্রস্থাকৃতির হয়ে থাকে। এই জালগুলোতে সাধারণত ধানের খেতের আইলে ঝুলন্ত অবস্থায় পেতে রাখা হয়। নিচের অংশ আটকিয়ে রাখা হয় কাদামাটির সঙ্গে। এই জালগুলোর বুননি কিছুটা ফাঁক ফাঁক। যার ফলে জমির এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে চলাফেরার সময় মাছ অতি সহজে জালে আটকা পড়ে। সাধারণত কৈ, ভেদা ও বেলে মাছই এই জালে ধরা পড়ে।

পোনাজাল বা ছাকনাজাল : সাধারণত টাকি ও শৈল মাছের পোনা শিকারের জন্য এই জালের ব্যবহার হয়ে থাকে। এর আকৃতি অপেক্ষাকৃত ছোট। এটি একজনের ব্যবহার উপযোগী। এর গঠন প্রকৃতি অনেকটাই ছোট সেঁউতি বা খড়ার অনুরূপ। এই জালের বুননী অত্যন্ত ঘন, মোটা বস্ত্রের মতো।

চাঁরো : এটি তৈরি হয় বাঁশের চিকন চিকন শলাকা দিয়ে। শলাকাগুলোকে অপেক্ষাকৃত চিকন রশি দিয়ে গাঁথা হয়। চাঁরোর গঠন প্রকৃতি অনেকটাই হরতন তাসের অনুরূপ। এর উচ্চতা হয়ে থাকে সাধারণত ১ ফিটের মতো। এর সম্মুখভাগে থাকে মাছ প্রবেশের জন্য পথ মতো। মাছ একবার চাঁরোর মধ্যে প্রবেশ করলে বের হওয়ার আর কোনো পথ খুঁজে পায় না। চাঁরোতে সাধারণত ছোট ছোট চিংড়ি এবং বেলে মাছই অধিক পরিমাণে ধরা পড়ে।

বিত্তি বা ভাঁইড় : এটিও তৈরি হয় বাঁশ ও রশির সাহায্যে। ক্ষেত্রভেদে রশির পরিবর্তে বেত ব্যবহার করতেও দেখা যায়। এবং শক্তি পাকানো রশি বা বেত দিয়ে

www.pathagar.com

মাছ ধরার জাল

মাছ ধরার জাল

www.pathagar.com

বাঁশের শলাকাগুলো গ্রন্থনা করা হয়ে থাকে। এটি লম্বায় তিন ফিট, প্রস্থে দেড় ফিট পরিমিত। ঢাকনি ও তলার অংশ এক বিশিষ্ট। এর সামনের দিকে থাকে পকেট জাতীয় দু'টি প্রবেশ পথ। এই পকেটগুলো নির্মাণের ক্ষেত্রে কিছুটা বিজ্ঞানবুদ্ধির পরিচয় লক্ষ করা যায়। পকেট তৈরি হয় বাঁশের শলাকা দিয়ে। এগুলোও রশি দিয়ে গ্রন্থনা করা হয়ে থাকে। সামনের দিক প্রশস্থ হলেও পকেটগুলো এমনভাবে স্থাপন করা হয় যাতে পেছনের অংশটি সব সময়ই পরস্পরের দিকে লেগে থাকে। যে কারণে মাছ একবার ভাঁইড়ের মধ্যে প্রবেশ করলে আর বের হতে পারে না। এগুলো সাধারণত গভীর জলে স্থাপন করা হয়। এতে বেলে এবং বড় বড় চিংড়ি মাছ ধরা পড়ে। উল্লেখ্য যে, ভাঁইড় স্থাপন করা হয় সর্বদাই স্রোতস্বিণী জলাশয়ে। ভাঁইড়ের মুখটি থাকে স্রোতের অনুকূলে। কারণ সকল মাছের গতি থাকে স্রোতের প্রতিকূলে।[১৬]

দিয়াইর : এর গঠন প্রকৃতিও অনেকটাই ভাঁইড়ের অনুরূপ। এরও সামনের দিকে দুই বা ততোধিক পকেট জাতীয় প্রবেশ পথ থাকে। দিয়াইর স্থাপন করা হয় অপেক্ষাকৃত অগভীর পানিতে।[১৭]

ঝাঁকা : এটি তৈরি হয় বাঁশ ও রশির সাহায্যে। ঝাঁকার গঠন প্রকৃতি অনেকটাই গোলাকৃতির। এর মধ্যভাগ নিচের দিক অপেক্ষা মোট ওপরের দিক আবার নিম্নভাগ অপেক্ষা কিছুটা সরু। একটি ঝাঁকার চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কেজি পরিমান মাছ বহন করা সম্ভব হয়।

খালুই : এটিও তৈরি হয় বাঁশের সাহায্যে। এর আকৃতি অপেক্ষাকৃত ছোট। এর তলার ভাগ চারকোণাকৃতির কিন্তু ওপরের দিক গোলাকার। উল্লেখ্য যে, বাংলার লোকসমাজে পেশাজীবী যে শ্রেণির মানুষ কুলো, চালুন তৈরি করে থাকে তারাই সাধারণত ঝাঁকা ও খালুই তৈরি করে।

তথ্যনির্দেশ

১. বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, ময়মনসিংহ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৫৬৬
২. ড. মুহম্মদ আব্দুল জলিল, লোকবিজ্ঞান ও লোকপ্রযুক্তি, রাজশাহী, ২০০৪, পৃ. ২১
৩. মো. আব্দুর রব, পিতা-এনামুল হক, গ্রাম-দলদলি, পোস্ট-ভোলাহাট, উপজেলা-ভোলাহাট, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৬৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-প্রাথমিক, সংগ্রহের তারিখ-১৫.১২.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৪. মো. আজিজুল হক, পিতা- সেকান্দার আলী, গ্রাম- ছত্রাজিতপুর, পোস্ট- ছত্রাজিতপুর, উপজেলা-শিবগঞ্জ, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৬১ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-প্রাথমিক, সংগ্রহের তারিখ-১৬.১২.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৫. মো, আব্দুর রহমান, পিতা- সলিম উদ্দীন, গ্রাম- বহালাবাড়ী, পোস্ট- ছত্রাজিতপুর, উপজেলা-শিবগঞ্জ, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৫৪ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-প্রাথমিক, সংগ্রহের তারিখ-১৬.১২.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা
৬. ফাইজুর রহমান মানি, পিতা-মরহুম ইউনুসুর রহমান, মাতা-উমরাতুন নেসা, হাসপাতাল রোড, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ,

www.pathagar.com

বয়স-৪৯ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ-২৬.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

৭. মো. জামালুল ইসলাম, পিতা- মো. নজরুল ইসলাম, মাতা- মোসাঃ সুফিয়া বেগম, গ্রাম- দাদনচক, ডাকঘর- আদিনা কলেজ, উপজেলা-শিবগঞ্জ, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৩৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২৫.১২.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৩:০০ টা

৮. ফাইজুর রহমান মানি, পিতা-মরহুম ইউনুসুর রহমান, মাতা-উমরাতুন নেসা, হাসপাতাল রোড, পোস্ট- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৪৯ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২৬.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

৯. মো. জামালুল ইসলাম, পিতা-মো. নজরুল ইসলাম, মাতা-মোসাঃ সুফিয়া বেগম, গ্রাম- দাদনচক, ডাকঘর-আদিনা কলেজ, উপজেলা-শিবগঞ্জ, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৩৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ২৫.১২.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৩:০০ টা

১০. প্রশান্ত কুমার পাল (গোপাল), মিলন পাল, পিতা-রতিকান্ত পাল (ঝড়ু পাল), মাতা- পূর্ণশশী পাল, গ্রাম- বারোঘরিয়া, পোস্ট- বারোঘরিয়া, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স- ৬৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- উচ্চমাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ-২৬.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

১১. মিলন পাল, পিতা-রতিকান্ত পাল (ঝড়ু পাল), মাতা-পূর্ণশশী পাল, গ্রাম-বারোঘরিয়া, পোস্ট- বারোঘরিয়া, উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৫৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ-২৬.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা

১২. প্রশান্ত কুমার পাল (গোপাল), পিতা-ঝড়ু পাল, গ্রাম-বারোঘরিয়া, পোস্ট-বারোঘরিয়া, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৬৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- উচ্চমাধ্যমিক, সংগ্রহের তারিখ-২৬.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

১৩. মিলন পাল, পিতা-রতিকান্ত পাল (ঝড়ু পাল), মাতা-পূর্ণশশী পাল, গ্রাম-বারোঘরিয়া, পোস্ট-বারোঘরিয়া, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৫৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ-২৬.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৪:০০ টা

১৪. মো. আব্দুর রব, পিতা-এনামুল হক, গ্রাম-দলদলি, পোস্ট-ভোলাহাট, উপজেলা-ভোলাহাট, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৬৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-প্রাথমিক, সংগ্রহের তারিখ- ১৫.১২.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

১৫. তরিকুল ইসলাম, পিতা-হুমায়ুন কবির, মাতা-রাজিয়া বেগম, গ্রাম-সাগরইল, পোস্ট- আক্কেলপুর, উপজেলা-গোমস্তাপুর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৪৬ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতকোত্তর, সংগ্রহের তারিখ-২৬.১১.২০১৩ খ্রি., সময় সকাল ১০:০০ টা

১৬. মো. শামসুদ্দিন, পিতা-মরহুম লোকমান বিশ্বাস, মাতা-মরহুম হাসিনা বেগম, গ্রাম- মহারাজপুর, পোস্ট-মহারাজপুর, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বয়স-৪৭ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতকোত্তর, সংগ্রহের তারিখ-২৬.১১.২০১৩ খ্রি., সময় বিকেল ৫:০০ টা

www.pathagar.com

লোকভাষা

যে কোন অঞ্চলের প্রকৃত পরিচয় সে এলাকার সংস্কৃতির সঙ্গে যেমন জড়িত, তেমনি জড়িত সেই এলাকার আঞ্চলিক বা উপভাষার সঙ্গেও। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় নিয়ে আলোচনার শেষ করার আগে এখানকার আঞ্চলিক ভাষা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

নবাবগঞ্জের উপভাষা নিয়ে আলোচনার পূর্বে আমাদের মনে রাখতে হবে যে এখানকার উপভাষার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা ও জঙ্গীপুর মহকুমা, পূর্ণিয়া ও মালদহের আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে অনেকটাই সাদৃশ্য রয়েছে।[১] কারণ পদ্মানদীর উভয়তীরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা ও জঙ্গীপুর (লালগোলা) মহকুমা অবস্থিত। অঞ্চলগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা এবং আত্মীয়তা গোত্র কুটুম্বতায় সংশিষ্ট হয়ে পড়ার ফলে এবং রাজা-বাদশাহদের গমনাগমনের ফলে এখানকার মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণ ঘটতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সকল ভাষার একটি বিকৃত সম্মিলিত রূপ গড়ে ওঠে। তাই এখানকার ভাষার কোন উৎসমূল খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন আছে আরবি-ফারসি, তেমনি আছে হিন্দি, খোট্টা, মৈথিলি; এমনকি উপজাতীয় ভাষাও এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট।[২] মুর্শিদাবাদের কথ্যভাষার সঙ্গে নবাবগঞ্জের উপভাষার সাদৃশ্য থাকার একটি প্রধান কারণ হচ্ছে– নবাবরা প্রায় শিকারে আসতেন এখানে। আবার আলীবর্দী খান (রাজত্বকাল ১৭৪০-৫৬ খ্রিষ্টাব্দ) গোদাগাড়ীতে অস্থায়ী রাজধানী স্থাপন করেন। সেসময় বর্গীর ভয়ে অনেক ব্যবসায়ী ধনি ব্যক্তি মুর্শিদাবাদ থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রহনপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী প্রভৃতি স্থানে এসে বসতি স্থাপন করেন। তাই এই অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে মুর্শিদাবাদের উপভাষার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।[৩]

চাঁপাইনবাবগঞ্জের উপভাষায় আরবি, ফারসি ও হিন্দির বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়। এরও একটি কারণ রয়েছে। নবাবগঞ্জ অবিভক্ত মালদহ জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। মালদহ জেলার এক সীমা পূর্ণিয়া ও অন্যসীমা অবশ্য পদ্মাপারে মুর্শিদাবাদে পড়তো। মুর্শিদাবাদ ও পূর্ণিয়া বিহারের সংলগ্ন হিন্দি ভাষা-ভাষীদের যাতায়াত ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে মালদহের এতদঞ্চলে খুব বেশি ছিল। বিহার, মুর্শিদাবাদ, মালদহ নানা বিষয়ে অনেকদিন পূর্ব থেকে যোগাযোগ সূত্রে আবদ্ধ ছিল বলেই বিহারের হিন্দি এবং গৌড়ের মুসলিমদের বহুকাল রাজত্বের দরুণ এখানে আরবি, ফারসি ভাষার প্রচলন হয়। কিন্তু এসব ভাষা পরবর্তীকালে বিকৃতভাবে উচ্চরিত হওয়ায় সেগুলো যে কোনো ভাষা তা নির্ণয় শক্ত হয়ে পড়ে।[৪]

ডক্টর আবদুর রহিম [illegible] চাঁপাইনবাবগঞ্জের কথ্যভাষাকে গৌড়ীয় উপভাষা বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর [illegible] প্রারম্ভকালে বাংলাদেশের রাজধানী

ছিল গৌড়। এই গৌড় বর্তমান মালদহ জেলায় অবস্থিত। লক্ষ্মণ সেনের নামানুসারে এর অন্য নাম লক্ষণাবতী। যেহেতু আলোচ্য উপভাষা মূলত অবিভক্ত মালদহ জেলার কথ্যভাষা, সেহেতু অন্য নামের অভাবে এ ভাষাকে 'গৌড়ীয় উপভাষা' নামে অভিহিত করাই সঙ্গত হবে।[৫]

চাঁপাইনবাবগঞ্জের উপভাষার ধ্বনিগত রূপ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরা হলো।

ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ

স্বরধ্বনি : শিষ্টভাষার মূল স্বরধ্বনিগুলো এ ভাষার বাক-প্রবাহে শব্দের সামগ্রিক উচ্চারণে নানাবিধ পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে শিষ্টভাষা থেকে এ ভাষার উচ্চারণে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এই পরিবর্তন বেশির ভাগই শব্দের আদি ধ্বনিতেই হয় এবং এক্ষেত্রে স্বরসঙ্গতির নিয়মই অনুসৃত হয়ে থাকে।[৬]

ক. নবাবগঞ্জের কথ্যভাষায় কখনো কখনো আদি 'ই' ধ্বনি 'এ' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। যথা–লিচু>লেচু, ইদুর>এন্দুর, সিদুঁর>সেন্দুর ইত্যাদি।

খ. এ ভাষার আদি 'এ' ধ্বনি প্রায়ই 'এ্যা' হয়। যথা– তেল>ত্যাল, মেঘ>ম্যাঘ, বেল>ব্যাল ইত্যাদি।

গ. আদি 'এ' কখনো কখনো 'আ' হয়। যথা– বেগুন>বাগুন।

ঘ. 'এ' কখনো কখনো 'ই' হয়। যথা ঢেঁকি>ঢিঁকি, গেলা>গিলা ইত্যাদি।

ঙ. আদি 'এ্যা" এবং 'আ' ধ্বনির কোনরূপ পরিবর্তন হয় না।

চ. আদি 'অ' কখনো কখনো 'এ্যা' হয়। যথা– কলা>ক্যালা। আবার কখনো 'এ' হয়। যথা– তবে>তেবে।

ছ. আদি 'ও' ধ্বনি প্রায় ক্ষেত্রে 'উ' হয়। যথা–ঘোচা>ঘুঁচা (খুলে দেয়া), বোচা>বুঁচা, মোটা>মুটা ইত্যাদি।

জ. 'ও' কখনো কখনো 'অ' হয়। যথা– ওর>অর, ওকে>অকে ইত্যাদি।

ঝ. শব্দের আদিতে 'ই' ধ্বনি থাকলে পরবর্তী অক্ষরের 'আ' ধ্বনি 'এ্যা' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন- মিঠা>মিঠ্যা ফিতা>ফিত্যা, হিসাব>হিস্যাব ইত্যাদি।

ঞ. বাংলা প্রায় সব আঞ্চলিক ভাষায় অপিনিহিতির প্রাধান্য থাকলেও চাঁপাইনবাবগঞ্জের উপভাষার অপিনিহিতির প্রাধান্য খুব কম। তবে অপিনিহিতির মতো একটা স্বর এলেও তার উচ্চারণ পরিপূর্ণ বোঝা যায় না। যথা– করিরা>কইরা> কর‍্যা। ড. আব্দুর রহিম খোন্দকার তাই এই অপিনিহিতিকে 'অর্ধ-অপিনিহিতি' বলে উল্লেখ করেছেন।[৭]

ব্যাঞ্জন ধ্বনি

ক. চাঁপাইনবাবগঞ্জের উপভাষার শিষ ধ্বনির মধ্যে একমাত্র 'স' এর উচ্চারণ হয়। যথা–সীত, সিয়াল, বিসাদ ইত্যাদি

www.pathagar.com

খ. শব্দের আদিতে 'ন' থাকলে উচ্চারণ 'ল' হয়। যথা– নগদ>লগদ, নতুন>লতুন, নষ্ট>লষ্ট, নবাবগঞ্জ>লবাবগঞ্জ ইত্যাদি। আবার এর বিপরীত দেখা যায়। যেমন-লেবু>নেমু, লেজ>নেজ ইত্যাদি।

গ. মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষার মতো 'ই' মহাপ্রাণতা এ উপভাষায় অধিক পরিমাণে দেখা যায়। যথা– বউ>বহু, সই>সহি, রুই>রুহি, বিয়ে>বিহ্যা ইত্যাদি।

ঘ. শব্দের মধ্যে ও অন্তে অনেক সময় 'হ' ধ্বনির অকারণ আগম ঘটে। যথা– ১) শব্দের মধ্যে– গম>গহম, মসজিদ> মহজিদ ইত্যাদি।

শব্দের অন্তে- জোলা> জোলহা, বোলা>বোল্‌হা ইত্যাদি।

ঙ. কখনো কখনো 'হ' বিশিষ্ট হয়ে উচ্চারিত হয়। যেমন- কাঁঠাল>কাঁহাটাল, ভানা>বাহানা ইত্যাদি।

চ. কখনো কখনো 'র' ধ্বনি লুপ্ত হয়, কখনো কখনো আগম ঘটে। যথা–রুটি>উটি, রসুন>ওসুন আর উই>রুই (পোকা)।

ছ. 'ক' ধ্বনি কখনো কখনো 'খ' আবার কখনো 'গ' হয়। যেমন- নাকো>নাখো, শাক> শাগ ইত্যাদি।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত আঞ্চলিক শব্দের তালিকা

* পঁহাত– সকাল
* খইল্যা– অলস
* বিহ্যা– বিয়ে
* কান্টা– বাড়ির পেছনের মফস্বল জায়গা
* লোগ– আঙ্গুল
* কান্দা– কাঁদা
* কাজিয়া– দ্বন্দ্ব
* নাইড়্যা– পাছা/ পেছন
* টপকা– লাফ দেয়া
* ওইষোধ– ঔষুধ
* তাম্‌সা– তামাসা
* অরা– ওরা
* লাক– নাক
* লোদ্দি– নদী
* চান্দাড়– বারান্দার চালার নিম্নাংশ
* মজাক (করা)– রসিকতা (করা)
* চিৎ বস্তর– বাসন কোশন
* মটকা– চূড়া/ শিখর
* বাভুন– বামন

* লাপিত– নাপিত
* হালবাহা– বলদ দিয়ে চাষ করা
* লাহারি– নাস্তা
* পাইঠ– মজুর
* লোঘি– লোগি
* কুঢ়োল– কুড়াল
* লোকড়ি– জ্বালানী/ খড়ি
* লড়ে– নড়ে/নড়াচড়া করে
* লাত–লাথি
* ঘিনাহা– ঘিনঘিনে/ কদাকার
* সাধা– সাদা/সাধন করা/লালন করা
* খাইদ– খাদ্য
* ছ্যান্দা– ছিদ্র
* দুয়া– দোয়া
* আন্ধার– আঁধার/ অন্ধকার
* ঢ্যাকা– ধাক্কা
* ঢ্যাল– ঢিল
* ভটকা– পটকা
* বাইহা– বাঁকা/বক্র/খারাপ
* বাগুন– বেগুন
* কান্ধা– কিনারা/ধার
* কাইয়া– কাক
* সোনার– স্বর্ণকার
* কামার– কর্মকার
* নিন্দ– ঘুম/ নিদ
* বুঞ্জা– বোঁজা
* পাত– পাতা
* সন্ধ– সন্দেহ
* গিথানা– গৃহিণী/ গিন্নি
* শিথান– বিছানার মাথার দিক
* পইথান– বিছানার মায়ের দিক
* ডাহি/আহি ড়াহি– যন্ত্রণা/ জ্বালা
* বান্ধন– বাঁধন
* লাতি– নাতি
* লাহি– নাভি
* পোতা– নাতি (ছেলের ছেলে)

www.pathagar.com

* পুতিন– নাতনি (ছেলের মেয়ে)
* জাগা– স্থান/জায়গা/জগরণ
* দিগদারী– বিরক্তি/ ছটফটি
* বর্তন– বদনা
* খাস্তা/খাস্তানা– ক্লান্তি
* টাটি– বাঁশ ও কঞ্চি দড়ির তৈরি দেয়াল
* লহু– রক্ত
* বান্দর– বাঁদর
* খ্যামতা– ক্ষমতা
* আইধোর– আধিয়ার
* বল– বলদ
* গাই– গাভী
* খ্যাড়– খড়
* সালুন– তরকারি
* সান্দ– সন্ধ্যা বেলা
* পাটখড়ি– পাটের খড়ি
* বহিন– বোন
* পাটা (বুকের)– সাহস
* উভুড়/পট হওয়া– উপুড় হওয়া
* মিছা– মিথ্যা
* বকন– গাভীর মেয়ে বাছুর
* রাইত– রাত
* কাইত– কাত
* তড়ফে উঠা– লাফিয়ে উঠা
* তিখড়ে উঠা– উত্তেজিত হয়ে উটা
* তিষষা– তৃষ্ণা
* ভোক– ক্ষুধা
* সানা– ভর্তা
* লোলি– টুঁটি/ গলা
* সহা– সহ্য করা/ বন্ধু
* ডহার– সরান/ রাস্তা (গ্রামের)
* ছুট্ট/বিদনী– ছোট্ট/ ক্ষুদ্র
* সইলতা– সলতে
* পইলতা– পলতে
* চ্যারাক– চেরাগ
* টুঁটি–চূঁড়া/শিখর

www.pathagar.com

* ছাটা বাটা লেওয়া– আশেপাশে থাকা
* বিহাদারী– বিবাহিত
* মাইর মহিম– মারামারি
* ঠোঁ ঠোঁ করা– তর্ক করা
* গাভীন হওয়া– গর্ভবী (পশু) হওয়া
* আন্দাড়ী– আনাড়ী
* কইল্ল্যা– কর্লা
* ক্যালা– কলা
* খাইসটা– রুক্ষ/ কর্কশ
* পোল্লা– পটল
* গাহাক– গ্রাহক
* গলি– উঠান
* লককইরা– চুপ করে/ চুপিসারে
* কুদ্দা– লাফা/ লাফানো
* হ্যালা– সাঁতার/ সাঁতার কাটা
* ঠোঁ ঠোঁ করা– তর্ক করা
* পাঞ্জর– পাঁজর
* আইসো– এসো
* ঢুঁড়া– খোঁজা/ খোঁজ করা
* শোঝ (করা)– শোধ (করা)
* ছাইলা– ছেলে
* মুনসাড়ে মুনসাড়ে– মনে মনে/ গোপনে
* ঝড়া ফিরা– পায়খানা করা
* দুপ্পহর– দুপুর
* ভাটি বেলা– বিকাল বেলা
* আইগনা– আঙিনা
* পুইব্যা– পূর্ব দিককার
* সন্ধার বেলা– সন্ধ্যা বেলা
* তিত্তা– তিতা/ তেতো
* চিক্যাশ– সূর্য
* হামি– আমি
* হামরা– আমরা
* বৈশাগ– বৈশাখ
* ঘাঁটা– পথ
* বিসিদ্বার/ বিসপোইতবার– বৃহস্পতিবার
* শুককর বার– শুক্রবার

www.pathagar.com

* চ্যাংড়া– বাচ্চা/ অল্প বয়স্ক যুবক
* টাপমারা– দৌড়া/ দৌড়ানো
* সোঝা– সোজা
* বুঝসুজ– বোঝাপড়া/ পরামর্শ
* ক্যাদ্দানি– কেরামতি/ ক্ষমতা
* গইঢ়্যা– গর্ত
* আলা– আলো
* উটি– রুটি
* কচ্চুল– চামচ
* দেহেলি– দেউড়ি/ ভিটা
* আবাস্তা– অবস্থা
* তামাল– তামাম
* লিঠুর– শক্ত/ নিষ্ঠুর
* ছ্যাঁচা– সেচন করা
* ছ্যাঁচ্চা– সত্য
* পুছ করা– জিজ্ঞেস করা
* বাস্‌না– গন্ধ
* পাটাল– পাড়, ধার
* ছিছছিড়িয়া– দ্রুততার সাথে (দৌড়)
* মাঞ্জা– পরিষ্কার করা
* ঠাণ্ঠা– ঠাণ্ডা
* জাড়– শীত/ ঠাণ্ডা
* শরিল– শরীর
* বাড়ি আলা– বাড়িওয়ালা
* বাড়ি আলি– স্ত্রী/ গৃহিণী
* বহু– বৌ
* জাঁওই– জামাই
* গীদ– গীত
* গাহা– গান গাওয়া
* গাহা– দড়ির খাট ছাওয়া/ গাঁথা
* পেসাব– প্রস্রাব
* মুতা– প্রস্রাব করা
* হাগা–পায়খানা করা
* হাইথার– অস্ত্র/ ধারালো বস্তু
* চালা করা– কথাবলা/ সাড়া দেওয়া
* হিল্লা– আশ্রয়

www.pathagar.com

* চাল্লাক- চালাক
* চাছা- চাচা
* চাছি- চাচি
* অরঘে- ওদের
* মন্দানী- শক্তি/ ক্ষমতা
* পইচ্ছা- পশ্চিমা
* কিরমিশে কিরমিশে- ক্রমে ক্রমে
* হুলুক- হ্যাংলা
* আইবারি- ঘটক
* পই[illegible]- সংস্পর্শ
* গি[illegible]- হাল্কা অহংকার (অনুরাগ মিশ্রিত)
* গিলাস- গ্লাস
* ইনকার করা- অবজ্ঞা করা
* উনকি ঝুনকি- ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়/ বস্তু
* ঘষ্টা- ঘর্ষণ
* [illegible]- মহিষ
* গন্ধান- গন্ধ
* পইরোশ- প্রশংসা
* কিরপিন- কৃপণ
* গোঙা- কালা
* বহিরা- বধির
* ন্যাংড়া- খোঁড়া
* গিবত- দুর্নাম
* ডোভা- গর্ত/ নীচু জায়গা
* উঁচ্চা- উঁচু
* লাম্ভা- লম্বা
* ডুলি বিবি- বরের মহিলা সাথী
* বোল- গামলা/বুলি
* ডোল- বালতি
* ছালা- বস্তা
* গহাম- গম
* চাইল- চাল
* ডাইল- ডাল
* বাসি ভাত- পান্তা/ ঠাণ্ডা ভাত
* রামপটল- ঢেড়স
* লসুন- রসুন

www.pathagar.com

* হলোইদ- হলুদ
* আখা- চুলা
* ঠেঠি- শাড়ি
* কাঁহাটাল- কাঁঠাল
* তারাজু- দাঁড়িপাল্লা
* হাইলকা- হাল্কা
* উবকার- উপকার
* সোতে- সাথে
* প্যাট- পেট
* লজর- নজর
* বুট- ছোলা/ বাদাম
* লা- নৌকা
* হাইলে হাইলে- আস্তে আস্তে
* হাইল- হাল(নৌকা/ গরুর)
* পেরেম- প্রেম
* ভেজাল (করা)- সমস্যা (করা)
* কপাট- দরজা
* কুনি- নখ
* ভোগা দেওয়া- ফাঁকি দেওয়া
* থালি- থালা
* হটাস- হঠাৎ
* জরম- জনম/ জীবন/ জন্ম
* পোইখ- পাখি
* লাপা- মাপা
* চোপা- মুখ
* সাহার- সার
* গোশসা- রাগ/ দুঃখ
* সাহার- ঝাঁটা
* বঁড়াই- অহংকার
* বেঁড়ি- বিড়ি
* চিনহা- চেনা/ পরিচিত
* চিনহার- পরিচয়/ পরিচিত
* কুনঠে- কোথায়
* গুড্ডি- ঘুড়ি
* পদ্দা- পর্দা
* লিশান- নিশানা/ লক্ষ্য

www.pathagar.com

* লাকমাছি– নাকফুল
* জাফত– জিয়াফত/ দাওয়াত
* কিরয়া (খাওয়া)– শপথ (করা)
* পিন্ধন– পরণ
* কাইল্যা– কালো
* ঢুডডা– বেকার/ ভবঘুরে
* বৈরাতি– বরযাত্রী
* কাঁকই– চিরুনি
* জমিজিরাত– জমিজমা
* বিছান– বিছানা
* গা ধুয়া– গোসল করা
* মুনজা– মোজা
* বুনজা– বোঁজা/ বন্ধ করা
* জুত্তা– জুতা
* গারকাপড়– গায়ের চাদর
* মিত্তু– মৃত্যু
* খ্যাঁখড় (দেওয়া)– ধমক (দেওয়া)
* হ্যালসা– দুর্বল/ শক্ত নয় এমন
* খাড়ো হওয়া– দাঁড়ানো
* ডির– সোজা (উঁচু)
* বিছন– বীজ
* ন্যাঞ্জ– লেজ
* সুতা– শোয়া/ শয়ন
* রাহি– পথিক
* ত্যানা– ন্যাকড়া
* তহমন্দ– লুঙ্গি
* সোঠা– সোডা
* সাবু– সাগু
* খেড়ু– খেলোয়াড়
* জানজি আইড়্যা– জীবন দিয়ে/ প্রাণপনে
* নোনদা– গোবরের ঘুটা
* পসন– পছন্দ
* বোধক– বোদ্ধা/ ভারি
* ঠসা– বধির
* তাতা– গরম
* কুসিঝ্যা– অসিদ্ধ

www.pathagar.com

* রাইত উছুর– রাতের বেলা
* ভককইরা– চট করে/ দ্রম্নত
* চখরাপখরা– বিচিত্র রঙের
* খিদিবিদি– বিরক্তি
* কান্ধাড়– ধার/ কিনারা
* পুষ মাস– পৌষ মাস
* ভ্যাসলা– ভ্রুকূটি (করা)
* বিদড়া– ভ্রুকূটি (করা)
* হাইম (তোলা)– হাই (তোলা)
* ভীড়ভীড্ড– হৈ চৈ/ প্রতিযোগীদের হাতাহাতি/ মুখোমুখি/ হৈ হুল্লোড়
* খাংতি– কমতি/ ঘাটতি
* কাচ্চিম– কাছিম/ কচ্ছপ
* লাদ– গরুর/ মহিষের মল
* লাদি– ছাগল/ ভেড়ার মল
* গু– মল
* পুস্তা– ঘরসংলগ্ন পিছনভাগ
* নেমু– লেবু
* বাঁইট্যা– বেঁটে/ খাটো
* বেরেঞ্চি– বেঞ্চ
* গাঞ্জি– গেঞ্জি
* গুমান– অহংকার
* গুমানী– অহংকারী
* আবাদশাসন– চাষাবাদ
* গিরোস– গৃহস্থ
* গাইরোস্তালি– গৃহস্থালি
* (হামার) চাইহ্যা– (আমার) চেয়ে
* কইটা– কৌটা
* ভালোবাসা– প্রেমিক/ প্রেমিকা
* কাসটানা– পক্ষপাতিত্ব
* কাসটনাটানি– পক্ষপাতিত্ব করা
* গুঁহির– গভীর
* তানতাসির– চেহারার হাবভাব
* আশায্য– আশ্চর্য
* টিকলি–টিপ
* লাপ– মাপ
* ছুপ– থুথু

www.pathagar.com

* বিলাই– বিড়াল
* দুবড়া– দুর্বা
* লাড়ি– নাড়ি
* ল্যাপা– লেপন করা
* ছিনহ্যার– ছিনাল
* ছোড়াং– চাবি
* দহি– দই
* ঝুঝকি ভোর– অতি ভোর
* ধীশব্দ গীরস– শক্তিশালী অবস্থাপন্ন নামজাদা গৃহস্থ
* পৈখোর– পুকুর
* হুজ্জত– জিদ
* কুশকুইশ্যা– মিশমিশে (কালো)
* বইত্যা যাওয়া– খুশি হয়ে যাওয়া
* ঝইটন– আবর্জনা
* ঘুগরি ঘুগরি চুল– কোঁকড়ানো চুল
* বাইহ্যা ইচ্ছা– বদমাইস
* কইলজা– কলিজা
* মাংতার– ভিখারী
* বাঐ– বাবুই (পাখি)
* ভাতার– স্বামী
* ডাহিন– ডান
* বাঁই– বাম
* পাল্লা– দাঁড়িপাল্লা
* খিঁচ্চা– কচি/ কাঁচা
* ফাড়া– চেরাই করা
* ফাঁড়া– বিপদ
* সিঁথ্যা (করা)– চুল আঁচড়ানো/ সিথি (করা)
* ডেড়হ্যা– বাঁকা/ সহজ নয় এমন
* পুঞ্জি– পুঁজি
* তড়িক– পর্যন্ত
* দিঘলা– দীঘল/ দীর্ঘ
* ছুত্রি (শাগ)– সজিনা (শাক)
* মাধা– মোটা বুদ্ধি/ নির্বোধ
* মহকন– গন্ধ (মিষ্টি)
* মহাকইন্যা– সুগন্ধি
* ছত্তিশ্যা– ছলনাময়/ ময়ী

www.pathagar.com

* ছতরবাজী– চতুরালী
* মাইয়া– স্ত্রী/ স্ত্রীলোক
* শিল্লোক– স্ত্রীলোক
* পোথলা– পুতুল
* হাঁজি– কীজ্বি/ আছেন কি
* মাগে– মাগো/ মাজি
* পঘলানো– পাকানো/ রাজি করা
* খাড়ো মনে– খাড়া ভাবে
* খাসলত– অভ্যাস
* বয়সাল– বয়স্ক
* লাছা– নাচা
* গিরাইটা– বক্র/প্যাঁচানো/ জটিল
* পঁহচ– চৌছা
* হুব– সাহব/ উৎসাহ
* টাইহা ট্যাপরা– সুডৌল নয় এমন বস্তু বা শরীর
* প্যাটভর (লোক)– পেটুক লোক
* প্যাট ভাতা– শুধু ভাত খেয়ে কাজ
* দিন ভইর– সারাদিন (ধরে)
* লিহর– শিশির
* দোস্তালি– বন্ধুত্ব
* পাথোল্যা মনে– পাশাপাশি ভাবে
* হাঁইস্যা– হাঁসুয়া
* হাইসাল– হেঁসেল/ রান্নাঘর
* রান্ধা/আন্ধা– রান্না করা
* বনঝা– বন্ধ্যা
* দবদবা– প্রভাব
* চোটে (ভয়ের চোটে)– জোরে/ কারণে/ ঠেলায়
* বাতা (চালের)– বাতি
* ডাহা– নির্জলা
* ল্যাহাজ– লজ্জা
* ফইজ্জত– ইজ্জত
* শীলসরম– লজ্জাসরম
* চক্ষুশীল– চোখের লজ্জা
* ব্যাবাক– তামাম/ সমস্ত
* কুল্লে– মোটে
* তালাম– তামাম/ সমস্ত

www.pathagar.com

* সভাই– সবাই
* গোঁসা/ গোঁশসা– রাগ/ অভিমান
* গুস্টি– গোষ্ঠী/ বংশ
* ফিটফিট্যা– ধবধবে
* রা কাড়া– কথা বলা
* কাইড়্যা লেওয়া– কেড়ে নেওয়া/ ছিনিয়ে নেওয়া
* ফাইজলামু– রসিকতা
* তিক করা– লক্ষ স্থির করা
* তিরফুট (রোদ)– ঝকঝকে (রোদ)
* লাগাদ– নাগাদ/ পর্যন্ত
* দামাইঠ্যা– শক্তিমান/ সবল/ জোরাল
* ভুঠাইরা– সবল/ জোরাল/ শক্তিমান
* ঢুঁড়া– খোঁজা
* চিমস্যা– কষা/ কিপটে
* ডাওর– লাগাতার বর্ষা
* ঠাহর– ঠাণ্ডা/ ধীর/ শান্ত
* পশন– পছন্দ
* লগদ– নগদ
* পহার– প্রহর/ সময়
* কুইড়্যা– কুঁড়ো/ অলস
* সুদ্ধা– সহ/ সহকারে
* হাঁকা– হাঁকিয়ে দেওয়া
* ভাঁকা-চুকা– বাচ্চাদের খেলার হাঁড়ি বাসন
* তীতকুট– তিতা
* বাতাল– আবাদ
* ভ্যাদ ভ্যাদ করা– বকবক করা
* ভ্যাকভ্যাক করা– বকবক করা
* কুঁকড়ি মুকড়ি– কুঁড়ি সুঁড়ি
* ওলাহ্– বুট/ মটরের গাছসহ পোড়া ফল
* কিসিম– প্রকার/ রকম
* ভুটপড়া– বাতিল হওয়া
* গাহাবাজা– কথাবার্তা/ প্রচার
* বকরী– ছাগল (স্ত্রী/পুরুষ)
* হাইল্যান– ছাগল (স্ত্রী)
* নমস্কারী (কথা)– অহেতুক বানানো ভদ্রোচিত কথা/ ব্যবহার
* লগে ভগে– আশেপাশে

www.pathagar.com

* ভোগরাভোগরি/ভুগরি– মিছামিছি/ ফাঁকিবাজি
* হালি– সদ্য
* চাঁইড়্যা (ধরা)– তুলে ধরা
* বুক চিওঁড়ি– বুকের চুল (পুরুষ)
* আনাজ– খাদ্যশষ্য
* কাহানি– কাহিনি/ গল্প
* টুহুটুহু (লাল)– টুকটুকে লাল
* কুন্দা ফান্দা– লাফালাফি
* থোড়া– অল্প
* ট্যাঁড়– বাঁকা/বক্র
* কুরকুইঠ্যা– বয়স্ক কিন্তু আকারে ছোট/ বর্ণচোরা
* কুচলা– জটিল
* ক্যাচাল– সমস্যা
* মরদ– মর্দ/ পুরুষ/ স্বামী
* মহাক– সুগন্ধ
* পুটঠি– শক্ত সবল
* ভুটকি– পাছা/ পেছনভাগ
* গুঁড়ি কাটা– গোপনে/ দুর্নাম করা/ দুশমনি করা
* গাবাড়– গর্ত
* গাবান– উত্তম মধ্যম
* দাবড়ান– উত্তম মধ্যম
* মরচুন মুখা– শুষ্ক/ বিমর্ষ মুখা
* দামান/ দামান্দ– স্বামী
* রহ্– থামো/ অপেক্ষা করো
* প্যারাই– বাচ্চা গরু (পুঃ)
* বকন/ বকনা– বাচ্চা গরু (স্ত্রী)
* দামড়া– বাচ্চা গরু (পুঃ)
* প্যাটপালা– পেটে খাওয়া
* কাত্তি– দা এর ছোট সংস্করণ
* লাহা লাহা– শক্ত শক্ত
* রুয়া রুয়া– মূল মূল
* ভোগনপোইত– ভগ্নিপতি
* বুহুনু– দুলাভাই
* খাইদ– খাদ্য
* আগামারা– পেছন থেকে আগে যাওয়া
* বৈশাড়ী কাজ– বসে বসে কাজ
* হাংকার– আকাংক্ষা/ প্রবল ইচ্ছা

www.pathagar.com

* গোটারাই– সারারাত
* অপরুব– অপদার্থ
* নুনছা– নোনতা
* আইন্না– আলুনা/ নুনের অভাব
* খোটঠি– অন্তরণ (ঘায়ের)
* কুখড়াকুখড়ি– দ্বন্দ্ব/ ঠেলাঠেলি
* ভানী– ভাবী
* চ্যাংড়া ছুল্লু– ছন্নছাড়া অল্পবয়স্ক ছেলে
* ছুল্লুমার– বদমাইস/ শয়তান
* পচকাইট্যা– পচা/ ষড়া
* পচ্চা– পচা
* জোর কইর‍্যা– বলপূর্বক
* হাঁকরা– চিৎকার করা
* জোগা– পাহারা দেওয়া
* গন্ধান– গন্ধ
* দগ্ধান/দগ্ধা– বিরক্ত করা
* লষ্ট– নষ্ট
* আঁহিকা– জীবন/ অন্তর/ হৃদয়
* ঢাকুন– ঢাকনা
* বইসা– চুলা থেকে হাঁড়ি নামিয়ে রাখার পাত্র
* দাইড়– বুড়ি ছাগল
* পাইছ্যা– ডালি
* তোড়া– তরাই (তরকারী)
* ধুমা– এক প্রকার তরাই (অুন্নত)
* আবাস্তা– দুর্গতি
* পুয়াল– গরুর খাওয়ার চারা/ শষ্য ডাঁটা
* কাঁড়ি– গরুর খাওয়ার চারা/ শষ্য ডাঁটা
* আহটি– আনন্দের নাচন/ মহানন্দের উচ্ছৃংখল প্রকাশ
* উ– ও/ সে
* ঢ্যাবরা– ফোলা/ ঢ্যাবরা পেট
* উজু– অজু
* গাইল (দেওয়া)– গাল (দেওয়া)
* ষড়া–পচা
* বিরকিনী– ক্ষুদ্র
* কাঁইহা– কৃপণ/ জটিল
* আঁইড়্যা– ষাঁড়
* পিরহ্যান– জামা

www.pathagar.com

* কাঞ্জি–বাসি/ এঁটো খাবার
* দিরম–দেরী/ বিলম্ব
* আঁহতে–আড়ালে/ গোপনে
* দোস্তালি–বন্ধুত্ব
* ছামছাম (করে)– ভাগ ভাগ করে
* বাইটক্যা– লম্পট
* চড়নদার– যাত্রী/ যিনি অন্যকে পিছে ফেলে উঠে যান
* টুঁটি– গলা
* গোলপিদার– গাল্পিক/ গল্পকার
* গোলকি– গোলকিপার
* টুকিমারা– উঁকি মারা
* লক কইর‍্যা– চুপ করে/ চুপিসারে
* মুচ্ছুদ্দি– দালালি
* সিনমারা– সিঁদ ফুটানো
* হককে– বিবেচনায়/ নিকটে
* ফ্যাচাং– প্যাঁচ লাগানো/ কুকীর্তি/ সমস্যা
* এনদুর– ইঁদুর
* অর– ওর
* অরঘে– ওদের
* হামারঘে– আমাদের
* টুয়াটিপা– গুঞ্জন/ গুঞ্জরণ
* ভ্যাবানো– ছাগলের ডাক/ চিৎকার
* ধপাস কইর‍্যা– হঠাৎ করে আছড়ে পড়া
* আঞ্জর পাঞ্জর– আশেপাশে
* ল্যাবড়া থ্যাবড়া– অগোছালো
* আইল্যা ঝাইল্যা– এলোমেলো/ যত্রতত্র
* টুকি ভুল্কি– গোপনে গোপনে উঁকি মারা
* ধলো– সাদা/ ফর্সা
* ছুছুন্দর– বদমাইস/ একপ্রকার গালি
* সটাং– সটান/ খাড়া
* কৃসিঝা– অসিদ্ধ
* রইহ্যা থাকা– থেকে/ দাঁড়িয়ে থাকা
* রহা– থাম/ ধৈর্য ধর
* রহা– গাভী/ স্ত্রী ছাগলের যৌন উত্তেজনা/ উত্তেজক অবস্থা
* পাল দ্যাওয়া– গাভী/ স্ত্রী ছাগলের যৌন ক্রিয়া ঘটানো
* হামলা/ হামলানো– গরুর চিৎকার (বিশেষ করে যৌন উত্তেজনায়)
* দহাসইত্যা– ভীষণণভাবে ক্লান্ত/ বিধ্বস্ত

www.pathagar.com

* ড্যাহাটা– কলঙ্ক/ দুর্ণাম/ ঝমেলাপূর্ণ সমস্যা
* কুকুর কাহিটালী– দ্বন্দ্ববিবাদ
* হ্যাবলা– হুঁশমোটা
* ট্যাঙা– টক
* ট্যারা– টেরা
* পানি কধু– লাউ
* নাকাল– নাস্তানাবুদ
* সুপারীকধু– মিষ্টি কুমড়া
* পোল্লা- পটল
* নাইড়্যা– পাছা
* সুফরী আম– পেয়ারা
* স্যাথড়া– দুর্বল/ শক্তিহীন
* চোপা (রাইত/দিন)– সারা (রাত/দিন)
* জ্বী হ্যাক হ্যাক (করা)– জ্বী বমি বমি (করা)
* সিধলা– স্যাৎ সেতে
* খটখইট্যা– প্রচণ্ড শুকনা
* তিরফুট (রোদ)– দুপুরের প্রচণ্ড রোদ
* কাঠা– চাল মাপার জন্য কৌটা
* খাম করা– নষ্ট করা
* অহার পহার– প্রতীক্ষা ধৈর্যহীন সময়
* হাঁকট পাঁকট– বমি বমি ভাগ/ উদ্বিগ্নতা
* মনে/মোহে– দিকে
* পাইছ্যা– ডালা/ ডালি
* চাঙ্গারি/ চাঙারি– ডালি/ ডালা
* ধামা– বড় আকারের ডালা
* সাঠা– গরু তাড়ানোর লাঠি
* লিকা/ লিকিয়ে (দেওয়া)– ছিলে (দেওয়া)
* গুন করা– জাদুকরা
* হাঁড়া– বড় মাটির পাত্র
* ঝাপানি– ঢাকনা
* সান্ধা– ঢুকা/ প্রবেশ করা
* উটি পাকা(কলাইয়ের)– রুটি তৈরি করা (কলাইয়ের)
* মিশাইল্যা– মিশ্রিত/ কলাই ও চালের আটা/ আটার রুটি
* খুরুটি– অনিয়ন্ত্রিত আনন্দ প্রকাশ
* প্যাট কষ্টা– পেট ব্যথা
* বিহ্যান– সকাল
* নোড়া/ পাটা– মসলা বাটার শীলপাটা

www.pathagar.com

* শিরোমাথা– উত্তরমাথা/ উত্তর দিক
* আজোগা–অবাস্তব
* আজাইড়্যা– উদ্ভট
* আঁকাইড়্যা– গোঁয়ার
* আতি জাওয়া/ জারুয়া– জারজ/ এক প্রকার নিকৃষ্ট গাল
* দোইদ্যা– বংশ
* ভ্যাকিয়ে যাওয়া– ভয় পেয়ে যাওয়া/ ভীত হওয়া
* ভাঁড়ুয়া– স্ত্রৈন
* ভোক লাগা– ক্ষুধা পাওয়া
* লাকড়ি– ভাত নাড়ানি (কাঠের)
* ডোই– ডাল নাড়ার কাঠের বড় চামচ বিশেষ
* লহলোট করা– আর্তনাদ করা
* লেহেলি– লেপ
* হাধানি– তরকারী ও হাত ধোয়ার পাত্র
* তস/কিচলি– হাত ধোয়ার পাত্র
* ছেঁচকি– ভাজা পোড়ার কাজে ব্যবহৃত ধারালো নাড়ালি
* খাবভাস– পেটুক
* ডাইবর‌্যাল– নোংরা
* লালচ– লোভ
* টাটানো– ব্যথা করা
* ড্যাহোড়– বার বার/ পুনরায়/ একে একে
* পাইলঠামু– রসিকতা
* বন্ধুতালি– বন্ধুতৃ
* লাড়া– নাড়া
* ছোটকা– ছোটটা
* বড়কা– বড়টা
* মাইঝল্যা– মেজো/ মধ্যমটা।[৮]

তথ্যনির্দেশ

১. আ.কা.শ. নূর মোহাম্মদ, নবাবগঞ্জ পরিচিতি, রাজশাহী জেলা কাউন্সিল, রাজশাহী, ১৩৭৩, পৃ. ১৯
২. মাযহারুল ইসলাম তরু, চাঁপাইনবাবগঞ্জের লোকসংস্কৃতি পরিচিতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২৮
৩. মহসিন আহমদ, নবাবগঞ্জের কথ্য ভাষা, নবাবগঞ্জ সাময়িকী, নবাবগঞ্জ, ১৯৬৪, পৃ. ১২
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
৫. ড. আবদুর রহিম খোন্দকার, গৌড়ীয় উপভাষা, সাহিত্যিকী, শরৎ-বসন্ত সংখ্যা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৩৮৮, পৃ. ১৬৬

www.pathagar.com

৬. আ.কা.শ. নূর মোহাম্মদ, নবাবগঞ্জ পরিচিতি, রাজশাহী জেলা কাউন্সিল, রাজশাহী, ১৩৭৩, পৃ. ২০
৭. ড. আবদুর রহিম খোন্দকার, গৌড়ীয় উপভাষা, সাহিত্যিকী, শরৎ-বসন্ত সংখ্যা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৩৮৮, পৃ. ১৬৬
৮. আঞ্চলিক শব্দসমূহ মোহাম্মদ ইব্রাহিম, পিতা-মরহুম সৈয়দ আহমদ বিশ্বাস, মাতা-মৃত মাহাতা বিবি, সহযোগী অধ্যাপক (অব.), ইংরেজি বিভাগ, নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জের নিকট হতে সংগৃহীত

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমী